CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সাপ্তাহিক বসুমতী

দেওয়ালী সংখ্যা

১৩৭৭

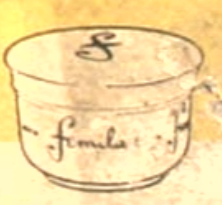

আমলা ব্রো

ঘরে ঘরে আজ শিশুরা
নতুন বেবী সোপ নিয়ে কানাকানি
করছে আর তা হল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

বেবী সোপ

প্রত্যেক মায়েরা চান এমন একটী বেবী-সোপ যার ব্যবহারে শিশুদের গাত্রত্বক কোমল, মোলায়েম ও স্নিগ্ধ রাখে। বেঙ্গল কেমিক্যালের বেবী সোপে এই সমস্ত গুণই বর্তমান—ঘরে ঘরে তাই এই সাবানের এত কদর।

কসমেটিক ডিভিসন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা।

মহাকালের বুকে নৃত্যরতা দক্ষিণাকালী

(নয়াদিল্লী ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি প্রাচীন চিত্রের অনুসরণে)

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]		১৬৩
উপন্যাস		
লক্ষ্মী	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	১৬৯
অতীন্দ্রিয় উপন্যাস		
প্রেতের দৃষ্টি	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৩
মিত্র সাহানা	— দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	১৯৩৭
বিশেষ নিবন্ধ		
মন্থে সবা কালিকাম্	— শ্রীগিরীন্দ্রশেখর সেন	১৯১
দীপান্বিতা উৎসব ও কালী পূজো	— ডঃ নরেন আচার্য	১৯৯১
ঃ জানাসি ভগং সর্বং	— রণজিৎকুমার সেন	১৯২৩
ভূতসেবে দীপান্বিতা	— বুদ্ধদেব গুহ	১৯৩৫
[illegible]		
আনন্দ সুন্দর		
একটি বালকের বিদ্যারম্ভ	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	
গল্প		
ফড়িং	— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	
ধূলিভূমি	— অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	
গল্পগাছা		
আমি কামড়ুয়াণ্ট লিখি	— সুবোধ সরকার	

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এস.সরকার
এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঐতিহাসিক জাতীয়-কাহিনী		
মুক্তা-সাহেব	— প্রদীপ চক্রবর্তী	
বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিক		
ক্রাইস্ট	— চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রবন্ধ		
জনশিক্ষার সমষ্টিমূলক ও স্বামী বিবেকানন্দ	— সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম যুগে	— আশা দেবী	১০২২
অন্নদাদের বুদ্ধিজীবী মহলের সংকট ও জিজ্ঞাসা	— মনোরঞ্জন হাজরা	১০৮১
সংঘের নির্বাচন ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ	— অসীম মুখোপাধ্যায়	
ঔপনিবেশিক লোকের অন্তিমকাল	— সন্তোষ ভট্টাচার্য	
রাজা ও রাজনীতি		
বিদ্রূপ ও বিদ্রূপী বুলির চুলকানি	— কৃত্তিবাস ওঝা	
সঙ্গীত-সমালোচনা		
বাজারে-গীতির উৎস ও তার পরিণতি	— নিতাই ঘটক	১০১৪
ক্লাসিক ও সঙ্গীত	— নীহারবিন্দু চৌধুরী	১০৪৭

With Compliments
from

K. L. (P) LTD.

H. O. : 8, Moore Avenue, Calcutta-40
71, CHITTARANJAN AVENUE (3rd Floor),
CALCUTTA-13
Phone : 23-6817

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোট-গল্পগুচ্ছ		
ইন্দ্রের সেই ছাত্রের গল্পটা দিনপঞ্জি	— আরবি	
কবিতা		
ধূলিপটে	— হেমেন্দ্র মিত্র	
একটি আলোর বিন্দু	— দিনেশ দাস	
একটি দিনের স্মৃতি	— পরমানন্দ সরস্বতী	
একটি চেনামনের স্মরণে	— সাবির শর্মা	
অন্ধকার	— শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য	
অন্তর্মুখী	— হরেন্দ্রনাথ মল্লিক	
সেই-রাতি, আর	— অনিলকুমার মোদক	
হৃদয় আজ বন্দী	— সুশীল ভট্টাচার্য	
অধীর	— সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়	
তিনটি দিনের মধ্যে	— শিবেন চট্টোপাধ্যায়	
এ মাটির বুকে	— কার্তিকচন্দ্র মিত্র	
মুহূর্তের	— গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	
বন্ধুদের জন্য	— সামসুল হক	

বিদ্যোদয়ের বই

হেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস ও গল্প

ময়ূরপঙ্খী ৬·০০

মকরমুখী ৬·০০
শুকে যারা শিরোমণি ৩·০০
ডাগনের নিঃশ্বাস ২·২৫
গল্প আর গল্প ২·২৫

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প-সংকলন

চোরের পাল্লায় চক্রবর্তি ৩·০০

আমার ভালুক শিকার ৩·০০

স্বপনবুড়োর গল্প-সংকলন

স্বপনবুড়োর কৌতুক-কাহিনী ২·৮০

শৈলেনকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কঙ্কাবতী ৩·৫০

নীলেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ভয়ংকরের জীবন-কথা ২·২৫

সত্যেন্দ্রকিশোর বসুর উপন্যাস

ভয়ংকর সেই মানুষটি ৩·২৫

কিশোর ভারতী

শারদীয়া ১৩৭৫ ৫·০০

সুকুমার রায়ের

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ঃ

প্রথম খণ্ড ২০·০০
ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ঃ ১ম ১৬·০০

হরেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১০·০০

ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১০·০০

নৃসিংহলাল বসুমল্লিকের

কবি শ্রীমধুসূদন ১০·৫০
বঙ্কিম-বরণ ৬·৫০
সাহিত্য-বিচার ৮·৫০
সাহিত্য-বিতান ১·৫০
বাংলার নবযুগ ৮·০০

কিশোর ভারতী

নববর্ষ ১৩৭৬ ২·৫০
শারদীয়া ১৩৭৬ ৫·০০

হেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা ৪·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস

মরুরাক্ষী ৪·০০
মৃত্যুকপোতী ৩·০০
সোমলতা ৪·০০
মধুমিতা ৬·০০
জীবনে প্রথম প্রেম ৪·৫০

সুশীল জানার উপন্যাস

বেলাভূমির গান ৬·০০

সূর্যস্নান ৩·৭৫

মণীশ ঘটকের উপন্যাস

কমলকল ৭·০০

প্রমথ মিত্রের স্মৃতি-চিত্র

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ঃ ১ম ১১·০০

অরুন্ধতী দেবীর উপন্যাস

নাগমণী মন্ত্রা ৩·৫০

কিশোর ভারতী

শারদীয়া ১৩৭৭ ৬·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ঃ কলিকাতা ৯ ফোন ঃ ৩৯-৩১৩৭

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কাছে বা দূরে	— সুকুমার রায়	১০৮৪
ছেঁড়া দায়	— সুরেশরঞ্জন দত্ত	১০৮৪
ভালোলাগা ভাঁতি	— তপেশ্বর হাজরা	১০৮৫
দুষ মেরে কেমন নবনী	— শান্তনু দাস	১০৮৫
অগুনেই ফুল, ফলেই আগুন	— বুদ্ধদেব সরকার	১০৮৫
অস্থির হাওয়ায় কাঁপছে	— বাসবীবালা দাস	১০৮৫
একটি উজ্জ্বল তারা	— বরুণ চক্রবর্তী	১০৮৫
অসুখ	— অমিয়কুমার হাটি	১০৮৫
নিয়মিত বিভাগ		
বলাবলি	—	১৭৫
জরেপেলিন	—	১৭৫
অন্তর্জাতিক	—	১৭৭
শহর কলকাতা	— বিজন	১০০০
ক্রীড়াবেলা	—	১০০৬
ছলচাত্র—এদেশে এবং ওদেশে	— শিলালি	১০৫০
বুলবুলং	—	১০৫২
খেলাখেলা		১০৬৭
খেলার রাজার রাজা	— শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৭৪
আমার ডায়েরী থেকে:		
মারিয়ম গোর্কী	— অনুবাদ : সুশীল রায়	১০৯০
চলচ্চিত্র	— অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	
অলঙ্করণ	— সুব্রত ত্রিপাঠী, মলয়শঙ্কর ধাবেগুপ্ত, সজল	

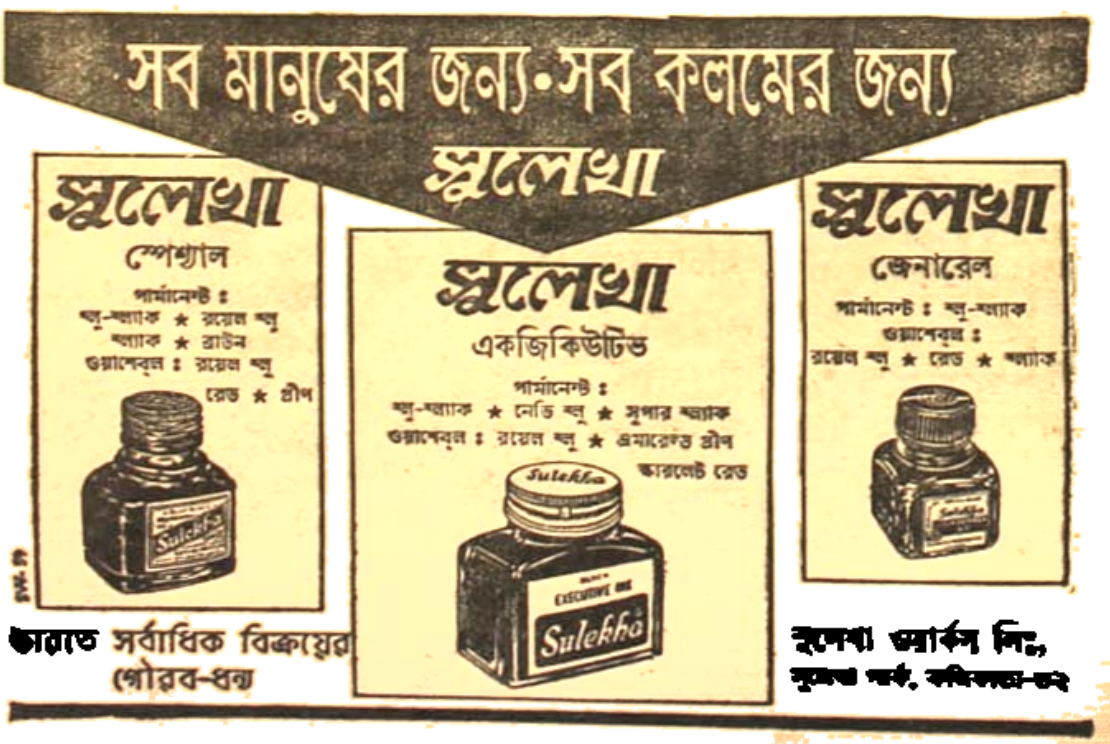

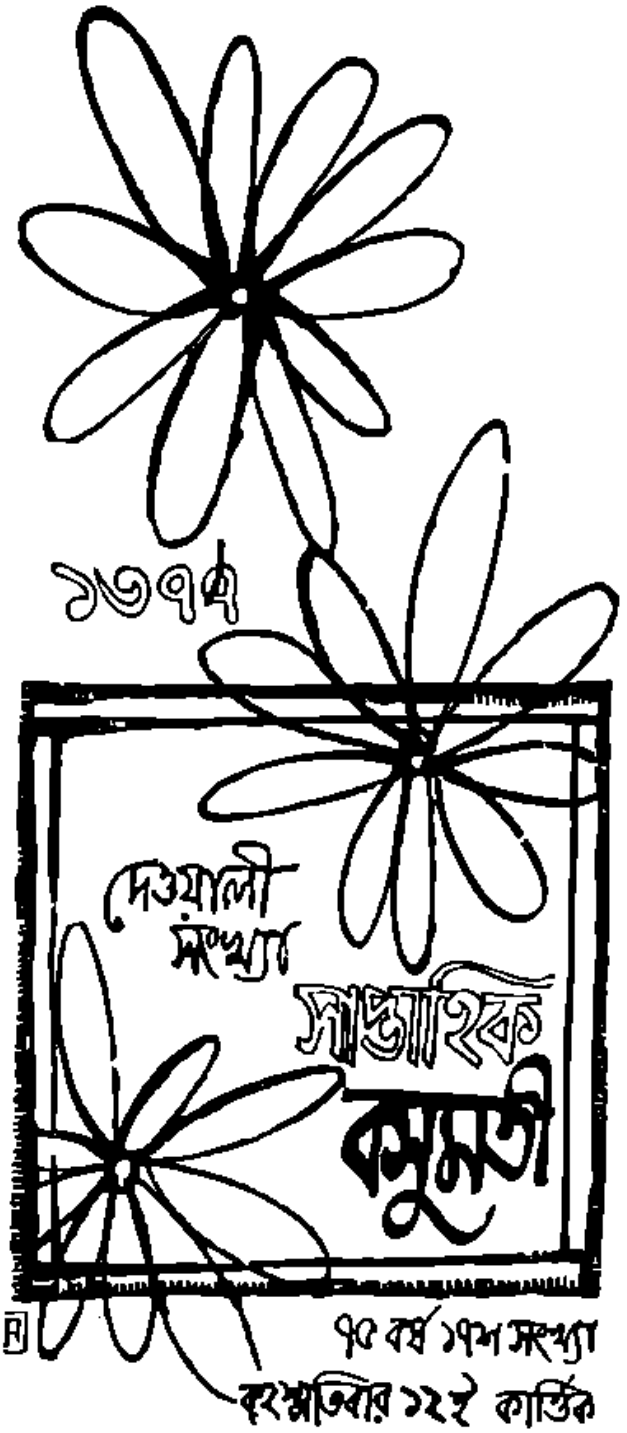

দেওয়ালী উৎসব

আজ দেওয়ালী উৎসব। এই উৎসব বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যার ঘনান্ধকার রজনীতে ঘরে ঘরে আলোকসজ্জার জ্বেলে রোশনাই ও নৈঋতকোণে মহা শঙ্খধ্বনি করে নতুন আলো যে-উৎসবে আনা হয় সেই দেওয়ালী উৎসব।

কালীমূর্তির উপাসনার মধ্যেও রয়েছে সেই শক্তির সাধনা, যিনি মুণ্ডমালিনী এবং খড়্গ যাঁর হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপরপক্ষে তিনিই আবার অন্নপূর্ণা—বুকে যাঁর ক্ষীরসমুদ্র। কালীমূর্তির রূপ-কল্পনা ভবিষ্যৎ কল্পনাকেও দান করেছে। তবে বাঙালী-চিত্ত তার মননশক্তির সাহায্যে যে পরিপ্রেক্ষিতে এতদা কালীমূর্তির উপাসনা সুরু করেছে, তাও বর্তমানকালে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাই কল্পনা করি, কালী-সাধনার আদিমের চিত্তশক্তি আজ নব বলে বলীয়ান হোক, দেওয়ালী উৎসবে পুনরুজ্জীবিত হউক আনন্দের আলো-আকাঙ্ক্ষায়।

দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষে এই বর্ষিষ্ণু বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের আনন্দে আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভার্থী, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের যে আগ্রহ লাভ করেছি এবং আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্যে তাঁদের জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

দু পিঠে

মেঘের ছিঁ

সব মেঘ সরে যায়
সব বৃষ্টি একদিন থামে।
প্রচণ্ড দিনের ঘাম
ভুলিয়ে দিতে অনিবার্য এক রাত্রি আসে।
জীবন তা বলে শুধু
এই নিত্য খেলা-ধুলোয়
জন্ম মার নয়।
জীর্ণ ঘরে শুধু
কোন দুটি তীরে বাঁধা
ঘর না সমুদ্র।

যা দেখি যা জানি তার নিচে
প্রাণের খোরাই চলে
মহাসৃষ্টি মস্ত খোঁজা
সংগোপন সন্তাদের বাঁচায়।
জানি তাই ক্ষতীর গহনে
সময় প্রবাহ নয় শুধু,
আলো ছায়া দুঃখ সুখ
হৃদয়ের মেদ, আর মজ্জা—
শুধু অনুভূতি নয়
জীবনের লাভ আর ক্ষতির হিসাবে।
এক পিঠে এ সত্তার সমর বাহিত
উন্নাসন্ত ইতিহাস চলে,
অন্য পিঠে থেকে তিনি
নিজেতেই নিজের অতলে।

একটি দিনের স্মৃতি

পরমানন্দ মজুমদার

ঘুমের ছবি ভাসে মনে, লাগে ছিন্ন সুর
একটি দিনের স্মৃতি তুমি চিরকালের দূর।
এক আষাঢ়ে বরষা শুরু, তিন আষাঢ় গেলো,
কালো আঁকে কালের চোখে সবল এলোমেলো।
তোমার চুল চিকন কালো একরাশি মেঘকূল,
তারা দিনের ঘনঘটায় মনে জাগায় ভুল।
মেঘ-ভাঙা চাঁদ তোমার মুখ, রাত্রি-আঁকা চোখ
প্রতিবারে কাঁপিয়ে রাখে নতুন সম্ভাবনাক।
বারে বারে দিনের ধুলো কালের মুখ ঢাকে,
অতুল রূপ-তুলি তোমার হাজার ছবি আঁকে।
তিন আষাঢ়ের গানের পালা এই আষাঢ় শেষ,
রৌদ্র এলো আকাশ ভরে নেই তোমার উদ্দেশ।
নিজের ছায়ায় ঘুমোয় একা দুপুরে রোদ্দুরে
একটি দিনের স্মৃতি তুমি চিরদিনের দূরে॥

একটি আলোর বিন্দু

বিনয় বসু

অতীত দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়ের পিরামিডের মত।
ভবিষ্যৎ যেন ধূসর-নীহারিকার একখণ্ডিত বাড়ি।
এদের পাঁচিলের ছায়ে
আমি কোনোদিন প্রবেশ করতে পারব না,
আমার আলো কোনোখানেই মোলায়েম হয়ে ফুটবে না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি অনিশ্চিত বর্তমানের মাঝখানে
যে-বর্তমান দুলছে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।
আর আকাশ অজগরের মত কঠিন চোয়ালে
হরিণ-সূর্যকে ধরে রেখেছে।
কে তাকে মুক্ত করবে?

আমি দাঁড়িয়ে আছি
অথবা হাঁটছি অন্ধকারী প্রেতের মত
যার ছায়া মাটির এ-পিঠে পড়ে না,
হয় তো অন্য কোথাও, অন্য গ্রহে পড়বে।
আমার শূন্যতা মিশিয়ে যায় বেদনাহীন অন্ধকারে।

আমার দেহকোষের উজ্জ্বল রশ্মিরেখাগুলি
একটি একটি করে নিভছে
পেণ্ডুলামকে জ্বালাবার সামর্থ্য আমার নেই।

আমার অবয়বগুলি বিশ্লেষ করে:
আমার চোখ মনে করে, তারা হাত
আমার হাত্‌ড় ভাবে, তারা মুখ
আঙুলগুলি জানে, তারা ঠোঁট:
সকলেই তাদের ইচ্ছেমত চলতে চায়।
আমার মন তাই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন—
অন্ধকারে আলোর বিন্দুর মত
আকাশে হেমন্তরাত্রির মত স্থির॥

জনৈক চেনম্যানের স্বরে

শরিফ শর্মা

নমস্কার ওভারসিয়রবাবু, কত পথ মেপে দেখেছেন
এ-জীবনে? রোদে-জলে ঘাটে-মাঠে উঁচু-নিচু জমিতে জঙ্গলে
রাজপথ খাল-ঘুঁজি বস্তি শহরতলী ইস্টিশান গ্রাম...
অনেক তো করলেন ঘাম—জীবনের কত বাকি, বলেছেন?
সবারই তো রাস্তা বানালেন: কত গাড়ি হুস্ করে যেন চলে,
কেউ কি রেখেছে মনে আপনার আমার বিদ্যা কুলীদের নাম।

তবে কি জানেন সার, আমরা যা করি না বলে করা—
এই একফোঁটা ফিতে চেনে বাঁধা নয়া পয়সার সমান দেনা!

মধুরাণী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মধু! মধু! উপর থেকে উল্লাসিত ডাক এসে পৌঁছুল।

রমলা চৌকাঠের থেকে মুখ তুলে বললে, 'তোমার বাবা বোধহয় ডাকছেন।'

অন্যে হলে লাফিয়ে উঠত মধুরা, তবে হয়ে বললে, 'বাবা ডাকছেন! কিন্তু কেন বলুন তো?'

রমলা আসন্নপ্রসবা হিচারে—সে কী করে বলবে? তবু অনুমান করতে বাধা নেই বেশে সংক্ষেপে বললে, 'আওয়াজ শুনে মনে হয় নিশ্চয়ই কোনো ভালো খবর।'

'ভালো খবর!' বড়-বড় চোখ মেলে এপাশ-ওপাশ তাকাল মধুরা। তার পক্ষে কী এমন ভালো খবর হতে পারে ভেবে-কিনারা করতে পারল না।

'কে এসেছে কেউ এসেছে। উঠে দেখেন গে যান।'

রমলা যেদিকে মুখ করে বললে সেদিক থেকে মিষ্টিমিষ্টি গেলে যায়। মধুরা কয়েক বিপরীত মুখে, নাচের ঘরের। তাই সন্দিগ্ধতে জিজ্ঞেস করলে। 'কে এল? কোনো ভদ্রলোক?'

'না' একজন মহিলা।'

মহিলা? মধুরার বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল—তবে কি মা ফিরে এল? মাকে তো কলকাতায় চেনবার কথা নয়—কলকাতার চাকরির অনেক আগে থেকেই মা বাড়িছাড়া, তাই স্বাভাবিক কৌতূহলে মধুরা জিজ্ঞেস করলে। 'মহিলা? কেমন দেখতে? লম্বা, না বেঁটে?'

রমলা মুচকে হেসে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'সুন্দর।'

সুন্দর? তবে মা না হয়ে যায় না! মধুরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'মধু! মধু!' আবার ডেকে উঠলেন জয়দেব।

স্যান্ডেল পায়ে একলম্বা মেয়েটি একছুটে চলে এসেছে বাবার কাছে। কই মা নয় তো। এ আরেকজন।

একটা রঙিন ঘুড়ি, হাতের কাছে উড়ে এলে সাধ নেই তুমি না ধরো। বন্ধুটি তাই স্থির করল না, হাত বাড়িয়ে ধরল মধুরাকে একটু বুঝি বা চেনে নিল ভোলের কাছে।

'এই আমার মেয়ে।' বললেন জয়দেব।

দশ-এগারো বছরের পাতলা ছিপছিপে মেয়ে, চোখ দুটি মেলে উঠেছে, মুখখানি তেমনি নরম ভরা। দেখলেই স্নেহ করতে সাধ যায়। মনে হয় কেমন যেন নিঃসঙ্গ, পরিত্রাণ।

'তোমার নাম বুঝি মধুরালা?'

মধুরা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'ও মা, কী বিচ্ছিরি, মধুরালা কেন হতে যাবে?'

'তোমার বাবা যে তোমাকে ডাকছিলেন

হবে তো' মধু কি তাহলে আসল নাম? জানতে চাইল।

'মেয়েদের বুঝি মধু-মধু কখনো নাম হয়?' খুশিতে ভরপুর অন্তরঙ্গ হল মধুরা, বলল, 'মধু আমার কোনো আসল নাম নয়। আমার নামের ছবোই মধু আছে।'

'তাহলে তুমি মধুমতী।'

'উহু, হল না। মধুমতী তো কোন এক নদীর নাম।'

'তবে, তুমি আমার ছোট্ট বন্ধু কিনা, তুমি মধুশ্রী। আমি বনশ্রী, আর তুমি মধুশ্রী।'

বনশ্রী আর মধুরার এই ঘনিষ্ঠ আলাপে চিন্তা পাচ্ছে জয়দেব। মধুরা ওদের অপরিচয়ের ব্যবধানের দেয়াল আস্তে-আস্তে একটা স্নেহের সেতু গড়ে ওঠে তাই তখনি বনশ্রীকে আজ সে একেবারে গভীর অন্তঃপুরের দোলনায় দোলার ঘরেতে নিশ্চিন্তে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু মধুশ্রী নামটাও উজাড় হাসিতে প্রত্যাখ্যান করল মধুরা। বললে, 'ওটাও হল না। আপনি ছেয়ে ফেলেন।'

'সত্যি? তবে তোমার নাম কী?'

'আমার নাম? বলব? আমার নাম মধুরা।'

'সত্যিই তো, খুব সুন্দর নাম। মধুরার মধ্যেই তো মধু আছে।' মধুরার মুখখানি ধরে একটু আদর করল বনশ্রী। বললে, 'আশ্চর্য কিন্তু, এত সহজ নামটাই মনে এল না। অতদিনে কত তো মেয়েদের নাম দেখি, কিন্তু এমন সহজ-সুন্দর নাম মধুরা তো চোখে পড়ে না। মাধুরী অনেক দেখি কিন্তু মধুরা নেই?'

'আমিই মধুরা।'

'একশোবার মধুরা।' অন্তরের থেকে সায় দিল বনশ্রী। জিজ্ঞেস করল, 'এ নাম তোমার কে রেখেছে?'

মা রেখেছে। মা ছাড়া এমন নাম আর কে রাখবে? কিন্তু সে কথাটা যে এখানে বলা শোভন হবে না তা বুঝতে আর বাকি নেই মধুরার। তাই প্রসঙ্গকে সে গম্ভীর মুখ তরল করে ফেলল। বললে, 'আমার নাম বাবা রেখেছেন।'

বেশ একটা গর্বের ভঙ্গিতে কৃতিত্বের হাসি হাসল জয়দেব।

মধুরার কাছ থেকে বনশ্রী আরো কিছু সংবাদ সংগ্রহ করল। কোন্ ক্লাসে পড়ে, তার স্কুলের নাম কী, সপ্তাহে রবিবার ছাড়া আর কোনদিন তার বাড়ির ছুটি? কি করে স্কুলে যায়, কখন ছুটি হয়, কোথায় কি খেলাধুলো করে, তার সঙ্গী-সাথীই বা কে কে? কতক্ষণ পরে হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, 'যাও পড়ো গে, তোমার মাস্টারনি বসে আছেন।'

'মাস্টারনি না, মিস। আমাদের টিচারকে আমরা মিস বলি।'

'বিয়ে করলেও মিস থাকে?'

'আই কিউ কমুক না, সব মেয়েই মিস।' হাসতে-হাসতে ভাসতে-ভাসতে নিচে নেমে গেল মধুরা।

জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে মেয়েটাকে?'

'ভালো। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি কথায়-বার্তায়।' বনশ্রী উদার-স্বরে বলল, 'ওকে যে দেখবে সেই স্নেহ করবে।'

খুব তৃপ্তি পেল জয়দেব। বলল, 'ওকে প্রথম আটকাতে চেয়েছিল কিন্তু মেয়েই এখানে থাকতে রাজী হল না। ও ওর বাবাকেই বেশি আঁকড়ালে।'

'তাই তো আঁকড়াবে। বাবাই তো ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে, বোদ্ধা ঘরে-বরে বিয়ে দেবে, চাই কি বিদেশে পাঠাবে, মায়ের অনুরোধ কী। না আছে টাকাকড়ি, না আছে প্রতিষ্ঠা। কোথে ছেলেও বাবাকেই আঁকড়াত কিন্তু—মেয়ে তো আর বুকের মেয়ে মন বে, মা নেবে। মেয়ে বেশ বুদ্ধিমতী—'

'হ্যাঁ, প্রায় দেড় বছর হতে চলল মেয়ে মায়ের আঁচলছাড়া, দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে কিন্তু। এখন তুমি যদি এসে ওকে আপনার করে নিতে পারো তাহলেই শান্তি।'

'ও তো এক মুহূর্তেই আপনার হয়ে উঠেছে।'

'বেশ নয় ও বাবা মেয়ে।' জয়দেব নিজেই সার্টিফিকেট দিল।

ছেলেমেয়ে যে অবাধ্য হয় সব অভিভাবকের মেয়ে, তুমি দেখবে আমার কথার ও কখনো অবাধ্যতা করবে না।'

'আসল সম্পর্ক যেটা দরকার সেটা গড়ে ভালোবাসা।'

'আর অবাধ্যতা করলে তাকে কী ভয়ে বশীভূত করতে হয় সে কৌশলও আমার জানা আছে।'

'সে কৌশলও যে ভালোবাসা।' নিজের ব্যাখ্যায় নিজেই পরিপূর্ণ সন্তোষে হেসে উঠল জয়দেব।

জয়দেবের সংসারে বনশ্রীর এই প্রথম প্রবেশ। যদিও একেবারে বৈধ স্ত্রী হয়ে নয়, তবে প্রায় সে পক্ষের পক্ষিক হয়ে। কলকাতা বড়মা মনোমালিন্যের ফলে প্রথম স্ত্রী সুরেখা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর স্ত্রী-দফতরে জমেলা করে ডিভি পায় জয়দেব। সে ডিভির পর দেড় বছর কেটে গেছে। আর ছমাসের মেয়াদ আছে, তার মধ্যে সুরেখা ফিরে না এলে আর সঙ্গে জয়দেবের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আর বিয়ে একবার ছিন্ন হয়ে গেলেই বনশ্রী সর্ব সাধারণের প্রত্যক্ষ অধীশ্বরী।

সেই আধিপত্যই একটু আগ বাড়িয়ে প্রয়োগ করতে চায় বনশ্রী। তাই সে রবিবারের সকালটা বেছে নিয়ে এসেছে সরেজমিন তদন্তে। ঘরে-ঘরে ঘুরছে, দেখছে, জানছে, অনুমান করছে। এটা এখানে কেন, ওটা কেন ওখানে—ঠিক জবাবদিহি না চাইলেও খুঁজে দেখছে শিল্পসম্মত কোনো উন্নত ব্যবস্থা আছে কিনা। এখন ঠিক হুকুম করছে না, ফাঁকি খুঁজে ইশারা দিচ্ছে—তাইতেই চাকর-বাকররা জিনিসপত্র নিয়ে নড়ে-চড়ে।

'ওপরের ঐ ভদ্রমহিলাটি কে?' নিচে, পড়ার ঘরে মধুরাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি কী করে বলব?'

'বা, তুমি তো দেখে এলে, আলাপ করে এলে—তাই না?'

'বাবার যেমন কাণ্ড—খুব একচোট আলাপ করিয়ে দিলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি আমার মেয়ে। কিন্তু উনি যে কার কে সেকথা একদম চেপে গেলেন। এতে করে কি প্রাণ খুলে আলাপ করা চলে?'

'আচমকা-অনুমানে কিছু বুঝলে না, কে?'

'খুব বুঝেছি। এ সেই মহিলা যাকে নিয়ে ঝামেলা-মতেতে ঘুলে কলকাতা ছাড়তে হত, যাকে আগলে রাখতে মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন শেষ পর্যন্ত। নামটা বললে বনশ্রী। যদিও দেখি নি আগে, তবুও মধুরা নামটা শুনেছি।'

'যাক্ গে, এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' রমলা বইয়ে চোখ ডোবাল।

'কেন, দরকার নেই কেন?' আমি মেয়ে, আমার তো নিতান্তই বোঝা দরকার। আপনি আমার শিক্ষিকা, ঠিক উপদেশ তো আপনাকেই দিতে হবে।'

'কী দেখতে হবে শুনি?'

এমন উত্তর শুনবে আশা করে নি রমলা। মধুরা গম্ভীর মুখে বললে, 'দেখতে হবে বাবা যেন তার জীবন অঙ্কের নতুন করে ঘড়ে তুলতে পারেন। একটা জীবন নাকে নিয়ে তাঁর কী ঘোর অশান্তিতে কাটল!'

রমলা হঠাৎ তিরস্কার করে উঠল: 'পাকামো কোরো না। ছোট মেয়ে ছোট মেয়ের মতই থাকো। বুড়ো মেয়ের মত কথা বোলো না।'

'বুড়ো মেয়ে—বা, আমি তো বুড়োই!' নির্মল নয়নে হেসে উঠল মধুরা।

'তুমি বুড়ো, কী বলছ তুমি?'

যার অত বড়ো ছেলে, সে বুড়ো নয়?'

'ছেলে—তোমার আবার ছেলে কে?'

'বা, বাবা আমার ছেলে নয়? বাবার বয়েস বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ হবে। আপনি তাকে বুড়ো বলবেন না?'

'একশ বুড়ো।'

'তবে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে আমার বুড়ো না হয়ে উপায় কী।'

মহুয়া যে বালিকা এই মুহূর্তে রুমলাও যেন কেমন ভুলে গেল। ধীরে, প্রায় নিজের মনে বলল, 'চাঁদের থেকে পঞ্চাশ বছর বয়েসটাই পুরুষদের পক্ষে মারাত্মক।'

'তবেই বুঝুন আমাকে কত যত্ন নিতে হয়।' ভারিক্কি চালে কথাটা বলেই স্বভাবতাড়নায় উজ্জ্বল হল মহুয়া। 'এই যে উনি আসছেন—'

ওপরটা একরকম দেখা হয়েছে, নিচেটা দেখতে এসেছে বনশ্রী। অন্তত মহুয়ার পড়ার ঘরটা দেখে যাই, দেখে যাই তার নিমকে।

মহুয়াই পরিচয় করিয়ে দিল। 'এই আমার মিস-দি, আর ইনি—'

অরুণদেবের মত মহুয়াও জানে না কি বলে বনশ্রীর পরিচয় দেবে।

রুমলাকে দেখে মোটেই আকৃষ্ট হল না বনশ্রী। বনশ্রীকে দেখেও যেমন ছিল তেমনি বিনা নিচ্ছল রইল। কাণ্ড একটা নমস্কারের বাইরে গদগদ একটু হাসল না পর্যন্ত। অবশ্য বলতে যে রুপে বোঝায় তা রুমলার নেই বটে, কিন্তু বনশ্রীর মনে হল বিদ্যেও বুঝি একটা রুপ, সেই রুপে রুমলা স্বতন্ত্র।

কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের ছাত্রীর জন্যে জরুরের বাঙালী মাস্টারনি কেন? এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাওয়া যায় না? অন্তত কোনো খ্রীষ্টান ভারতীয়?

দাঁড়াও, আস্তে আস্তে সব ব্যবস্থা করছি।

'আপনি বুঝি রবিবার সকালে পড়ান?' কী রকম চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্ন করল বনশ্রী।

'সকালে দুদিন রবিবার আর বেস্পতিবার, বিকেলে দুদিন, মঙ্গলবার আর শুক্কুরবার।'

'কি পড়ান?'

প্রশ্নটা মহুয়াকেই কেমন বেখাপ্পা লাগল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'সব টুকটাক—ইংরিজি, বাংলা, অঙ্ক—'

'খুব ভালো কথা। পারতপক্ষে মিডিয়মটা ইংরিজি তো?'

একদিন কাছে বসে পড়ে দেখেই পারেন—রুমলার ইচ্ছে হল বলে। কিন্তু মহুয়ার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

'আপনি এখন চলে যাচ্ছেন?' মহুয়াই আরো সব প্রশ্ন থেকে বনশ্রীকে নিরস্ত করল। প্রশ্ন কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখখানি বাড়িয়ে বলল।

'এখন যাই মা, আবার আসব।' বনশ্রী মহুয়ার চিবুকে ধরে আদর করল।

ঘরে ফিরে এসে মহুয়া হাসতে-হাসতে বলল, 'আমার আবার এক বুড়ো মেয়ে হল। আমাকে তো এখন সাত বুড়ির এক বুড়ি হতেই হবে।'

বেস্পতিবার দুপুরের নিরিবিলিতে বনশ্রী উপস্থিত হল। যে সময়টায় রুমলা অফ-ডিউটি, জরুরের অফিসে, চাকর-বাকররা সংসার-ছুট্টে। মোট কথা যে সময়টায় মহুয়া একা।

জরুরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে খাটের ওপর একগাদা জামার ম্যাগাজিন নিয়ে শুয়ে আছে মহুয়া।

'ওমা, আপনি? কী ব্যাপার!' ধড়-মড় করে উঠে খাট থেকে নেমে পড়ল মহুয়া।

'তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।' পাশে একটা লম্বা সোফার এক প্রান্তে বসল বনশ্রী।

'আপনি কি ভালো। আমি খুব গল্প শুনতে ভালোবাসি। বাবা বলেন আপনি বিলেত ফিরেছিলেন, আমাকে সেখানকার গল্প বলুন না।'

গল্প শুনতে এসেছে বনশ্রী, শোনাতে আসে নি। বলল, 'তুমি তোমার ছুটির দিনে বাড়িতে একেবারে একা থাকো?'

'একা থাকব কেন? আয়া-দি থাকে।'

'আয়া-দি! সে আবার কে?'

আয়া-দিকে ডেকে দেখাল মহুয়া। বনশ্রী নিশ্চিন্ত হল, আয়া-দি নির্বিঘ্ন-সুখে বৃদ্ধা। মহুয়ার জন্মের থেকে আছে, নানা কার্যকারণে আর চলে যেতে পারে নি।

'শোও কোথায়?'

'আগে বাবার ঘরে শুতাম—নইলে একা-একা ভয় করত। কিন্তু বাবার ঘরে আরো ভয়—ভীষণ ভয়।'

মুহূর্তে বনশ্রীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। অস্বাভাবিক গলায় বলল, 'ভয়—কিসের ভয়?'

'বাবা যে ভীষণ নাক ডাকান।' মুখ লুকিয়ে হেসে উঠল মহুয়া।

কিন্তু বনশ্রীর মুখভোড়া আতঙ্কের ছাপ। 'সত্যি?'

'মনে হবে যেন দুটো ট্রেন-ইঞ্জিন একসঙ্গে সিটি মারছে।'

'বলো কী?' লঘুতার পৌঁছবার চেষ্টা করেও পৌঁছতে পারল না বনশ্রী।

'তার ওপর আরো বিপদ, ঘুম ভাঙবার পর জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি নাক ডাকিয়েছিলাম? যদি বলি ডাকিয়েছিলে, তাহলে খুব খুশি হবেন, তার মানে, বুঝতে হবে তাঁর তবে সাউন্ড স্লিপ হয়েছিল। যদি সোনাটা কোনদিন মিস হয়ে যায়, যদি বলি শুনি নি বা জানতে দি, তাহলে বিরক্ত হবেন, তার মানে, বুঝতে হবে তাঁর ভালো ঘুম হয় নি। তাই বাবার ঘরে শোয়া মানে সমস্ত রাত প্রায় জেগে কাটানো। প্রথমত নাকের গর্জনে, দ্বিতীয়ত রিপোর্ট করতে।'

মেয়েটা প্রগল্ভতায় হাসালেও বনশ্রীর মুখের আদল। তরল না একটুও। বিরসমুখে বলল, 'তার পর থেকে বুঝি এই ঘরে শোও?'

'আমি খাটের ওপর শুই, আয়া-দি মেঝেতে শোয়।' মহুয়া চেখে-মুখে সংযোগ রস মিশিয়ে বলল, 'এখনো যে আমার ভয় করে না তা নয়, কিন্তু ভূতের ভয়ের চেয়ে বাবের ভয় বোধ হয় স্বাভাবিক। ভূতের ভয়ে তো ঘুমোনো চলে, কিন্তু বাঘের ভয়ে তাকে এক-বিন্দু ঘুম নেই।'

মেয়েটা কিন্তু না ভয় বাড়িয়ে বলছে কিন্তু একেবারে বানিয়ে বলছে এ বিশ্বাস করতে পারল না বনশ্রী। একবার নিজে অবজেক্টিভলি পরীক্ষা করে দেখলে হয়। কিন্তু এখন যা অবস্থা, ঘরে-মুখো একসঙ্গে শোয়া গেলেও একসঙ্গে ঘুমুনো যাবে না। নিদ্রা ছাড়া নাসিকার পরীক্ষা হবে কী করে?

'তুমি তো ওপরে এই ঘরেই পড়লে পারো? প্রকাণ্ড ঘর। বই আলমারি টেবল-চেয়ার সব কিছুর জায়গা হবে। নিচে যাও কেন?'

ওরে বাবা, এ ঘরে পড়বে কে? অঙ্কটা তো এইখানে পড়ান, কিন্তু বাকিদিন কথায়-কথায় বাবা-মার ঝগড়া হয়—ঝগড়ায় মন দেবে কে? সে ঝগড়া নয়, সে আমার মিস বলত, যাকোর বিকৃবিরস।'

মিস কি বলত, তাতে বনশ্রীর আগ্রহ নেই, জিজ্ঞেস করল, 'কি নিয়ে ঝগড়া হত?'

'কি নিয়ে নয় তাই বলুন। পাশের

Collection Information
• বিশ্বী ব্যাঙার
JANTA SALES (S)
Shakti Nagar, Delhi 7

'ঘরে নিল অমনকে পড়াচ্ছে তা জেনেও ওরা নিরস্ত হচ্ছেন না—বুঝলে তবে সে কী বড়!'

'মেজাজ কার বেশি ছিল?'

'কার আবার? জানি।' মহুয়া অনুভব করল ঘরে বসে থাকাকে দোষী করা ঠিক হবে না। তাই অত্যন্ত মৃদু স্বরে মৃদু ভাষায় বলল, 'না তো। শুধু ভালোবাসাই নিতে না, কিনিস চাইত। চলে যাবার দিন যাবার রিস্টওয়াচটা টেবিল থেকে তুলিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে। আচ্ছা এটার কোনো মানে হয়?'

'তোমার বাবা কি বললেন?'

'শুনতে অনতে রাস্তায় চলে গেলেন না। যা গেছে তা গেছে, তার জন্যে কোনো আফসোস নেই। বাবার মেজাজ খুব ঠান্ডা। তিনি খুব শিক্ষিত, তাই ওকে নিষ্ঠুর দেখায়। আসলে তিনি খুব সময়ের মূল্য, আর মেয়েরা যে কতো জানেন তাঁকে আনাড়িজনেরা।'

'এ বুঝি তোমাকে তোমার বিল ধরেছে?'

'না, কলকাতার সঙ্গে বাবার মুখে শুনেছি। কিন্তু আর ছোট-মা হন, আমার মা যে আনাড়িজনেরা তাতে সন্দেহ নেই। নইলে বলো, ছেলে-বাড়ি ছেড়ে কেউ? ছেলেমানুষের একটা আছে?'

'ছেলের মা আর থাকতে না?'

'আর আসবে? মেয়েদের না জানো বলো, ডিভি হল, সন্তান চলে আসে, তবু মায়ের মন যেই।'

'তুমি যাও না ওদের কাছে?'

'আমি যাব? মায়ের স্নেহ আছে, স্নেহের কেন থাকতে পারে না? উনি তো ওঁর স্বামীর জন্যে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি কি করলাম, আমাকে যা তাড়ন কেন? আমার আবার তবে ঠেকা কি?'

'যেতে ইচ্ছে করে না?'

'অনেক করত না, এখন তো আরও করে না।'

'কেন করে না?'

সাহসে বুক বাঁধল মহুয়া। বলল, 'আমি এখন আমার মা পেয়ে গেছি, সতিকার মা।'

অন্যমনস্কই মহুয়াকে চুমুখতে টেনে নিতে পারল বন্দী। বলল, 'আমি তোমার নতুন-মা।'

'নতুন-মা তোমাকে কীভি করে খাওয়াই।'

বন্দীর কপাল তার বুকোতাকে আরো সম্বোধন করে তুলল মহুয়া। আরো কাছে এগোল।

'আমো তোকে এ একটা প্যান্টের পাসি, এটার মানেটা বুঝিয়ে দিন না।'

'কি প্যান্টের? পড়ো।'

মহুয়া পড়তে লাগল। 'চিরন্তন কখনো পুরাতন হয় না। চিরন্তন কখনো নূতনও হয় না। চিরন্তন চিরন্তনই থাকে।'

সাধারণ ব্যাখ্যা করল বন্দনা। পরে বলল, 'তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। যেমন মা। মা কখনো পুরোনো হয় না, কখনো বুড়ো হয় না। মা কখনো নতুনও হয় না। মা মা-ই থাকে।'

'সুন্দর উদাহরণ। আমার চির-দিন মনে থাকবে।' বলে বলা নেই কওয়া নেই হাসিতে ফেটে পড়ল মহুয়া: 'বলে কিনা নতুন-মা।'

'কে বলে?'

'কে আবার বলবে। যা হয় মা তা আবার কারু বলা সহজে নাকি? আপনিই বলুন, কোথাও হয় শুনেছেন?'

'তাহলে তো ধরিত্রীর অনেকের হত। মরীচিকার নাম করা যেত।'

এলো ওই উদাহরণ মেয়ে-মহুয়া তত হাসে। এর বুঝি হাসিরও শেষ নেই, মানুষেরও শেষ নেই।

ছুটি নেই, ছুটি নেই, সমস্ত-সময়ের প্রহরী আসলাল এসে খবর দেবে। এখানে-ওখানে নাক ঢোকায়। তার প্রভুর পাঠানোর চেষ্টা করে।

কিন্তু সময়ই আসুক, মহুয়া বাড়ি যাবার সর্বপ্রথম তাকেই সে খোঁজ নেয়। ছেলেটা-এর নতুন-মা নতুন-মা করে যে, সহাসা সম্ভাষণে তাকে প্রথমে এনেই, আদর করে-না নিলে তার অন্ন-প্রাণ ওজা-করা এসে না।

'কই গো আমার বন্ধুমাতা কই?'

বন্দীর চেহারা মহুয়া পাকা গিন্নির মত খাটির এলাকারের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সুরে কথা বলেছে। নাগড়ে তিনমিনিট হয়ে সে আসছে না—তার মানে কী? তোমাদের কি কোনো ওপরওয়ালা নেই? ওরা কি খাস জমিতে আর চোরাবালি ঘুমোও?

আসলাল কাজল এ বাড়ির আনাচে-কানাচ তিনমিনিট ঘুরে আসছে, তাই আজ তাকে বর্ষীয়ান পাঠিয়ে দিয়েছে। তার চেহারা চেনা নেই।

পিছনে নতুন-মাকে দেখে আসলাল ছুটে চলে মহুয়া। মজা করে বলল, 'অসুখ বলে আর দোষ কি। যাও ওদের কাছে যাও।' বলে ওপরে যাবার সিঁড়ি তাকে দেখিয়ে দিল।

ওপরে সিঁড়ির মুখে সবলা ঘর-চেহারা ফাটে যেন ফালবেলোঁদির মত ফেটে উঠল। 'নোরো ঝুলালি আর ফাটা হতে করে তুই এ সিঁড়ি দিয়ে উঠলি কেন? হারামজাদা উল্লুক!'

আসলাল বলল, 'আমি কি জানি, আমাকে মিনি-মা এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বললেন।'

'মিনি-মা! এই বাড়িতে আবার মিনি-মা কে? নিচে যে-কেউ একটা মেয়েছেলে থাকলেই সে মিনি-মা হয়ে গেল?' বলে আরো পলকা গালাগাল বর্ষণ করলে।

ছুটে ওপরে চলে গেল মহুয়া। বারান্দায় নিজের বাক্সা করে শান্ত করল তাকে। আসলালকে নিম্ন-স্বরে বললে, 'ঐ যে দোতলার বাঁকানো সিঁড়ি দেখছ ওটাই সম্ভবতের সিঁড়ি। তা এতদিন ভুল হচ্ছে তো ভুল হচ্ছে। কিন্তু মনে তোরো না।'

তারপর হাসির লহর তুলে নিয়ে পড়ার ঘরে এসে ঢুকল মহুয়া—যেখানে বন্দী এসে আশ্রয় নিয়েছে।

'কী মজা হল নতুন-মা, তুমি তখন আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছিলে বলে ফালি-জবার আমার কথাটাকেই তোমার হুকুম বলে মনে করেছে। আর বাবা তো ওপর থেকে তোমায় দেখতে পান নি, তাই বললেন এখানে একটি মিনি-মা কোথায়? স্বাভাবিক আর কিছু ভুল নেই, শুধু কিচেনার চৌকাঠ মেয়েটি ঢুকে ঘরে গেছে।'

মেয়েটার হাসি সংক্রামক, না হেসে থাকতে পারল না বন্দী। কিন্তু এ কী মেজাজ! ছেলেটা নতুন, না হয় ভুল করেছে, তাই বলে এমনি গালাগাল করতে হবে! লোহার সিঁড়িটা ভেঙে দিলেই হত! প্রথম দিনের ভুলে একটা ওয়ার্নিংই যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া মিনি-মা বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, তার হুকুমের কথা বলছে, সেটা একবার যাচাই করে দেখবে না? যাচাই না করে চড়াও হলে যেটে পড়বে? সেটা খুব 'রিজনেবল' হবে?

কিন্তু এ নিয়ে তর্ক জমবে তার সঙ্গে? শুধু যা দেখবার দেখে যাচ্ছে।

সেদিন সকালে মহুয়ার পড়ার ঘরে ঢুকতেই মহুয়া বললে, 'জিন যে সেই বাবার কাছে মাইনের পাকেটই আনতে ভেঙে ফেরবার নাম নেই। কী যে ঘটে বলা তা কে জানে!'

বন্দীই শোন তোমাকে করতে।

ছেলেটা সামনের বারান্দার একটা ছোট টেবিলের মুখোমুখি বসেছে—জন্মদের আর রমলা দু চেয়ারে বসে আছে। রমলার হাতে একটা খাম—তার মানে তার মাইনে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তবু কথা চলছে। ভদ্রিল চেয়ে অন্য কিছু, আজকাজা নিয়ে কথা নয়, অন্য কথা।

বনশ্রীকে দেখেই রমলা দুই ঘরে ওর পড়ল ও আশে-পাশে না তাকিয়েই মুখ নেবে গেল।

বনশ্রী গম্ভীর মুখে বললে, মাস্টারনির সে সার্কেটো মধুর হাতে দিয়ে পাঠালেই হয়। ওকে একেবারে ভিতরে ডেকে আনবার দরকার কী।'

'না, আজকাল বেশ কামাই করছে, তাই বলছিলাম—'

'এর আবার বলাবলি কী! যে কদিন কামাই করবে মাইনে কেটে নেবে। কাজ হবে মাইনে তার।'

'না, মাইনে কাটি নি। প্রথম বার তো ওয়ার্নিং দিলাম।'

'কেন, ওর বেলায় খাটির কেন?'

অরুণদেব চুপ করে গেল। আর এখানটা যে শুধু ওয়ার্নিং নয় কোনো গোপন পরামর্শ সেটা বুঝতে পেরে বনশ্রীও আর কথা বাড়াল না।

এ রহস্যেরও উদ্ভেদ মধুরাই করলে।

'কী ওদের অত পরামর্শ হলো তো?' মধুরা যেন বনশ্রীর অন্তরঙ্গ সখী এমনিভাবে এক নির্জন মুহূর্তে খুঁজে নিয়ে বনশ্রী এসে জিজ্ঞেস করল।

'একটা নাম নিয়ে মতভেদ।' হাসল মধুরা।

'নাম নিয়ে? তার মানে?'

'আবার ইচ্ছে মিস-দি আমার গার্ডিয়ান টিউটর হয়ে এ বাড়িতে থাকেন।'

বনশ্রীর মুখ পলকে ঘোরালো হয়ে উঠল। বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করলে, 'আর তোমার মিস-দির কী ইচ্ছে?'

'তিনি বাড়িতে থাকতে অরাজি নন, তবে তিনি বলছেন, আপনি—আপনারা থাকতে আমি গার্ডিয়ান হই কী করে? আমি বরং সেক্রিটেরেস্ট হয়ে থাকি আর সকালে-সন্ধ্যায় যখন যেমন দরকার মধুরাকে পড়াই। সেস্ট না গার্ডিয়ান এই দুটো কথা নিয়ে এখন মতের অমিল হচ্ছে।'

কথা দুটোতে কী সূক্ষ্ম বৈষম্য আছে, মাইনে না মর্যাদা, এ প্রশ্নে যেন না বনশ্রী। তার প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হল তা হল ও এ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দে হবে কেন, কোন্ সাহসে, কিসের কোন্ অধিকারিতে?

'ও এখানে রাতদিন থাকতে চায় না কি?' প্রায় গর্জে উঠল বনশ্রী।

বাবা ভাবছেন আমার একজন উপযুক্ত কম্পানিয়ন দরকার। তোমরা এদিক-সেদিক বেরিয়ে গেলে কাকা বাড়িতে আমি কী করি, আমাকে কে দেখে।' বেশ সন্তর্পিত মুখে বলতে লাগল মধুরা। গার্ডিয়ান টিউটর গেলে তার উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। মিস-দি নিজে-পড়ে মধুমনি মাসির নিতে চান না, তিনি বলেন, আত্মীয়ার মত থাকতে পারি সেক্রেটারির মত মেপাশোনাও করতে পারি কিন্তু অমরো তো আউটিং আর ড্রাইভার আছে—'

বনশ্রী কামটা দিয়ে উঠল : 'কম্পানিয়ন হিসেবে ওকে কী দরকার? আমিই তো এখন কম্পানিয়ন হতে পারব।'

মধুরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। 'কী মজা! নতুন মা-ই এখন আবার কম্পানিয়ন! মিস-দি যেমন চায় দিন আসে তেমনি আসুক।'

মাস্টারনি তো, শুধু অধিকার বিস্তার করবার চেষ্টা!' প্রায় নিজের মনেই বললে বনশ্রী 'আত্মীয়া সেজে কাছ ঘেঁসে থাকা, পরে মাইনে বাড়িয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়ানো।'

'অফিস থেকে ফিরলেই বাবাকে বলব। বাবা কী ভীষণ খুশি হবেন!'

'যা চলনের আসে, সালউদ্দিনের জন্যে অরুণদেব আমাকে বলে না কেন?'

পরদিন অরুণদেব আর বনশ্রী গাড়ি করে বেড়াতে বেরুবে, দেখা গেল পিছনের সিটে এক কোণে চুপ করে বসে আছে মধুরা।

'এ কী, তুই কোথায় যাবি?' অরুণদেব থমকে গেল।

'জানি না।' অমল মুখে সুন্দর হেসে মধুরা বললে, 'নতুন-মা বলেছেন সঙ্গে যেতে।'

'সে কী?' অরুণদেব অবাক হল, তাকাল বনশ্রীর দিকে : 'ও যাবে?'

মেয়েটা সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে দিল। কিন্তু ওর সারল্যের বিরুদ্ধে কোনো স্লোগান বা শাসন টিকবে বলে মনে হল না। বনশ্রী ঘলা মাখিয়ে বললে, 'আজ ক্লাব থাক, মেয়েটাকে নিয়ে এমনি চলো কোথাও ঘুরে আসি।'

আবার আরেক দিন গাড়িতে ফিরে আসছে মধুরা।

'তুই আজ আবার কোথায় যাবি?' অরুণদেব বিরক্ত হল।

'নতুন মা জানেন। তিনি আমার কম্পানিয়ন, কিংবা আমি তাঁর, তিনি জানেন কোথায় আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি কী করে বলব বলো?'

পরের কণ্ঠস্বরের ছত্র সব সময়েই লেগে আছে মেয়েটা, প্রশ্নে-জোগানে কোথাও কোনো সুখ নেই। স্বস্তি না থাকলে সুখ কোথায়? মেয়েটাই যত অস্বস্তির বিপাক।

বেদিন বেন মুক্ত ঘরেই সেক্রেটারি করল অরুণদেব।

'না, তুমি আজ যাবে না। তুমি নেমে এস।'

মধুরা বনশ্রীর মুখের দিকে তাকাল। সে মুখে আজ প্রসন্নের আয়াটুকুও খুঁজে পেল না। মধুরা দুখানা করুণ করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

একটু আদরের সুড়া না দোঁচিয়ে পারল না বনশ্রী। বুঝিয়ে বলার মত করে বললে, 'আজ একটা জরুরি নিমন্ত্রণে আমাদের এক সঙ্গে যেতে হচ্ছে কি না, তুমি তাই যাবে না। তোমাকে আরেক দিন নিয়ে যাব।'

দু চোখে সরল আলো ঠিক তেমনি এনেছে মধুরা। তবু যেতে-যেতে বনশ্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

সামান্যতম কথার কত হাসি দিয়ে সারিয়ে দেয় মানুষে। কিন্তু মধুরার কথা যেমন বোঝে, হাসিও তেমনি বোঝে।

গাড়িতে অরুণ হয়ে বনশ্রী বললে, মেয়েটার সম্পর্কে এবার কঠিন হতে হবে।'

আর কী কঠিন হওয়া যায় অরুণদেব ভেবে পায় না।

রিকশা থেকে নামতে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির উপরে চোট খেয়েছে রমলা। রমলা চেয়ারের সামনে মেঝেতে বসে, মধুরা রমলার আহত পায়ে কি একটা মলম মেলাবেশ করে মাখিয়ে দিচ্ছে।

এমন সময় বনশ্রীর প্রবেশ।

'কী হল?'

'রিকশা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছেন।' রমলার হয়ে মধুরা বললে।

'মানুষে মানুষে টানে এমন গাড়িতে চড়া কেন?'

এবার রমলা বললে। বললে, 'না চড়লেই ভালো ছিল। রিকশাওলার রোজগার হত না, আমারও জখম হত না।' তারপর নির্লিপ্ত রেখায় হাসল: সব অবস্থায়ই মানুষে মানুষকে টানবে। কখনো মানুষের উপরে গাড়ি, কখনো গাড়ির উপরে না।'

'কিন্তু ওটা মানুষ কী?' বনশ্রী এবার মধুরাকে লক্ষ্য করলে।

'বাবার হাতের মলমটা মালিশ করে দিচ্ছি মধুরা চোখ নিচু করল।

'তা তুমি দিচ্ছ কেন? না কি ওটাও মাস্টারির অঙ্গ?'

হাঁপানিতে অব্যর্থ মহৌষধ
রোগীর বয়স ও কতদিনের রোগ জানালে চির-আরোগ্যের গ্যারান্টি।
শ্রীকমলা দেবী
কবিরাজপাড়া, চন্দননগর, হুগলী।
(সি ২৩০৮)

মধুসূদনের মেজ মেয়ে তো তাহলে। তাদের নতুন-মা?' মধুমালিতে আবার এক সম্পর্কের হিসাব নিয়ে তাকাল মধুরা : 'আমি তো কতদিন পূর্ণিমা-অমাবস্যাতে যাবার পথে এ ওষুধ রাখিয়ে দিই, যদি কত আরাম পান—'

ধুম ধুম করে পা ফেলে উপরে উঠে গেল বনশ্রী।

মধুরা বললে, 'আমার খুব ইচ্ছে করে—'

'কী ইচ্ছে করে?'

'ইচ্ছে করে আমার সাংঘাতিক অসুখ হোক, আমার যখ-মর অবস্থা হয়—'

'এ কী সাংঘাতিক ইচ্ছে!'

'যা হলে হাসপাতাল সকালবেলা নড়ে-চড়ে ওঠে, ডাক্তারদের আসা-যাওয়া শুরু হয়, যন্ত্রপাতি মেজেঘষে দেখবার জন্যে টানা হয়ে।'

'সে অবস্থা মোটেও আসবে না।'

'আসবে না?'

'কখনো না। তোমার অসুখ বাড়া-বাড়ির দিকে গেলেই তোমাকে ওরা হাসপাতালে বিদেয় করবে।'

'হাসপাতালে বিদেয় করবে! তবে আমার অসুখের কাজ নেই।' মধুরা বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়াল। 'আমি কিছুতেই বাড়ি ছাড়ব না। মা তো বাড়ি ছেড়েই গেছে। আমি কিছুতেই যাব না। আঁকড়ে থাকব।'

'কিন্তু দু বছরের আর বাকি কত?'

'এখনো মাসদুয়েক আছে বোধহয়। হিসেব নেই। দু বছর পার হয়ে গেলেও আমি যাচ্ছি না।'

সমস্যার একমাত্র সমাধান মধুরাকে কোনো একটা অন্যে হস্টেলে রেখে আসা।

অভয়দেবকে রাজি করাল বনশ্রী।

'তুমি মধুরাকে আনো।' অভয়দেব বলল।

'আমি বললে যাবে কেন? তোমার মেয়ে তুমি বলবে। তাহলে সব শালীন ও শ্রদ্ধেয় দেখাবে তুমি বিচার করবে। আমি বলবার কে? আমার শাসন করবার এক্তিয়ার কী?'

অভয়দেবই বললে মধুরাকে।

ভালো স্কুল, ভালো হস্টেল, ভাল-কাছার উপরে—কাছে-কলমে অপত্তি করবার কিছু নেই।

মধুরা চুপ করে রইল।

আরাই সব বন্দোবস্ত করে দিল। ঠিক হল সোমবার সকালেই অভয়ের নিজে মধুরাকে নিয়ে গিয়ে হস্টেলে পৌঁছে দেবে।

কত সহজ ব্যবস্থা। কত আয়াসসহ। কত নিরাময়।

সবকিছু সব ঠিক, গাড়ি প্রস্তুত, সোমবার সকালে আর মধুরার দেখা নেই। কোথায় মধুরা? বাড়িতে-সিঁড়িতে কাছে বারান্দায় বাথরুমে বাগানে কোথাও মধুরাকে পাওয়া যাচ্ছে না। মধু! মধু! কোথায় মধু! অভয়দেব পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কোথাও কেনো সাড়া নেই উদ্দেশ নেই। মধুরা নিরুদ্দেশ। মধুরা পলাতক।

তখন অভয়দেব গাড়ি নিয়ে ছুটল। স্কুলে বনশ্রী পুরোনো স্কুল নতুন স্কুল সমস্ত-পড়শী জানা বন্ধু সবার কাছে খোঁজ করতে লেগে—মধুরা এসেছে? সবাই অস্থির উঠোন হল, জানায় হাত দিয়ে বলল—কোথায় মধুরা?

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল, সে তার মায়ের কাছে চলে যায় নি তো? যার সঙ্গে এত দীর্ঘ দিনের ছাড়াছাড়ি, যার উপর এত তার অভিমান, সেখানে সে সহজে ফিরে যাবে বিশ্বাস হয় না। তবু অভয়দেব সেখানেও ফোন করল; ফোন বাজল, সেখানে যায় নি।

থানায় খবর দিল, হাসপাতাল খোঁজতে লাগল—সমস্ত অনর্থক।

মধুরা বাড়ির ত্রিসীমানা ছাড়ে নি এটা যখন পাকা পাতা পর্যন্ত নড়ল না।

কেউ-কেউ বললে, সুজয়াই মধুরাকে লুকিয়েছে।

তখন অভয়দেব নিজে গেল সুজয়ার কাছে। মেয়ের শোকে উন্মাদিনী সুজয়া—মধুরাকে লুকিয়ে রেখেছে এ অপবাদেরও অবকাশ। বিধি বিপাকেতে ছিল এখন পড়ল এসে অভয়দেব আদুনে।

কিরোল রাতের কিনারায় এসে ঠেকল।

সবাই যখন ক্লান্ত অবসন্ন, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, বনশ্রীর ফ্ল্যাটে এসে দেখা দিল মধুরা। ডাকলে, 'নতুন-মা।'

'কে মধুরা?' বনশ্রী প্রাণ পেয়ে উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, আমি। আমি শুধু জানতে এসেছি তুমি থাকতে আমি কেন অনাথ হয়ে গিয়ে হস্টেলে থাকব? আমি কি তোমার ভালোবাসা পাই নি? তুমি কি আমাকে দু চোখ দেখতে পার না?' বলে মধুরা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মধুরাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল বনশ্রী। আকুল হয়ে বললে, 'না, না, তুমি আমার কেন, তুমি জগৎশুদ্ধ সকলের ভালোবাসা পেয়েছ। তুমি হস্টেলে থাকতে যাবে কেন, তুমি তোমার বাড়িতেই থাকবে। চলো তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। কিন্তু দুষ্টু মেয়ে, একলা তুমি কোথায় ছিলে?'

'সে পরে বলব।'

অভয়দেবের বাড়িতে অনেক লোকের ভিড়, মধুরাকে বনশ্রীর সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে সবাই সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠল—মধু এসেছে, মধু এসেছে।

তার চেয়েও বড় খবর—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মধুরা আবিষ্কার করল অন্য আবিষ্কার করেই আনন্দধ্বনির সঙ্গে সুর মেলাল। 'মা এসেছে, মা এসেছে।'

উৎসব বাধতে সুজয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুরা।

সুজয়ার আজ নিরাময়ের স্নান শেষ করবার দিন নয় সত্ত্বেও এসে সজ্ঞানে স্নানঘর করবার নিলজ্জ।

'কিন্তু দুষ্টু মেয়ে, সারাদিন তুই কোথায় ছিলি?' জিজ্ঞেস করল মধুরা।

'মিস-বি কোথায়? মিস-বি জানে।'

রমলাকে খোঁজ করল মধুরা। রমলা আসে নি।

মধুরা একজনকে খোঁজ করল। সেও থাকতে চেয়েছিল একদিন মধুরা কোথায় ছিল। তখন বিরোধিতা পরে ডেকে বলবে।

সেদিন বনশ্রীও নেই। বনশ্রী চলে গিয়েছে।

— সদ্য প্রকাশিত হইল ॥
ছোটদের জন্যে একটি অপূর্ব গ্রন্থ
রায় বাহাদুর অরুণকুমার সাধু
র চি ত
॥ উপেক্ষিতের উপকারিতা ॥
অন্যান্য বহু উপাদেয় পুস্তকের প্রকাশক
বসুমতী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

বঙ্গদর্শন

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা কূটনৈতিক পরিবর্তন অত্যাসন্ন। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে বন্ধনের শিথিলতা ছিল, দ্রুত তার সমাধান হতে চলেছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি মূলত দুটি শাখা ভেঙে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রথমটি হচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বর পার্টি জোট আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অবশ্যের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আট পার্টি জোট। আর এস- পি এই দুই জোটের বাইরে অবস্থানই ছিল এবং এখনও আছে। আট পার্টি জোট গোড়া থেকে ভেবে নেওয়াছিল যে, বাংলা কংগ্রেস তাদের সঙ্গেই থাকবে। এটা স্বাভাবিক প্রত্যাশাই ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সেই প্রত্যাশার পূরণ ঘটল না. বাংলা কংগ্রেস বহুদিন পর্যন্তসি করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাফ জানিয়ে দিল যে, তার পক্ষে আট পার্টি জোটে আসা সম্ভবপর নয় এবং তাদের সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা আট পার্টির জোট বলে কোন সত্তাকে স্বীকার করতে নারাজ। এর কারণটা আমরা পরে আলোচনা করেছি, কেন না ইতিমধ্যেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আট পার্টির পরিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে গোলযোগ ঘটেছে এবং সেই গোলা জলে মাছ শিকার করার চেষ্টা করছে একদিকে বাংলা কংগ্রেস, অপরদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। উভয়ের প্রচেষ্টার অনেকগুলি ঘনাক্ষর ঘটতে পারে। সেগুলির কথাতেই পরে আসছি।

যে দুটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ রাজনীতির স্বরূপ নির্ধারণ করার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে কংগ্রেসের ভাগ হয়ে যাওয়া ও কেরলের নির্বাচন। যখন তখন কংগ্রেস ভাঙলো, তখন থেকেই বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে এক বিচিত্র চঞ্চলতা সুরু হল। তার কারণ হচ্ছে, একবার কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিভূমিতেই বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের সামিল হয়েছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের ব্যবসন্ধী দলগুলির আদর্শ ও কর্মসূচীর সঙ্গে তাদের হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। ফলত বাংলা কংগ্রেসের সংগঠন ব্যাপকভাবে এবং যুক্তফ্রন্টের কৃষিনীতি বাংলা কংগ্রেসকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ঠিরে ফেলেছিল। শরিকী সম্বন্ধে বাংলা কংগ্রেসের কোনই ক্ষতি হয় নি, তবুও যুক্তফ্রন্টের কৃষিনীতি তাদের আশঙ্কিত করে তুলেছিল। বাঘিও ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পর তারা খুব পাচ্ছিল না। দেবতার অশীর্বাদের মতই কংগ্রেস ভেঙে তাদের সামনে একটা সুযোগ এসে গেল এবং সম মতাবলম্বী একটি দলকে তারা এতদিনে খুঁজে পেল। যে অনুকূল-চক্রের চক্রের উপর বাংলা কংগ্রেসের সমস্তের বড় ভোর ছিল, সেই চক্রের পতনে তারা খুশি হল এবং নব কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তখন থেকেই সুরু হল তৎপরতা। আট পার্টি বাংলা কংগ্রেসকে সাধাসাধি সুরু করল, যাতে বাংলা কংগ্রেস তাদের জোটে যোগ দেয়, কিন্তু গত কয়েক মাস বাংলা কংগ্রেস তাদের কোন স্পষ্ট কথা দিল না, শুধু পরিস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে গেল, সেটি হচ্ছে কেরলের নির্বাচন। কেরলের নির্বাচনে তাদের কমিউনিস্ট পার্টি সাফ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করল, একেবারে গোড়া থেকেই পাকাপাকি সহযোগিতা, পুরোদস্তুর নির্বাচনী জোট। আর তখনই আট পার্টির মধ্যে চঞ্চলতা ঘটল, কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রশ্ন করা হল তোমরা সাফ কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে আমাদের পথের কাঁটা সরাচ্ছো কেন? কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যুত্তরে আট পার্টির শরিকদের এই বলে আশ্বস্ত করল যে, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এক নয়; কাজেই কেরলে যা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তা করা হবে না, এখানে কোন অবস্থাতেই কোন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা নয় এবং সেই সঙ্গে আরও একটি তত্ত্ব প্রচারিত হল যে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আর সকল রাজ্যে নব কংগ্রেস প্রগতিশীল, তাদের সঙ্গে জোট বাঁধলে কোন অসুবিধা নেই, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল। অতঃপর কেরলের নির্বাচন ফলের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেখানে কমিউনিস্ট প্রভাবিত মন্ত্রিসভা সুনিশ্চিতই কংগ্রেসের সমর্থনে গঠিত হল। এই ঘটনায় নব কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয় পক্ষই বল পেল। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ প্রস্তাব নিয়ে কেরল যে, অতঃপর আসন্ন নির্বাচনে সর্বভারতীয় পরিসরে কমিউনিস্ট পার্টি সাফ ভিত্তিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করবে। আর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আঁতাতে সরকারী-ভাবে না হলেও বেসরকারীভাবে এই সিদ্ধান্তই বহাল হল।

আট পার্টির অন্যতম দলগুলি মাথায় হাত দিয়ে বসল, তাদের মধ্যে বিক্ষোভ করে কয়েকটি ফ্রন্ট ও এস-ইউ-সি'র মতবা—কোন অবস্থাতেই কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সমঝোতা নয়। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব নিয়ে এরা তুলকালাম কাণ্ড বাধাল। যদি কমিউনিস্ট পার্টি এরকম সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আট পার্টির সংহতি থাকবে না, কেন না আট পার্টির অন্তত পক্ষে ছয়খানি সি-পি-এর বিরোধী, ঠিক ততখানি কংগ্রেস বিরোধী। তারা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সুস্পষ্ট দাবি করল, তোমাদের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় যাও, তাহলে তার প্রতিক্রিয়াটা আট পার্টির উপর কি রকমের হবে, সেটা সহজেই বুঝতে পারছ। তোমরা স্পষ্ট করে বল, জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তোমরা থাকবে, না তার বিপক্ষে যাবে? কমিউনিস্ট পার্টি আমতা আমতা করে জানালো যে, আসলে জাতীয় পরিষদ সিদ্ধান্তটা রেখেছে প্রস্তাবের আকারে, এক্ষেত্রে পাকাপাকি কোন ব্যবস্থাই হয় নি, কাজেই তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা আট পার্টি আছি আট পার্টিই থাকবো, আর তা ছাড়া আমাদের পথের বিসিসটা ভুলে যাচ্ছ কেন? নব কংগ্রেস অবশ্য প্রগতিশীল হলেও পশ্চিমবঙ্গে ঘোরতর প্রতি-ক্রিয়াশীল, আর তাছাড়া আমাদের জাতীয় পরিষদ এমন কোন বাধি করে নি, যাতে তাদের প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাক, এ ছাড়া বাংলা কংগ্রেস এসে আমাদের আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু বাংলা কংগ্রেস ঘটনাচক্রের দিকে ঠিক লক্ষ্য রেখে যাচ্ছিল। তারা দেখল যে, এখনই তাদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। তারা সোজাসুজি বুঝে নিল যে, কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা যতই চোক গিলুক না কেন, জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত তাদের মানতেই হবে। আর তা ছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক তত্ত্বই হচ্ছে—যারা তুলনামূলকভাবে প্রগতি-শীল, তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসা। যে জাতীয় দলতন্ত্রের দোহাগান তারা এতাবকাল দিয়ে আসছে, এখন তাকে কার্যে পরিণত করার সুযোগ তাদের এসে গেছে। এখন কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা এখানে যতই কংগ্রেস বিরোধিতা করুক না কেন, আখেরে তারা কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় সংস্থারই নির্দেশ মেনে চলবে। কাজেই কালবিলম্ব না করে অতঃপর অজয়-বাবু ও সুশীলবাবু নয়াদিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং

আসন্ন নির্বাচনে নব কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস সমঝোতার ব্যবস্থা করে এলেন। তাঁদের মনে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে একটি তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি গঠন—যেখানে থাকবে নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি। আট পার্টি জেতার হলে পরিবর্তে ছয়েই বাংলা কংগ্রেস টেনে নিয়ে। তাদের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে তাঁরা খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং তোমাদের বহু প্রচারিত জাতীয় গণতন্ত্রের তত্ত্ব অন্ধকারে কবর দাও এবং তা হচ্ছে তোমরা আমাদের জোটে এস। শুধু তাই নয়, আরও এক ধাপ এগিয়ে বাংলা কংগ্রেস বলল যে, আট পার্টি জোট বলে কোন সংস্থাকে আমরা স্বীকার করি না, তবে এই জোটের কথা বলে যেই সকল দলের সঙ্গে একতরফা আলোচনার বাংলা কংগ্রেসের আপত্তি নেই। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস তার লক্ষ্যকে আর এক ধাপ বাড়াল। শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে নব কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধা নয়, সম্ভব হলে আরও দু-একটি দলকে নিজেদের পকেটে নিয়ে আসা।

তাহলেই আট পার্টির নিজের ঘরই বেসামাল হবার যোগাড় এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও এই সংযোগে আট পার্টি জোট থেকে, বিশেষ করে ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সিকে সেতে চাইছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কাছেও কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সির অবস্থান দ্বিধাবিভক্ত এবং এদের দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক আচরণ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির থেকে তেমন কিছু পৃথক নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে গত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে এদের সঙ্গে স্থানীয় ব্যাপারে কিছুদিনের জন্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তফাৎ সম্পর্ক চলছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আশা, এদের পক্ষে একটি সুযোগ কংগ্রেস এবং সি-পি-এর দ্বিধাবিভক্তা করা সম্ভব হবে না, কাজেই চেষ্টা করলে তাদের এদিকে টেনে আনা সম্ভবপর হবে, পক্ষান্তরে এই দলগুলিরও একই সমস্যা—কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্তা করার ব্যাপারে তারা কি সি-পি-এর পক্ষ ভিড়বে, না সি-পি-এর বিরোধিতা করার ব্যাপারে তারা অন্যদিকে যাবে, অথবা নিজেরা বিভিন্ন ভেঙে একতরফা দুই অংশের সঙ্গে মিশে যাবে? আর-এস-পির সামনেও ঠিক সমস্যা। কেরলে তারা নব কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে রয়েছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গ শাখার তাতে ঘোরতর আপত্তি। তারা কি কেরলের ব্যাপারে অনুসরণ করবে, না কংগ্রেস বিরোধিতার জন্য সি-পি-এম কোটে আসবে, না আট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সি পি-এর বিরোধী বলয়টির সঙ্গে একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করবে?

সে যাই হোক অন্যান্যত সুবিধাজনক স্থানে আছে বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। বাকি দলগুলি প্রত্যেকেই যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাইকে বলে না গেলে বাংলা কংগ্রেসের ক্ষতি নেই, কেন না তার সঙ্গে নব কংগ্রেসের পূর্বোবস্থার সমঝোতা হয়ে গেছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও মোটামুটি একটা জোট গঠন করে ফেলে আছে। সমস্যা কমিউনিস্ট পার্টির, কেন না তাদের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত মানতে গেলে আট পার্টির জোট থাকে না। আট পার্টি জোটেরও সমস্যা, কেন না কমিউনিস্ট পার্টি ছিটকে গেলে তাদেরও বেকায়দায় পড়তে হবে, সমস্যা আর-এস-পিরও। ঘটনাচক্র কোন্ দিকে মোড় নেবে, তা এখনই আমরা বলতে পারছি না, তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কিছুই চিরন্তন নয়, কোন স্থবিরতাই চূড়ান্ত নয়। আশা করা যায়, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ছবিটা আমাদের সামনে আরও একটু বেশি পরিষ্কার হবে।

কলকাতা বন্দরের সম্ভাবিকী ও ফরাক্কা

কলকাতা বন্দরের শতবার্ষিকী এমন একটা সময়ে পালিত হচ্ছে যখন ঐতিহ্যসম্পন্ন এই বন্দর অস্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মুর্তাদাবাদে কলকাতা বন্দরের প্রতি সর্বভারতীয় সহানুভূতি আজ নেই। কাজেই বিদেশের পর দিন এই বন্দর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে এলেও তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। হুগলী নদীর গর্ভ ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, কারণ জলের যোগান কম। বড় জাহাজ হুগলী নদীতে এখন প্রবেশই করতে পারে না, এখন বর্ষার সময় জোয়ারের স্রোতে নদীর জল কিছুটা ফুলে উঠলে তখনই মাত্র ২৬ ফুট গভীরতাসম্পন্ন জাহাজগুলি বন্দরে মাত্র পনের দিন কলকাতা বন্দরে আসতে পারে। দীর্ঘকাল ধরেই অনাদরে নদীর গর্ভ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতাই বেশ জানা যায়। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার সরকার নদীর বিভিন্ন উপনদীগুলির উপর বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার ব্যবস্থা করার পর নদীগর্ভে জলস্রোতের প্রখরতাও কমে গেছে, জলের যোগানও অনেক কমেছে। এখন কলকাতা বন্দরকে সচল রাখতে গেলে ফরাক্কা বাঁধ থেকে হুগলী নদীতে কমপক্ষে কম চল্লিশ হাজার কিউসেক জল না ছাড়লে বর্তমান ব্যবস্থাটুকু বোধ হয় চালু রাখা যাবে না। আশা করা হয়েছিল যে, ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পটি ১৯৭১ সালের মার্চমাসে সম্পূর্ণ হবে এবং গঙ্গা থেকে পদ্মাতে জলপ্রবাহ মেপ করে দীর্ঘ একটি খিতার কালনেলখোলে জলস্রোতকে আবার হুগলী নদীতে ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু ফরাক্কা এখন যত দূর জানা, ওই সময়ের মধ্যে ফরাক্কা প্রকল্প যে শেষ হবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। যেভাবে সেখানে কাজকর্ম হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যা দৃষ্টিভঙ্গী, তাতে আশার চেয়ে আশঙ্কারই কারণটাই বেশি। আর সমস্যা হচ্ছে, ফরাক্কা থেকে চল্লিশ হাজার কিউসেক জল কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করবেন কি না, তাতেও সন্দেহ আছে। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বয়ং কর্তৃপক্ষ ফরাক্কা থেকে চল্লিশ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নেবার যে আবেদন করেছেন, কেন্দ্রের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া গঙ্গা থেকে পর্যাপ্ত জল আদৌ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উপনদীগুলি গঙ্গায় আগে যে জল চালত, সেগুলিতে বাঁধ দিয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সরকার ইতিমধ্যেই গঙ্গায় জলের যোগান কমিয়ে দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার, সরযূ নদীর উপর বাঁধ দিয়ে গঙ্গায় ছয় হাজার কিউসেক জল আসা বন্ধ করেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারও ফরাক্কার জন্য দাবি করেছে। সব মিলিয়ে শুধু ফরাক্কার উপর নির্ভর করেই কলকাতা বন্দরের সমস্যা মিটবে না, আরও কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের যে সব নদী একদা গঙ্গার জলের জল চালত, সেগুলি আজ মজতায় ভরে গেছে। এইসব নদীতেও জলের প্রবাহ যাতে বাড়ে, সে চেষ্টা একটা সঙ্গে করা দরকার। মনে রাখতে হবে যে, কলকাতা বন্দর, তার সব অসুবিধা থাকলেও, তুলনায় হলেও ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতের সকল অংশের সমষ্টি হলেও কলকাতা বন্দরের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ব্যাপারের প্রতি আমেরিকার অযৌক্তিক প্রকাশ

ভারতের লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকা কোনমিনই পছন্দ করে না। ইন্দোচীন এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ভারত যে নীতি গ্রহণ করেছে (যেমন প্রাচ্যে ইসরায়েল গঠনের ফলে ফিলিস্তিনের যে অংশ দখল করে আছে, সেই অংশ থেকে হটে যাবার আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গত বছর নভেম্বর মাসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তার প্রতি ভারত পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। ইন্দোচীনে মার্কিন ফৌজ এবং সমস্ত বিদেশী ফৌজের অবিলম্বে অপসারণ দাবি করে সুইজারল্যান্ডে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, ভারত সেই প্রস্তাবেরও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে), সেটাও আমেরিকা বরদাস্ত করতে পারছে না। তাই ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার ঠাণ্ডা লড়াই সুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানকে ভারত সরকারের নিন্দাও তার মূল কারণ। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বাউলস কিসিঞ্জার-এর অনেকদিন প্রকাশ্যে তার একটি নির্মম ভাষায় ওয়াশিংটনের ধাক্কা।

গত বছর অক্টোবর শেষ হবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রসংঘের বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে যোগদানের জন্য দিল্লী থেকে নিউ ইয়র্কে যাত্রা করেন। আন্তর্জাতিক সৌজন্য অনুযায়ী প্রথম-বিশ্বের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের (আমেরিকা) রাষ্ট্রদূতের উচিত ছিল বিমানবন্দরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর বিদায় গ্রহণের সময় বিমান ঘাঁটির ত্রিসীমানায় কিসিঞ্জারকে দেখা যায় নি। ব্যাপারটা সকলের কাছেই খুব দৃষ্টি-কটু হয়ে ওঠে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই কিসিঞ্জার এই সৌজন্যবোধ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ব্যাপারটা নিয়ে চারি-দিকে যখন ছা-ছা সুরু হয়ে যায় তখন মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন যে, মার্কিন সরকারের অতিথি হয়ে যখন আমেরিকায় যাচ্ছেন না, তখন তাঁর আমেরিকা-মাটির প্রথমদিনে বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের হাজির থাকবার কোন প্রয়োজন হয় না। মজার কথা আরও বলা হয় যে, কিসিঞ্জি বিমান-বন্দরে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু অবসরের নিষ্ক্রিয়তা না হওয়ায় তিনি যেতে পারেন নি। তাঁর মুখ অবশ্য পাল্টির ঘরের ওস্তাদ কেলো হয়েছিল, তাঁরা তাঁকে সময়মত জানিয়ে দিতে না পারায় এই অঘটন ঘটে গেছে। কিসিঞ্জি নাকি এজন্য দুঃখপ্রকাশ করে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন।

বিমান বন্দরে কিসিঞ্জার অনুপস্থিতি মার্কিন দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্র-ভাবে ব্যাখ্যা করায় মানুষের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, আসলটার মধ্যে কোন পাঁচ আছে। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার সরকারী অতিথি নন বলে যদি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিমান বন্দরে হাজির থাকার প্রয়োজন না বোধ হয়, তাহলে কিসিঞ্জি সেখানে হাজির থাকার জন্য 'প্রস্তুত' হয়েছিলেন কেন? আর নিদ্রা যদি 'কপট' হয়, তাহলে সে নিদ্রা ভঙ্গ করা যে শিবেরও অসাধ্য, তা কারও অজানা আছে কি? ব্যাপার কিসিঞ্জি যা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নিশ্চয়ই নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন না। তাঁরা নিউ ইয়র্কে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বাগত জানাতে আসেন নি কেন?

ওদিকে ওয়াশিংটনের সরকারী মহল থেকে খবর এসেছে যে, আগামী প্রেসিডেন্ট ভ্যা কেন্সল কাউন্সার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের একটা সাক্ষাৎকারের পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিক্সন ঘোষিত করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা যে খুবই অপ্রত্যাশিত, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি মার্কিন কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত অযাচিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রেসিডেন্ট নিক্সনের এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাষ্ট্রসংঘের বক্তৃতা অনুষ্ঠানের শেষ দিনের উৎসবের রাতেই (২৪শে অক্টোবর) প্রেসিডেন্ট নিক্সন একটা পাল্টা অনুষ্ঠানের হিসাবে উৎসবে আগত বিশিষ্টজনদের এক ভোজসভার আয়োজন করেন। শ্রীমতী গান্ধী সেই ভোজসভায় যোগ দিতে রাজী হন নি।

ভারতের প্রতি আমেরিকার অযাচিত আচরণের প্রতিবাদে শ্রীমতী গান্ধী যা করেছেন, তা আন্তর্জাতিক-সম্মত প্রতিটি ভারতবাসীর সমর্থন লাভ করবে। আমেরিকার ভারত-বিদ্বেষী স্বরূপ দিনের পর দিন বেআব্রু হয়ে উঠছে, তাতে দুই দেশের সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

ভারতের অতীব মর্যাদা রক্ষার জন্য ইন্দিরা গান্ধী বিদেশের আমন্ত্রণ প্রত্যা-খ্যান করে যে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল মহলের মনঃপূত হয় নি। সিন্ডিকেটী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী এস-কি-সিন্হা প্রধানমন্ত্রীর এই কাজের নিন্দা করেছেন। তাতে একটা বেশ ঘোলা মাছে যে, জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা নেই তাতে সন্দেহ নেই।

বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনা

আটটি দলের সমর্থনপুষ্ট বিহারের মহামায়া প্রসাদ (কংগ্রেস) মন্ত্রিসভা গভীর সংকটের সম্মুখীন। কোয়ালিশনের চারটি ছোট ছোট দল (যথা ইণ্ডিয়ান জাড়খণ্ড পার্টি, বি-কে-ডি, হাল জাড়-খণ্ড এবং পাঞ্জাবী সি-এল-পি) এদের ছোট সদস্য সংখ্যা ৩২) স্থির করেছেন যে, বিধান সভার স্পীকার পদ থেকে কৃষ্ণ সিংকে কাজ করবেন। কংগ্রেসের বিদ্রোহী সোশালীস্ট দলের হাত মিলিয়ে তাঁরা সরোজা প্রসাদ মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন এবং রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগোর কাছে অধিবেশন বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, সরোজা প্রসাদ আর বিধানসভা সংখ্যা কোয়ালিশনের আস্থাভাজন নন।

উপরোক্ত চার পার্টির বৈঠকে গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেন বনমন্ত্রী রাঘুনন্দন সাম্বুই। তিনি বলেন যে, মহামায়া প্রসাদ যদি সঠিক পথে না চলেন, তাহলে বিহার উত্তরপ্রদেশের পথেই এগিয়ে যাবে।

বিহার বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ৩১৮ জন। তার মধ্যে কোয়া

[illegible] ১৯২ [illegible] সংখ্যা ২১৩, মত ৭১ জন। উৎপলের ছবি ৮৫ ঘটি প্রথম হয়ে গত হলো, এইবার দেবকীবিজয়ের [illegible] তাঁর বিখ্যাত [illegible] পরিচালনা করছেন। এই ছবি পরিচালনা প্রসঙ্গে [illegible] বলেন, [illegible] পরিচিতির [illegible] পারবেন।

[illegible] এবারও নিজে অভিনয় করবেন [illegible] ছবি পরিচালনা করবেন। [illegible] এ-আই-সি-সি অধিবেশনের [illegible] ছবিতে অভিনয় করবেন বিহারে কংগ্রেসের [illegible] ছবিতে [illegible] বলে এবং [illegible] পরিচালনা করবেন [illegible] ছবিতে অভিনয় করবেন [illegible] ছবিতে [illegible] ছবিতে [illegible] ছবিতে

আন্তর্জাতিক

ভারত ও রাষ্ট্রপুঞ্জ

রাষ্ট্রপুঞ্জের রজত-জয়ন্তী। পঁচিশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও উক্ত সভায় উপস্থিত হয়েছেন। এতেদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের জীবনে ভারতের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

দুশোবছর পৃথিবী হিংসার উন্মত্ততা থেকে মুক্তি পেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইলো। যেন ক্লান্তক মানুষ; নিশ্চিন্তায় হয়ে চাইলো শান্তিতে থাকতে। চাইলো পৃথিবীতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। চাইলো সাম্যবাদ। চাইলো অসাম, অত্যাচার, বুভুক্ষা ও অত্যাচারমুক্ত পৃথিবী। লীগের দুঃস্বপ্নজর্জর মানুষ যদিও আশাহত ছিল, তবু নেতৃত্বের ব্যর্থতায় ধ্বংস হয়েছে। তবুও নতুন আশা নিয়ে সেই মানুষ জন্ম দিল রাষ্ট্রপুঞ্জের। ভারত তখন পরাধীন ছিল, কিন্তু নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ভারতও কামনা করলো, অতীতের রাষ্ট্রসংঘের দোষগুলি এই বর্তমানের রাষ্ট্রপুঞ্জে যেন না ঘটে। পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো। যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হলো তা-কি পালিত হয়েছে এবং হচ্ছে? চার্টার-এর প্রতিটি নীতি কি প্রযুক্ত পরিবর্তন যেন চলেছে? তারই বিশ্লেষণ-নিকাশের সময় এসেছে।

আজ আমরা কি প্রত্যক্ষ করছি? স্নায়ুযুদ্ধের অন্তর্নিহিততার একান্ত অভাব, জাতীয় স্বার্থ, শ্রেণী-স্বার্থ রাষ্ট্রপুঞ্জের মহান্ আদর্শকে রূপায়িত করে দিতে চায় না। প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে একত্র হয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বাধা অতিক্রমের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর জাগ্রত জনতাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সমর্থনে দাঁড়ি তুলতে হবে—পরমাণু বিস্ফোরণ বন্ধ ও নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদ ও ফেসবাদের প্রেরণা নিষ্ক্রিয়করণ, উপনিবেশিকতা এবং বর্ণবৈষম্যের অবসান। জাগ্রত জনমত বন্ধ করা আজ বন্ধ করতে হবে শান্তির নামে বাগাড়ম্বরী এবং শোষণে-প্রবৃত্তের দুর্বল জাতিগুলিকে পঙ্গু করার অপচেষ্টা। অনেকে দোষ করতে হবে এই মৌলিক অধিকারগুলিকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের দুর্বল ও অনুন্নত প্রগতিবাদী দেশগুলিকে ক্রমাগত লড়াই করতে হবে পৃথিবীতে সুখ-শান্তি-স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। যদি কোন দেশ প্রগতির পথে যাবার প্রচেষ্টা করে তা উদ্যত করতে হবে নিহত। এতেদ্বারা রাষ্ট্রপুঞ্জ তার সততার দ্বারা দেউলিয়ে পারে।

জলার ধর্মা, আমাদের দেশ প্রগতিশীল দেশগুলির অন্যতম। তাহে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্মলগ্ন থেকে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য যা নিশ্চিহ্ন বর্বরতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, রোডেশিয়াতে জয়ন্ত সিথের বৈরতন্ত্রী সরকার, আলজেরিয়া, মোজাম্বিক, পর্তুগীজ, গিনি প্রভৃতি দেশের জনগণের লড়াইকে ভারত সমর্থন জানিয়ে আসছে এবং ভারতের সহানুভূতি রাষ্ট্রপুঞ্জেও আশ্রিত প্রভাবিত করতে পেরেছে।

পাকেনা, আলজিরিয়া, সাইপ্রাস, কিউবা প্রভৃতি দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সহানুভূতি সাহসী অনস্বীকার্য।

শান্তির জন্যও ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত শান্তি ভূমিকায় যে, বিদেশী হস্তক্ষেপের পরিবর্তে পরস্পর বিবদমান দুই অংশের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক তাদের জন্মের সমস্যা সমাধানের ভার।

চীন যেন আজও রাষ্ট্রপুঞ্জের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার সুযোগ পায় নি। যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের সদস্যপদ স্বীকৃত হতো, তবে তাই কি, চীনের বৈদেশিক নীতি ও অভিমানসহতে অনেকটা ভিন্ন রকমের হতে পারতো। ভারত বরাবর চীনের আন্তর্জাতিক দাবির পক্ষে লড়াই করেছে।

চীন, দুই জার্মানী, দুই কোরিয়া, দুই ভিয়েতনাম রাষ্ট্রপুঞ্জের সভ্য তালিকাভুক্ত হবে না কেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি তার চার্টার মেনে চলতো তবে ভিয়েতনামের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রয়োজন হতো না। রাষ্ট্রপুঞ্জের গৃহীত সুবিধাবাদের সুযোগ নিয়ে আমেরিকা তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার্থে ভিয়েতনামের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, যেমন ইরাক এবং কুয়েত একদিন নিরস্ত্র অবস্থায় শেষ আক্রমণে মেতে ওঠে। বিশ্বের চোখে ধুলো দেওয়া হয়ে গেলো না। বরং, পৌঁছানোর সাথে সাথে পাকড়াও। ভারতও সোভিয়েত এ অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে দিধা করে নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধবিরতি, স্থিতি পরিস্থিতির জন্য তাকে লড়াইয়ের সক্রিয় হতে হলো। পৃথিবীর এই নবীন সার্বভৌম শক্তি ও তার রাষ্ট্রপ্রধানের বিশ্বের একটা লড়াই করে পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন যুগ সৃষ্টি করলো। ভিয়েতনামের যুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের চরম পরাজয় ঘটলো।

আজও পৃথিবীর বহু দেশ, বহু জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি। পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভ্যতালিকাভুক্ত হবার দাবি জানাবে। তাদের দাবি যতক্ষণ অপূর্ণ থাকবে, ততক্ষণ রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিশ্বমানবের সভা বলে মনে করা অনুচিত হবে। পরাধীন জাতিগুলির মুক্তির জন্য, বর্ণবৈষম্য অবসানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের চেয়ারে বাইরে লড়াই-এর ভূমিকা এবং ও লড়াইতে ভারতের নেতৃত্ব। সফল কামনা করি।

পরিশেষে এখানে, বিশেষত ভারত অন্যান্য দেশের অনুরূপ কথা যে শুনেছে তা শুধু হওয়া প্রায় সম্ভব নয়। জর্ডনের হোসেন যুদ্ধ এবং ইস্রায়েলের তাদের অক্ষয় বাহের জোরে সমঝোতা——এর কিছু সিদ্ধান্তে মধ্যস্থতা যে-কোন সময়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সমস্যা বেলেটিস্থিতি তাদের কিছুই তাদের না হলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি বাঁধা রাস্তা নিতে পারে। তখন ভারতের মুক্তাকাঙ্ক্ষা সামরিক ভূমিকার জন্য করলেও তখন কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। যেমন কাশ্মীর বেলায় ভারতের মুক্তেচ্ছা আজ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপুঞ্জের সক্রিয় সাহায্যের অভাবে অসোয়াস্তী ও তাদের অনেকটা মুক্তেচ্ছা হয়ে হলো। মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তেচ্ছা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা আজ অসোয়াস্তীর সৃষ্টির পথ মুক্ত হয়ে নি। এই সমস্ত অবস্থানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের দায়িত্ব অতীতের চেয়ে দ্বিগুণ বিশেষের প্রয়োজন করছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের ভূমিকা নিরপেক্ষতা প্রগতিবাদী। অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য ভারত বরাবর চেষ্টা করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তির সম্বন্ধে সে অন্যান্য সভ্যদের প্রচারিতও করছে। শ্রীমতী গান্ধী অভিযোগ যে, রাষ্ট্রপুঞ্জকে সম্পর্কে সম্পর্ক আজ নাশাবেন না। কম শক্তিশালী ও অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্যই যেন সমস্ত দেশগুলির

নীতি না হয়। শান্ত ও স্থিতিশীল থেকে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বৈষম্য কেমন করে দূর করা যায় সে চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ঔপনিবেশিকতা ও বর্ণবৈষম্যের অবসান, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ও নয়া ঔপনিবেশিকতার অবসানের দাবি। তারপরে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদের ঐতিহ্যের দিয়েছেন এই বলে যে, অস্ট্রেলিয়া পার্লামেন্টকে নতুন করে চলা আরম্ভ করেছে যে নিজস্ব নিয়মে, তা পরিণামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হতে পারে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, দু-একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অকেজো করতে চেয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ছোট ছোট দেশ তা করতে দেয়নি। তারা বড় দেশগুলির অন্যায় আবদার মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। আশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তন হবে, যেদিন ছোট-বড় দেশগুলি পৃথিবীর কল্যাণের চিন্তা করে প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে জোট বাঁধবে। সেদিন মানুষ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব টের পাবে এবং প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সেদিনই রাষ্ট্রসঙ্ঘের জয়ধ্বনি শোনা যাবে। সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কেউ আর অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলবে না। —ভারতপ্রসাদ রায়চৌধুরী

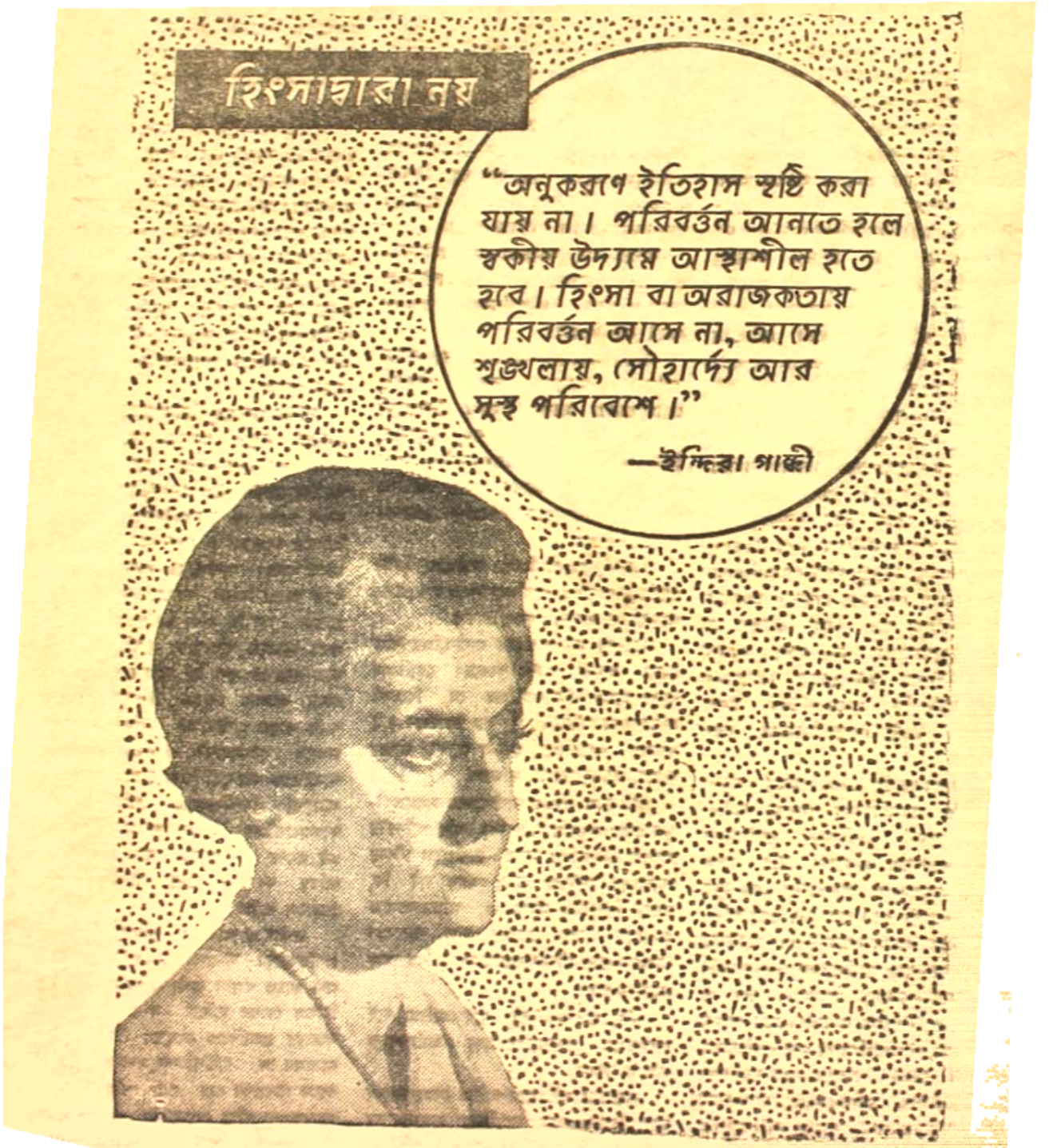

জনশিক্ষার পটভূমিকা ও স্বামী বিবেকানন্দ

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাতত্ত্ব কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তথাপি সমকালীন ইতিহাস আলোচনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে সেদিনকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ বিনাশে বিশেষ ত্রুটি ছিল না। অন্যথা লর্ড মেকলের মন্তব্যকে ইতিহাসের পক্ষে বেদবাক্যরূপে পাওয়া সম্ভব হোত না। গণশিক্ষা প্রচলনের জন্যে লিখিত-পড়িত কোন প্রমাণ না থাকলেও, স্মৃতি-শ্রুতি, ধর্মানুষ্ঠান, লোকাচার থেকে সুরু করে, লোক-গীতি সভ্যতা, পঠন-পাঠন, যাত্রা অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে সেদিন জন-শিক্ষা প্রচলনের জন্যে যে সমস্ত আয়োজন দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, সেইগুলি আলোচ্য শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে কোন অংশেই নগণ্য ছিল বলে মনে হয় না। বৌদ্ধযুগে মহা-রাজা অশোকের চেষ্টায় শিক্ষাকে সর্ব-জনীন ও সহজলভ্য করার জন্যে—শিলালিপি উৎকীর্ণ, শিলাস্তম্ভ স্থাপন, দেশ-বিদেশে প্রচারক প্রেরণ, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা ইত্যাদিও ঐ জনশিক্ষা বা গণশিক্ষা প্রসারের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া অপর কিছুই ছিল না। পরবর্তীকালে নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিদ্যানুশীলন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা উপরোক্ত প্রচেষ্টারই ক্রম-পরিণতি মাত্র।

অতঃপর বৈদেশিক আক্রমণের সূত্রে তথা মুসলমান অধিকারের সূচনা থেকে আমাদের জাতীয় জীবন ভাঙা-গড়ার যখন ক্রমান্বয়ে সূত্রপাত হবে, তখনই জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির অবলুপ্তনের সূচনা হয়। এটিও স্বাভাবিক। বিজেতা বিজিতকে চক্ষু-শূল ও বিভ্রান্ত করে রাখার ব্যবস্থা না করতে পারলে তার পক্ষে বিজিতের উপরে আধিপত্য চালানো সম্ভব হতে পারে না। এই সত্য ধরলেও শত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সমভাবে প্রযোজ্য।

খৃষ্টীয় ধর্ম সূত্রে বৈদেশিক আক্রমণের আবার ভারতের যে ভাঙা-বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল, তার ফল কেবল রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মোন্মত্ত আক্রমণকারী সেদিনকার মুসলিম গোষ্ঠীর অভিপ্রায় ছিল ভারতীয় কৃষ্টির মর্মস্থলে আক্রমণ চালিয়ে তার শিক্ষাধারা ইত্যাদি ধ্বংস করে ভারতের জাতীয় ও আধ্যাত্মিক সত্তাকে নির্মূল করা। কাজেই মুসলমান যুগের ভারতীয় ইতিহাসে গণশিক্ষা ব্যবস্থার কোন প্রমাণ লক্ষিত হয় না। আকবর, যুগের পর প্রমুখ দু-চারটি নাম ব্যতিক্রম মাত্র।

পরবর্তীকালে ভেবেচিন্তেই হোক, ইংরেজদের এই দেশে আবির্ভাবের পরে, উক্ত শিক্ষা প্রচারের ভার মূলত নস্ত হয় তাঁদের মিশনারী তথা ধর্মযাজক-দের হাতে। এইভাবে তাঁরাও সেদিন ক্রমে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নানা-ভাবে প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেখানেও মোটামুটি ছিল নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা। তথাপি আলোচ্য সময় হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও প্রমুখ মনীষীদের উক্ত কাজে আন্তরিক অবদানেরও অভাব ছিল না। তবে একথাও সত্য যে, এই সকল আয়োজন ও প্রচেষ্টার সকল কিছুই সেদিন ভারতের সীমাবদ্ধ থাকতো মোটামুটি-ভাবে মধ্যবিত্তের গণ্ডীর মধ্যে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে জন আডামের আবেদন পরিচালিত শিক্ষা-আন্দোলন বিশেষ থেকেই প্রতিভাত যে, সেই সময়ও বাংলা দেশে লক্ষাধিক পাঠশালা বর্তমান ছিল। স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা, অল্প-পরিসরে অবস্থিত এই পাঠশালা-গুলিই জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে জনশিক্ষার ধারক ও বাহকরূপে সেদিন বেভাবে পরি-চালিত হোত তার সঙ্গে বর্তমানে স্কুল কোড পাঠ্যতালিকা প্রাইমারী স্কুলের তুলনাই চলে না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে, শাসকের ঔপনিবেশিক সংকীর্ণ রাজনৈতিক কারণে উক্ত জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের ধারা ক্রম প্রায় বিলীন হতে থাকে। শিক্ষিত ও বিত্তবান শ্রেণীর মানুষের শ্রেণী-সম্বন্ধ যেখানে ছিন্ন, সেখানে শিক্ষা প্রসারের উপায়ের পরিণতি স্বাভাবিক। এই কারণেই দেখা গেছে। তবে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে সেদিন অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্তের মধ্যে যে নূতন ফলশ্রুতির তারই পরিণতি বিংশ শতকের সূত্র থেকে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার আবির্ভাব। (ক)

তবে একথা সত্য যে, উক্ত শিক্ষা সেদিন দেশের যে মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমিত ছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ঐ শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক

(ক) 'আইনের স্কুলে প্রথম ইংরাজ ছাত্র ছোষ প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস নামক বাংলা গ্রন্থ পাঠ করি। আমাদের এস্ট্রান্স পরীক্ষাতেও বাকল্যাণ্ড প্রণীত ইংরাজী ভাষায় ইংলণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ্য ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস জানার অন্তরে দেশভক্তি ও রাষ্ট্রনীতিকে পাইবার প্রবৃত্তি জাগাই-বার অন্যতম গ্রন্থ। ভোলেন্দ্রনাথের মত দেশভক্ত শিক্ষক (ধেলোহেন্দ্র ইনস্টিটিউশনে মাইনার স্কুলের হেড-মাস্টার ভোলেন্দ্রনাথ দত্ত) এই পুস্তকের সাহায্যে ছাত্রদের অন্তরে দেশভক্তি বিকশিত করিবার সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই। ইংরাজরা পরে বুঝিতে পারে ইংলণ্ডের ইতিহাস ছেলেদের পড়িতে দেওয়া ভুল হইয়াছে।" (অধ্যাপক শ্রীনিবারণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ, বি এসসি লিখিত 'আত্মোন্নতি সমিতির জন্ম-কথা—রামধনু, জন্মাষ্টমী, ১৩৫৪ হইতে উদ্ধৃত)।

...করার ইচ্ছা তাঁহার কোনো দিনই ছিল না। ব্রিটিশ রাজত্বের চর-চতুরেরা সর্বদাই তাঁহাকে সন্দেহের চোখে দেখিত। তাই তাঁহার নিজস্ব তথা সমাজের সম্পর্কেই ঐ সন্দেহের সম্পর্ক উঠিয়া সমস্ত ব্যাপারে এই বাক্যও পর্যালোচনার অবকাশ থাকিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন থাকিতে পারে সেই বিষয়ে সমাক জ্ঞান হইলে আমার বাসনার সম্ভবত কোনো ত্রুটি সম্ভব বা সুযোগ ছিল না। বাহিরের অনুপ্রেরণায় সমাজের একশ্রেণীর প্রগতিশীল বিপ্লবীদের কল্পনা দোলা—সেদিন তাঁহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় ছিল ইংরেজের দেশ থেকে সর্বপ্রথম তাড়ানোর কথা। তবে একথাও ঠিক যে, বাংলা তথা ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার সূত্র থেকে তরুণদিগের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুভবনার অভাবে উক্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছিল উৎকটভাবে। স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন বিভিন্ন ইতিহাস বা নির্দেশগুলিও সেদিন সমাক প্রকাশ পায় নি। সেগুলি হয়তো ছিল, যে-কারণেই হোক তাঁহাই প্রকাশিত তথা স্বামীজীদের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপদেশ ঐ সকল তত্ত্ব লেখা বা বলা হয়েছিল। সম্ভবতঃ বেলুড় ধর্মপ্রচারকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি-মন্ত্র প্রচারেই ব্রতী হয়েছিলেন, সেই বিষয়ে হয়তো তাঁহা সমাক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। অথবা অপর কোন অজ্ঞাত কারণও থাকতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, স্বামীজীই প্রথম আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, জনগত মুক্তি-আন্দোলনকে সার্থকভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন তাঁর সমাজ-সম্প্রদায়ের ধার্য পদ্ধতির বিপ্লবের। তাহারা শিক্ষায় যে মানুষের জন্মগত অধিকার এবং একে অপরকে শিক্ষিত করে তোলা যে মানুষের পবিত্র কর্তব্য ও তাঁর জীবনব্রত। উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের সূত্রপাতে এই বিষয়ে অন্তর তারতম্যে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম। দীর্ঘ পরাধীনতার প্রভাবে বাঙালী তথা ভারতবাসী যখন মুক্তির স্বপ্নে পলকে, তার সমাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্নিত, স্বামীজীই তাদের প্রথম পথনির্দেশিয়েছিলেন আত্মশক্তির বাণী তথা সাম্যবাদের উদাত্ত আহ্বানে।

১৮৯৭ সাল—রামেশ্বরমে ভিক্ষুমান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর সম্বর্ধনার তিনি একদিন বলে ওঠেন —হাঁ, গরু আমাদের মতোই বটে, তা না হলে এমন সব সন্তান-সন্ততির জন্ম হবে কেন?" —(প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪০৬)

অতঃপর বলেন—মানুষকে তৈরি করতে হবে। তাকে আশা দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে, তার মধ্যে ধর্মভাব জাগাতে হবে।"—(পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪০৬)

মানুষের জীবন ধরে, মানুষের জন্যে যদি সহানুভূতি না থাকে, তাকে কি মানুষ বলা চলে?" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ —পৃঃ ৪০৬)

'বৃন্দাবনের বংশীধারী কৃষ্ণের ধ্যান এখন চলবে না—গীতা উপনিষদ কৃষ্ণকে ভাবতে হবে: তাঁর ধনুক-ধারী রামের চিন্তা, মহাবীরের আরাধনা, আর মা-কালীর ধ্যান।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪১৩)

'ফ্রান্সাতের মত স্নায়ুর সঙ্গে বুদ্ধিতে তারা ইউরোপের কাছে মাথা হেঁট করে।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪১৩)

শিক্ষা ছাড়া, জ্ঞানের প্রসার ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪৪৪)

সমাজ পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যেক কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্ম-চারিণীকে সংগ্রহ করে সমাজ জীবনে অধিষ্ঠিত করতে হবে। তাহাদের তাঁদের পাঠাতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। পুরুষ পুরুষের মধ্যে কাজ করবেন, স্ত্রী জাতি তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে যাবেন। যা কিছু করতে হবে, সবই হওয়া চাই আমাদের নিজের দেশের আবহাওয়ায়।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৪৪১)

'তাদের প্রথমে দিতে হবে খাদ্য, অতঃপর শিক্ষা—আর সর্বশেষ ধর্ম।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ—তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭)

যে শিক্ষা সাধারণকে তার জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করতে অসমর্থ, যে শিক্ষা হৃদয়ে চরিত্র গড়ি তুলতে অক্ষম, যে শিক্ষা মানুষের মধ্যে সিংহসদৃশ সাহস সঞ্চার করতে পারে না—সে শিক্ষা শিক্ষা নামের যোগ্য নয়।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ১৪৫)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর স্বামীজীর পরামর্শ—'তোমরা নিজে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ভবন নির্মাণের চেষ্টা কর। সেখানে যাহাদের দেখিবে যে, তাহাদের একটি মাত্রিকা নির্মিত কুটির ও তথা প্রস্তুত কর, সেখানে সপ্তাহে অন্তত দুইবার, রবিবার ও বুধবার, সেখানে ও কতকগুলি ছায়া-ছবির দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার কর। কুষ্ঠি-দিন কথার সময় দেখাবে পারিপার্শ্বিকতা, এমন কি ভূগোলবিদ্যার পর্যন্ত কথা কহ; তাহাদিগকে প্রথমে কৃষি উপদেশ দাও; তাহাদের ঐ মাত্রিকা কাটিয়া ও অন্যান্য ভূমির সহায়তা ভূগোলের প্রস্তুতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। ভূগোলের শিক্ষিত এক মানচিত্র গঠন কর। তোমাদের ইংরাজীবিদ্যা তাহাদের ভিতর ছড়াইয়া দাও। তাদের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাক।' (সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৬।৪।৭০, পৃঃ ২৬৬৫ দ্রষ্টব্য)।

মনে রাখতে হবে, দেশকে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে স্বামীজীর এই সকল ইঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। তারপরে পৃথিবীর ইতিহাসে কত ঘটনাই না ঘটে গেছে, কত ইজমই না পরীক্ষিত হয়ে চলেছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন ধাঁচে সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের এই মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার প্রকল্পে স্বামীজীর ঐ সুস্পষ্ট নির্দেশ, সুনিশ্চয়তায় আজও আমাদের দেশে কাজে লাগান হয়েছে বলে মনে হয় না।

যে আশাই প্রকাশ, দেশ স্বাধীন হয়েছে, তথা ভোটাধিকারের ব্যক্তির কথা-বলে হয়েছে বটে সকলেরও অধিক হবে। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেও এই বিষয়ে কতকগুলি পরি-কল্পনা ছাড়া, কার্যকরী ভিত্তিতে কিছু করা হয়েছে বলে জানা যায় না। তথা-কথিত স্বাধীনতা (খ) লাভের ২৩ বছর পরেও অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতপক্ষে দেশে এখনো

(খ) অবশ্য সকলে তথা বলে বিশ্বাস, বিগত ২০ বছর স্বাধীন দেশে কাজের করবার পরেও বলে, দেশ আজ—"অভাবের তাড়নায় ছোট ছোট ছেলেরা তাদের বৃদ্ধা ঠাকুরমা যোগানীদের থেকে কলকাতার ভিন্ন আসন নিজি করবার জন্যে" তখন আমরা যে কোন্ সুখের স্বাধীন দেশের অধিবাসী সেই কথা ভাবতেও লজ্জা হয়। (১১।৮।৭০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীজনের অভিভাষণ—কলকাতার বিভিন্ন সভিতি, অনাথবন্ধু, গ্রন্থি)।

শিক্ষিতের হার যা শোনা যায় তা হচ্ছে অতি নগণ্য। তুলনামূলক রাশিয়ার কথাই ধরা যেতে পারে। ১৯১১ খৃস্টাব্দে তাঁদের বিপ্লব প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্যে পৌঁছবার আগে থেকেই যে দেশে এক হুকুমনামা জারি হয়, আট থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক নিরক্ষর নর-নারীকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাক্ষর করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন চলে। পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর এই মর্মে হুকুমনামা জারি হয় যে, নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজনের অজুহাতে যে কোন অজুহাতে ছাত্র পরীক্ষা, সাহায্যের বন্টন ইত্যাদি শিক্ষার কাজে ব্যাঘাতের ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় জনশিক্ষা বিভাগের ওপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে যায়। কোথায় পরিকল্পনা বা হুকুমনামা জারি হয়েই তাঁরা কাজ হয়ে গিয়েছে ধারাবাহিক হিসেব গ্রাহার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত হয় প্রয়োজনীয় সরকারী কমিশন। আন্তরিক চেষ্টা যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়েও। ফলতঃ, এই দ্রুত উজ্জীবনের কথার জন্যে সেদিন সেখানে একযোগে এগিয়ে আসে কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট ইউথ লীগ, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতি, জাহাজ-কর্মী ও রেলওয়েকর্মী সমিতি ইত্যাদি ঘরে ঘরে নির্বিশেষে—উদ্দেশ্য, জনশিক্ষা প্রসার। কেবল তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, উকিল-মোক্তার, ডাক্তারের স্বেচ্ছাশ্রমী (৭) গ্রুপে প্রতিটি শিক্ষিতকেই সেদিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। জন-শিক্ষা আন্দোলনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। রাশিয়ার বিপ্লবীরা সেদিন একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছিল উচ্চারিত—"Each one Teach One", প্রত্যেক একজনকে শিক্ষিত করতে হবে, এই বাণীর মাধ্যমে। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ার উপরোক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে ওঁদের পরিশিক্ষা বিস্তারের বিষয় বিস্তারিত তথ্য থেকে মোটামুটি একটা অনুমান করা যেতে পারে।

	১৯১৯	১৯৬০
রাশিয়ার মোট জনসংখ্যা—	১০,১০,০০,০০০	১৯,০০,০০,০০০
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা—	৭৮,০০,০০০	
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা—	১,১২,০০০	৮,২০,০০০
ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা—	১২,০০০	১০,০০,০০০
শিক্ষাখাতে ব্যয়—	১০৪৭,০০,০০০ (রুবল)	৪১৭,৯০-০০,০০০ (রুবল)

অর্থাৎ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি রাশিয়ার বিশ বছরের ব্যবধানে তিন-চার কোটি অনুন্নত অঞ্চলে বেতার-যন্ত্র শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হয়েছিল এই বিংশ শতাব্দীরই মাত্র কয়েক বছর আগে। তার কারণ, সে-দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের সঙ্গে হৃদয়ের নিবিড়তায় সকলেই সমভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার ছাড়া দেশের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। পরবর্তী ইতিহাসের কথাই ওঠে না। তুলনামূলক আমাদের দেশে গত ২০।২২ বছরে যে সমস্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে, তার বাস্তব রূপায়ণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার স্থান এখানে নয়। তবে পরিশিক্ষা বিস্তারের কাজে আমরা যে অনেক পিছিয়ে আছি একথা অনস্বীকার্য।(৮)

১৯১১ সালে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেনিনকে যে সমস্ত সমস্যার সমাধানে হতে হয়েছিল, বেসরকারী শিক্ষার অভাব ছিল তার মধ্যে অন্যতম। অনুরূপভাবে আমাদের দেশের বর্তমান তুলনামূলক চিন্তা করা যেতে পারে। যে কয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁর সামনে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, আমাদের দেশের অবস্থাও তা হতে বিশেষ প্রভেদ ছিল না বোধ হয়। কিন্তু লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীরা জাতি গঠনের মূল উপকরণ পরিশিক্ষা সম্বন্ধে যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন, আমাদের দেশে তা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, শিক্ষার সার্বজনীন প্রসার দ্বারা জাতীয় উন্নতি অনস্বীকার্য—এই তথ্যটি তাঁরা যেভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের দেশের যাঁরা বর্তমান নেতৃস্থানীয়রা, তাঁরা সকলেই, আজ পর্যন্ত ঠিক সেভাবে অনুধাবন করেন বলে মনে হয় না। অন্যথা লেনিন যুগে রাশিয়ার তুলনায় আমাদের দেশে জনশিক্ষার অবস্থা আজ পর্যন্ত এত পিছিয়ে থাকবে কেন? সেদিনকার রাশিয়ার মত আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে এই কাজে নিদেনপক্ষে যা অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা কি বাস্তবিকই এখনও অসম্ভব?

(১) অর্ডিনান্সের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কোন বিশেষ ধরনের প্রত্যেক অন্যূনকে (বেসরকারী নির্বিশেষে) অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করা।

(২) বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও সংস্থাগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ সৃজনের ব্যবস্থা করা।(৯)

(৭) আজ আমাদের দেশে যেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মিক গ্রুপের এক-একটি ধরনের অস্তিত্ব এখনও চোখে পড়ে তাতেই মনে হয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন আশ্রম আশ্রম নিয়োগকর্তার বিভাগের অনুরূপের অনুধাবনে চলতে অসুবিধা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমী এনে যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মূলে যোগাযোগ যোগান দেওয়া যায়।

(৮) সোভিয়েত ফেডারেশনের হিসেবে মতে ১৯।২২ বছরে সমগ্র আমাদের দেশের হার মোটামুটি বর্তমানে ২১-৭% হলে চলবে। আর বিশ্বের ৮১ কোটি বয়স্ক নিরক্ষরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৩৬ কোটিরও বেশি হচ্ছে ভারতীয়। এই বিষয়ে ইউনেস্কোর বিশ্বাস ও ইউথ সংস্থা সমস্যা প্রকাশিত "৮ মেগাটন অজ্ঞতা" শীর্ষক লেখা প্রবন্ধটি বিশেষ বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। (যোজনা কমিশনের পত্রিকা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০)।

(৯) কিন্তু এই জাতীয় প্রচেষ্টাতেও দেশের ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্রতী হয়েছেন জানা যায় না। কলকাতার মত শহরের আশে-পাশে, ঐ ফ্যাক্টরি ও সংস্থাগুলির আয়োজন মাধ্যমে বিভাটকার অটোমিক ইত্যাদি নির্মিত হতে দেখা যায় মাত্র—কিন্তু সেই সকল স্থানে অধিবাসীদের নিম্নু সংস্কারের প্রবেশ ব্যবস্থার, প্রয়োজন অর্থের অভাবে কর্তৃপক্ষের সমস্যা-সমাধানের মনে চেষ্টাই ওঠে না। আমাদের ধারণা, এই জাতীয় সৌধ নির্মাণে এবং সেই সমস্ত আয়োজন পরিচালনায় আশে-পাশে পরিবেশ আর যত্ন করে তাকে, সেই অর্থের সাহায্যে স্বাধীনী নিবেদিত

অপেক্ষায়

শঙ্খনাদ ভট্টাচার্য

ছেলে ভুলানো ছেলের সংখ্যা কম।
ছাই মাটি এখনও চলছে
দু একটি ছেলে আঁকে পৃথিবী।
জানলা থেকে শূন্যতায় ছেড়ে
দিয়ে এলো ভেমিক-বুদ্বুদ।

সিঁড়ি মেঘ দেখেছিলো ঐ ঘন বনের আড়ালে
দুজনার সম্মুখে দুজন।
অন্ধের যত ধন
আবার বৃষ্টিতে বাঁধি ভেঙে যায়
তুমি ভাবো ওপারেই শূন্যলোক
তুমি ভাবো তারা কেন শূন্যতায় অভিমুখী।

---

(৩) জেলায় জেলায় পাঠচক্র স্থাপন ও প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা বা বিশিষ্ট নাগরিকের সাহায্যে সেইগুলি পরিচালনার ব্যবস্থা।

(৪) উক্ত পাঠচক্রে পাঠ ও আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে স্থানে স্থানে পাঠ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। এই সকল পাঠ কেন্দ্রে গ্রন্থাগার এবং অবসরপ্রাপ্ত কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা হলে আরো ভাল হতে পারে। পত্রালাপের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়।

(৫) এ ছাড়া নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার (৬) বেতার-যন্ত্র (৭), ইত্যাদির সাহায্যে এই জনশিক্ষা বিস্তারের কাজ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করাও সম্ভব হতে পারে উপযুক্ত কর্মীর সাহায্যে।

এইভাবে দেশের মঙ্গল যদি সত্যই আমাদের কাম্য হয় : তাহলে এই জনশিক্ষা বিস্তারের কাজকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে আমাদের

রাজা সুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (লেখকের পিতৃদেব) ইত্যাদির উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা। প্রসঙ্গত ১৯০৩ সালে নিখিল ভারত লাইব্রেরী কনফারেন্সে পঠিত নরেন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরী ও লাইব্রেরী আন্দোলনের' সম্বন্ধে পূর্বাভাস ও বক্তৃতা আলোচ্য বিষয়ে অনেক আলোকপাত করতে পারে। (অমৃতবাজার পত্রিকা ২২।১।০৩, পাইওনিয়ার ২৯।১২।০৪ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়)। কিন্তু সেই সমস্ত কাজের প্রয়োজনীয় বিস্তার এখনও বিশেষ লক্ষ্য হয় না।

(৬) বেতার-যন্ত্রের মাধ্যমে শিশুদের-জন্যে, কৃষি-শ্রমিকের জন্যে প্রভৃতির প্রয়োজন প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু সেই সমস্ত আয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্যে হয়, তা ঠিক বোঝা যায় না। কারণ এই সকল আসরে যখন ছিন্ন-শাল ইত্যাদি ধারণার উদ্ভব করে প্রয়োজনীয় আলোচনা শোনা যায়, তখন মনে হয় ঐ সকল ধারণার স্থান গরীব, অশিক্ষিত আর দরিদ্রের ধারণা থেকে বহুদিন অনেই তো বিদায় নিয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। বিশ্লেষণে তাদের দাড় বা কেন নয় তাও, কাঁচা শিঙাড়া, কচুরি, ছাতু ইত্যাদি গরীবের পক্ষে সহজ ও নিত্যলভ্য খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে বর্তমান জনসাধারণকে সম্যক ওয়াকিবহাল করার ব্যবস্থা হলেই হয়তো সমবেদনাবাদী হোত।

স্বেচ্ছাসেবক হতে হবে: উক্ত কাজকে পূর্ণোদ্যমে গৌরব দেবার প্রয়োজন। আর সেই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, রাজ-কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী, যুবক-যুবতী আর সকল স্তরের মানুষের ঘরে ঘরে নির্বিশেষে একযোগে। সকল শিক্ষিত মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হবে প্রতিজ্ঞা-হওয়া চাই—তাঁদের প্রচেষ্টায় অতিবিলম্বে যতত দু-একটি নিরক্ষরকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করবেন নিশ্চয়। সেই ১৯১৯ সালে বৃদ্ধ জাতির অভ্যুত্থানে প্রতিধ্বনি— 'টচ্ এভরি টিচ্ এভরি' প্রত্যেকে প্রত্যেককে শিক্ষিত করতে হবে। এই মর্মে কোন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা উপযুক্ত মনে হোক বা না হোক, সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাদের ধারণা, এইভাবে স্বেচ্ছাসেবকের হাতে পরিপার্শ্বিক বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একবার সচেতন করে তুলতে পারলে, অর্থাৎ গণসমাজের শিক্ষালাভের সত্য দাবি যে ভাবেই হোক একবার স্বীকৃত পারলে, তাদের অপরাপর দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে আমাদের আর মাথা ঘামাতে হবে বলে মনে হয় না। তখন প্রত্যেকেই নানা ছাপা প্রত্যেককেই স্বেচ্ছায় দিতে হবে বাধ্য হবে। দরকষাকষির নয়, তখন আপনা হতেই প্রশ্ন উঠবে সহকর্মীদের। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানের কবে নেপথ্যে হয়তো শোনা যাবে—"এই বাস্তু এতদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢোকেছিল। তাই আড়ালে ছিল চলার বল্গা ছিলো ঠিক। এইভাবে কি করে টিকে থাকতে হয় তাই সহসা ওর কাছ থেকে শিখছিলাম কি করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগলো না পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললাম, নিরন্তর টিকে থাকার থেকে ওকে দিলাম মুক্তি।" (রক্তকরবী —রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৪৭)।

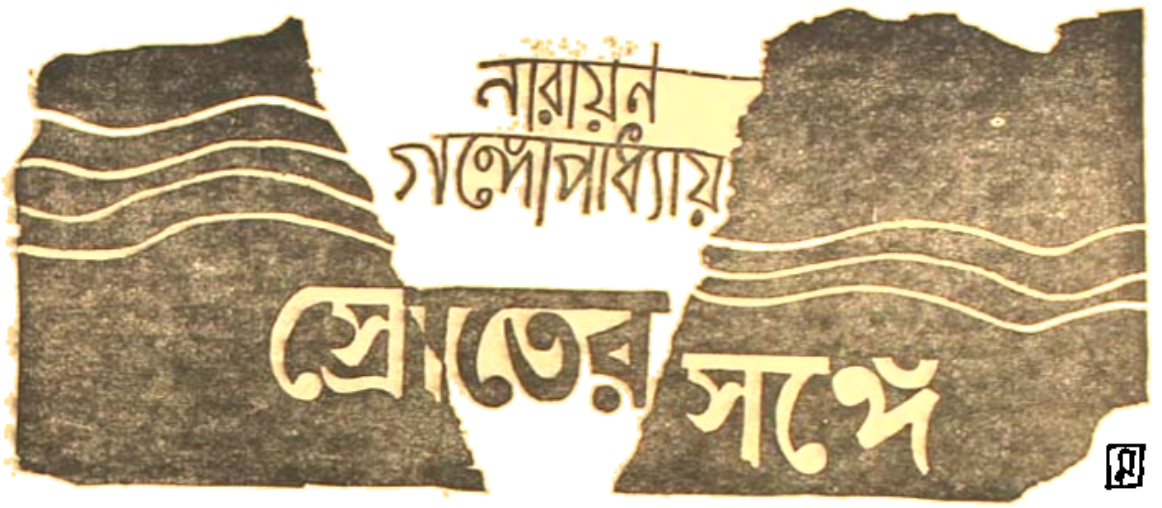

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ আটাশ ॥

স্বপ্না বললে, 'তুলুদা কেমন আছে?'

টুলু চাইতে পারল না তার দিকে। রিসেপ্‌শানটা ঘরের আবার লুকিয়ে রেখে তখনও তার হাত কাঁপছিল। আস্তে গলায় বললে, 'ভালো, অনেকটা ভালো।' তার তখনকার একটা অশান্তি যেন হারিয়ে গেল, ঘরের ভেতরটা খুঁজিয়ে আসছিল।

'আর ভয়ের কিছু নেই?'

'ডাক্তার বলেছে, নেই।'

একটা বিশ্বাস ছেলে স্বপ্না পাশের চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল। কতদিন পরে এল এই বাড়িতে? পাঁচ বছর না ছ বছর আগে? ছবি-বুলানো মনে হয়।

এইভাবে অনেক তুলুদার ঘর, কথা বলে ছেলে কিছুই বদলায় নি। যেওয়ালে পাশাপাশি সেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর ওপাশটায় লেনিন, স্তালিন, টলস্টয়। সেই হুক-কেস, মেরামত-দেওয়া টেবিলটা, জানলার ধার ঘেঁষে হেলান দিয়ে বসবার সেই বড়ো চেয়ার।

কতদিন তার এ ঘরে কেটেছে ছেলে-বেলায়। তুলুদা তখন কলেজে পড়ত। তাকে মস্ত বড়ো একে দিত ছবিওয়ালা ছোটদের বইয়ের বাংলা সব অনুবাদ, চীনের গল্প, জাপানী-ছবিতে ভরানো। একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এক দল ছাত্র-জানোয়ারের বাসা বাঁধবার চেষ্টা—সে গল্পটার কথা এখনো তার মনে আছে।

সমস্ত বললাম। কাঁদাবে যে বললাম। কতদিন পরে এই ঘরটিতে এসে স্বপ্নার মনে হল, মাঝখানকার সাত-আটটা বছর যদি স্বপ্নার না থাকত, কী ভয়ঙ্কর কী ভয়ঙ্কর কথা ছুটে বেত এখন!

সামনে শুকনো মুখে টুলুদা দাঁড়িয়ে। চোখ নিচের দিকে। কী একটা নাড়াচাড়া করছে টেবিলের ওপর। যে সাত-আটটা বছর কোথাও না থাকলেই ভালো হত, সেই সময়টা আবার নিষ্ঠুর আর নগ্ন হয়ে ফিরে এল তার কাছে।

স্বপ্না একবার ঢোঁক গিলল। বলল, 'টুলুদা, কী হয়েছিল?'

টুলু এবার চোখ তুলল। দৃষ্টিটা অপলক।

'বুঝতেই পারছ।'

'তার মানে, ওরা তোমাকেই?'

'হ্যাঁ, তাই।' —প্রফুল্ল একটা ঢোক গিলল। 'বাবা আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। এবার তুমি—এবার বাবা।' —কথাটা বলতে বলতে গলার স্বর শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এবারে অবাধ্য হয়ে উঠেছে। আমি আর এমন করে পালিয়ে বাঁচতে পারছি না। এর পরে আমিই ওদের এক-একটা করে শেষ করব।'

স্বপ্না একটু চেয়ে রইল প্রফুল্লের দিকে। মুখটা শাদাটে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে অল্প অল্প। চোখের চাউনিতে উদ্‌ভ্রান্তির ছায়া।

'ওদের তুমি শেষ করতে পারবে না টুলুদা, ওরা অনেক, তুমি একা। অন্য রাস্তা ভাবতে হবে।'

'অন্য রাস্তা মানে আমাকে কলকাতা ছেড়ে, বাংলা দেশ ছেড়ে পালাতে হবে? তাই বলতে বলো তুমি?'

আবার একটু চুপ করে থেকে স্বপ্না টুলুর দিকে তাকিয়ে রইল। ওরকম বিকল ভাবা পড়ল টুলুর মুখে।

'স্বপ্না, একটু চা খাবি?'

'না বৌদি, এখন থাক। খেয়ে এসেছি একটু আগেই।'

'তবে কাঁচের নাড়ু আছে। এনে দিই দোটাকরেক?'

আবার স্মৃতি। বৌদির তৈরি এই কাঁচের নাড়ুর ওপর ছেলেবেলার কী আকর্ষণই তার ছিল। দুটি নাড়ুর বিনিময়ে দু ঘণ্টা খুঁজে বৌদির মাথা থেকে একটি পাকা চুল তুলে দিতে তার এতটুকুও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আজ অন্যরকম। বৌদির দিকে তাকানো যাচ্ছে না—সমস্ত চোখ-মুখ যেন অন্ধকারে তলানো। এখন কাঁচের নাড়ু মুখে বিস্বাদ ঠেকবে।

'না বৌদি, আজকে থাক। একেবারে খিদে নেই।'

বিষণ্ণ ছায়াটা সরে গেল ঘরের ভেতর থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ। বাইরের উঠোনে, কলের মুখে ঘিরে ফাঁদ বাসন ধোয়া পড়ছে চৌবাচ্চার ভেতরে, তার একটানা শব্দের সঙ্গে। বৌদির রান্নাঘরে জ্বাল কাঠের একটা, তার শুকনো কাঠি পুড়ছে। তুলুদার জানলা ঘেঁষে সজনেডাঙা আজ তুলসীর, বাতাসে তার কাঁচা ডাঁটার সোঁদা-সাদা নৈবেদ্য।

'টুলুদা?'

'হ্যাঁ?'

'সেদিন তুমি আমার কোনো কথার জবাব না দিয়েই চলে গিয়েছিলে।'

টুলু জবাব দিল না।

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হয় নি। আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে গেছ। তুলুদা, কতবার একেবারে আমাদের বাড়িতে তুমি এসেছিলে আমো নি। তোমার কী হয়েছিল টুলুদা?'

প্রশ্নটা এত স্পষ্ট, এত সোজাসুজি যে, তার কোনোমতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। টুলুও তৈরি হল। স্বপ্নার একেবারে অপ্রয়োজনীয় একটিমাত্র তথ্যও যে জানতে হবে—সেদিন স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হওয়ার

পর থেকেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। বাইরের যে জগতের ভেতরে এতদিন একটা খুপরিপাকে সে দুরছিল, সেটা থেকে বেরিয়ে আসবার পরই তার সমস্ত পারিপার্শ্বটাই ছোট হয়ে গেছে এখন, আর কাউকে সে এতুকুও ভয় পাবে না, এমন কি অপনাকে তো নয়ই।

টুলু ঘণ্টাটা একবার পরিষ্কার করে নিলে। আবার কিছুক্ষণ চুপ। বাইরে থেকে চৌরাস্তার ভেতরে কলের জল পড়বার শব্দটা। এঘরের ভাল দুটোই—তার শব্দ। চড়ুইয়ের কিচির-মিচির। ঠাণ্ডা হাওয়া সিরসির করছে। অপনা চেয়ে আছে টুলুর দিকে। মুখে ঘাম, কিন্তু চোখ।

টুলু বললে, তুমি তো জানো, আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলুম।

কেন দিয়েছিলে?

'আমার ভালো লাগছিল না।'

'অত পড়াশুনোর এত মন ছিল তোমার।'

'না, ছিল না। আমি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলুম।'

'নষ্ট কেউ হয় না টুলুদা—কেউ না। তোমার মাথায়ে পাগলামি চেপেছিল।'

টুলু উঠে গিয়ে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। অপনার সামনা-সামনি বসে থাকতে তার ভালো লাগছে না। বাইরে চোখ রেখে টুলু বললে, তারপর স্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

কেন ছিল না? টাকাটা তো তুমি ফিরে দিয়েছিলে।'

'আমি দিই নি, তুমি দিয়েছিলে।' জানলার গ্রিল ধরে টুলু শক্ত হয়ে দাঁড়ালো, কেন নিজের ওপর জোরটা করে রাখতে চাইছে : কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছিল। হেড মাস্টার আমাকে আর স্কুলে রাখতেন না।'

পিটি-সি দিতেন। কলকাতার স্কুলের অভাব ছিল না।'

'সব জায়গায় খবরটা পৌঁছে যেত।'

'না—যেত না। কেউ অন্যের কথা নিয়ে অত মাথা ঘামায় না। নিজেই তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। আমরা বাড়ি করে বালিতে চলে গেলুম, তুমি আর আমাদের খবরও নিলে না।'

'তোমার বাবার সামনে আর আমি দাঁড়াতে পারতুম?'

'বাবাকে তুমি চিনতে পারো নি।'

'উনি কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। জাঠামশাইকে দেখলে আমার ভয় করে।'

অপনা হাসতে চেষ্টা করল।

'অন্যায় সহ্য করতে পারেন না, তা ঠিক।'—অপনা হাসতে চেষ্টা করল : 'কিন্তু ক্ষমা করতে জানেন। আমাকেও তো শাসন করতে পারতেন। আমি সব খুলে বলেছিলুম বাবার কাছে। একটু চুপ করে থেকে কেবল বলেছিলেন, টুলু কেন এ-রকম লোকের সঙ্গে মিশতে গেল? ও তো ভালো ছেলে।'

স্মৃতি। সেই ঘটনাটা। বাবা যার সম্পর্কে অনেক আশা রাখতেন মনে মনে, স্কুলের যে ভালো ছেলে প্রফুল্ল বানার্জীকে নিশ্চিন্তে সবরকম দায়িত্ব দেওয়া যেত, তার জীবনটা হঠাৎ বেতালে কেলে গেল, তাই ইতিহাস।

রমেনদা।

তখন টুলু ক্রিকেট খেলত—ভালোই খেলত। স্কুলের ক্লাবের হয়ে—ছুটির দিনে, শনিবার সকালে বল পিটতে যেত গড়ের মাঠে। সেইখানেই আলাপ।

আজকে টুলু জানে, রমেনদা জীবনে কোনোদিন ক্রিকেটের ব্যাটে হাত ছোঁয়ায় নি। কিন্তু সব নামজাদা খেলোয়াড়ের ইতিহাস—সব বিখ্যাত স্কোর-বোর্ড তার কণ্ঠস্থ। নিতান্তই নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্টে তার ছেলে গেছে, নইলে এতদিনে অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেটার হত সে। তার সম্পর্কে নাকি কার্তিক বোস আর নির্মল চ্যাটার্জী এইরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

রমেনদা চমৎকার গল্প করতে পারত, ছেলেদের মন-ভোলাবার বিদ্যেটা জানত ভালো করেই। বেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়েও দিয়েছিল কতদিন। তারপর বলেছিল, ফেলের মাঠে খুব মজার জায়গা। যাবি একদিন?

ভালো ছেলে টুলু শিউরে উঠেছিল। 'ওরে বাবা!

'এত ভয় কেন রে?'

'ওখানে যে যায়, সর্বনাশ হয় তার।'

'কে বলেছে এ সব বাজে কথা? বোকারাই ভেবে, যার বুদ্ধি আছে, ঘোড়া চেনে, ঠিক মতো টিপস্ ধরতে পারে, সে কোটিপতি হয়ে যায়।'

'না রমেনদা, আমার দরকার নেই ফেলের মাঠে গিয়ে।'

'আ রে, তোকে তো আর কেউ রেস খেলতে বলছে না। গিয়ে শুধু মজা দেখা। খুব ইন্টারেস্টিং—বুঝলি? ঘোড়াগুলো ছুটছে—লোকে চিৎকার করছে—কী এক্সসাইটমেন্ট—কত টাকার খেলা। চল্ না শনিবার।'

'কিন্তু কেউ যদি আমাকে দেখতে পায় ওখানে? কী বলবে?'

'বলতে যাবে কেন? কে যায় না মাঠে? ও তো স্পোর্টস। রোমনযানান-ইস্ট-বেঙ্গলের খেলা দেখতে খেলে লোকে নিন্দে করে?'

সুতরাং তর হাসিয়ে কৌতূহলী স্পোর্টস। দেখতে কী দোষ? কে না যায়?

রমেনদার বোধ হয় দেখাই এই। ছোট ছেলেদের ভোবানো। টুলুর সামনেই পাঁচ টাকা না কী খেলে আড়াইশো টাকার মতো পেয়ে গেল একদিন।

অতএব কৌতূহল হাসিয়ে গেছে।

তারপর রাস্তা পরিষ্কার। শুধু স্পীড বাড়িয়ে যাবার ওয়াস্তা।

স্কুলের বিখ্যাত ভালো ছেলে প্রথম মা-র কাছ থেকে চেয়ে নিলে পাঁচ টাকা। পরের পর্বে দাদার পকেট হাতড়ে এক-খানা দশ টাকার নোট। দাদা কোনোদিন পয়সা-কড়ির হিসেব রাখে না—শুধু অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, 'গোটা দশেক টাকা কেন পাচ্ছি না—কাউকে দিয়েছি, না—হারিয়ে ফেলেছি?'

শেষ পর্বে স্কুলের সরস্বতী পুজোর চাঁদা। বাহাত্তর টাকা গেল। টুলু সেক্রেটারী।

তখন চোখে অন্ধকার। ফেলকারী। দেখতে দেখতে জানাজানি। স্কুলের এক-জন টীচার জানালেন, তিনি স্বচক্ষে টুলুকে দেখেছেন রেসের মাঠে।

তিনি নিজে সেখানে কেন গিয়ে-ছিলেন সে প্রশ্ন তখনো কেউ তুলল না। হাঁটিং বসল হেড মাস্টারের ঘরে।

হেড মাস্টার সংক্ষেপে বললেন, 'তোমার সম্পর্কে অনেক কথা ভেবেছিলুম, কিন্তু আপিয়ারেন্স ডিসেপটিভ। তোমাকে স্কুল থেকে রাস্টিকেট করা হবে। দুদিন সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে টাকা এনে দেবে। যদি না আনো—পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করব। শিক্ষা হয়ে যাবে।'

টুলু ছুটল রমেনদার কাছে।

রমেনদা নাকি কলকাতায় নেই। ব্যবসার কাজে চলে গেছে টাটানগর, তিন মাস পরে ফিরবে। রমেনদা যে ব্যবসা করে, সে খবরটাও জানা গেল এই প্রথম।

পৃথিবী অন্ধকার।

অপনাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

'এই নাও টাকা।'

'তুমি তোমা থেকে পেলে?'

'আমার ছিল।'

ছিল না। নিজের গলার হার বেচে কিনে দিয়ে বিদ্যি করিয়েছিল এক-জোড়া রেবে।

টাকাটা নিতে হয়েছিল, আর কোনো উপায় ছিল না তখন। তারপর সে টাকা

ফেরেন্সো কমিটির হাতে পৌঁছে দিয়ে—লুকোবার ভাবনা ঘোচা। সারাদিন বাড়ি থাকে নিরুদ্বেগ। কখনো বন্ধুদের, কখনো আত্মীয়দের, কখনো সিনেমায়।

খবর পেয়ে প্রথমটা চমকে আসল কমিটি থেকে। প্রথমদিন পিছল। পাঁচ বছর বয়েসের পরে টুলু মার খেলো সেই প্রথম। যা কেঁদে পাড়া মাথায় করলেন। বাবা মায়া নিরোধপের আগেই, নইলে হয়তো হার্টফেল করতেন।

টুলু আবার পাশের ঘরে। এমন সময় তখন। একটা ঘরের দোকানের আওয়াজ—

তারপরে চেঁচামেচির পর চেঁচামেচি। এখন মুখোমুখি আমরা। বড়দা হাসপাতালে। আমরা একটা সোজা প্রশ্নের জবাব চাইছি। কী বলা যায়?

কী বলা যায়?

ঘরের ভেতরে রিভলভারটাকেই ঘরে পড়ছিল। নিজেকেই খুন করবে নাকি?

[ক্রমশ]

ঘর ভরে পড়ানো মানুষ, আমার মনে হলো, বুঝি মেলা বসেছে। ছোটো না ভেবে বড়ো করে ভাবলে, কম মানুষে বিশ্বাস করে। তবু ওদের ভুলে গ্রাম পাঠিয়ে হাজার বিছু প্রশ্নের।

হাজার বলি। পাঁচ তারা হোটেল। ঘর ভুপালি ঝিনা, ভৈলচিত্রে পুরুষে ঘরে, আয়া। সবের অসবাবও এত ভুল নয়, আসবাও এমন করে পুরুষের চিনে না।

আমি রাজপুরুষের মানুষ, সমার রক্ষি-ভাতের পরাল, তার ওপর মাসের তিন তারিখ, বুঝতে পারছেন কেমন করে ছিল না। আর এই অবস্থায়, হু, মাত্রে টাকা কে কি লগ্না হাত শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু হাত শুনে চোখ শুনে, বিশেষ করে এমন চোখ নিয়ে রোদ ওটা আশ্বিনের দুটির সকালে, বাজারে নিয়ে বিল মিনিটের আরগায় চল্লিশ মিনিট দেরি করলেও দেরি করা যায়, একটা দোকানের আরগায় পাঁচটা দোকানে ঘুরে এটা-ওটা দেখতে, করপুর করতে কখন আপত্তি থাকে না, আপত্তি-কারারির এক কোটা তাড়া নেই, এই অবস্থায় এমন মানুষ মনের মা থেকে কি চাইবে পারছে, খলা থেকে সদা তুলে আনা ভুপালি হাঁসিদের ভুপালারা দেখতে কম ন ইচ্ছে করে! হু, লগ্না হাত শোনা যাচ্ছে, কবের টাকা—আছে হবেন—

কিন্তু কবের মেলেই যে কিনতে হবে, তার কি মানে আছে?

চোখ দিয়ে দেখতে কিছু, পাঁচের পয়সা খরচ নাই।

তবে আর ভাবনা কিসে ভুপালারা ছোটো মেলে এত মানুষ আসবে কেন, চোখ মেলে কেন, পরে পরম কিনবার থেকে কেন?

তাই বলে হাঁসিল, পয়সাওলা মানুষ, চাহু, এক দুই করে ভুপালে না মেরেও পাঁচাহ, কম মিনিট পরে ভুপ হয়ে যেত, সিঁড়ির ওপর সিঁড়ি, ভুতলির নিচে ভুতলি, একজনের কলমের ভুলা দিয়ে আর একজনের পশু, একটা মাথা ঠেলে আর একটা মাথা চাপিয়ে উঠেছে, ঠাসা-এর ভিতরে ঠাসা ভুকিয়ে দিয়ে ভুবাড় মেরে পড়েছে কত জন—গলা বাজিয়ে উঁকি দিয়ে উৎসুক চোখে গলার মোহিনী হাঁসিল দেখছে, কান ছন চোখ দিচ্ছে।

ভাল মিনিস দেখলেই কিনতে ভাল লাগে। একটা কিনতে আর আর চোখ দিতে হয় না।

কলুত ন' দেখল মানুষের গরে না ঠেকিয়ে, পায়ের দেখায় ঠেকিয়ে, চুলে ভুতলি ঠেকিয়ে মাছ দেখার ভুপটাও দেখার মতন।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ না, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ভিড়টা ছাড়া ছাড়া হয়ে গেল। কেন খুব কেউ নেই, ঠৈকেয় ঠুকেয় হাল হয়ে একটা দোকানে, চায়ে চায়ে ঠোবায় বলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠোটে ছোটো ভাসলে ভুলে, একটু ভরসা পেলে দেরি নেই।

কি মনে হলো, কাছাকে কি।

মানুষ ভরে এক এক ঠোড়া ভুলে কলমে ঠাঁস, এক-একটা চোখ চায়, ভুলের মতন ভোল হয়ে যেত।

'ও ঠৈকা ছিল?'

'পরাল চাকা।'

'ভোলায় ভেবেছিলেন?'

'এই তো ভেতরের ঘরে পকেট।'

ভদ্রলোক পা থেকে জামাটা ভুলে ভোলল। কিন্তু কেউ সেটা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল না। যেন জামার ভয়ে বিরাট কিছু লেগে আছে। ভদ্রলোক নিজেই ঝিটের জামাটা আশ্বিনের চাহু দেওয়া রোদে মেলে ধরে সকলকে দেখাল। ভেতর দিয়ে পকেটের এমাথা থেকে ওমাথা ভেটে কাঁক করা হয়েছে।

ভীষণ ভাসার, সাংঘাতিক হাত-সাফাই ভোরকার! সকলের চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছে। 'এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ আমাদের ভলে যায় দেখছিল। আর ভাল ভলে ভোল কাজটা করে ভোল।'

কিন্তু ভবে ভোথায়, সবাই তো এখানে আছে।

'ঐ দু মিনিটের কম সময়ের মধ্যে কাটি ভোল করে সরে পড়েছে, আমরা কি

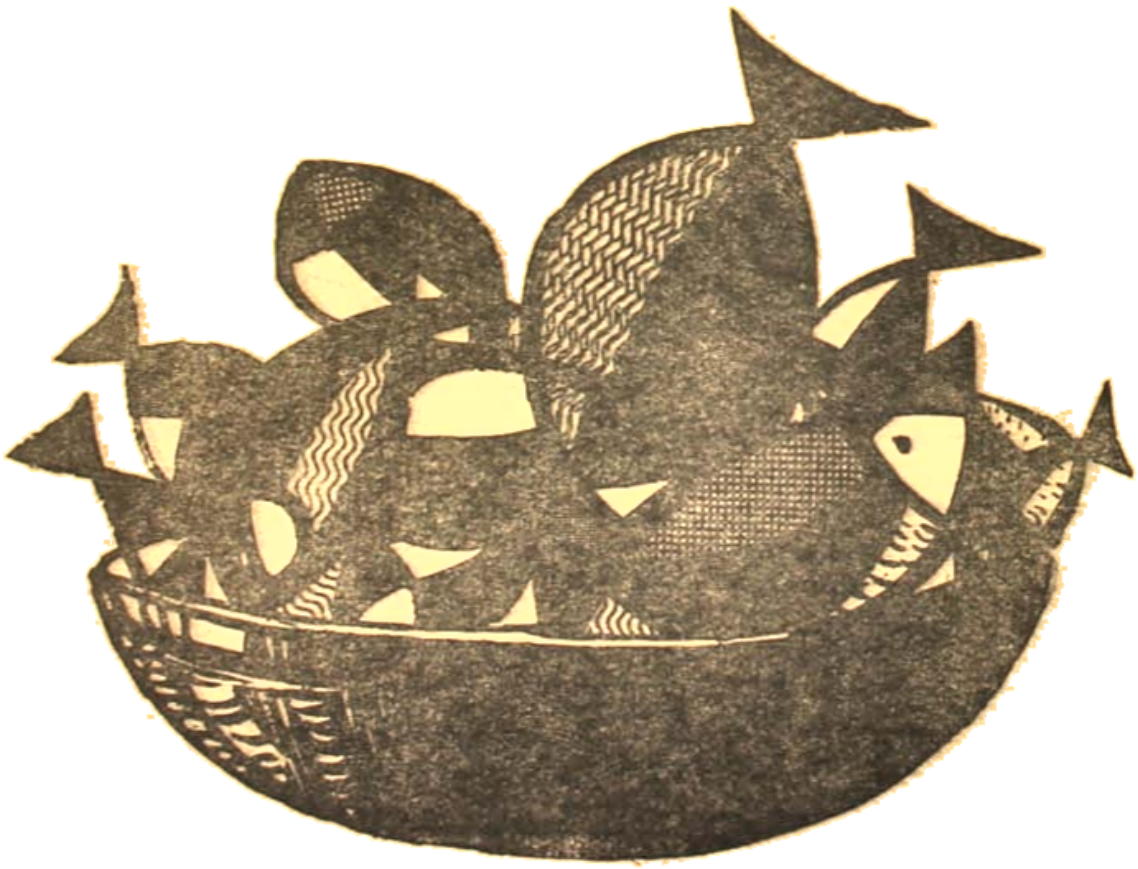

ভুল দেখেছিলাম এই মাত্তর যে এল আর কেন্ হুর্ঘাট সয়ে পড়ল? আমাদের চোখ তো মাহের দিকে ছিল।

হুঁ, চোখ বন্ধ-ত্রাণ—বলতে গেলে সেটাও, কথার চাইতে ইসিলের দিকে ঢালে দিয়েছিলাম।

কথাটা মিথ্যে কি? আমাদের হাত-পা ছুঁড়ি ধাক্কা খেলা মাথা কি আমাদের মধ্যে ছিল? মনে কার পরীক্ষা কোথায় ছিল আমরা বেমালুম এই দশ মিনিটের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম। পরেই তো ভাল, আমাদের একটা হাত কেটে নিলেও টের পেতাম না। কান কেটে নিলেও ঠিক সেই মুহূর্তে না বুঝে পরে বুঝতাম।

'এতক্ষণে কেউ ষ্টীমার বা ছোক একটা কিছুতে লাফিয়ে উঠে পড়েছে।'

টাকি, কিসে চাপতে আটকায় কে? কারুরে পঞ্চাশটা টাকা দু' মিনিটে রোজগার হয়ে গেল।

হ্যাঁ বলাই, পঞ্চাশ টাকা ছিল কলেরে, না কি আরো বেশি ছিল?'

তদ্রলোক মাথা নাড়ল। মুখে শব্দ নেই। চোখ দুটো ভিনদিনের বরফ-পড়া খোয়ালের মতন ফ্যাকাশে চপ চপে।

মুখে শব্দ না করে কেবল মাথা নেড়েই বুঝিয়ে দিল পঞ্চাশ টাকা, আর বেশি ছিল না এবং এই পঞ্চাশ টাকার লোভেই সে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, সোজা হয়ে প্রায় দাঁড়াতে পারছে না, পকেটমার কেবল টাকাটা নিয়ে যায় নি, সেই সঙ্গে পঞ্চাশ আউন্স রক্ত তার শরীর থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

আহা। কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে ওঠা হয়েছিল মশাইয়ের! টাকাটা কি আপনার এই বাজারে এসে গেল, না কি রাস্তায় আর কোনো ভিড়ে—আপনি থাকেন কোথায়? গাঁয়ে-বাসে ছেপেছিলেন কি? একবার মনে করে দেখুন তো। বাজারে ঢুকেই পকেটে হাত দিয়ে টাকা আছে কিনা পরীক্ষা করেছিলেন কি?

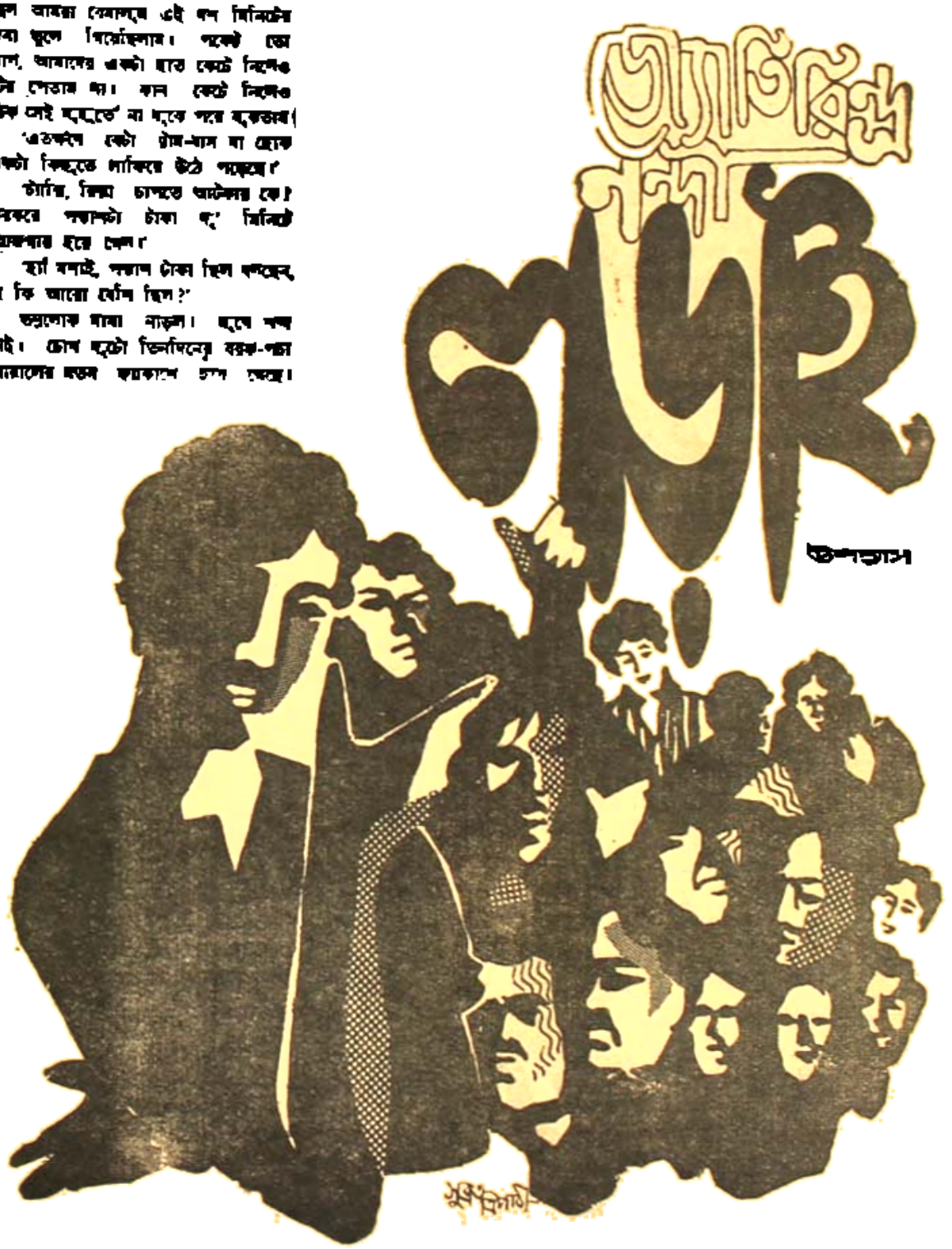

চাল করে ঘরে ওরা যত একবার দেখেন। কাজের সময় চলে যায়। যেন এইসব ঝামেলা পছন্দ ছিল, আসলে ওটা উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে তাদের।

'উহু, এখানে, এই ইলিশ বাজার লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে আমার এই সর্বনাশ হল। এই দশ মিনিটের মধ্যে।' মুখে না, চোখের ভাষায় ভদ্রলোক তার সর্বনাশের স্থান-কাল ব্যক্ত করে দিল।

টাকাটা আপনার কাপড়ের খুটে বেঁধে নিয়ে কোমরে গুঁজে বাজারে আসা উচিত ছিল।'

'আজকাল পাজারা কোমর থেকেও টাকা তুলে নিচ্ছে, ভয়ানক হাত সাফাই। টাঁক কেটে সাফ করে নিচ্ছে।'

'সবচেয়ে ভাল মাছের মুড়োর টাকা-পয়সা মাথা। কিলো করে বাজার-টাজার করতে এসে। ওখান থেকে কোনো চোর ডাকাতকেও সন্দেহ করতে পারে না।'

'যাক দাদাই, মন খেয়ে খেয়ে—এসব মন খারাপ করে কি হবে?'

'কিন্তু লোকটা পালাল কোন্ দিক দিয়ে?'

'মুহূর্তে পালায় নি, মুহূর্তে আমার আপনার আশেপাশেই দাঁড়িয়ে আছে।'

'বলছেন কি দাদা, এত সাহস?'

'সাহসের কিছুই না, মুখ চেনে চিনবেন কি করে কে পকেটমার আর কে সাধু?'

'তবে তো আমাকেও আপনি সন্দেহ করতে পারেন।'

'হুঁ, পারি বৈকি—আপনি যদি পালটা আমাকে সন্দেহ করেন তাতেও কিছু বলার নেই।'

'তা বটে। আমরা সবাইকে সবাই সন্দেহ করতে পারি। আমাদের মধ্যে চোর বসে মিশে ছিল আমরা তাকে চিনতে পারি নি। আমার আপনার মতন সব ভেবে তার গায়ে গা ঠেকিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রসন্নমনে ইলিশ কিনে বেরিয়েছি।'

'মুহূর্তে দাদাই, আপনি এখানে সবাইকে সন্দেহ করতে পারেন। বাজার-সুদ্ধ মানুষকে আপনি আপনার পকেট

'মুহূর্তে দাদাই, আপনি এখানে সবাইকে সন্দেহ করতে পারেন।'

ছাড়া টাকাটা তুলে নিয়ে যেতে সন্দেহ করলেও আরো কেউ, কল্পনা থাকে না, ছাড়া নয়, চোর বলে ধরা পড়ল না, ওখন আমরা এখানে সবাই চোর।' হাত ধরে একজন ভদ্রলোককে মানসিক দেওয়ার মতন সুর করে বলে গেল।

'তা তো বটেই।' আর একজন ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। 'এ ছাড়া ভদ্রলোককে আমাদের আর কি বলার আছে, বলবার আছে?'

'আমার যদি পঞ্চাশ টাকা একবার আর হাওয়া হয়ে যেত আমি মূর্ছা যেতাম।'

'আমার দেশে আমি কেঁদে বুক ভাসাতাম। আমার চুল ছিঁড়তাম।'

'আমি মোটে টাকা পঞ্চাশেক নিয়ে বাজার করতে আসি, একটা নয়া পয়সা বেশি আনি না। পাশ দিয়ে মাছ যাচ্ছে বাজার। ঘাড়ির ছেড়ে যেন পকেটমার এখানে বেশি ভজন করছে।'

এক-একজন এক-একটা কথা বলে সরে পড়ছিল। দেড় মিনিটের মধ্যে দেড় শ' মানুষ পঞ্চাশে এসে চেনেল। তারপর আর দেড় মিনিটের মধ্যে পঞ্চাশ এসে জমে দাঁড়াল। এক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল মুহূর্তে মোটে দাঁড়িয়ে আছে। আর টাকা হারিয়ে সেই ভদ্রলোক, আর দেখা গেল তিনজন চেহারার একটি মানুষ। মুহূর্তে। মুখে জলিনের না-কামানো দাড়ি। চোখ দুটো ছোট ছোট। নাকটা উঁচু। ফরসা রং।

'আপনার উচিত ছিল, এখানে যতজন ভিন্ন মানুষের পকেট সার্চ করা। বেরোলে টাকা বেরিয়ে যেত।'

অর্থাৎ আর একটা সান্ত্বনাবাক্য।

ভদ্রলোক চোখে চুপ করে রইল

বেশি আপনার জামাটা।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে এই শেষ মন্তব্যটার হাতের সার্টটা তুলে নিল। এই একজনই তার আসল হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল।

'এ যে দেখছি, নিখুঁতভাবে তোমার কাটা দাদাই। কেনা হেড দিয়ে এমন ফাইন মাল আর কেউ দেয় না।' আসল ছেলে সার্টটা ভদ্রলোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মুহূর্তে আবার অন্যের কোমর থেকে মাল এল।

কিন্তু এই যে, অপরাধ করলে আপনাদের আমাদের আর একবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে, আমরা ফাঁতে করলে সেই অপরাধীকে শিরদাঁড়াসোজা দেখতেও আর সাধ হয় না, আমরা ফাঁতেটা, যে আমরা আমরা আমাদের হয়েছে আসল কৌতূহল। বাসিন্দাটা মুখে মুখে এসে দিয়ারেই কেনার আছিলা

ওরে যুবক একটা পান সিগারেটের দোকান হঠাৎ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক পলা সিগারেট কিনল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দোকানটার দিকে তাকাল। রাস্তার দোকান তো অনেক। তার দৃষ্টি সেই ফলার ইলেকট্রিকালের দোকানের দিকে। কিন্তু কথাটা সেখানে আর লিখে নেই। এক বাবু, বেশ গাড়ি করে এসেছে, ইলেক ফ্যান বরমারি করছে, তারপর মুখ করে এক সঙ্গে পাঁচ কে কি এমনের দু' ডজন ইলেক কিনে নেবেন। দোকানের সেই ভদ্রলোক, যার পকেট মারা গেছে, একমুখ দুঃখাশ দাঁড়িয়ে থাকবে যাচ্ছে কেবা দেখছে। আহা, বাবুটি জানতে পারল না একটু আগে এখানে এই ভদ্রলোকের কী সর্বনাশটা হয়ে গেছে। সব শুদ্ধ পকেটে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ধরিয়ে ফেলে দোকানের সামনে থেকে এইটুকু ইলেক কিনতে এসে আজ মশাইটির চেয়ে দুর্ভাগ্য হতো। কথাটা পকেটের মালিকটা এখন আমার মাথে ঘোরাচ্ছে। তা তাকে উপায় কি? টাকার শোকে তাকটা ছেড়ে দেবে নিতে পারে না। কস্তুত যদি এই বাবুটি, যার কিনার বন্ধু ছাড়িয়ে ধরিয়ে নিচে নিজের পঞ্জাবি দুলছে, যা অতি অবশ্য, দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না, পকেট কঠিন রোগের হয়, সেদের রোগে চিকচিক করছে, চলকে পড়ছে, হাতে ঘড়িটি, মাথে আধেকের আগের বলেই বড়লোকের পোশাক তিনি আজ রেখেছেন, যেন সুটেডের ধার ধারেন না—হঠ, এই বাবু যদি তখন নিজের মনে থাকতেন যে ঐ রোকরাম ভদ্রলোক, যাকারপুরে সবাইকে যেমন পকেটমার মনে সন্দেহ করছিল একেও কি সন্দেহ করত? যিনি পড়ি চড়ে এসেছেন? সন্দেহ চলন? চোর বলে যিনি পাঁচ কে কি এমনের দুটো ইলিশ কিনে ফেলেন?

উঁহু, এমন কোনো সন্দেহ করার কোনো ঐ মাছওয়ালাই ভদ্রলোকের পাশে বাস্তায় বসিয়ে দিত। ইত্যাদি, আমার এখন পঁচিশের যুবককে দুটি পকেটমার ঠাওরাচ্ছে, সাহস তো তা না। কেবল ইলিশওয়ালা কেন, বাজারের সব জেলেই হয়তো বেশ বেত, আনাজের বেপারীরাও এর একটা কোন সন্দেহের কথা শুনলে ভদ্রলোককে কথা বলবার ছিতে নিশ্চিত ছেড়ে আসত। কি-আনতে দোকানের কথা ছুটে আসত। সব কথা দুটি দোকানের ভদ্রকে ছেড়ে আসত।

পকেট তো মারা গেছেই, সন্দেহ কোনো এক পঁচিশের যুবকে সঙ্গে সন্দেহ করার ছিতে রোকরাম ভদ্রলোক বাড়ি ফিরে যেত।

কথাটা চিন্তা করে যুবক মনে মনে হাসল। তার বাঁচাল না, সিগারেট ধুয়ে সিধে রাস্তার ভেতে বেরিয়ে এল।

এটা ঘটি কথা, সিধে মনের ভয়ে চোর ধরানির ভয়ে আমরা সবাইকে ছিতে সব কিছু সন্দেহ করতে পারি না, তাহলে সন্দেহ হলেও মুখ বুজে সেটা চলন করতে পারি না। তা না হলে হলপ করে বলা যায়, পাঁচ আঙুলে আংটি ও সোনার বোতাম পরা, বাড়ি-গাড়ি-আলা একটা লম্বা ফুলপাক বাবু ভিড়ের মধ্যে থাকে, আর সেখানে আমাদের কারো পকেট থেকে টাকা চুরি যায়, টাকা বাড়ি আংটি বোতাম ঘড়ি—এমন কি সুটের চুলপটা চুরি হোলেও আমরা অন্তত এক মেজেন্টের জন্য হলেও ভিড়ের আর পঞ্চাশটা আঙুলের মধ্যে সোনার বোতাম-পরা আঙুলগুলিকে ছিতে সন্দেহের আসন্ন করে থাকি। কেন তাদের তখন ধরা হয়, সোনার বোতাম, ছিলকন আংটি, ঘড়ি, চেনের—এসব কিছু নয়, একটিও নাছিও না, সব সেকেলী, সেকেলী সাজানো ও বড়লোকী চাল ছিতে এক ঘটি ভেদ ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। কেন না, এটা আমরা আগে থে, চোর সন্দেহের অনেক ওপর। আমরা কেন করে আমরা চুরি ছাঁটপাড়ি ভিড়েরই অবস্থানীদের ওপর ফেলতাম। একেবারে আসল চোর ধরা না পড়া পর্যন্ত ভিড়ের সমু মানুষকেই চোর ভাবতে ইচ্ছে করে। তোমার গায়ে সিল্কের জামা থাকুক কি আমরাকা ছেড়া গেঞ্জি, তাতে কিছু যায় আসে না। বিশেষ করে এই জন্যই যুবক সিগারেট কেনার অছিলায় পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। দোকানটা একটা বড় আয়না টাঙিয়ে রেখেছে। অনেকেরা নিজেদের কোমর পর্যন্ত দেখতে পায়। তাতে হয় শ্যামটা ভাল। যুবক যুবক নানাভঙ্গিতে পরিষ্কার চেহারা পড়ে।

হুঁ, সে তার মনের মতো ভাবের বাবু দু' একজনের কোঁচা ঝোলা সাটটা দেখল, তিন-চার ঘিয়ের না-কামানো-মুখটা দেখল, তিন-চার দিন ধরে কেন, তেল মেখার পয়সা ছিল না, হিসাব করে দেখা গেল খুরো দুয়াটাই সে বাড়ি কামাতে পারে ঘি। কাজেই না-কামানো-মুখ, ছেড়া সার্ট এবং চোখের কোলের চাল চাল কালি ও মাথার রুক্ষ চুল নিয়ে তাকে কতটা ভার চোর, পকেটটা পকেটমার দেখা যেতে পারে সিগারেটের দোকানের আয়নায় মধ্যে ফুটিয়ে তুল

সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থমালা

উদ্বাস্তু

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধানের তথ্যচিত্র। [১০·০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

ড. মহাবোধিমিত্র বড়ুয়ার গবেষণা গ্রন্থ। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [২০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্যে অভিযান কাহিনী। ১০টি বিরল মানচিত্র। [৬·৫০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়া তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি ব্লক চিত্র। [১৪·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সুখপাঠ্য আলোচনা। [১২·০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রামাণ্য আলোচনা। [৭·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বইটি রচনায় তাঁর সাহিত্য অবদানটী পুরস্কারে ভূষিত। [১৪·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা ৯

করে দেখে তারপর ঘাড় ফেরাতে ইলিশের [illegible] ওলাকে ভদ্রলোক ও দু'[illegible] একটা বাদুড়কে ছেড়ে পড়ল। বাদুড়কে দেখার পর তার লক্ষ্যটা এবারে কেউ দেখে। গায়ে এমন সোনা রঙের চাঁড়ের ঘাড় নিয়ে এলেও ঐ বোকারামের বেরোনা সন্দেহের হাত থেকে বাদুড় বাঁচতে পারত না। চোর ধরা না পড়লে সবাই চোর। বড় চালকের কথা। লাখ কথার এক কথা। এবার সে হনহন করে হাঁটতে আরম্ভ করল। বড় রাস্তার উঠেই অন্য কিছু করার আগে তাকবার আগে সরকারী প্রস্রাবখানাটায় ঢুকে পড়ল। অনাদিন রুমাল বা কাপড়ের খুঁট নাকে গুঁজে যুদ্ধে নেয়। আজ এসব বাদুড়ওলা মাথায় এল না। তাই করা মোটর তাড়াটা টাকি থেকে বের করল। পোনার সময় নেই। তাই দেখেই বুঝল পঞ্চাশ টাকা হবে। অবশ্য দুটাকা কম বেশি হলে কিছু এসে যায় না। মনে মনে সে চিন্তা করল। একশ' টাকার বান্ডিল না হয়ে তখন পঞ্চাশ, বাহান্ন বা আটচল্লিশ সমান। টাকাটা সে ভেতরের পকেটে লুকোল। তারপর পাশের কোনার পকেট থেকে ছেঁড়া খুচরা। একদিকে রং ধরেছে। তাতে আসলে কিছু আসে যায় না। আর একটা দিক ভোঁতা ধার, রীতিমত চকচক করছে। পকেট কেন, বোকারামের পকেটও এই ব্লেড দিয়ে কাটা যেত। প্যান্টের কোনায় খুলে প্রস্রাব করার মুহূর্তেই নর্দমার মধ্যে সে হাতের ছেঁড়া ছুড়ে দিল। যাতে প্রস্রাবের তোড়ে ছেঁড়া ভাসতে ভাসতে চলে যায়। কিন্তু তিন সেকেন্ড পার না হতেই সে বুঝল, তার ঘনের ভেতর খুব বেশি জল জমে নেই। প্রস্রাবের তোড়টা চট করে সরু হয়ে গেল, সুতোর মতন একটুখানি বেরিয়ে তারপর একেবারে স্টপ। কোঁত দিতে আর দু-চার ফোঁটা করে পড়ল ঠিকই, কিন্তু তাতে ভেজের কিছু হল না। যদি অন্তত হাইড্রান্টের জলের কাছেও চলে যেত তো আর একজন এসে প্রস্রাব করলেই টুক করে জিনিসটা ওদিক দিয়ে গলে ধিঙা বেরিয়ে যেত। কিন্তু এখন হলদে হাতাসড়া প্রেনটার মাঝামাঝি এমন একটা জায়গায় ভেজটা ঝুলে আছে—এখন যে কেউ ভেতরে ঢুকে প্রস্রাব করতে আরম্ভ করলেই দেখে ফেলবে। দেখেই বুঝবে কোনো পকেটমার দেখাদেখি ভেবে ওটা এখানে ফেলে গেছে। বুঝবে, সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকছে না। পঞ্চাশটি প্যান্টের কোনায় আটকে একটা লাভ নিয়ে প্রস্রাবখানা থেকে বেরিয়ে এল।

খুব হাল্কা লাগছিল নিজেকে এবার। আপাতত এক কাজ হল। সেই কেন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। অনেক হাঁটা হয়েছে। প্রথম দেয়ালদা। কাল রাতে দেয়ালদা স্টেশনেই সে ঘুরঘুর করছে। হাওড়া একটু চালু হলে খেলে হাওড়ার দিকে যাবার ইচ্ছে। হুঁ হাওড়া স্টেশন, হাওড়া ব্রীজ, বড়বাজার। যেমন ঠিক তেমনি পায়ে পায়ে পাঁসালো মজেলের খোঁজ পাবে ঘুরে, টাঁকে, পকেটে পাঁচশ হাজার দু হাজার টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে ঘোরাঘুরি চলাফেরা করছে সব। এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নারকেলডাঙা। চুঁ দেয়ালদা, দেয়ালদা চুঁ কলেজ স্ট্রীট, আরপর সুবোধ মল্লিকের দিকে, নয়তো জাঁবতলা বাজারের দিকে, বাদুবাগান বাজারের দিকে বা শ্রীরামপুর মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। অর্থাৎ একটা জানাশোনা চৌহদ্দি সে মেপে নিয়েছে। সবে যখন হাতেখড়ি অবশ্য তার তখন ছোট জায়গা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা ভাল। ফ্লাস্টা ও লোকাল-স্টাটের মতন এসব জায়গার বাদুবগুলির হাবভাব চলাফেরা কথা চাউনি সবই তার প্রায় জানাশোনা হয়ে গেছে।

কিন্তু আজকের এই বোকারামের ওপর-লোকটি যে বাইরে থেকে এসেছে কেন বোঝা যাচ্ছিল। আসরপাড়া, কোথাকিয়া, বারাসত, নৈহাটি—কেন জায়গার মানুষ তা বোকারামই জানে। মোটের ওপর যে-কোনো জায়গার একটা ট্রেন থেকে নেমে শিশুকালের বাঁধ বাড়ীদের সঙ্গে শিলাপদ করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। উঁহু, মোটেই চোখে পড়ার মতন চেহারা না, পোশাক না। যেমন সাদামাটা চেহারা তেমনি জামাকাপড়। চোখে পড়ল তার এই কারণে, ফুটপাথের ওপর সিল্কসুতো কলার মোজনের সামনে হুট করে মানুষটা দাঁড়াল যখন।

তা কলা কিনতে তো কত মানুষ দাঁড়ায়। সেটাও চোখে পড়ার মতন কিছু একটা সাংঘাতিক ঘটনা নয়। আসলে বোকারাম কুড়ি নম্বর একজোড়া কলা কিনতে গিয়ে সার্টের ভেতরের পকেট থেকে ইয়া বড় নোটের বান্ডিলটা টেনে বের করেছিল। দশ টাকার একটা নোট কলাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিতে লোকটা ভয়ে ভেঁড়ি কেটেছিল—সন্ধাবেলা চেঞ্জ কোথায় পাব মশাই, খুচরো থাকে তো দিন। খুচরো আছে, একটা সিকি, এমন একটা ছোঁচি খাবার পরেও কিনা বোকা-রাম ভদ্রলোকটি দাঁত ছড়িয়ে হাসল, ওটা যে বাসে লাগবে, ওরা দশ টাকার চেঞ্জ দেবে না আমাকে।

তবে কলা রেখে দিন। চালার ভেতর লোকটা উত্তর করেছিল। যেমন তার গলাটা, তেমনি চালাচালা মুখের ভাব। মুখে আমার কেমন যা সরে হয়ে উঠেছিল, ইচ্ছে করছিল মাথার একটা চাঁটি বসিয়ে লাখ মেরে তার কলার ঝুড়িটা উঁড়িয়ে দিই। কিন্তু আমার সঙ্গে তো ব্যাডমিন্টন ব্যাট নেই, আমি খুব পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম; যার সঙ্গে ব্যাট তিনি ঠিক তখনই খুবই যত্নখানা চুন করে হাতের কলা ঝুড়িতে নামিয়ে রেখে ফের খুবই একটা মেড়া, যেন কলাওয়ালার কাছে ভুল অপরাধ করেছে, ঘাড় গুঁজে বাস স্টপটার দিকে চলল। তখনই আমার মনে হল আজ বোকারামের দুর্দিন পাওয়া গেছে। আমি পিছু নিলাম।

এখন কথা হচ্ছে, খুব ঘুরঘুর বাস করে হাঁদাকান্ত বাদুবাগানের বাজারে করতে এসেছিল কেন? ইলিশ মাছ কিনতে? বৈঠকখানা বাজার ফেল করল কি? না কি সেখানে সস্তায় ইলিশ পাওয়া যায় না?

ব্যাপারটা নিয়ে আমি অবশ্য তখন মাথা ঘামাই নি। আমার চোখ মন সারাক্ষণ তার পকেটের দিকে ছিল। ভেবে-ছিলাম বান্ডিলটার মধ্যে কম করেও দু'শ নোটের থাকবে। এতোবারে পঞ্চাশ ভাবি নি। তাই স্রোক, যা পাওয়া গেছে তাই লাভ, আমার পক্ষে এখন দুটাকাও অনেক টাকা। খুব শেয়ালদার বৈঠকখানা বাজার পিছনে ফেলে বাদুবাগানের বাজারে ঢুকল। না কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল বোকারামের? এদিকে এসেছিল কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে? তারপর ইলিশওয়ালার বড় গলা শুনে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে মাছের দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল?

যেমন যাহোক্কানেন্দ্রনাথ হয়ে গলার খুপালি ইলিশ দেখছিল, চেহারাটা এমন হলে হাসি পায়, পকেট তো ভাল, সেই মুহূর্তে একটা হাত কেটে নিলেও আহাম্মকটা টের পেত না।

চায়ের দোকানে ঢুকে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটা পরিচিত মুখ। বাবলা। তাকে দেখেই দাঁত বার করে হাসছে।

সঙ্গে ওটা কে? বাবলার বোন? বাবলার কি বোন আছে?

বাবলার বোন আছে কি নেই কোনো-দিন জিজ্ঞেস করার কথা তার কিন্তু মনেই হয় নি। এখন আফসোস হল। মেয়েটার চেহারাটা দারুণ। কিন্তু এখন আর হুট করে কি করে জিজ্ঞেস করে? এখন জিজ্ঞেস করতে গেলেই বাবলা ভাববে, মেয়েটাকে দেখে আমার জিভে জল এসেছে।

'এদিকে হঠাৎ?' বাবলা চৌকি ছেড়ে

ওভারটাইম করা রাত জাগরণ

ছাড়া এল। অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে তার মনে হল, বাবলা একটা কাজটাজ জুটিয়ে ফেলেছে। মাথার চুল চেকচক করছে। তার মানে বেশ তেলটেল দেওয়া হচ্ছে। বাবুয়ে মাথায় তেল দেয় কখন? ই, পাইস ঊপায় করলে।

হুঁ, এসেছিলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। হাসি হাসি মুখে কথা সে উল্টে বলল। তারপর তুই—'

'আমি এসেছিলাম শিলভুয়ের বাড়ি। আমার শিলভুয়ো বোন।' আঙুলে দিয়ে বেলা খুলে চেয়ারে-বসা মেয়েটিকে দেখাল। 'আমার ছেলের মুখে ভাত খাওয়াতে এসেছিলাম। এই তো এখানে অন্নকালী লেনে থাকে ওরা।'

'অ—রে, তোর ছেলে হল আবার কবে?'

'হুঁ, হয়ে গেছে এর মধ্যেই।' বাবলা ফোস করে শ্বাস ফেলল। 'নে, সিগারেট খা।'

অবাক হয়ে সে দেখল বাবলা পকেট থেকে কর্কটিপত্র বের করছে। মহাসুখে মাথা চাঁছে। মনে মনে বলল সে। ভিক্টোরিয়ার চৌহদ্দি ওয়ার্কস-এ থাকতে বাবলা বিড়ি খেত না?

প্যাকেটটা বাবলা খুলে ধরতে ইবং কাঁপা হাতে সে একটা সিগারেট তুলে নিল।

'চা খাবি?'

'হুঁ, তা খাব।' বাবলার হাত থেকে দেশলাইটা তুলে নিয়ে সে সিগারেট ধরাল। 'আমি এখানেই বসছি—তোর বউমা একলা বসে আছে—তুই তার কাছে যা।'

'তুইও আয়। এক সঙ্গে বসে গল্প করা যাবে।'

'আমার তাই একটু তাড়া আছে—চট করে খেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'অ।' বাবলা ঘরকে গেল। সেই মুহূর্তে সে টের পেল, বাবলা তার মুখের ওপর ছোট্ট সরু চোখের কালি বুলিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। চট করে মুখটা আবার ঘুরিয়ে নিতে পারলে তার ভাল লাগত, কিন্তু তা আর কি করে নেয়া? বোধহয় সন্দিগ্ধ করতে পারলি?' বাবলা মুখ করে প্রশ্ন করে বসল। যে জিনিসটা সে ভয় করছিল।

সে কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না। হাসি হাসি মুখে করে গাল থেকে বোঁয়াটা বের করে দিল।

'নাহ, পরের চাকরি আর করব না, ভাবছি ওদিকে আর চেষ্টা-টেষ্টা করছি না।'

'কি করছিস তাহলে এখন?'

অফিস ফিরছেন। অফিসে সে একটা ভাল মিথ্যেকথা বলে ফেলল। কিন্তু বাবলা বিশ্বাস করল কি? তার কেন জানি মনে হল বাবলা বিশ্বাস করেছে।

'আচ্ছা! খুব ভাল জিনিস। বাবুয়ে চুলটুল ছোট্ট। ভালোমন্দ কিছু খাবি নাকি?' খুশির চোখ করে বাবলা জানতে চাইল।

'না, আর একটু পরে বাড়ি গিয়ে আমাদের ভালোমন্দ খাওয়া আছে। এখন হোল-মেলোগ্রেনের বার খেয়ে বাজে খিদে এনে পার্টিদের সাজাই করছি।'

'সেকেন্ড—আচ্ছা, আর একদিন দেখা হবে।' বাঁ হাত ঝাড়া করে বাঁ-হাতের ভেলোটা খুলতে নাচাতে নাচাতে বাবলা তার মুখোমুখী শিলভুয়ো বোনের কাছে চলে যাচ্ছিল।

'তুই এখন কোথায় থাকিস—মানে, ইয়ে, কোন্ কলনালে—' প্রায় থমকে ছাড়ার মতন করে প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত বাবলার দিকে সে না ছুড়ে পারল না।

বাবলা ঘাবপথে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিগারেটটা মুখে পুরে কোমরে দু' হাত রেখে চোখ টেপার মতন চাউনিটা করে

হচ্ছে হাসতে লাগল। এত আগে এরকম দেখে। এবার ফেরার সে চাই দেখা। নিশ্চয় বলবে তোমার ভাল লাগে সেরে গেছে। তা না হলে এমন চমকে ছুল? কী চিন্তা নিয়েছে? মুখে এমন ছন্নছাড়া হাসি?

'তোর কি মনে হয়?' বলতে বলতে বাবলা আবার এক পা এগিয়ে এল।

মনে হয় তুইও আমাই আছিস? স্মৃতিও' শব্দটায় ওপর জোর ছিল সে। অর্থাৎ সে বলতে চাইছিল—চায়ের বাবসা শুরু আমি যেমন ভাল আছি, তেমনি তুইও সিদ্ধেশ্বর মেটাল ওয়ার্কস-এর চাকরি নিয়ে বারাপ কিছু নেই। আর একটা কিছু বাধিয়ে বিরেছিস।

'ধুকলি?' বাবলা জোরে মাথা ঝাঁকাল। আমার মাকে বলে কিনা শাপে বর হয়েছে —সিদ্ধেশ্বর মেটাল ওয়ার্কস লক-আউট হয়ে গিয়ে আমার পুনর্জন্ম হল।'

'কি করবি?' তার হতশ্রীটা বড়ুস্ বড়ুস্ করছিল।

'আমার বিধিরপুরের মামা একটা ছেলে কিনেছে। বলল, বাবলা মিত্তের ছেলে ছাড়া এ জিনিস চালাতে পারব না —তুই যখন বলে আছিস একটা লাখ— আমার তো আরো কাজ-কারবার আছে।'

'ও, তাহলে তুই তোর মামার ছেলে হয়েছিস?'

'হয়েছি মানে কি—আমার ওপর ছেলের সব দায়িত্ব। চায়ের্লী প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর ম্যানেজার আমি।' ধুকলী টান করে বাবলা কথাটা শেষ করল।

চুপ করে রইল সে। সে কেন সিধা-সোজা ছাই কাড়ছে এমন একটা বাস্তবতা নিয়ে আসুলের দিকে তাকাল।

'চলি—দেখা হবে—'

চোখ তুলতে সে দেখল ঘাড় কাত করে বাঁ হাতের ঝোলাটা দুলো নাচাতে নাচাতে বাবলা তার পিসতুতো বোনের কাছে সরে যাচ্ছে। এক কাপ চা চেয়ে নিয়ে খরচ পরচ সেটা গলায় ঢেলে কোনোরকমে দাম মিটিয়ে সে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল। কেন ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছাড়ল। অসময়েও সে ঘামছে ঘামছিল।

আমার নাম ফটিক—ফটিকচাঁদ, তুমি শালা যদি গাছের ডালে ডালে চরে বেড়াও, আমি চলি পাতায় পাতায়। তোমার চেয়ে আমি কম তালেবর না। কম বুদ্ধু না। তুমি শালা মামার ছেলে বেঘোরে। মামার ছেলের তালেবারি। লম্বা বাত বাড়াবার আর জায়গা পেলে না। বিধিরপুরে কোথায় কোন লম্বর লোহার এমন সোনার ডিম-পাড়ামামা ছিল আগে কোন-দিন শুনেছিলাম কি? বেশ কিছু একটা ডিগ্রা ভেবে ফটিক তাতে হেলান বসল। মনে মনে বাবলার বাপান্ত করে ছাড়ল। কোথায় মৌজ করে বসে চা খাওয়া হচ্ছে— তেনা বুদ্ধুর মাথায়ই তা-ও আবার সিদ্ধেশ্বর মেটাল ওয়ার্কস-এর একটা মুখ এভাবে সামনে পড়ে যাবে, বিশেষ করে এই সময়ে, সে ভাবতেই পারে নি।

উঁহু, মোটেই তার দুঃখ হতে না যদি সে দেখত গোলাপ সিদ্ধেশ্বর মেটাল কারখানার আর পাঁচ শ' ছেলের মতন বাবলাও অথৈ জলে ভাসছে। বস্তুত পাঁচ শ' কর্মচারীর কে কোন্‌দিকে যে ছেলে গেল, এত বড় কলকাতা শহরে চোখে পড়ার কথা নয়। তা হলেও হাঁড়ির একটা ভাত টিপলে হাঁড়িসুদ্ধ ভাতের খবর পাওয়া যায়, পরশু খগেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না রাজাবাজারে? কী চেহারা হয়েছে! খগেনের কোন্ এক দোস্ত রাজাবাজারের হামিদ মিঞা। হামিদের দোকান থেকে লুঙ্গি, গামছা নিতে যাচ্ছে বেলেঘাটা বাজারে। খগেন এসব ফেরি করে বেচবে। হাড়গিলের মতন হয়ে গেছে গলাটা, চোখ দুটোই ঠেলে ঢুকে পড়ে ভয়ানক জ্বলজ্বল করছিল, তাকাতে ভয় করছিল তার, গলায় স্বরটা একেবারে ভেঙে গেছে খগেনের। ভগবান্‌দিল প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না।

'ফটিক না?'

'হুঁ,' ফটিক ঘাড় কাত করেছিল, 'খগেন না?'

'হুঁ।'

'কেমন আছিস?'

কাঁধ থেকে লুঙ্গি, গামছার পুটলিটা নামিয়ে রেখে খগেন কেমন যেন ধুকছিল। দুবার কাশল।

'থাকার কথা বলছিস ভাই, থাকা আর আমাদের হল না, একেবারে মরে আছি।'

'লুঙ্গি, গামছা এনে হচ্ছে?' পুটলিটার দিকে চোখ রেখেছিল ফটিক।

'হুঁ, কিন্তু সুবিধে হচ্ছে কোথায়— এর মধ্যেই বার-দেনা হয়ে গেছে, পুঁজি না থাকলে কোনো ব্যবসাই চলে না। তোর কোনোরকম সুবিধে হল?'

ফটিক মাথা নেড়েছিল। চায়ের ব্যবসার কথা শুনিয়ে খগেনকে খাপ্পা দিতে পারে নি সে, দরকারও ছিল না। ঐ তো চেহারা দেখাচ্ছিল খগেনের, আর তার বেশভূষা, পায়ের চটিটা অনেকদিন আগেই ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। এমন চটি কেউ পায়ে রাখে?

'না রে ভাই, কোনো সুবিধেই হচ্ছে না,' ফটিক অকপটে স্বীকার করেছিল, 'আমারও ঐ একই অবস্থা, এমন পুঁজি নেই যে, একটা পান-বিড়ির দোকান দেব।'

'আমার তো এখন এই ব্যবসাটা ভাবনা ছেড়ে দিয়ে দেখে নিজে চালাব ভাবছি।' ঘাড় তুলে ফটিক খগেনের গলায় হেসেছিল। কিন্তু তা-ও করার জো নেই। খগেন যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে বেচছে, গামছা চলছে দিয়ে বুকের অসুখ বাধিয়ে ফেলেছে।'

'বুকের অসুখ!' ফটিক চমকে উঠেছিল। চোখ দুটো ডুলো করে আর একবার ভাল করে খগেনের আকাশে মুখটা দেখছিল। খগেন কাশছিল। কুঁকছিল। ঐ অবস্থায় সে মাথা ঝাঁকাল।

টি-বি সন্দেহ করছে ডাক্তার। একবার বুকের ফটো তোলা হয়েছে। দেখে ওষুধ খেতে দিয়ে ডাক্তার বলছে, আবার তিন মাস পর ফটো নিতে হবে। রোজ ঠাণ্ডা, ভাত খেতে পাই না, মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকার ওষুধ, পনেরো টাকা খরচ করে তিন মাস পর আবার ফটো।'

জলহাওয়াটা ভয়ানক গুমসে হয়ে-উঠেছিল। চৈত্র মাসের দুপুর। বোধ চেনান করছিল। ঠিক তিন মাস আগে রাজাবাজারের মোড়ে ছিন্নর দুপুরে খগেন সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না? তারও সাত মাস আগে সিদ্ধেশ্বর মেটাল কারখানার মালিক কারখানার দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কাজেই হিসেব মতন ফটিক এক বছর বেকার হয়ে ঘরে বসা। হুঁ, চলতি কথায় ঘরে বসা। কিন্তু বসে থাকলে তার চলত কি? তিন-তিনটে পেট বেকথা শুনত? ব্যারাম হয়ে খগেনও কি ঘরে বসে থাকতে পেরেছিল? থাক সে। কথা হচ্ছে, গত শুক্রবার শেয়ালদা স্টেশনে হারানের সঙ্গে দেখা। বেলঘরিয়ার ছেলে। সিদ্ধেশ্বর মেটাল কারখানার আর এক হতভাগা। হারানের মুখেই শুনেছিল সে, তিন বছর-বারো আগে খগেন মারা গেছে। টি-বি হয়েছিল। খগেনও বেলঘরিয়ার মানুষ ছিল কি না, কাজেই হারান সকলের আগে খবরটা জেনে গিয়েছিল।

'তুই, তোর খবর কি?' যেন খগেন নেই—গেছে, তার কথা ভেবে শোক করার আর লাভ নেই, এখন যে কজন বেঁচে আছে, তাদের নিয়েই ভাবনা, এমন একটা চেহারা করে ফটিক গম্ভীর মুখে হারানের চোখ দুটো দেখছিল। 'কোথাও সুবিধে করতে পারলি?'

'না', হারান মাথা নেড়েছিল। ফটিকের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলছিল, 'একটা কথা বললে বিশ্বাস করবি?'

'হুঁ, হুঁ, কেন করব না, এ-বাজারে অবিশ্বাস করার কিছু নেই।' অতঃ

[সেবারণ ১০২৩ পৃষ্ঠায়]

আনন্দসাগর

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

একটি বালকের বিদ্যাসাগর

১১১

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আনন্দের ছিল না। প্রথমেই 'প্রথম ভাগ' বইখানার চেহারাতেই অপছন্দ করেছিলুম। অন্যান্য স্কুলে তখন ভালো আকারের ঝর্ঝরে-ছাপার বই চালু হয়ে গেছে, তাতে ছবির বাহার ছত্র, আর আমাদের পাঠশালায় (আমার বিদ্যারম্ভ পাঠশালাতেই হয়েছিল; পটলের আকারে খড়ি দিয়ে 'অ-আ-ক-খ' লেখা, তারপরে কিছু উন্নতি হলে লাল কালির কাগজে কলম-কাটা খাগের টানা-লেখা; সত্যই আমরা একেবারে হরফের থেকে একাদে অবতীর্ণ হয়েছি!) পুরোনোপন্থী গুরুমশায় কি না বিনাপয়সে পাওয়া লাল মলাটের খাটো আকারের প্রথম ভাগ হাতে রাখলেন। বইটার নির্বাচনে পিতৃদেব মিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন, কারণ তার দাম, যতদূর মনে পড়ে, পাঁচ পয়সা ছিল, কিন্তু আমরা তখনো 'ঘোড়া পুরোনো ঘোড়া' হইনি, তাই ও-হেন অশ্লেষের চেহারার কোনো বই পেয়ে সুখী হওয়া সম্ভব ছিল না। বইটার উপরে একটা বুড়ো মানুষের ছবি ছিল, ভয়ানক কড়া চেহারার, চোখে-মুখে অসহ্য লিখনের কঠোর নীরসতা—সেই বোধ হয়, উনিই বইটির লেখক। গুরুমশায় বইটি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে, আমাদের সকলের মাথায় ঠেকাবার নির্দেশ জারি করে 'অজ' আরম্ভ করেছিলেন, যে-কাজটা আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কারণ সরস্বতীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলাম না।

বিদ্যাসাগরকে তাঁর কীর্তি (যিনি কি না ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার ধারা করেন) এবং চেহারা কোনো দিক দিয়েই ভালবাসতে পারি নি। অপছন্দ ক্রমেই বেড়েছিল। 'প্রথম ভাগের শেষে 'জল পড় পাতা নড়' নামক কবিতা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদি কথা, এ কথা পরে জেনেছি, কিন্তু ঐ অংশও আমার নিজের পড়া-মনে কোনো দোলা লাগাতে পারে নি। ছোট বয়সে দোড়া থেকে ঘোড়ায় রূপান্তর করতে তার ভাল লাগে, কিশোরও প্রায় সুরুতেই যদি 'ঐরাবত, পারলৌকিক, সুশীল, অকস্মাৎ' এসে যায়। বানানের চেনা কায়দাবার পরে যেই-না লাল ফুল, ছোট পাতা, শীতল জল-এ এসে একটু জুড়িয়েছি, অমনি উপদেশ—উপদেশের পর উপদেশ—জীবনে যা কাজে লাগবে না।

কখনো মিছা কথা কহিও না;
কাহারও সহিত কলহ করিও না;
কাহাকেও গালি দিও না;
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না;
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না;
পড়িবার সময় গোল করিও না;
সারাদিন খেলা করিও না।

যা রে, ঐ সব উচিত কাজ যদি না করব তো করব কি? বাড়িতে যে-সব কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে, পাঠশালায় গিয়ে সেই কথা আবার আওড়াতে হল।

"দেখ রাম, কাল তুমি পড়িবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।"

"লক্ষ্মীন, কাল তুমি বাড়ি যাইবার সময় পথে হরকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলেমানুষ, জানো না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।"

"যদিলাল, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন? শুনিলাম, তোমার কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সারা দিন খেলা করিয়াছ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ; বাড়িতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।"

এর পরেই 'প্রথম ভাগের সুবিখ্যাত উপসংহার—গোপাল ও রাখালের চরিতকথা। "গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ যা বলেন, যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই

বলে।" অর্থে "গোপাল বেশ সুবোধ, রাখাল তেমন নয়, সে বাপ মার কথা শুনে না; তা খুশী তাই করু; সারাদিন ইস্কুলে যায়।" ছেলের রাখালের সঙ্গেই আমার আচরণের তুলনা; এবং তা আমার পরিবারের সকলে মনে মনে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা কবীন্দ্রমাধবের 'বিদ্যাসাগর-চরিত' পড়েন নি, রাখাল-গোপালের মধ্যে গভীর ভালো কিছু থাকতে পারে, একথা জানবার সুযোগ তাঁদের ঘটে নি, স্বয়ং বিদ্যাসাগর রাখাল-জাতীয় বালক ছিলেন—এই জ্ঞানের শিকারেও তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন; অপরপক্ষে সবাই আমার বাবার নয়ন গোপাল, সবাই তিনি লেখাপড়ায় ও আচার-আচরণে প্রথম হোক এই আশা করতেন—সুতরাং আমি যে ইস্কুলের বিদ্যাসাগরের আখ্যান—এ তিনিও সহজেই আমার পুতুলখেলা অভিলাষের কারণ মেনে নিয়েছিলেন, ও সেই অজুহাতে আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে আমার দুষ্টপনার পরিচয় দিতে দিতে আমার জন্মাবধি অভ্যাসের কথা জানতে তাঁরা ভুলতেন না। বাংলার সাহিত্য-গগনের প্রবাদ মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকল বাঙালীর অজ্ঞাতসারে 'প্রথম ভাগ' দ্বারে আমারই চরিত্রকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এই বোধহয় অবাধ হবার পক্ষপাতে বাপে আমার দাঁত কিড়মিড় করত এবং সাহিত্য-গুরু বিদ্যাসাগর এই অজ্ঞ লেখকের কাছ থেকে দন্ত কিড়মিড় করা নয়ও একটি শব্দলিখিত বাস্তবচিত্র পুতুল-বাঁধনসূত্রে পেয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম ভাগের বিড়ম্বনা বিস্মৃতে পরিণত হলে দ্বিতীয় ভাগ এল। উঃ, সেদিনটা মনে পড়ে, যেখানে পড়া নেই, ভাষা নেই, ভেদ নেই, শুধু দ্বিতীয় ভাগ আর বিয়োগ। আমার জীবনের প্রথম বিয়োগবেদনার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের ভাঙাচোরা, ছিঁড়েখোঁড়া, ঝাঁঝিকা, নিরেট-র বিশ্রীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ভাঙাচোরা গল্প ছিল—সবগুলিই কিন্তু চোখ-ভাসানো দুঃখমোহনকারী। বাঘব নামক বালকটির লেখাপড়ায় মন ছিল না, বিদ্যালয়ে না গিয়ে পথে খেলা করে বেড়াত এবং সেই সব কাজে অন্যান্য বালকদের দুঃখমোহনে চেষ্টা করত; সচ্চরিত্র অভিভাবিত বালকগুলি সেই দুষ্ট বালকের দ্বারা দুঃখমোহনের কাছে কান ধরে দিয়েছিল" ফলে বাঘবের পাঠশালায় বা বাড়িতে দুর্ভোগের শেষ ছিল না: বাঘবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, বই ভাঙিয়া যাহা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি তিনি বাঘবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।"

নবীনও বাঘবের পথের পথিক, সেও খেলার ছলে ভাঙবার চেষ্টা করত অন্যান্য বালকদের। কিন্তু সেই সকল দুর্বৃত্ত অসমর্থবান বালকেরা আমা থেকে নবীনকে নানা-প্রকার সদুপদেশে শাসিত করে সরকারে চলে গিয়েছিল, ফলে নবীনের চৈতন্য হয়েছিল। সে লেখাপড়ায় মন দিয়ে আমাকে বিদ্যা শিখিয়েছিল।

এহেন সৌভাগ্য বাঘবের হয় নি। ফোঁপার অভ্যন্তর ছিল তার পরিণত আত্মা দুঃখ পাওয়া। পরিণতিতে সে পাকে চোরে মতো বাঁড়িয়েছিল, আমাকে আড়ি ডেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। "আমাদের দুঃখের সীমা ছিল না। সে যাইতে না পাইয়া, পেয়ারার অন্বেষণায় ব্যাকুল হইয়া, সমস্ত সারা কাঁদিয়া বেড়াইত।"

একমাত্র পক্ষে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী—চুরি করলে আমি পড়তে হয়ই সেই সূত্রে ছিল গ্রাম নামক একটি নিষ্পাপ ছেলের অকালকথা। গ্রাম শিশুমাত্রার কথার অবোধ হয় না, সে বড় ভাইবোনদের কথা শোনে, ছোট ভাই-বোনদের ভালবাসে, বন্ধুদের সঙ্গে-প্রাণভরা শোষণ করে, শিক্ষকদের ভক্তি করে, জানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে না ইত্যাদি। স্বাভাবিকী আমার কথার মতো একমাত্র হাসি কাহিনী ছিল ভুবনের—কাহিনীটা অবশ্যে ভুবনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে (একেবারে ভাজির বিচার)—সর্দার মেয়ের ফুল মাস্টার জানে ভুবন তার বিদ্যাবাণী শোনাচ্ছে, ঠিক তখনি—কট্টাস্—আহা অসুখে—ভুবন মাস্টার কান ধোরে কাঁচের বাঁশ দিয়ে কেটে নিয়েছে। আমার স্মৃতিতে সাঁচা ছিল না। উদাসীন ভুবনমোহনকে প্রথম পর্যন্ত করে-ছিলুম—মোটা কানটা কি ভুবনের দুঃখের মধ্যে থেকে গিয়েছিল? মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির বারণ—এই কবিতার কলকারে মন-প্রাণ ভরে গিয়েছিল। মাসী ও ভুবনে মশায় আমার চেতনায় তখন একাকার। দ্বিতীয় ভাগের এই অংশটা ক্লাসিক, কিন্তু তার আগে—বাপরে—'ফুলকপিকা', 'মশকের', 'মুখটী', 'মুখোকেল', 'আঘাত', 'ফুটোমিত', 'উপায়ন'। আচার্যের কথায় ও কাজে তফাতও বেশবাস। এই সব কথা বালকদের শোনাবার পরেও তিনি লিখেছেন: "কখনও কাহাকেও ভুবাকা কহিও না।"

এই দ্বিতীয় ভাগ—তার উপর বিভীষিকা—ফার্স্ট বুক। শোনা যেত, ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাহার পরে অনেকের পক্ষেই এগোনো সম্ভব হয় নি। সম্ভব হবে কি করে—যা ঘোড়ার চেহারা। দুষ্টু ঘোড়ার চেয়ে দুষ্ট আন্তাবল ভাল। ফার্স্ট বুকের মালিক জনকয়ার প্যারটিকল সরকার নাকি বিদ্যাসাগরের বন্ধু। হতে হবেই। না হয়ে পারে।

এও অবশ্য মত—অন্য। অন্যের আতঙ্ক নিয়েই বোধ হয় জন্মেছিলুম। অন্য ঈপ্সিত অন্য করে ফেলার মত বন্ধুর প্রতিভা পাঠশালায় ছিল না। তাদের কৃতিত্বে ঈর্ষা করে আমি আর কিছুই উপহার দিতে পারি নি। মাস্টার পণ্ডিত, আত্মীয়ের গাঁটে ঈসপ্ ঈসপ্ কাঁচি-ফেডের ঠোকর এবং অবিরত অনুযোগের জ্ঞানীয়ের উপদেশ হতে হতে এক-এক সময় বড় বৈরাগ্য এসে যেত। তেমনি মানসিক অবস্থায় একবার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রিত-সভায় পাঠশালায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলুম (এখনকার সাধ না পূরিল, আশা না মিটিল ধারায়)—সেটি কম দেওয়া অনুযোগিল কৌশল—অসুখ, ফুল-এর সাজি-দোয়াত—এই অন্তে তখনকার দাদিম আবিষ্কারিত অনুযোগের কারণ—আমি নাকি বাড়ির সব চেয়ে ভাল ছেলের চরিত্রের বাজার করে দিয়েছি।

একটা অসামাজিক ভয় থেকে আমাকে চিরতরে নিষ্কৃতি দিয়ে ফেলবার জন্য দুর্ঘটনার কোন্ সংশোধনী শাস্ত্রীয়শিক্ষক বিশ্বোদ্ভাবন, তার ইতিহাসে আর নাই দেখলুম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে—আজ না পাবার জন্য যখন অসীম সাধনা হচ্ছে—তখন হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে ভালবাসার সুযোগ পেয়ে গেলুম। দুর্ঘটনার হাত আমার শরীর থেকে সরিয়ে, সেই হাত নিজেদের ভাগ্যিতে উঁচু করে তুলে, ছেলেদের মধ্যে আমার সাড়ম্বরে যে অসম্মানকর উঠে-ছিল তাকে থামালেন; তাদের গল্পটা বললেন। দ্বিতীয় ভাগের প্রথমভাগের লেখকের বাল্যদুর্গতির অদ্ভুত কাহিনী আমরা শুনলুম। সে কাহিনী বাঙালী দেশের প্রায় সকলেই জানেন। বীরসিংহ গ্রাম থেকে হাঁটা-পথে কলকাতায় আসার সময়ে পথপার্শ্ববর্তী ইশ্বরচন্দ্র পথের ধারে মাইল স্টোনের উপরে ইংরেজী সংখ্যা দেখতে দেখতে ইংরেজী সংখ্যা-গুলো আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। খুব মজা হয়ে গিয়েছিলুম। সেই তন্ময়তার অবসরে দুর্ঘটনার পাশ কাটিয়ে আমার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আনলেন—সেই বিদ্যাসাগর আর আমাদের এই বিদ্যাসাগর! তারপরেই আমার মুটি ধরে মাতা দিয়ে (মাথা কলে অবশ্যে টাক পড়ে গেছে), দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—পথ হাঁটতে হাঁটতে একটা মুখের ছেলে ইংরেজী অঙ্ক শিখে ফেললে, আর এই বুড়ো ধেড়ে খোকা (মোটা নয়, মোটেই তখন বুড়ো ছিলুম না।)—লজ্জা হয় না বাঁদর!"

বলাই বাহুল্য, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মনে আমার বাল্যাবিদ্বেষ জন্মেছিল। বিদ্যাসাগর-পুরাণের মধ্যে প্রবেশ না করে আমাদের উপায় ছিল না। সাহেবের মুখের সামনে চাটিজুতোয় নাচানোর কাহিনী শুনে কত হাসলাম; কত জামোদর সাঁতরে পেরিয়ে প্রতীক্ষাব্যাকুল মায়ের কাছে প্রবলবেগে হাজির হয়ে ছেলে বলল, মা আমি এসেছি—চমকে পিছনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম; ভক্তিতে আবেগে বিগলিত হয়ে গেলুম—বিদ্যাসাগর পথের উপর থেকে কলেরা রোগীকে বুকে তুলে নিয়েছেন। আমাদের অজ্ঞাতে 'প্রথম ভাগে' ছাপা ছবির কঠোর মানুষটি একেবারে ভালবাসার পিতা হয়ে গেলেন—শকুন্তলার পিতা কণ্ব—নাকি বিদ্যা-সাগর! শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অমর রচনা আমার জীবনে প্রথম গভীর সাহিত্যের রস এনে দিল—গভীর অথচ নিকট—কারণ ও-দৃশ্যের সাক্ষী কি আমি নিজে নই, নিজের বাড়িতেই।

বিদ্যাসাগরকে নতুন করে জানলুম। বিদ্যাসাগর বিরাট পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্, সমাজসংস্কারক এবং জাতীয় মর্যাদার আপসহীন প্রতিনিধি। জানলুম তাঁর মনুষ্যত্ব ও পৌরুষকে। জানলুম তাঁর অপূর্ব প্রেমকে, যা অজস্রতে বিগলিত হত নিরন্তর এবং প্রবাহিত হত মর্ম-ঘাতের দ্বারা বিদ্ধ দুর্গত মানুষের জীবনের দিকে। মানুষের প্রতি ভালবাসায় সহস্র-চক্ষু, সহস্র-বাহু সেই সকলের ঈশ্বর।

বিদ্যাসাগরের কোন্ ইঞ্চের আমার এবং প্রায় সকল বাঙালীর কাছে উপাদেয় ছিল? তা হল তাঁহার কঠোর ধীরের একটি মূর্তি, বিরাট এবং দুর্ভেদ্য; অন্যদিকে কোমল অশ্রুব্যাকুল জলাভিলাষী। কোমলেতেই কিন্তু সহজ যাতায়াত মানুষে তিনি নন। বিদ্যাসাগর চরিত্রে বাঙালী নন; তিনি এত বিরাট ও মহান যে, তাঁকে যদি হবি বাঙালী আমরা, তাঁকে নিজেদের কাছে কখনো পাবি হতে পারি না; বাংলা দেশের সবাই একক, বিদ্যাসাগরই একমাত্র দ্বিতীয়হ ইত্যাদি। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন "বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁর নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম বিপজ্জনক বিদ্যা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" আমাদের মেরু-দণ্ডের সনাতন কোমলতা সম্বন্ধে বিজ্ঞার দিয়ে তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন, "এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কণ্টকাকীর্ণ মানুষ কিরূপে উদ্ভূত হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত, কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উন্নত পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন অন্যের নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উন্নত স্বেচ্ছাবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব-বিধ কণ্টকের হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার কলমেলে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য দায়ী হইবে, সন্দেহ নাই।" সুতরাং সেই "প্রকাণ্ড আদর্শটাকে সংকীর্ণ বাঙালীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে বাঙালা নিতান্ত দুষ্চেষ্টা, এবং বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত "বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত দর্পণস্বরূপ" অর্থাৎ "আমাদের দেশের যাহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ দুটি একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।"

জন্মে বাঙালী হলেও কর্মে ও ধর্মে বিদ্যাসাগর যে বাঙালী ছিলেন না, একথা রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর-চরিত' নামক অকৃতজ্ঞতীয় রচনার সাহায্যে জেনেছি। আমরা ঠিক সামান্য এবং বিদ্যাসাগর কত অসামান্য, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একলব্য করে ঐ লেখায় দেখিয়েছে। "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্ব-কর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" এবং—আমাদের এই অসম্মানিত দেশে ঈশ্বর-চন্দ্রের মতো এমন অবশ্য পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কবের বাসা কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ অগোচরে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে দান করিবার ভার দিয়াছিলেন।" বিদ্যাসাগরের দয়া বাঙালির দয়া নয়, তাও জেনেছি। "বিদ্যাসাগরের দয়ার কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও

পাওয়া যায়।" সুতরাং বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন "সুবেসুরো, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালি" হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বিদ্যুষ্টা, সত্যানিষ্ঠা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় বিলেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।" এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যথা অবশ্য আলোচনা করা যাক, কারণ রামমোহন মোটেই বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু বিদ্যাসাগর অবশ্যই তা ছিলেন, এবং রামেন্দ্রসুন্দরের বিদ্যাসাগরের চরিত্রবৈচিত্র্যের তত্ত্ব প্রকারান্তরে যাহারা করেছেন, তা মনে রাখার কোনো: "চরিত্রবৈচিত্র্য দ্বারা তাহাকে একটা অসাধারণত্ব দান করিয়া তাহার একটা বিশেষ মূল্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইত।" রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথের মতোই বাঙালি চরিত্রের ক্ষুদ্রতার পাশে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৃহৎ মূল্যকে উপস্থিত করেছেন, তাহলেও একই সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগরকে খাঁটি বাঙালি বলেই মনে করেছিলেন। "তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।...যেমন বাঙালিটি হইয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। তাঁহার নিজের এত সম্বল ছিল যে, অন্যদেশ হইতে পরের মুখের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজের সম্বলের সময়ে এমন উচ্চ মুষ্টি বাঁধন করিত যে, তিনি কদাচিৎ এই সম্বলকে সম্পূর্ণ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি অথবা তাঁহার পূর্বোপার্জিত অনত্ত নৈসর্গিক সম্পত্তি।"

রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের মানবপ্রীতিকে পাশ্চাত্য দেশানুরাগের সমতুল এত জরে দেখেন নি। "বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ রাষ্ট্রিসাম্যের, ধর্মসাম্যের, অর্থসাম্যের বা সমাজসাম্যের অপেক্ষা করিত না।...কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে—একান্তের সমাধানের সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না।" "অন্যকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া ওঠে, কোনরূপ ক্রটি-শোধ দেবার বা কর্তব্য নির্ণয়ের সময়ের প্রয়োজনমাত্র উপস্থিত হয় না"—বিদ্যাসাগরের ছিল সেই স্নেহ। বিদ্যাসাগর তাই বলিতেন—অভিধান করার চোখের জল। "রামায়ণ ও ইতিহাসের অন্তরের একটা অপরূপ জনকসমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে। কোনো একটা কিছু ছল পাইলেই আমরা কবির পূর্ণিমা তাসাইয়া দেখেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের অশ্রুসম্বরণ বলা প্রবাহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই অস্ত্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রভাব। প্রতাঁচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ।...ভাগীরথী কলার পুণ্য ধারায় যে-ভূমি দুধে ধানে শস্যশ্রিয় সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, হিমালয়ী কলার পুণ্যের অনুস্রোতবাহ সহস্র ধমনীর ধমিয়া যে-জাতিকে সসাগর-তাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির অন্ন ও সেই জাতির মতো বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সম্ভব ও স্বাভাবিক।"

রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার করি। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের পূর্ণ আর কিছু সম্ভব কি না জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। বিদ্যাসাগর অসাধারণ—সর্ববিষয়ে তিনি আমাদের থেকে মহান—তাঁর কাছে দাঁড়াবার যোগ্য আমরা নই—তিনি অনুকরণীয় অত্যাশ্চর্য ব্যাপার—তিনি কেবল আমাদের বিস্ময়ের, আমরা দু হাত বাড়িয়ে নিয়েছি, তারপরে কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছি—এমন চরিত্র কি কারুর এবং তাদবাসার মানুষ হতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তাহলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেতেন"—বিদ্যাসাগর অবতার হন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কন্যায় বিদ্যাসাগর দুর্গম ঐশ্বরিক প্রকাশের নিত্রে বিরাজমান, সেখানে সাধারণের পক্ষে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এমন চরিত্রকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় রামেন্দ্রসুন্দরের বেশনে বিদ্যাসাগরের প্রতি রোমান্টিক প্রেমের প্রকাশ দেখেছেন, সেখানে অনেক মৌলিক ভেদ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-প্রশস্তির-ভেদেও, তার মধ্যে প্রাচীন কবির প্রেমা এক ইংরেজের সাহেবের সঙ্গে বাঙালী মায়ের প্রেমের কথা ছিল। তবু এই মধুর কবিতার মধ্যে একটা বিষাদ ছিল না, রোমেন্দ্রের উচ্চারণে বিদ্যাসাগর-চরিতকথকের অভাব নয়। রোমেন্দ্র লিখেছিলেন।

"আজিকে দেখো সবার আগে দুঃখ সুখেতরা,
বিদায় সাদর ধরণি, জনের বিদায়।
অনেক সাহিত্যরত্ন নিকট সমাপনী,
বীণা-পাশে অন্তিমের স্নেহে আসবাণী।

উপমায় গ্রামের শিবা, রাত্রে শাশ্বাড়,
ছাওয়াল বিধবা-বৌ জমায়েত বাড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরদুঃখ, ধর্মাকর্ম ধ্যানে,
স্বাতন্ত্র্যে সে-কুলকাঠা—পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির বিয়ে তাহা সংস্কৃত ডিগ্রি,
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিশ্‌ড্‌।

না, এর কিছুতেও সেই জিনিসটি নেই, যা বিদ্যাসাগরের মধ্যে সত্যই ছিল, যা একেবারে আমাদের কাছে তাঁকে হাজির করে দিতে পারত—বিদ্যাসাগরের হাসি। বিদ্যাসাগর সজনে কহেন, জনমে কহেন, হাসেন না? বিদ্যাসাগরের আর সমস্ত বীরত্ব দেখব কিন্তু হাসির বীরত্ব দেখব না—যা তাঁর করুণার অশ্রুকণার মধ্যে আলোক-সম্পাত করে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং বাকি সকলকে আনন্দে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য নিয়ে রাজনীতির চর্চা করতে আমাদের লেখকদের শক্তি-ক্ষয় হয়ে গেছে, কিন্তু সকল শক্তির অতীত উর্ধে যেখানে, সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গভঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখের বিষয় হয় নি কেন? একেতে একমাত্র সুরসিক রাজশেখর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যাঁর লেখার সহজ সরল অথচ গভীর মানুষটি খুঁজে পাই। বিদ্যাসাগরের জীবনীগুলিতে তাঁর পরিহাসপ্রবীণের কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাঁর জীবনের এই হাসির অবদান কি ছিল, তার কোনো পরিচয় সে সকল স্থানে পাই না। তাঁর ফলে একটা ভুল—তাতে পৃথিবীর দুঃখ কেমন এমনই আঘাত করত যে, তিনি তেতে চুরমার হয়ে যেতেন, আর-যা হাসির স্নেহ ছড়িয়ে বিদ্রূপে ধারণায় করে রাজত্বের নিজেকে এবং বিদ্যাসাগরের হাসি মুখেই স্নেহময় নয়, তা স্নেহের মাণিকজুড়িকাও হয়েছে কখনো কখনো।

সে প্রসঙ্গে পরে আসব, এখন আবার অভিযোগ উপস্থিত করছি বিদ্যাসাগরের তথা জীবনীকার ও চরিতাখ্যায়কদের বিরুদ্ধে, তাঁদের চিত্রকরদের বিরুদ্ধেও। একেবারে শেষ বয়সের রেখাঙ্কিত কঠোর একটি মুখকে চিত্র তাঁদের অঙ্কন করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কি চমৎকার মানুষ তিনি। তাঁর যৌবনের ছবিতে তার প্রমাণ রয়েছে। মনের সেই নবীনতা তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তখন, যেখেতুন শহরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যভূমিতে যে মন কেবলই পড়ছে, চলে যেতেন কার্লাইলের সাঁওতালদের মতো, যারা মানুষ হয়েও সরল, অথচ সামান্য স্নেহেই খুশি, এবং কপটতা অপরিজ্ঞাত নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইংলণ্ডের তাঁর জনসনের বিস্তারিত তুলনা করেছেন। সে কাজ অল্পাধিক পরিমাণে করেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যদুনাথ সরকার প্রমুখ। কৃষ্ণকমল প্রধানত তাঁদের ব্যবহারে উভয়ের সাদৃশ্যের কথাই বলেছেন। 'বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের পণ্ডিত, জনসন লাটিনের: তাঁদের লেখার ভাষা অতীব সাদু কিন্তু কথাবার্তার সময়ে তাঁরা চলিত ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যা-সাগর "লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি ছেলে ভুলান' পদ্য পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। 'কথামৃতের থাওয়া', 'বহরম বহরম', 'খাসিনাও', 'গিবগুটে', 'বাছুরা পওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সেদিকে যাইতেন না।"

যদুনাথ সরকারের মতে, "ইংলণ্ডের সাহিত্যে এবং সমাজের ইতিহাসে তাঁর স্থানের জনসনের যে স্থান, বাংলার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তাহাই।" দুজনেই কঠোর দারিদ্র্য থেকে উঠে প্রতিষ্ঠা ও ধনলাভ করেছিলেন; দুজনেই "মিতব্যয়ী, সরল, অনুকম্পায়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা ও কঠোর শ্রমী"; দুজনেই প্রাচীন সাহিত্যে গভীর পণ্ডিত এবং তাঁদের স্টাইল সমকালে অনুকৃত; দুজনেই চরিত্রের দৃষ্টান্ত "দেশের ভণ্ড স্বার্থপর মিথ্যাবাদী দুষ্ট নেতাদের নীরব তিরস্কার" করত; দুজনেই বন্ধুজনের কাছে বিদ্রূপের পাত্র ছিলেন। "জনসনের মৌখিকরস অনেক দিন পর্যন্ত জনসনকে চিত্তাকর্ষক হইতে সাহায্য করিত" বলিয়া মনে করিতেন, আর আমাদের তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজসভার শ্রেণিতে উঠে বেহালা হইতে পৃথক ভাবিতেন না।" ঐতিহাসিক যদুনাথ অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে জনসনের তুলনায় বড় বিবেচনা করেছেন। জনসন চিরজীবন সাহিত্যিক হয়েই কাটিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাসেবা বা সমাজ-সংস্কারক হন নি।

যদুনাথ সরকারের অনেক দিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বলে ফেলেছেন, "বাহিরের কাজে বিদ্যাসাগর জনসন অপেক্ষা অনেক বড়ো ছিলেন।" উভয়ের সাদৃশ্য, রবীন্দ্রনাথের মতে, "অন্তরের সরল প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে। জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জনসনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, স্বভাবে উদার্যে, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন।" রবীন্দ্র-নাথ লেদ্‌লি স্টীফেন্‌ এবং কার্লাইলের জনসন সম্বন্ধে কথা উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর ও জনসন-চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। সেইসঙ্গে খুবই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, "বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বে স্নেহ ছিল না। তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, তাহা সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।"

বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বে ছিল না, একথা সত্য। অবশ্য একথাও সত্য, বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে জীবনীর আলোয় ভাস্বর ছিলেন। বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন—এই দুই-জনেরই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কয়েকখানি দুঃখ জীবনী রচিত হয়েছিল, অন্য কারোর ক্ষেত্রে যেমন ঘটে নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বন্ধুত্বের মত নিরাসক্তি জীবনীকার বিদ্যাসাগর পান নি, যিনি তাঁকে প্রতিদিনের সান্নিধ্য-মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। অথচ তার ফলে কী ক্ষতি হত—রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছেন—সেই আশ্চর্য জীবন্ত মানুষটির দৈনন্দিন সান্নিধ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং ইঙ্গিত করেছেন, জনসনের মত বিদ্যাসাগর মানুষটিও 'অকালপাকে

আকাশচুম্বি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ভবনের ইন্দ্রিয় তালিকা নিয়ে যদি
প্রাণের প্রকাশ ভাষা অন্বেষ করিবে,
হৃদয়ের মূল বীজ খুঁজিছে স্থিরে—
তাদের দেখিতে চায় পরিচিত মন।

হেথায় চলমান শত বিশ্ব প্রাণ
লক্ষ-লক্ষ বর্ষ দেখি ইচ্ছার বর্ষিত
উচ্চতম বেদনার মহতী সমূহে
বিশ্বতীত প্রেত-মুখে সঞ্চারিত ধরি।

প্রভাতী সূর্যের রক্ত ভালো লাগে বড়;
তবু তাই সন্ধ্যালোকে মায়াবী কাজল।
মনের নিহিতী কেন? তার মাঝে সুর
প্রকাশিত প্রেমিকের বন্দিত চেতনা।

গভীর গতির রাজো—তারা, ফুল, ফল,
আলো, বস্তু, জল, মাটি—সবটুকু নিয়ে
চিত্তের সৌন্দর্যের চলোর্মি ছায়ায়
ভালো লাগা মনে আনে আকাশ চুম্বিত।

সেই রাত্রি, যার

অনিলকুমার ভৌমিক

অনেক রৌদ্র গায়ে
প্রখর দিনের
অনেক উত্তাপ ঘরে রেখে
এগিয়ে আসি আমরা
রাত্রির দিকে।

কিন্তু সমস্ত
যা প্রতিটি আছেই আমাদের
দয় বাহনীয়।
অন্ধকার শান্তি দেয়—
কিন্তু আকাশ সেই রাত্রি, যার
অন্ধকারে আলো।

ঘরে শুধু আলো নয়—
জানলা যা ধরণী খুলেছে
সেই আলো দেখতে চাই—
বাইরেও ভরসা।

সুরসিক ছিলেন—অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখায় সুরসিক বিদ্যাসাগরকে খুঁজে বার করার চেষ্টা নেই, অন্য অধিকাংশ লেখকের লেখাতেও নয়। তার ফলে বিদ্যাসাগরের জীবনী-গ্রন্থগুলিতে হাসির আলো পড়ে নি। বাঙালীদের জনক-জীবনীর মধ্যে জনকদের রসগ্রাহী মনের উজ্জ্বল ছবি পাঠার পৃষ্ঠায় থেকে সেই চরিত্রকে সর্বমানবের কাছে চলনীয় ও আদরণীয় করে তোলে। বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকদের থেকে যেখানে ঐ মহাপুরুষকে সদাগম্ভীর মূর্তিতে দাঁড় করানো হয়েছে, সেখানে রসগ্রাহীদের জনক সর্বস্তরের পাঠকেরা সহজে তাঁর পরিহাসপ্রিয়তার জন্য উচ্চ আসনে বসিয়ে উপভোগ করেন।

বিদ্যাসাগরের সুরসিক চিত্তখণ্ডের ভক্তিপরায়ণ বাঙালী লেখকদের একেবারে বিপরীতমুখে ধরা পড়ে বাংলাদেশের একমাত্র রসগ্রহণের লেখা পড়ার পরে। শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্র-নাথ গুপ্ত এখন আর কেবল বাঙালী পাঠকে নন, স্বামী নিখিলানন্দের ইংরেজি অনুবাদের ফলে তাঁর রামকৃষ্ণ কথামৃত এখন বিশ্বসাহিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম ছিলেন বলে অবতার মানুষের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে—পৃথিবীতে রামকৃষ্ণই একমাত্র দৃষ্টান্ত, যিনি ঘরওয়ালে পেয়েছেন। শ্রীম-রচিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকার-বিবরণের মতো বিদ্যাসাগরের সরস তীক্ষ্ণ বাক্যালাপের যে রূপ দেখেছি, তার থেকেই বুঝেছি, বিদ্যাসাগরের ঘরওয়ালে না থাকার আমরা অনেকখানি হারিয়েছি। অবশ্য একথা না বললেও চলে, রামকৃষ্ণ কথামৃতে রামকৃষ্ণই প্রথম চরিত্র এবং বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকার বিবরণ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সরকারের লেখা বিদ্যা-সাগরের দুই বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থেই রয়েছে। বিহারীলাল লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অতি সরল ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল।"

চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মমতপ্রাণ সাধুগণের সমাগমলাভে বড়ই সুখানুভব করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে এরূপ ধর্ম-নিরত সাধুগণের সঙ্গে মিলিত দেখিয়াছি।" বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রারম্ভিক কি কথাবার্তা হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার পরে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "এরূপ কথা কাটাকাটির পর পরস্পরের কথাবার্তা খুব জমিয়া গেল, আলাপও বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল। নিরক্ষর সত্ত্বেও সে আলাপে পরমতৃপ্তি অনুভব করিলেন।"

চণ্ডীচরণ ঐ আলাপের বিবরণ শুনেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন যিনি, এবার তাঁর রচনা থেকেই তখনকার বাংলা ও ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মানুষের সাক্ষাৎ-বিবরণ দেখে নেওয়া যাক। ঐ মানুষ দুজন সেরা রসিকও ছিলেন।

[ক্রমশ]

বন্দে সদা কালিকাম্

শ্রীবিশ্বনাথ সেন

স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—

শুক জানে যে কালী কেমন,
ও যার মহিমারে না পায় তল।

সত্যিকথা, শাস্ত্র পড়া বা বিচারের দ্বারা, তীক্ষ্ণ মেধা বা গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা কেউ সহজে ঠাকুরের মনে ঠাঁই পায় না, কেন না, সহজ ও সরল হওয়া সাধনা বা উপাসনার বস্তু। মুখে মুখে তিনিও সহজ বা নিরক্ষরদের কাছে অনেকটা বিচারে আবিষ্কৃতা হয়েছেন, কিন্তু এই মহালক্ষ্মির স্বরূপে আমাদের কাছে চিরকালই দুর্জ্ঞেয় ও দুর্নিরীক্ষ্যা। তবুও এই বাঙালী এই মহাশক্তির আরাধনা করেছে কখনো সখ্যভাবে, কখনো বাৎসল্যরসের মাধুরীতে, কখনো একান্তনির্ভরশীলা কন্যারূপী লক্ষ্মীরূপে, কখনো পত্নী ও জননী বিশ্বের অধীশ্বরী রাণীরূপে, আবার কখনো বা অন্নদাত্রী ভীমা কালিকারূপে। কিন্তু শাক্ত সাধনার চরমতম আদর্শের পূজা আর কোথাও হয়নি, কালরাত্রির পূজা আর কোথাও হয়নি, আবার অন্নদাত্রীর পূজা আর কোথাও এমন করে আত্মহারা হয়ে ও ধন্য হয়ে নিজ ও জগৎ হিতে এমন বিশ্বরূপে প্রকাশ পায়নি। বিশ্বের আদি এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী পুরাণ, স্কান্দিকা পুরাণ ও লিঙ্গ পুরাণে শ্রীশ্রীকালীর যে বিরাট রূপ পরিকল্পিত হয়েছে তারও মূলে রয়েছে সমস্তজগৎ ব্যাপ্তকারী বিরাজতা। কবিতার অন্ধকারের বিশ্বতোধারী অন্ধকারে চরাচর নিখিলের বাঙালী যে মহাকালীর উপাসনা করে, তিনি হচ্ছেন কালিকাকালী। এই নিত্য মহাকালের বাঙালী তার গৃহ লীলাভূমির সন্নিহিত করে, কিন্তু চরাচর নিখিলের এই লীলাভূমির কথনি না বিস্মৃতিতে হয়ে যায়। এই যে মহাকালী প্রজ্ঞাপারমিতা উপাসনা, এর তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে চাই বিশ্ব চেতনা, বিশ্ব দৃষ্টি। কিন্তু সাধকের আত্মকেন্দ্রিকতার যে দেবী কালিকার দৃষ্টি উন্মীলিত হয়েছে, সেই দৃষ্টির অন্তর্নিহিতে তাকেও যদি আমরা প্রকাশিত করতে চেষ্টা করি, তা হলেও আমরা পরম কল্যাণ লাভ করব।

শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় আমরা যে দেবীর ধ্যান করি, তিনি করালবদনা, মুক্তকেশী, দক্ষিণা, দক্ষিণাভিমুখিতা, শ্মশানালয়া, শবাসনা, বিকচাক্ষী, পক্ষদংষ্ট্রিকাচিতা, ঘোরনাদা, রয়াবোষ্ট্রী, শবানাকরকাঞ্চিনী, চিতোদ্যা, শবরূপী মহাদেবের বক্ষোপরি সন্নিবিষ্টা ও তাঁকে শবরূপী শিবাসনস্থের দ্বারা পরিবেষ্টিতা। তিনি চতুর্ভুজা ও তাঁর দক্ষিণের দুইহাত হচ্ছে বর্দ্ধ। তিনি সোজা ও রুদ্রা, তাঁকিনী হয়েও তিনি অভয়কে দান ও অভয় দান করে থাকেন।

যা আমার মনে মনে আসরে পাঁচকে বিশেষ করে দেবী শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাকালী জননী অন্নদাত্রী, তাই তিনি করালবদনা, মুক্তকেশীবিকৃতিতা, দুর্বিগতচিত্তা। আকাশে এই ভয়ের বিরাটকে ধ্যান করে, এই আকাশকে তিনি অভয় অন্নের দান করেন, তিনিই হচ্ছেন এই ভোরবেলা আরোগ্যী জননী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—কালের কাল আকাশ যে কাল মায়ের শ্মশান। এই কালিকাদেবীর কোনো বসন নেই, তাই তিনি মুক্তকেশী ও দিগম্বরী। এ সংসারে এমন কে আছেন, যিনি এই বিশ্ববাসিনী মহাশক্তির আবরণ করা করতে পারেন? কালিকাদেবী দক্ষিণা, তাঁর বঁদিক করে বর ও অভয়, বাম করে খেটিকের খড়্গ ও ছিন্নমুণ্ড। তিনি শ্যামাঙ্গিনী ভোরে ভীষণা, কিন্তু ভক্তের নিকট অতীব প্রসাদিনী। তিনি চিরন্তনা, নিত্যা, সত্যা ও আদ্যা হয়েও তাঁর বিরতি নেই। সাধকের দৃষ্টিতে তিনি কোথাও কৃষ্ণবর্ণা, কালো, কৃষ্ণ বলেই সকল বর্ণ লয় পেয়ে যায়, আবার কোথাও বা তিনি শ্যামা, তাঁর এই বিশ্ব শ্যাম কান্তির সমুদ্রের নীল-জল একেবারে তরল করে দেয়। তিনি কালরাত্রিরূপিণী,—কালের সংজ্ঞা করতে যা পারে, তারও কালরূপ তিনি। এখানে বিস্তৃতি না করে তিনি সাধকের হৃদয়ে রেখে যাচ্ছি না। তাই অনেক বিশ্লেষণ লিখেছেন—

মূর্খ লোক দেখে সাধ্য মম, হাস্য করয়ে
সকলে তাহারে শ্যামা।

চন্দ্রীদাস গেয়েছেন, তোমার সকলের চন্দ্রিমের শীতল ও তোমার চরণের ছোঁয়ায় কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের ধারণা দেবে এই পদাবলীগুলির চরমতম করেন। তারপর থেকে বাঙালী বর্ষে বর্ষে সাধনায়ের ধারা অনুসরণ করে আসছে। আমরা বাংলার সাধনার কৃষ্টি চরম সার্থক লক্ষ্য করে থাকি,—তাঁর দৈনন্দিন ছোট-খাটো ও আর সাধকদের শক্তি-সাধনা। মুসলমান-বিজয়ী, বাংলাবিজয়ী, গৌড়ীয়দের অনুসরণকারী আজ বাঙালীর গ্রামের দেবতা, আবার তাঁরই, চলাচলকারী আন্তর্দেবীও বাঙালীর ঘরের উপাস্য অন্নদাত্রী। ঈশানচন্দ্র ও অন্যান্য পাঞ্জিকাকারেরা কৃষ্টিতে কিন্তু নাম ও ধাম দিচ্ছেন।

এই যে শক্তি সাধনা, এর লক্ষ্য কি? লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের ভয়ে যে মহাশক্তি অন্নদাত্রী হয়ে তার ঔদার্য ভরে পরিচয়ের এই নাম দুর্গতিনাশিনী। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—যেকো ভূয়া যেন মহৎ অন্নদাত্রী হয়ে দেবতার উপাসনা করতে হবে। দেবতা না হলে, দেহ ও মনের দিব্য ঐশ্বর্যের না ফুটতে পারলে দেবতার স্বরূপ আমাদের অধিকার জন্মে না। আমাদের দৈহিক সুস্থতার পূর্ণে সাধককে হতে হয় মনঃশক্তির অধিকারী। কিভাবে সাধক মহাশক্তির সুস্থতার অধিকার লাভ করতে পারেন, তন্ত্রশাস্ত্রে সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। তুরন্তবিধি, অন্তর্মুখি, প্রাণ, চৈতন্যের ক্রম লাভ করেন।

তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকেই অন্তরের বাণী শুনিয়েছে। অহিংসা নিখিলের প্রত্যেক মানুষেরই তাদের সাধনার অধিকার আছে। তবে বলেছেন—যিনি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যী হন বা ব্রহ্মচর্যী হন, তাঁদের সংসার ধর্মের কোনো বন্ধন নেই। তন্ত্রশাস্ত্র ব্রহ্মচর্যী, ব্রহ্মচর্যী ও গৃহস্থী যোগের সমন্বয়ের সাধনার, বীরাচার ও দিব্য ভাবের সাধনার বিধান দিয়েছেন। ঈশানচন্দ্র, অন্নদাচারে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্য ভাবেরই সাধক। বলা বেশ বহু, বীরাচারী সাধকেও আবির্ভাব হয়েছে।

আমাদের এই বাংলা দেশ শাক্তসাধনার পীঠস্থান হলেও শাক্ত সাধকদের মধ্যে ঈশানচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি মহা বামাক্ষেপা-রামপ্রসাদ আগমনী ও বিজয়ার গানেই ভরপুর করে দিয়ে, কালী তাত্ত্বিক-দেবী তাঁর কাছে স্নেহময়ী, অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী, মমতাময়ী জননীরূপে আবির্ভূতা

ছড়েছেন। রামপ্রসাদ কখনো তাঁর কন্যা আবার ও সাঁতমান করেছেন, কখনো তাঁকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেছেন, কখনো বা তাঁর প্রতি চরম সত্য প্রকাশ করে পরমেশ্বরকে অতিক্রম করেছেন। রামপ্রসাদের কিছই না ইচ্ছামরী, লীলাময়ী, অনুযায়ী, ছলনাময়ী, বিশ্বজননী, কালভয়হারিণী। এমনি ভাব আশ্রয় করে কখনো রামপ্রসাদ গাইছেন—

শুন ঝেয়ের ভাবিস এত,
ও মন, মানুষটা যাদের মত,
ওরা হবে ছেলে ভয়,
এ যে বড় অদ্ভুত,
ওরে তুই ভাবিস কালের ভয়
হবে ভবানী-সুত।'

আবার কখনো বা গাইছেন—

দুর্গা দুর্গা বা শাইলে—
হবে হবে বা দুখের আঁটা,
ওরে আমি ভবভয়ের ভীতা,
এলাম বা তোর ভবাভারে
আমায় মতন নেয়ে কটা,
আমি ভবের ঘর হতে পারি
চরণে ভবভয়হরীর ছটা।'

কখনো বা তাঁর গানে ভক্তের দৌরাত্ম্যের প্রকাশ ঘটেছে—

অসময়ে আমায় মধ্যে
করলি আমায় দোষারোপী,
শামি তবু, কালী বলে ডাকি
সাধাস আমার বুকের পাটা।'

কখনো বা অভিমানভরে মাকে ভর্ৎসনা করছেন—

মা মা বলে আর ডাকবো না,
তারা দিয়েছিস্ বিয়েছিস্ কতই যন্ত্রণা,
যারে যারে ডাকি মা মা বলিয়ে
মা হয়ি হয়েছিস চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
আর বিলম্বানে এ দুখ সন্তানে
মা হয়ে তাহার কি ফল বল না।'

পরবর্তীকালে বঙ্গোপাধ্যায়, দোজিন্দ চৌধুরী, রাজা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ শক্তিসাধকদের গানে গভীর অন্তরতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু রামপ্রসাদের গানের মতো আন্তরিকতার সুর নেই।

'দেশ মাতৃকা' মনের ভাব বঙ্কিম. চন্দ্রের কাছে শ্রীকালীমূর্তির এক নতুন তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। সন্তান ধর্ম বঙ্কিমের সত্যানন্দ অনুযায়ী, কালী ও দুর্গার মূর্তির মধ্যে দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর চোখে কালী হয়েছেন সেই সর্বাঙ্গীন কল্যাণময়ী প্রতীক যিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা, পীড়িতা, রক্তপ্লাবনে সন্তানদলকে রক্ষা করতে এবং দেশের ছেলে সর্বাঙ্গীন-কল্যাণের চেষ্টা অনুভবের ভীষণরূপে বিরাজিতা। মাতৃকল্প সন্তান করেন—

কালী—করুণার-সমাধ্যা কালিমাময়ী।
দুঃসময়ে—এই তব সাধনা। আর যেন সর্বদাই স্মরণ—তাই মা কঙ্কালমালিনী।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'Kali the Mother' কবিতায় প্রলয়ঙ্করী কালীর মূর্তির একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর অতোলনাথ 'দুঃখরূপা মাতা' নামে কবিতাটির যে অনুবাদ করেছেন, তা অনুবাদ বলেই মনে হয় না। কবিতাটির শেষ দুটি পঙ্ক্তি হচ্ছে—

'সাহসে যে দুঃখ-চৈকে চলে,
দুঃখের যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যাঁরা বীর সাধক, দুঃখ-বৈভবে যাঁরা হাসি মুখে বরণ করতে পারেন, মৃত্যুকে যাঁরা অভিঙ্গন করতে পারেন, প্রলয়ঙ্করী কালীর কালনৃত্যে যাঁরা উপভোগ করতে পারেন, মৃত্যুরূপা তাঁদের নিকটেই মাতৃরূপে আবির্ভূতা হন। সাধকের চোখে তিনি তো কালভয়হারিণী। তাঁর কাছে মৃত্যুর কোনো বিভীষিকা নেই। তিনি বলেন—

সে যে মাতৃ-পাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লয় যেবে টানি।'

সাধক দোজিন্দ চৌধুরী বলেছেন—

'আমি চেয়েছি যে তাই সেই আকুল-কাননে,
তবে মনোহরার দেহকে যায়
শ্মশান জলে তার পায় মরে,
তুলসী বোলা আজকে ছুতে
ছিনাইয়ে শূন্যদিন,
ও রে ভীষণকাল আজকে আমার
মহাকালে হবে লীন,
আমার জন্ম যাবে সেই জলাধারে
শেষ যাবে সেই কৈবল্যরে
ও রে ভয়ঙ্কর মাতৃ আমার
ছিনিয়ে আ সমীপে।'

নবীনচন্দ্র ছাড়া সমাজের স্রষ্টা, অসাধারণ স্বাধীন কেশবচন্দ্র স্বয়ং নিরাকার ব্রহ্মবাদী হয়েও কালীমূর্তি ও কালীপূজাকে যে তাৎপর্য নিয়েছেন করেছেন, তা যে গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির ফল, তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Mother গ্রন্থে শ্রীকালীমূর্তির মধ্যে আকালী, মহাকালী ও মহাসরস্বতীর ভাব-মূর্তির ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। বহু শ্যামাসঙ্গীতের রচয়িতা বিজয়চন্দ্র তাঁর নজরুল ইসলামও তাঁর 'মেঘমল্লার' নামক গ্রন্থে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।

আধুনিক যুগে দেশমাতৃকার বন্দনাগানের কবিদের বিশ্লেষণে শ্রীকালীমূর্তির ধ্যান করে তাঁর শক্তির বিভূতির সন্ধানের ও আত্মত্যাগের প্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁদের কাছে শক্তিপূজার অর্থই ছিল, আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা ও স্বরাজের সন্ধানে নিয়োগ করা। তাঁরা চাইলেন দেহে অসীমিত বল, মনে দুর্জয় শক্তি, সর্বোপরি আত্মিক শক্তি যা মানুষকে মৃত্যুভয় জয় করতে শিক্ষা দেয়। প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবেই তাঁরা শক্তিসাধনার প্রেরণা লাভ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে তাঁরা নিজে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, দেশের জন্যে আত্মত্যাগের চাইতেও দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি অনেক বড়,—এবারী চৌধুরানী ও 'সীতারাম' নামক উপন্যাসের এবং 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ 'ধর্মতত্ত্ব' থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন অনুশীলনের আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি—'What I want are muscles of iron and nerves of steel', আমি চাই লৌহনির্মিত মাংসপেশী ও ইস্পাত-নির্মিত স্নায়ু—তাঁদের লাঠিখেলা ও অন্যান্য ব্যায়ামচর্চার প্রেরণা জোগাত। স্বামীজীর আর একটি উক্তি—'টাকায় কিছু হয় না, মানুষেও কিছু হয় না, একমাত্র চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্র-কঠিন প্রাচীরকে বিদীর্ণ করতে পারে—তাঁদের মনে চরিত্র গঠন ও মনুষ্যত্ব লাভের প্রেরণা জোগাত।

আজ এই বিপর্যয়, প্রমত্ততা ও আত্মঘাতী তরঙ্গের মুখে, আমাদের বাঁচতে হবে এবং বিশ্বের সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে হবে, তবে আমাদের তরুণদের নতুন করে শক্তি-সাধনায় দীক্ষিত হতে হবে। সর্বপ্রকার অসৎ শক্তির বিরুদ্ধে দেশের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সকল মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। চাই দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, আত্মিক শক্তি। শক্তিসাধনায় দীক্ষিত স্বামীজী বিশ্বাস করতেন—বলিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, মেধাবী, বীর্যবান, শক্তিমান একজন মানুষ জগতে মহা পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে। তাঁর সেই বাণীকে সার্থক করার জন্যেই দেশের তরুণ-দের প্রস্তুত করতে হবে। দৈহিক শক্তির জন্যে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে—

'ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।'
ওঁ বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
'ওঁ ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
'ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
ওঁ সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।'

হে তেজঃস্বরূপ, তুমি আমায় তেজস্বী কর, হে বীর্যস্বরূপ, তুমি আমায় বীর্যবান কর, হে বলস্বরূপ, তুমি আমায় বল প্রদান কর, হে ওজঃস্বরূপ, তুমি আমায় ওজঃ প্রদান কর, হে মন্যুস্বরূপ, তুমি আমায় মন্যুসম্পন্ন কর, হে সহস্বরূপ, তুমি আমায় সহিষ্ণুতা দাও।

॥ ১ ॥

প্রথমেই বলে রাখা দরকার দীপালি-উৎসব এবং কালীপূজা, এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ঐতিহ্য এবং উদ্ভবের সংস্কৃতি ঘটেছে খুব বেশি দিন নয়। দীপালি-উৎসবের বিনে কালীপূজার কথা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে রচিত কালীনাথের কালীসর্বস্বাবিধি নামক গ্রন্থে। বাংলা দেশে উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যে কালীপূজা জনপ্রিয়তা পেয়েছে খুব বেশি দিন নয়, দু আড়াই বছর আগে থেকে এবং বাংলার বাইরে কালীপূজার কোন অস্তিত্বই কোনদিন ছিল না, এখন যে সব নিদর্শন দেখা যায় সেগুলি বাঙালী-প্রভাবের ফল। দেবী কালীর কল্পনা খুব প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও, এই দেবীর জাতে উঠতে, অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর মানুষের দ্বারা গৃহীত হতে অনেক সময় লেগেছে। এর কারণ কি? শুধু কালীই নয়, বাংলাদেশের ধর্মক্ষেত্রে আজকের যে দেবীআধানা, দুর্গা ইত্যাদি দেবীর যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা, তারও বিকাশ ঘটেছে সপ্তদশ শতকের আগে নয়। অথচ এ সব দেবীও কেম প্রাচীন। তাহলে অনুমান করা চলে যে, একদা এই সকল দেবীর ব্যাপক পূজার প্রচলন ছিল, তারপর যে কোন কারণেই হোক তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আবার সেগুলির নতুন রূপে পুনরুত্থান ঘটেছে, দুর্গাপূজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাচগোসব, কালীপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীপালি-উৎসব।

পূর্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (সাপ্তাহিক বসুমতী, ৭৩ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা) আমি এই প্রশ্নটির জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলাম যে, দেবীপূজোর পূর্ণ বিকাশ মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছাড়া ঘটতে পারে না। পিতৃপ্রধান সমাজে, যেখানে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তা পুরুষ, সেখানে দেবীদের পরিবর্তে দেবতা-দেরই প্রাধান্য হবে এটাই স্বাভাবিক, এবং সর্বোচ্চ দেবতা হবে পুরুষ। এর বিপরীতটা ঘটতে পারে একমাত্র মাতৃপ্রধান সমাজে। মানব ইতিহাসের অবিস্মরণীয় সমাজে মাতৃপ্রাধান্যই ধরতমান ছিল, কেন না পিতৃত্বের প্রশ্নটি তখন ছিল অবান্তর, বর্তমান অর্থের বিবাহ-প্রথা তখন গড়ে ওঠে নি এবং কোন-মিথুনের সঙ্গে গর্ভাধানের সম্পর্কটাও আবিষ্কৃত হয় নি। সৃষ্টিতত্ত্বে যার ভূমিকার কোন সন্দেহ ছিল না সে হচ্ছে মা। কাজেই আদিম দেবী কল্পিতা হতেন আদি মাতারই অনুসরণে, যে মায়ের পরিচর্যায় ও স্নেহে আদিম মানুষ জন্ম থেকে সাবালকত্ব লাভ করত। যে সকল প্রাচীন মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে ভল নদীর তীরে, হিসেনলোক ও মেসপটে অঞ্চলে, সবগুলি দেখি সেই মূর্তিগুলি আদি মাতৃত্বেরই প্রতিমূর্তি, নিরাবরণ স্তন, যেখানে মাতৃত্বসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত পরিস্ফুট। জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা যখন থেকে স্বীকৃত হতে শুরু করেছে, আদিম মাতৃদেবীর পাশাপাশি পুরুষ দেবতা গড়ে উঠেছে। সমাজ যত মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের অভিমুখী হয়েছে, ধর্মক্ষেত্রে দেবী-প্রাধান্যের স্থলে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বৈদিক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রাচীন ধর্মে আমরা যা দেখি পৃথিবীর সর্বত্র।

তবে বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাতৃ-পূজার অনুষ্ঠান একেবারে লুপ্ত হয়ে গেলেও একেবারে লুপ্ত নয়, সমাজ পিতৃপ্রধান হয়ে উঠলেও প্রাচীন মাতৃ-প্রাধান্যের স্মারকগুলি লুপ্ত হয় নি, সেগুলি রক্ষিত হয়েছে মাতৃকেন্দ্রিক বাসস্থানে, মাতৃকেন্দ্রিত উত্তরাধিকার ব্যবস্থায়, মাতৃকেন্দ্রিক বিবাহ প্রথায় ও আরও বহু সামাজিক আচার-আচরণে। এর একটা কারণ হচ্ছে, কৃষিকাজে মেয়ে-দের আবিষ্কার এবং বহুক্ষেত্রে মেয়েদের নিজস্ব ব্যাপার হওয়ার ফলে আদিম উৎপাদনব্যবস্থায় মেয়েদের একটি শক্তিশালী ভূমিকা গড়ে উঠেছিল। কৃষি-কার্য সুরুহবার হতে ফসলের পূর্বে পর্যন্ত, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গল ও পশুর ব্যবহারের পূর্বে পর্যন্ত এই ভূমিকা অব্যাহত ছিল, অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা দীর্ঘ-স্থায়ী হয়েছিল। আরও সহজ করে বলতে গেলে যেখানে বিবর্তনটা সোজা-সুজি শস্যসংগ্রহ থেকে উন্নত কৃষিতে ঘটেছে, সেখানে পিতৃতন্ত্রের বিকাশ খুব দ্রুত ঘটেছে এবং আদিম মাতৃকাপূজার দ্রুত অবসানও তার ফলে হয়েছে। পক্ষান্তরে যেখানে বিবর্তনটা নিম্ন কৃষি থেকে উন্নত কৃষিতে হয়েছে সেখানে সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্যের হ্রাস হতে অনেক বেশি সময় লেগেছে। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার হবার ফলে কৃষির সঙ্গে দেবীর যোগ অঙ্গাঙ্গী হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যে কোন দেবীই, যে কোন দেশে, মূলত শস্যের দেবী। দেবী দুর্গা আসলে ফসলেরই দেবী, যাঁর আসল পূজা নবান্নপার্বণের পূজা, যা আমি অন্যত্র দেখিয়েছি। লক্ষ্মীর সঙ্গে ধনের সম্পর্ক তো সুস্পষ্ট। অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রেও

হয়। গ্রীক ডিমিটার সমধর্মী, তাঁর কন্যা পার্সিফোনিও তাই। লিনুসের ডাইসস, ব্যাক্সিসের ইস্তারও তাই। লক্ষ্মীর আর এক নাম শ্রী. ডিমিটারের লাটিন নাম সেরেস, আর এই সেরেস থেকেই ইংরাজী সেরিয়েল কথাটির উদ্ভব হয়েছে, যার অর্থ শস্য।

সুতরাং কৃষিজীবী মানুষের কাছে দেবীর কদর থাকবে এটাই স্বাভাবিক, এবং বস্তুত তা বরাবরই ছিল এবং এখনও বহু স্থানে আছে, শুধু বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর বহু স্থানে। প্রেমার, ডিকট প্রভৃতির রচনা থেকে জানা যায় যে, আরব ইউরোপের প্রত্যন্তদেশে কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে দেবীপূজার প্রাবল্য বর্তমান। বাংলা দেশের গার্হস্থ্যজীবনে যে দেবী-প্রবণতা এমন কি গ্রামে গ্রামে একাধিক কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু যেহেতু এ দেশে কৃষিজীবীরা বরাবরই নিম্নবর্গের লোক হিসাবে বিবেচিত, তাদের পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান অভিজাত ও উচ্চবর্ণের মানুষদের মতো স্থান পায় নি, লাভজনক-সমূহেও এইগুলির পর্যাপ্ত প্রতিফলন নেই। অবশ্যই পরিবর্তন ঘটে সপ্তদশ শতকের কাছাকাছি সময় থেকে, যে কোন কারণেই হোক, উচ্চবর্ণের মানুষেরা দেবীপূজাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই কারণটি আমরা অবশ্যই খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। কিন্তু যারা দেবীপূজাকে গ্রহণ করলেন, দেবীকে তারা সেই সহজ গ্রামরূপেই গ্রহণ করে নি, তাঁদের তারা নিজ সমাজের উপযোগী করে নিয়েছে, গার্হস্থ্যের পবিত্রতা আকাঙ্ক্ষাহীন শুম্ভ-নিশুম্ভের বদলে জীবনময় ও আত্মস্বরূপে পূজাপদ্ধতির সৃষ্টি করে নিয়েছে।

বর্তমান রচনায় কালীই আলোচ্য। এই দেবীর চেহারাতেই তাঁর আদল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। আমাদের নিশ্চয়ই এই দেবী কোন কৃষ্ণকায় নগ্ন কবাইলির উপাস্যা দেবী ছিলেন, কালক্রমে বহুজন অঙ্গীকৃত জীবনে যাঁরে যাঁরে গৃহীত হয়েছেন। মহাভারতে আমরা জয়দ্রথবিমোচনপর্বে দেবীর কালরূপ দেখি। হরিবংশ থেকে এই দেবীকে আমরা শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের উপাস্যা হিসাবে বর্ণিত হতে দেখি। কালক্রমে কালরাত্রী মুখ্য সমবায়ন কর্তৃক বলিসহকারে দেবীপূজার উদ্ভব পায়। তন্ত্রচূড়ামণির কালীমাধব নাটকে

অমাবস্যায় পূজিতা করালী দেবীর পরিচয় পাই। বরদাচার্য বিরচিত মৌদ্গল্য নামক কবির পঞ্চস্তুতিতে পর্ণশবরী দেবীর উল্লেখ আছে। পর্ণ-শবরেরা, অর্থাৎ পর্ণ পরিহিত শিকার-জীবী বন্য জনগোষ্ঠী ছাড়াও আমরা নগ্নশবর নামক আরও একশ্রেণীর জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাই, যারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে থাকত। নগ্না দেবী কালী কি আদিতে এদেরই উপাস্যা ছিলেন? দেবীর এক নাম শাবরী। বরাহ পুরাণে দেবীকে কিরাতিনী ও কিরাতী বলা হয়েছে। দেবী সম্পর্কে এই সব উল্লেখ উল্লেখ থেকে একটি প্রতীয়মান হয় যে, পশুপালক বৈদিক মানুষেরা এদেশে আসার পূর্ব থেকে, এমন কি তদপূর্ব-বর্তী কৃষিভিত্তিক হরপ্পা সংস্কৃতি উদ্ভবের পূর্ব থেকে, এদেশে যে অরণ্যচারী শিকারজীবী শবর-কিরাত-পুলিন্দ প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব ছিল, যাদের বংশধরেরা আজও বিভিন্ন উপজাতি-রূপে ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে, দেবী কালীর উদ্ভব হয়েছে তাদেরই মধ্য থেকে। এখন দেখতে হবে এই দেবীটি কখন এবং কিভাবে তাঁর কন্যা জীবন ত্যাগ করে এলেন, এবং কিভাবেই বা তিনি বৃহত্তর জনজীবনে গৃহীত হলেন।

বৈদিক সাহিত্যে কালীর কোন উল্লেখ নেই: বৈদিক যজ্ঞের শেষ পর্যায়ে রচিত একমাত্র মুণ্ডক-উপনিষদে আমরা কালী ও করালী নাম দুটি পাই, অগ্নির সপ্ত জিহ্বার দুটির নাম হিসাবে। বলা বাহুল্য, এই নাম দুটি কোন দেবীকে সূচিত করে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরণ্যক জাতি পূজিতা এই কৃষ্ণবর্ণা দেবীর তখনও পর্যন্ত সাধারণ্যে পরিচিত হবার কোন সুযোগই ঘটে নি। মহাভারতে আমরা কয়েকক্ষেত্রে কালীর উল্লেখ পাই। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা যখন গভীর রাত্রির সুযোগে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত যোদ্ধাদলকে হত্যা করেছিলেন, সেই স্থানে দেবী কালীকে দেখা যায়। কিন্তু পণ্ডিতেরা মহাভারতের এই অংশটি পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবে আমরা কালীকে দেখি একজন অহোরাত্র দেবীরূপে, যিনি মাতৃকাদের সঙ্গে শিবের বিবাহযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন। রঘুবংশে আমরা একস্থানে একটি উপমায় ঘোরা কালিকা দেবীটির উল্লেখ দেখি, যদিও টীকাকার মল্লিনাথ এখানে কালিকা শব্দটির অন্য অর্থ করেছেন। কালিদাস পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষভাবে কালীর উল্লেখ না থাকলেও, কয়েকটিস্থলে পূজিতা অন্ধকারের উল্লেখ আছে, যার কয়েকটি নিবর্তন পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিবৃত। তখনও পর্যন্ত এই দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব পঞ্চিলের প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে তিনি বীভৎসভাবে নরবলি গ্রহণের পূজিতা আরণ্যক দেবী।

কালী দেবীর স্বাতন্ত্র্যে আমরা দেখি বিভিন্ন পুরাণে। পুরাণগুলি কোন নির্দিষ্ট যুগকে প্রতিফলিত করে না। সেগুলি চতুর্থ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। পুরাণসমূহে কালীর স্বাতন্ত্র্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর জন্মের ও উদ্ভবের একটা সাস্তীয় ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় এবং তৎকালীন সুপ্রচলিতা দেবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়াসটিও মুখ্য হয়ে পড়ে। একেশ্বরবাদী শিষ্টতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবে প্রচীন দেবীদের ওপরে সূক্ষ্ম অনোর অস্তিত্বই ঘোষণা করে তাদের শিব বা বিষ্ণুর (যাঁরা নিজ নিজ ভক্তদের কাছে সর্বশক্তিমান একেশ্বর) পত্নীরূপে গণ্য করা হয় এবং এই দাবির পালন করার জন্য পুরাণকারদের অনেক কষ্টকল্পিত কাহিনীর উদ্ভাবন করতে হয়। দেবীর কৃষ্ণবর্ণ পুরাণকারদের বিশেষ বেগ দিয়েছিল। এক শ্রেণীর পুরাণের মতে (যেমন পদ্ম, স্কন্দ ইত্যাদি) দেবীর যে পুত্র তারকাসুরকে বধ করবে তাকে উৎপন্ন করার জন্য দেবীর কঠোর তপস্যার প্রয়োজন এবং সেইজন্যই দরকার তাঁর শিবের কাছ থেকে কিছুকাল দূরে থাকা। তাইতেই দেবী যখন চন্দ্রশেখরের সান্নিধ্যে বিবাহমান তখনই তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। শিবের সঙ্গে বিবাহের পর একদা শিব তাঁকে কৃষ্ণবর্ণা বলে পরিহাস করতে দেবী তখন শিবকে ত্যাগ করে নির্জন স্থানে গিয়ে বহুদিন তপস্যা করলেন এবং তার ফলে তাঁর গাত্রবর্ণের পরিবর্তন ঘটল এবং তাঁর দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ কোষসমূহ থেকে আর এক দেবী উদ্ভূত হলেন, যাঁর নাম কৌশিকী (কৌষিকী) বা একানংশা, এবং এই দেবীর অবস্থানের স্থান নির্দিষ্ট হল বিন্ধ্যপর্বত। কালিকাপুরাণে আবার অন্য আর এক ধরনের কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যেকোনো শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে দেবী পার্বতীর নিকট প্রার্থনা জানালে পার্বতীর দেহ থেকে কৌশিকী দেবী নির্গত হলেন। ইনিই দেবী চণ্ডিকা বা চণ্ডী। কৌশিকী দেবী নির্গত হয়ে যাবার পর পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন এবং কালিকা নামে বিখ্যাত হলেন। অন্যত্র

কাহিনী দেবী ভাগবতেও পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কিন্তু কালীর উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন কাহিনী দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চণ্ড-মুণ্ড বধের জন্য দেবী অম্বিকা দুর্গারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর ললাট থেকে করালবদনা কালী নিষ্ক্রান্ত হয়ে চণ্ড-মুণ্ডকে সংহার করেন। দেবী চণ্ডিকা তখন খুশি হয়ে চণ্ড-মুণ্ডের বধকারিণী হিসাবে তাঁকে চামুণ্ডা নামে নিলেন। অবশ্য কোন ব্যাখ্যানের নিরিখেই চণ্ড-মুণ্ড থেকে চামুণ্ডা হয় না। অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, চামুণ্ডা ছিলেন শবর দেবী এবং তাঁকে কালীর রূপে আত্মীকরণ করার উদ্দেশ্যেই চণ্ড-মুণ্ডের কাহিনীটিকে তৈরি করা হয়েছিল।

কালিকা পুরাণ, যার একমাত্র উদ্দেশ্য কালীর মাহাত্ম্যকীর্তন, অনেক পরবর্তী-কালের রচনা। যা রচিত হয়েছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এখানে বলা হয়েছে যে, দেবী কালীই দক্ষযজ্ঞে আত্মাহুতি করেছিলেন এবং ভগ্নোদ্যমের পরে হিমালয়-গৃহে তিনি কালীরূপেই জন্মগ্রহণ করেন। এরপর উক্ত পুরাণে কালীর মহাদেবকে পতি হিসাবে পাবার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কালিকা পুরাণের লেখক বিলকুল কুমার-সম্ভব থেকে উঠেছেন। এরপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে কালীর গৌরীত্ব-লাভের কাহিনী, যা পদ্ম, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণবর্ণিত কাহিনীর অনুরূপ। শেষ অঙ্কে দেখি শিব তাঁর মূল দৈহিকত্বে এক হয়ে গিয়ে অর্ধনারীশ্বররূপে বিরাজ করতে লাগলেন। যদি কালিকা পুরাণ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রচনা হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বঙ্গদেশে ও আসামে দেবী হিসাবে কালী পরিচিতা হয়েছেন। তবে তাঁর পূজা জনপ্রিয় হতে আরও কয়েক শত বছর সময় লেগেছিল, যে কথা আমরা বলেছি। বাংলাদেশে কালী-পূজাকে জনপ্রিয় করার জন্য যাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। আগে কৃষ্ণানন্দকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করা হত। অধুনা প্রমাণিত হয়েছে তিনি সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ ছিলেন।

ইতিহাস বলে যে, একাদশ শতকে বাংলাদেশে তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলে পালবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন এবং সেই সময়ে যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কি প্রকার বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে তখন বিরাজ করত? বৌদ্ধধর্মের নামে এখানে যা চলত তা নিছক ভণ্ডামি। তন্ত্রের আদি উৎপত্তি নিয়ে অনেক তর্ক বলার আছে, বারান্তরে সুযোগমত তার আলোচনা করা যাবে, কিন্তু মহাযান থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে ভণ্ডামির চলছে, তার মূলে আছে তন্ত্রের উদ্ভব ও উদ্ভব ভেদ সর্বাংশে বর্তমান। প্রাক্-শ্রেণী সমাজে যা ছিল জীবনসত্যের একটি মস্তবড় আবিষ্কার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা বিকৃতরূপে অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হল সে ইতিহাস বীভৎস চিত্তাকর্ষক। সে যাই হোক, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মহাযানী বৌদ্ধদের শাখা-প্রশাখাগুলির তন্ত্র সাধনা নতুন করে দেবীস্থান ধর্মব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করেছিল। বৌদ্ধ মহাযানেরী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী, কালদণ্ডী, হরসিদ্ধা, কালিকা, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীসহযে যে এখনকার স্থানীয় প্রাচীন দেবীদেরই নতুন সংস্করণ তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা বৌদ্ধ দেবী হচ্ছেন তারা বা উগ্রতারা বা একজটী। বৌদ্ধ তন্ত্রসহযে এরকম তারার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তারা দেবীর উদ্ভব মহাচীনের থেকে হয়েছে। এই মহাচীনের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে সংশয় আছে, কেউ কেউ বলেন যে, তা নেপাল-তিব্বত-ভূটান প্রভৃতি অঞ্চল, আবার কারো মতে তা আসল মহাচীনই। বাস্তবিকের অপর নাম চীনাচার। জ্ঞানার্ণব নীলবাহু দেখিয়েছেন যে, তন্ত্রের মূলে তাও-বাদের পর্যাপ্ত সম্পর্ক আছে। কঙ্কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপ, যথা ডাকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিনী, শাকিনী প্রভৃতির অনেকই সম্ভবত মহাচীন অঞ্চলের। এই সকল বিষয়ে প্রবেশ না করে, একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে, বিশেষ করে পূর্বভারতে, তারাতন্ত্রের অপরিসীম প্রভাব দেখা গিয়েছিল, যা কালী-পূজাকে জনপ্রিয় করার পিছনকার শক্তি হিসাবে নানাভাবে কাজ করেছে। এই বৌদ্ধ তারা দেবী পর্যন্ত কালীর মূলে প্রতিমা হিসাবে ঘোষিতা হয়েছেন, অসমদাবিদ্যার একজন দেবী হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

আগেই বলেছি, এ দেশে কালীপূজা জনপ্রিয় করার মূলে কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের অবদান সর্বাধিক। তাঁর রচিত তন্ত্রসার গ্রন্থটির অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক। তন্ত্রসার গ্রন্থে কালীপূজার বিধি ছাড়াও তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা ইত্যাদি মহা-বিদ্যাদেবীর সাধনাবিধি সন্নিবেশিত দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের কালীসাধক সম্প্রদায়ের মধ্যেও যাঁকে নিয়ে আলোচনা বিস্তর, এরকম চরিত্রটিও আছে। কালীর মূর্তি কি প্রকার হবে সে সম্পর্কে কৃষ্ণানন্দ নির্দেশ দিলে দেবী তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে জানান যে, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথমেই যাকে দেখবেন তাকেই তাঁর করে দেবীমূর্তি গড়তে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখলেন যে, তাঁর বাড়ির বেওয়ারিশে একজন মহিলা ঘুটে দিচ্ছে। তার হাতে গোবরের ডালা, তাঁকে দেখেই সে লজ্জায় জিভ কাটল। অতঃপর কালী দেবী এই ভঙ্গীতে মূর্তিমতী হলেন। কোন কোন স্থানে এই কাহিনীটি অবশ্য নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে চলে। প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণচন্দ্রই নাকি বঙ্গদেশে প্রথম কালী-পূজা করেন এবং বড় বড় প্রজাদেরও তা করতে বাধ্য করেন। সে যাই হোক, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে কালীর যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে তাই এখন সর্বজনভাবে বাংলাদেশে গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা (কারো মতে দ্বিভুজা একটিতে ছিন্ন শির, অন্যটিতে খড়্গ, বাম হাত দুটিতে বরদ ও অভয়দায়ী), দক্ষিণা, দিগম্বরী, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, শব-কর্ণা, শিবহৃদয়ী, মুক্তমালাবিভূষিতা, মুক্তিবরদাত্রী, ঘোরদংষ্ট্রা শ্মশানালয়-পরায়ণা, হিংস্রা, সর্বরক্ষী সংহারের উপর সংস্থিতা।

কৃষ্ণানন্দ ছাড়া অন্যান্য যে সকল সাধক কালীপূজাকে জনপ্রিয় করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য উদ্ধারণ-ঘোষ কৃষ্ণানন্দ, যাঁর রচিত শ্যামানন্দপ্রকাশিনী গ্রন্থে শ্যাম কালী-সাধকদের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এঁর অপর গ্রন্থের নাম তারারহস্য। কৃষ্ণানন্দের জন্মকাল

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কোন সময়। তাঁর নিজা পূর্ণানন্দ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক, যাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম শ্যামরহস্য। ষোড়শ শতকের সর্বশেষের কথার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, যিনি হিসপুরা জেলার মেয়র হাসেম আলম এবং যাঁর উপন্যাস দেবী মেহের-কালী অত্যন্ত বহুপঠিত। সপ্তদশ শতকের শঙ্কর আখনাচার্য তার-রহস্যসূচিতা নামক গ্রন্থ রচনা করে কালীভক্তকে জনপ্রিয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই শতকের ধারাতেই উত্তরসাধিকা রামপ্রসাদ সেন, কমলা-কান্ত, দেবীদাস চৌধুরী, রামকৃষ্ণ পরমহংস। প্রথমোক্ত তিনজন সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেবীকে জনপ্রিয় করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সুপ্রাচীন এই দেবীটির জনজীবনে অবতরণ ও প্রতিষ্ঠা পেতে সহস্রাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কালীর পৌরাণিক রূপের থেকে তান্ত্রিক রূপান্তর বিবর্তনের পথ অতিক্রান্ত হতে খুবই সুস্পষ্ট। প্রথম স্তরে পুরাকল্পগণ নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, কালী, চণ্ডবতী, উমা, দুর্গা, চণ্ডী ইত্যাদি অভিন্ন এবং দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় যে, কালীই মূল দেবী এবং অন্যান্য দেবীসহ কালী ক্রমেই উদ্ভূতা, তারই রূপান্তর মাত্র। তন্ত্রে সাধনার পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব গৃহীত হয়েছে এবং সেই অনুসরে কালী মূল প্রকৃতি হিসাবে পরিকল্পিতা হয়েছেন। সাধনপদ্ধতি অবশ্য প্রাচীন, যার ভিত্তি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে প্রকৃতিই সর্বেসর্বা, পুরুষ নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র, সে অক্রিয় সাক্ষীস্বরূপ, অলস ও উদাসীন। হিন্দুও এই একই কথা বলা হয়েছে, এখানেও প্রকৃতি বা শক্তিই আসল, শক্তিবিহীন শিব শব ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাই শিবের অচল স্থান মহাশ্মশান অধিষ্ঠান। নৌমর্ণলহরী গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে। শিব শক্তি যদি ভবতি শক্ত প্রভাবিতুং, ন চেন্নেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি। শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তবেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ, নচেৎ তিনি নড়াচড়া করতেও সমর্থ নন। শাক্তানন্দতরঙ্গিনী গ্রন্থে দেবীকে স্পষ্ট প্রকৃতিই বলা পুরুষের রূপে অভিন্না হিসাবে দেখা হয়েছে। স্বয়ং রুদ্রযামল তন্ত্রে স্পষ্টতঃ ঘোষিত, সাম্য-ধর্ম্মাত্মিকেতেবাম্বাক্ত প্রকৃতির বিদুঃ, সৈব সত্ত্বপ্রকৃতি সাধ্বী প্রধানা পুরুষোহিদি চ। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণের কথিত হয়েছে। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অব্যক্তপ্রকৃতি হিসাবে পরিচিত, যা মূলপ্রকৃতি, প্রধান ও সেই-সঙ্গে পুরুষও।

তন্ত্রবাদের উৎসের আলোচনায় কোন কোন স্থানে দেবী কি কি নামে প্রসিদ্ধা তার একটি তালিকার বলা হয়েছে। কালিকা পুরাণে ৫। বাস্তবিকই বাংলার কালীর প্রাধান্যই সর্বাধিক। অন্যান্য দেবীরা, যেমন দুর্গা, ভুবনেশ্বরী, মহাসরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, বহুত্র একত্রেই পূজিত হন। কিন্তু দীপান্বিতা উৎসবের দিনে কালীর বাৎসরিক পূজা ছাড়াও এই দেবীর প্রাত্যহিক পূজা বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচলিত। বলতে গেলে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন-না-কোন ধরনের কালীমন্দির নেই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কোন কালী-মন্দিরই খুব পুরোতন নয়, দেবীর যা কিছু, প্রত্নবিধি তা সব ভিন্নতো ধরনের মধ্যেই। দেবীর স্থায়ী পূজা ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজন মতো যে কোন সময় কালীপূজা করা চলে। কোন বিশেষ বিপদ-আপদ, মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দেবীর পূজা করা হয়। চৈত্রান্তার মোড়ে প্রায়ই বক্ষা-কালীপূজা করা হয় এবং বহু অঞ্চলেই এই রক্ষাকালীর জন্য একটি বিশেষ স্থানও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বহু-স্থানে কালী গ্রাম অথবা নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবেও পূজিত হন। এই দেবীর সঙ্গে চোর-ডাকাতের কিছু সম্পর্ক আছে। কথিত আছে, অতীতকালে দিনের ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাবার পূর্বে কালীর আরাধনা করত।* কয়েক স্থানের ডাকাতে-কালী এখনও বিখ্যাত—যথা খলসীর, বীজ-পুরের ও বাঘাটির। বহু স্থানে দেবীর স্থানীয় নামও আছে, যেমন হলেশ্বরী বা শ্যামনগরের রক্ষমন্ত্রী, চন্দ্রেড়ার বরামরী, বোড়ালের হিসপুরাসুন্দরী, বরদার মহাকালী, শিয়াখালার উত্তর-বাহিনী, সেওড়াফুলির নিস্তারিণী, বৈদ্যবাটির ভদ্রকালী, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী, লাঙ্গলবন্ধ ও নবদ্বীপের জয়কালী, ঢাকার যমনা-কালী, আলদহের জয়দুর্গা-কালী, তিলকপুরের কলিকা-শ্বরী, খুলনার খুলনেশ্বরী, রাঘাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও কলকাতার বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী ইত্যাদি। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দিরে পূর্বে নরবলি হত। ১৭৩০ খৃস্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্র এই দেবীর একটি সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন যা স্যাক্ত প্যাগোডা বলে খ্যাত হয়, কিন্তু ১৮২০ খৃস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মন্দির পড়ে গেলে তার জায়গায় বর্তমান মন্দির নির্মাণ করা হয়। এই সব স্থানীয় দেবীরা ছাড়াও বিভিন্ন পীঠ-স্থানে ও উপপীঠে পূজিতা কালীরাও আছেন। আদিতে নিশ্চয়ই এই পীঠ-গুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা কালী ছিলেন না, কিন্তু কালক্রমে এই জনপ্রিয় দেবী পীঠ ও উপপীঠগুলির বেশ কয়েকটি দখল করে নেন।

শ্রীরামচরিত-মানস

তুলসীদাস

অযোধ্যার শিবমন্দিরে পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপনা

শ্রীরামচন্দ্রের কথা-গানে আকাশবাতাস মুখ হবে ও রাজধানী ফেরবী ধ্যান ধরিয়া রহেছেন অধিবাসীরা। সেই সময় তাঁর দেবতার প্রতিষ্ঠা-নির্দেশ আকাশের অযোধ্যার পুরিবার অধিকার করি ঐশীলোকে সমুদ্রে। তারপর তেজস্বী তুলসীদাস তাঁহার অমরত্ব—তিনি সহজ ভাষায় তাঁহার পরিকল্পনার শ্রীরাম-চরিত মানস রচনা করিয়াছেন। তুলসীদাসের অমরত্বের কারণ এই শ্রীরামচরিত-মানস। যে ভাষা তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অবধী। এই ভাষা তখন তেজস্বী ও ওজস্বী ছিল। তুলসীদাস শ্রীরামচরিত-মানসের মধ্যে সেই ভাষার সৌন্দর্য ও ওজস্বিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাই তাঁহার গ্রন্থ আজও এত জনপ্রিয়।

মূল্য—১৫ পাঁচ টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

প্রকাশক : পুস্তকবিপণি, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জর্মান সাহিত্যের একজন আধুনিক এখন গোটে। তাঁর সঙ্গেই শিলারের স্থান। গোটের চেয়ে আঠারো বছরের ছোট এক সাহিত্য-বন্ধুপ্রার্থী হুবেক এ দুজনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন, ঈর্ষাও করতেন ঠিক তেমনি। ঈর্ষার কারণ, এঁদের খ্যাতির সমান একটু অংশও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। ছন্ন ছাড়া সাহিত্যের সমর ক্ষেত্রে এঁরা দুজন অধিকার করে রেখেছেন, সেখানে আর ভালো স্থান নেই। তার ওপর গোটের উপেক্ষা ও বিদ্রূপ সমালোচনা নিদারুণ আঘাতের কারণ হয়েছে। প্রথম নাটক শেক্সপেরীলিয়া গো গোটের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকৃতি দেন নি। গোটের মোটেই ভালো লাগে নি তরুণ লেখকের রচনার মানসিক বিকারের লক্ষণ—হৈ-চৈ, গুরুত্ব উদ্ভট ভাব-এর মধ্য দিয়ে এসেছেন। এখন যৌবন অতিক্রান্ত, তাই সেই অতের মধ্যে লেখকের জীবন ও রচনার আবর্তন তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। অন্তত গোটের কাছ থেকে একটু সহানুভূতি পেলে ক্লাইস্টের জীবন অন্যরকম হতে পারত।

হাইনরিখ ফন ক্লাইস্টের জন্ম হয় ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ফ্রাঙ্কফুর্টে। তাঁর পূর্বপুরুষের সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। তাঁরা সেনাবাহিনীর লোক। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার তিনি বিয়ে করেন পঞ্চদশী এক কিশোরীকে। তাঁর নিজের বয়স কিন্তু তখন চল্লিশের ওপর। প্রথম স্ত্রীর দুই ছেলে; দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান তিনটি। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হাইনরিখ।

পড়াশুনার জন্য হাইনরিখকে বার্লিন পাঠানো হলো। একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে বিদ্যাচর্চা করতে হয়। শিক্ষক ছাত্রের ওপর খুশি নন। বড় একঘেয়ে আর খামখেয়ালী। বই খুলে অঙ্কের পাতাগুলো তাকে তবলো লাগে পড়ার চেয়ে। এদিকে বয়স যখন এগারো, তখন বাবার মৃত্যু হলো; মার মৃত্যু হলো পাঁচ বছর পরে। অনাথ ভাই-বোনদের আশ্রয় দিলেন মামারা।

পরিবারের রীতি অনুসারে পনেরো বছর বয়সে ক্লাইস্ট সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে। পতাকাবাহী দলের অধিনায়ক, অধিনায়কদের নিম্নতম পদ। তখন দেশের বড় বিপদ, নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযান চলছে য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রাশিয়ার রাজা অপমানজনক সর্তে নেপোলিয়ানের সঙ্গে সন্ধি করায় যুদ্ধ-বিগ্রহের হাত থেকে কিছুদিনের জন্য শান্তি পাওয়া গেল। ক্লাইস্টের তখন অফুরন্ত অবসর, দু-একটা সৈনিক মার্কিক কাজ ছাড়া বিশেষ কিছুই করবার নেই। এই অবসর সময় সাহিত্য ও দর্শনের বই পড়ে এবং সঙ্গীতের চর্চা করে কাটে। বিশেষ করে য়ুগোর রচনাবলী চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। নিয়মে অবশ্য সেনা অবসরের আলস জীবনযাত্রা সহ্য হয় না। সাত বছরে একবার পদোন্নতি হয়েছে। ধীরে ধীরে আরও উন্নতি হবে নিশ্চয়। কিন্তু পদোন্নতির মূল্য কিছুই নয় তাঁর কাছে। জীবনের সার্থকতা বলতে একেবারে বুঝা বেঁধেছে। আর অপেক্ষা করা চলে না।

রাজার কাছে আবেদন জানালেন, তাঁকে এই চাকরি থেকে মুক্তি দিন। চাকরি আর করব না, এবার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করব শুধু। অবসরকে চাকরিও চাই না।

এমন অদ্ভুত আবেদন আর কেউ রাজার কাছে করে নি। সবাই পদোন্নতির জন্য প্রার্থনা করে, নানা সুযোগ-সুবিধা চায়। কেননা অভিজাত পরিবারের তরুণ সন্তানেরা চাকরির সন্ধান খোঁজবার আগে করবে, এটা দিব সেতালে করবার অভ্যাস।

চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে এলেন। পড়াশুনা করবেন ফ্রাঙ্কফুর্টে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। বাবা কিছু টাকা উইল করে রেখে গেছেন। তাই একমাত্র ভরসা। মাইনে-করা সবাই তাঁর ওপর বিরূপ। পরিবারের বড় ছেলে; চাকরি না করলে ছোট ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করবে কে? সরকারী চাকরির ছাড়পত্র বংশমর্যাদাও ক্ষুণ্ন হলো।

ক্লাইস্টের মতো সর্বাঙ্গীন জ্ঞানের অদম্য পিপাসা তাঁকে পেয়ে বসেছে। য়ুগোর শিক্ষা, শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানার্জনই শেষ লক্ষ্য। অর্জিত জ্ঞানকে কোনো উপায় সিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করবার কথা ওঠে না। বন্ধু-বান্ধবরা বুঝত না এ সব কথা। তাদের অপেক্ষা হতো কি জানি, মাথা খারাপ হয় কি-না! অবশ্য এর জন্য তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। দিনান্তের নিত্য-নতুন পরিকল্পনা হতো যাবার প্রতিক্রিয়াই তা বাতিল হয়ে যেত। হয় এ পথ, নয় ও পথ। জীবনের সঙ্গে ক্লাইস্টের রফা করে চলবার মতো মানসিকতা ছিল না। এই

সময় ওঁকে একবার সম্বর্ধনা জানাতে
হয়েছিল। [illegible] এই তিনি সভা
[illegible] তাঁর সঙ্গে [illegible]
[illegible] আলাপ করেন।
[illegible] ঘনিষ্ঠতা।—
[illegible] ছিল
[illegible] যত চিঠি-
[illegible] তার প্রায়
[illegible] পুস্তিকা [illegible]
[illegible]

১৯০৮ সালে তাঁর [illegible] নিজের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। পাত্রী সেনাবিভাগের এক অফিসারের মেয়ে ক্লিয়হেলমাইন। সুন্দরী মেয়ে। বুদ্ধিমতীও একটু বেশি। ক্লাইস্টের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা। সর্বোপরি সাহিত্যের নেশা হয়তো কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল ক্লিয়হেলমাইনকে। কিন্তু স্থির করবার ব্যাপারেও ভুল ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ক্লাইস্টের কোনো নির্দিষ্ট আয়ের পথ নেই, যার ওপর নির্ভর করে নতুন সংসার পাতা যায়। তাছাড়া ক্লাইস্টের ছিল মাস্টারী করবার প্রবৃত্তি।—যা সকলের পক্ষেই বিরক্তিকর। ক্লিয়হেলমাইনকে ছাড়াও যেতো জার্মান ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, গণিত ইত্যাদি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি রীতিমতো ক্লাস নিতেন। তার ওপর ছিল ক্লাইস্টের তোতলামি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আটকে যায়, অনেক চেষ্টাতেও কথা বের হয় না। আর অক্ষমতার অপমানে ক্লাইস্ট ক্ষুব্ধ বিরক্ত হয়ে উঠতেন। কোনো মেয়েই ভাবী স্বামীর সম্পর্কে এমন লোককে বেছে নিতে পারে না।

ক্লিয়হেলমাইনও স্বাভাবিক কারণেই প্রথমে ক্লাইস্টের প্রস্তাবে রাজী হন নি। ফিরিয়ে দিয়েছে কয়েকবার। শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিল। হয়তো অনুকম্পায়। কিংবা ভবিষ্যতে খ্যাতিমান লেখকের স্ত্রী হবার আশায়।

ক্লাইস্ট ক্লিয়হেলমাইনের সম্মতি পেয়েই ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আবার এক সপ্তাহ থেকে চিঠি লিখলেন, আমি এখানে চিকিৎসার জন্য এসেছি। চিকিৎসা সফল হলে আবার মনপ্রাণ জীবন ঘরে সুখের হবে।

ক্লাইস্টের কোনো কোনো জীবনীকারের অভিমত, বিবাহের পথে অন্তরায় দূর করবার জন্যই এই চিকিৎসার দরকার হয়েছিল। চিকিৎসা যে সফল হয়েছে, সে কথা ক্লাইস্ট নিজেই জানিয়েছেন এক চিঠিতে। কিন্তু ঘরে ফিরে হঠাৎ কেন যে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগেও ঘরে ফিরে আসবার জন্য উৎসুক ছিলেন ক্লাইস্ট তাঁকে লিখলেন: "আমি ভবিষ্যতে হোমরুল ঘুরি বেড়ানোই কি আমার উচিত নয়? আমাকে আর চিঠি দিও না। আমার একমাত্র কামনা মৃত্যু।"

ক্লিয়হেলমাইনকে প্রায়ই তিনি বলতেন, জার্মান ভাষায় একটি শব্দ মেয়েরা বুঝতে পারে না। সেটি উচ্চাশা। একদিকে উচ্চাশা অন্যদিকে কামনা—এই দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতা ক্লাইস্টের জীবনের ভারসাম্য বিচলিত করেছিল। উচ্চাশা বলতে ক্লাইস্ট বুঝতেন লেখক হিসাবে খ্যাতি,—গোটে-শিলারের সঙ্গে তাঁর নাম স্থান পাবে—এই আশা। একদিন যে তা সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে ক্লাইস্টের ছিল দৃঢ় প্রত্যয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ করে, ক্লিয়হেলমাইনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৮০০ খৃস্টাব্দ থেকে চার বছর ক্লাইস্ট ঘুরে বেড়ালেন য়ুরোপের নানা জায়গায়। প্যারিসে ভাটল বেশ কিছুদিন। ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে স্থাপিত হলো নিবিড় পরিচয়। বিশেষ করে ফরাসী নাটকের সঙ্গে। নিজের কয়েকটি অসম্পূর্ণ নাটকের পাণ্ডুলিপিও নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে আশা ছিল রবার্ট গিসকার নাটকটির ওপর। বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা—দুই-ই ছিল গ্রহণ। কিন্তু লেখা কিছুতেই অগ্রসর হয় না, ছেঁড়ে যা হয় তাতে মনে তৃপ্তি নেই। বার্থতার ক্ষোভে পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলবার কথাও তাঁর মনে হলো।

এই সময় আলাপ হলো সমকালীন প্রভাবশালী কবি ও সমালোচক হিন্টোক মার্টিন ভিলাণ্ডের সঙ্গে। তিনি গিস্কারের পরিকল্পনা শুনলেন; আর শুনলেন ক্লাইস্টের মুখে নাট্যাংশের আবৃত্তি। মুগ্ধ হলেন তিনি। বললেন, ইস্কাইলাস, সফোক্লিস ও শেক্সপীয়রের বিদিত প্রতিভাও এরকম নাটকের পরিকল্পনা করতে পারত কিনা সন্দেহ। ভিলাণ্ড ও গোটে জার্মান সাহিত্যের যে অভাব পূর্ণ করতে পারেন নি, ক্লাইস্ট তা করবেন।

ক্লাইস্ট কিন্তু এই নাটক সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। শেষোলিয়ানের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নই যে এই নাটক রচনার প্রেরণা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবার্ট গিস্কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর, কিন্তু সে নিঃসঙ্গ। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে সে যাত্রা উচ্চ করে আছে, একটু সুযোগ পেলে তাকে টেনে নামিয়ে আনা হবে সেই উত্তাপন থেকে। অবশ্য সুযোগের চাকা তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। বীরের ভাগ্যই এই। বাধের যে পালন করবে, তারাই করবে বিধ্বংসন।

ক্লাইস্টের প্রথম নাটক Die Familie Schroffenstein প্রকাশ করেন তাঁরই এক বন্ধু, ১৮০০ খৃস্টাব্দে। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না। এ নাটক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

পাঁচ বছর পরে বের হলো পেন্থেসিলিয়া। ক্লাইস্টের নাম কিছুটা প্রচার লাভ করে। অশ্বমাজনদের রাণী পেন্থেসিলিয়া। রাণী তার প্রেমিককে যুদ্ধে পরাজিত করবে,—এই ছিল রীতি। কিন্তু তার প্রেমিক অ্যাকিলিস যখন রাণীকে পরাজিত করল, তখন অপমানের সীমা রইলো না। রাত্রির উৎসব শেষকেলির সুযোগে পেন্থেসিলিয়া অ্যাকিলিসের বুকে তীর বসিয়ে তার রক্ত পান করল প্রতিশোধ হিসাবে। এই পৈশাচিকতার পরে সে প্রাণ হারালো।

ঐ বছরই বের হয় স্যারমিনিয়াস বধ নাটক। দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এই নাটক নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জার্মানদের সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে রচিত। আক্রমণকারী রোমানদের বিরুদ্ধে আরমিনিয়াস জার্মানদের নেতৃত্ব করেছিল। আরমিনিয়াস একেবারে উন্মত্ত,—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে সন্তান, স্ত্রী, সন্তান—সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

ক্লাইস্টের শ্রেষ্ঠ নাটক পিঠার অব হামবুর্গ ঐতিহাসিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। ওপরওয়ালার আদেশ অমান্য করেও দেশের স্বার্থে অভিযান চালিয়ে রাজকুমার হামবুর্গ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়। কিন্তু পরে নিজের গভর্নর মেতের বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়,—কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করবার অপরাধে।

'ভাঙা কুঁজো' (১৮০৩) এক ছোট আদালতের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের কীর্তিকলাপ অবলম্বনে রচিত প্রহসন। বাস্তব জীবনের ছবি এই নাটকেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 'কেট অব হেইলব্রন' (১৮১০) এক অবাস্তবধর্মী প্রেমের কাহিনী।

নাটক ছাড়া ক্লাইস্ট লিখেছেন কতকগুলি সুন্দর গল্প। প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উজ্জ্বল। প্রতিটি কাহিনীর একটি বাণী আছে, কিন্দরস ক্ষুণ্ন না করেও তা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। লোকার্নোর কিংবদন্তী, দি মার্কুইস অব ও'—, দি কাউন্টেস, সেন্ট সিসিলিয়া প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠকের মন অধিকার করে রাখে। গল্প রচিত গল্প 'চিলির ভূমিকম্প' মিশন-সেন্সেসের আবর্ণ

হিসাবে সমালোচকদের অভিনন্দন পেয়েছে। নায় কিরের জন্য মানুষের চিরন্তন দাবিকে মূর্ত করে তুলেছে শাইলক কোলহাস।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে এক বন্ধুর সহযোগিতায় ফাঁকলা নাম নিয়ে একটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা শুরু করেন ক্লাইস্ট। এই উপলক্ষে হোট্ট, টিক্রেক এবং অন্যান্য অনেক লেখকের সঙ্গে তাঁকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। সাহিত্য জগতে যেন এরই পরিচিতি লাভ করলেন। কিন্তু পত্রিকা চলে নি বেশিদিন।

ক্লাইস্টের সাহিত্য সৃষ্টির সময় স্বল্পস্থায়ী বছরের বেশি নয়। আর এই সময়ও তিনি সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি। অল্প সময়ের মধ্যে লিখে খ্যাতি অর্জনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় পরিশ্রম করেছেন অসাধারণ। তার ফলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। এর ওপর নিদারুণ দারিদ্র্য। মূল্য বাঁচানোর তাগিদেই সহকারী অর্থ জগতে চাকরি নিতে হলো। নেপোলিয়নের আক্রমণে জার্মানী তখন বিপর্যস্ত। বন্ধুবান্ধবের চাকরি করে অনির্দিষ্টকালের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সের সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াবার সময় ক্লাইস্ট বন্দী হলেন ফরাসী পুলিসের হাতে, জার্মানীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবার অভিযোগে। মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন বার্লিনে।

কিন্তু ফ্রান্সের কারাগারই বোধ হয় ছিল ভালো। বার্লিনে বাঁচবার কোনো পথ নেই। দারিদ্র্যের কারাগার থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

ভিলহেলমাইনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব তিনি দেন অনেকদিন আগেই। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে পাঠান তাঁকে চেনেভিক্সের সঙ্গে। আশ্চর্য ব্যাপার, তার তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু শুধু মৃত্যু কামনায়। ক্লাইস্ট যেমন মাঝে মাঝে মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তেমনিভাবেই তাঁর মৃত্যুর জন্য যেন পা বাড়িয়েই আছে। ২১শে নভেম্বর, ১৮১১ মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পেলেন দুজনে একসঙ্গে। এবার সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হলো না।

এই আত্মহত্যা কি ক্লাইস্টের অবক্ষয়ধর্মিতার প্রমাণ, না সত্যি কারণ ছিল? ক্লাইস্টের জীবনের শেষ কয়বছরের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর পথেই তাঁর মুক্তি।

আর ক্লাইস্ট জার্মান নাটকারদের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে শিলারের চেয়ে বড় নাটকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে বাদ দিলে জার্মান নাটকের ইতিহাস হয় না। অবশ্য কালের দু-একটি নাটকের অভিনয় হয়েছে, কিন্তু কেউ তা নিয়ে আলোচনা করে নি। হোট্ট তাইমারের রঙ্গমঞ্চে তাঁর কৃতিনের অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নাটক নয়; এর সংক্ষেপ করা হয়েছিল যে, মূল নাটক তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন সুন্দর প্রহসনটিকে এভাবে হত্যা করবার জন্য ক্লাইস্ট একই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, হোট্টকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবার কথা মনে হয়েছিল তাঁর।

ক্লাইস্টের সমসাময়িকদের রচনাবলি জার্মানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনপ্রিয়তা লাভ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এমনিতে সমাদর লাভ করে নি। গোটের বিদ্বেষপরায়ণতাই হয়তো সমকালীন লেখকেরা ক্লাইস্টের প্রতি সৃষ্টি দেয় নি। ক্লাইস্ট সম্বন্ধে গোটের একটি মন্তব্য: "With the best will in the world toward this poet, I have always been moved to horror and disgust by something in his works, as though here were a body well-planned by nature, tainted with an incurable disease."

গোটে যে বোধের কথা বলেছেন তা হলো শেলগেল্সালিয়ার ক্লাসিকের বোধ। কিন্তু এটা যে ক্লাইস্টের রচনার সামান্য অংশমাত্র, আরও বহু সৃষ্টি যে রয়েছে, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। সমকালীন জার্মান সাহিত্যের একচ্ছত্র নেতা গোটে। তিনি অস্বীকৃতি না দেওয়ায় অন্য সবাই ক্লাইস্টকে উপেক্ষা করেছেন।

ক্লাইস্টের কোনো গোষ্ঠী ছিল না। যে অল্প কয়েকজন বন্ধু ছিল, তাঁরা কবুণার চোখে দেখতেন, তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। পরিচিত লোকদের নিকট ক্লাইস্ট একই সাধারণ ছিলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখা তারা প্রয়োজন বোধ করে নি। এই জন্যই ক্লাইস্টের জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। বন্ধুবান্ধব এবং সমকালীন লেখকদের চেষ্টাতে উপেক্ষাই ক্লাইস্টের মৃত্যু এনে এনেছে, তাঁর সৃষ্টির উপর ঘবনিকা টেনে দিয়েছে। প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছেন, নিরাশায় ফিরে আসতে হয়েছে। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নাটক পড়াও না পড়েই ফিরিয়ে দিয়েছে।

একটি সান্ধ্য পত্রিকা বের করবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ক্লাইস্টের আশা হলো, এবার দুঃখ দুর্দশা-দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজ তাঁর ওপর হলো তাঁর লেখনে। সরকারী মেজাজের কোপ পড়ল তাঁর কাগজের ওপর। ১৮১৩-এর সংখ্যা প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ টিকে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করলেন। আশায় উঠে গেল। যা-কিছু সম্বল সব বিক্রয় করেছিলেন। সুতরাং কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন ক্লাইস্ট। অবস্থা ভিখারির প্রায়। খাবার পয়সা নেই পকেটে। নিজের পর নিজ ঘরের জন্য বলে থাকতে হয়। শুধু বাঁচবার জন্যই আবার চাকরি করা দরকার।

এবারও সেনাবিভাগে চাকরি অনায়াসে পেতে পারেন পরিচিতজনের। কিন্তু সেই চাকরির জন্য আবেদন করতে হলেও টাকার প্রয়োজন। তখনকার দিনে অফিসারের ইউনিফর্মের সাজ-পোশাক নিজেকে কিনতে হতো। সেই টাকা চেয়েছেন তিনি উলফাইকের কাছে। অকাতরে সাহায্য করেছে। এই লেখকের মতো তার সহায়তা চায়। আশ্চর্য সেই অকৃতদারী উলফাইকও বন্ধুকে ছেড়ে গেছে। অপরিচিত লোকদের সামনেই অপমান করে বিদায় করে ছিল। বন্ধুর কৃপাকণা! অপমান, আরও কত কী! এমন অপমানের চেয়ে মৃত্যু অনেকগুণে শ্রেয়—পরে এক চিঠিতে ক্লাইস্ট লিখেছিলেন।

মূর্তিপূজার জড়তার ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন ক্লাইস্ট। আর সব পথ বন্ধ, শুধু মৃত্যুর

রাণীধূপ
নকাকার. প্রডাক্টসের তৈরী

নিয়মমাফিক খোলা। লেখক হিসাবে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আরও কত লেখার এবং কত ভালো লেখার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার জন্য তো বাঁচা প্রয়োজন।

এই সময় নতুন করে দেখা হলো হেনরিয়েটের সঙ্গে। যখন সরকারী অর্থ বন্ধুর চাকরি ছাড়লেন তখন আলাপ হয়েছিল। এক আন্তর্জাতিকতার দূত। এখন দুরারোগ্য ক্যান্সার তাকে ভুগাচ্ছে। অপেক্ষা করছে নিশ্চিতরূপে মৃত্যুর। মৃত্যু সুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তুলল। তাঁদের সঙ্গে জীবন যেন কথা বলতে চায় নি তাঁরা; প্রেম পরস্পরকে আকৃষ্ট করে নি। শুধু এক সঙ্গে মৃত্যুর কবলের তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন। ফ্রাইস্ট এর আগেও অনেককে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর অংশীদার হতে আমন্ত্রণ করেছেন। ঔপন্যাসিকও তাদের একজন। কেউ সাড়া দেয় নি, কেউ সঙ্গী হতে চায় নি। হেনরিয়েট সাহসে এগিয়ে এলো তাঁর হাত ধরে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর, সুখদ। ফ্রাইস্ট দুঃসাহসী, অসমসাহসী, জীবনে অকুতোভয়; তাঁকে অবলম্বন করে কেউ বাঁচতে চায় নি; অন্য কেউ তাঁকে অবলম্বন দেয় নি যাতে তিনি বাঁচতে পারেন, প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে জয় করবার আনন্দ লাভ করে গেলেন। মৃত্যুর আহ্বান জানিয়ে হেনরিয়েটকে তিনি জয় করেছেন।

বার্লিন শহর থেকে কিছু দূরে হ্রদের তীরে ছোট একটি হোটেলে ফিরে দুজনে উঠলেন। ২৩শে নভেম্বর, ১৯১১। সারাদিন দুজনে মেঝেতে করে হ্রদে বেড়ালেন। সারা রাত তাঁদের ঘরে আলো জ্বলল। দুজনেই যেন হাসি-খুশি। পরদিন খুব সকালে কফি খেয়ে চললেন হ্রদের দিকে। একটু পরেই হোটেলের লোক শুনতে পেল গুলীর শব্দ। ছুটে গিয়ে দেখল, হেনরিয়েট পড়ে আছে চিৎ হয়ে—খোলা বুকে রক্তের ছোপ। আর তার পায়ের কাছে ফ্রাইস্ট, তাঁহাতে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলী করেছেন।

কাজের অন্ত নেই। ফ্রাইস্টের মতো লোকের যে এমনি পরিণতি হবে তা তো সবাইরে জানা কথা! আত্মীয়-স্বজনের মুখ লজ্জায় কালো হয়ে গেল। কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে পরিবারের লোক বিরক্ত করে দিত, ফ্রাইস্টের নাম মুখেও আনবে না। চিঠিপত্র, অসমাপ্ত রচনা, ইত্যাদি যা-কিছু তাঁদের কাছে ছিল, সব পুড়িয়ে ফেলল।

মৃত্যুর পরও দুর্ভাগা ফ্রাইস্টকে ত্যাগ করে নি। তাঁর লেখা নাটক 'প্রিন্স হোমবুর্গ' মৃত্যুর পর বছর খানেক পরে অভিনীত হয়েছিল। কোনো সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে লেখেন নি দীর্ঘকাল। নাটক আলোচনা হয় নি কখনও চলে। সাংকেতিক ধাঁচের নাটক হাত মক্কেল করেছে তাতে লেখকের নাম প্রচারিত হয় নি। মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে ফ্রাইস্টের রচনা-বলীর ১২ খণ্ড প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতকের সমালোচকরা ফ্রাইস্টের উপেক্ষার সমাধি থেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। টমাস মান তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন:

"He was one of the greatest, boldest, and most ambitions poets Germany has produced; a playwright and storyteller of the very first order; a man unique in every respect, whose achievement and career seemed to violate all known codes of patterns."

ফ্রাইস্টের কথা আজ আমাদের বিস্ময় করে মনে পড়ে মাইকেল কোলহাসের জন্য। বড় কঠিন। ফিলকর্ম হিসাবে গল্পটির তো মূল্য আছেই। কিন্তু শুধু সে জন্য নয়। সুবিচারের ধারণাকে কোলহাসের যে সুগভীর ও আন্তরিক তা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের হৃদয় বিশেষ করে স্পর্শ করে। যত দিন মানব, সমাজ থাকবে, ততদিন সুবিচারের জন্য এমনি সংগ্রাম চলবে।

ফ্রাইস্টের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে কাফকার ওপর। কাফকা নিজে তা স্বীকার করেছেন। কোলহাসের প্রভাব থেকে কাফকা কখনো মুক্ত হতে পারেন নি। প্রায়ই কথনের পড়ে শোনাতেন কোলহাসের কাহিনী। অথচ বলে অনেক শ্রোতার সামনেও তিনি এই গল্পটি পড়েছেন প্রাগ শহরে।

জার্মান ঔপকথার পুরনো কাহিনীকে ফ্রাইস্ট লাভবত শিল্পরূপ দিয়েছেন। মাইকেল কোলহাস ঘোড়ার ব্যবসায়ী। অভদ্র নয়, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ন্যায়ের পথে চলবার জন্য কঠিন স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

একবার ঘোড়া নিয়ে চলেছে শহরের বাজারে বিক্রি করতে। দেখল, গ্রোস্কা দুর্গের সামনে কয়েক আসরের একটা নতুন বাড়ি বসেছে। এর আগে কতবার গেছে এ পথে, কেউ টোল আদায় করে নি। কই ভেবে, মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও যে টাকা দাবি করল তাই দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল। না হলে শহরের বাজারে পৌঁছতে দেরি হবে। ফলে লোকসান হবে। কিন্তু টাকা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগোবার উদ্যোগ করতেই দুর্গের ম্যানেজার এসে পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, পাস দেখি?

পাস? অবাক থেকে পড়ল কোলহাস। পাস যে প্রয়োজন তা তো জানে না! কোনোদিন দরকার হয় নি। ম্যানেজার বলল, নতুন অর্ডিন্যান্স হয়েছে।

কোলহাস অনুরোধ জানাল, এবার আমাকে ছেড়ে দিন; পরের থেকে পাস করিয়ে আনব।

না, কিছুতেই ছাড়বে না! অগত্যা সে দুর্গের অধিপতি জেনটজেলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। রাজরাজড়ার সঙ্গে আড়া দিচ্ছে কর্তা। সে খবর আবেদন জানাল। এক পাল ঘোড়া নিকটেই আছে জেনে কর্তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল। সবাই এল ঘোড়া দেখতে। কার কোন্ ঘোড়া পছন্দ, ঘোড়ায় চড়ে কিকরে গেলে কেমন হয়, ইত্যাদি কথা নিয়ে কর্তার বন্ধুরা আলোচনা শুরু করল। কোলহাস দেখল বড়ই বিপদ। যদি জোর করে সব ঘোড়া রেখে দেয় তাহলেই বা সে একা কী করবে? সুতরাং অনেক ভেবে ঠিক করল, সে দুটো ঘোড়া জামিন হিসাবে রেখে যাবে দুর্গে। পরে পাস যোগাড় করে ঘোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। চমৎকার ঘোড়া; তরুণ, তেজস্বী। ঘোড়া দেখাশুনোর জন্য একজন সহিস রেখে গেল। নাম হেরুস্।

শহরে পৌঁছে খবর নিয়ে জানল পাসের কথা একেবারেই মিথ্যা; ওটা শুধু টাকা আদায়ের ফন্দি। পাসের যে দরকার নেই, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের একটা চিঠিও নিয়ে রাখল। ঘোড়া বিক্রি করে টাকা-পয়সা আদায় করে ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে গেল।

গ্রোস্কা দুর্গে এসে চিঠি দেখিয়ে ঘোড়া ফেরত চাইল। ম্যানেজার কিছু না বলে শুধু আঙুলটা বেঁকিয়ে দিল; তখন থেকে ঘোড়া নিয়ে যাবার উপায় করল। কোলহাস তো চিনতেই পারল না তার সেই সুন্দর তেজী ঘোড়া দুটিকে। তাদের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। পাঁজরের প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। তার দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এর চেয়ে ঘোড়া দুটো মরে গেলেও ভালো হতো। সান্ত্বনাও নেই; দুর্গের বাজা চাকরটা জানাল তাকে ঘেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ম্যানেজার। থাকলে জানা যেত ঘোড়ার এ দশা কেমন করে হলো।

কোলহাস ঘামি করল, যেমন অবস্থায় আমার ঘোড়া ফেরত দিয়েছিলাম ঠিক তেমন অবস্থায় ঘোড়া ফিরে চাই।

দুর্গের অধিপতি বিদ্রূপ করে হেসে উঠল। হুকুম করল, যদি লোকটা ঘোড়া না নিতে চায়, তবে ওকে ঘেরে তাড়িয়ে দাও, যেমন করে পারি সহিসটাকে ঘেরে তিনি করেছি।

কোলহাস একা, নিরুপায়। যেমন ঘোড়া রেখে মিয়োছলম ইবন হেনোট আসে মিশরে চাকরি—আরবে বলল সে। আমি আমার সুবিচার কি করে পেতে পারি।

কোলহাসের দীর্ঘশ্বাস শুনতে শুনতে দুর্গ থেকে সে বেরিয়ে এল। কোলহাসের বিচারবোধ অত্যন্ত সচেতন। তার মনে হলো হয়তো সাহেব সত্য কথা বলছে। হয়ত তার দোষেই ঘোড়ার এই দশা। সুতরাং আগে সাহেবের কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে তারপর কর্মপন্থা স্থির করবে।

ঘোড়া পেয়ে স্যার এক থেকে জানতে পারল সাহেব মানের ছোট অফিসার হয়ে এসেছিল। এখনো সস্ত্রীক। অনেক কষ্টে তাকে বাচানো গেছে। তার বিশ্বস্ত পরিচারক হাসি কখনো মিথ্যা বলবে না। তবু বিচারকের মতো প্রশ্ন করে করে কোলহাস সব জেনে নিল। ঘোড়া দুটিকে বিক্রি করেছে ম্যানেজার মাল গনিমেহ। তাই ওদের এই হাল! হাসি প্রতিবাদ করায় তাকে মেরে এবং জিনিসসহ ঘোড়া নিয়ে আটকে দিয়েছে।

কোলহাস নিশ্চয়তের হলো দুর্গাধিপতির অপরাধ সম্বন্ধে। এর প্রতিকার চাই। উকিল ডেকে তার সকল অভিযোগ উল্লেখ করে অভিযোগ তৈরি করল। তারপর প্রেসক্রেনের আদালতে মামলা দায়ের হয়ে গেল দৌলতা দুর্গের অধিপতির বিরুদ্ধে। কিন্তু মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছে, বছর পূর্ণ হয়ে এল—আদালত থেকে মামলা সম্বন্ধে কোন চিঠি আসে না। স্মারকপত্র পাঠিয়েও উত্তর নেই। তারপর উকিল বন্ধুকে লিখল খবর জানাতে। সে জানাল দৌলতার দুজন আত্মীয় আছে, যারা রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। তাদের চেষ্টায় আদালতের মামলা চাপা পড়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছুই হবে না। কোলহাস দুর্গ থেকে ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে আনতে পারে। কোলহাসের এতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। যদি না হয় তাহলে উকিল এ ব্যাপারে তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

কোলহাস চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই কি নিরপেক্ষ বিচার? তাদের অঞ্চলের গভর্নরকে ব্যাপারটা জানাল। সব শুনে তিনি গ্রান্ডেনবুর্গের ইলেক্টরকে চিঠি দিলেন যাতে কোলহাস সুবিচার পায়। ইলেক্টর অভিযোগ আদালতে না পাঠিয়ে যে অফিসারকে তদন্ত করতে দিলেন, সে দৌলতার আত্মীয়। সুতরাং আবার পরামর্শ এল ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। কোলহাস হয়তো মেনে নিত এই পরামর্শ যদি দৌলতা নিজে এসে ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে যেত তার বাড়ি। তা যখন নয়, বরং খবর পেলো এখনো ঘোড়া দুটোকে রাখা হয়েছে দুর্গের কাছে আস্তাবলে।

কোলহাস এই পরামর্শ নতুন করে ভাবার পর গ্রামের লোকদের ডাকিয়ে পাঠাল। তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির বিবরণ দিয়ে জানতে চাইল, বিক্রি করলে এসব কত হবে। দামদস্তুর সব ঠিক করে নোডল চলে গেল। লিসবেথ সবই শুনেছিল। স্বামীকে একা পেয়ে কেঁদে বলল, তুমি কি

আবশ্যক

সারা ভারতে প্রবেশিকা ও তদূর্ধ্ব ট্রেনী

টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, রেডিও ও ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরী বিদ্যার জন্য

সিটী ও গীল্ডস্ (লন্ডন)-এর জন্য কোচিং

আই. টি. ই. সার্টিফিকেট ও আই. ই. আর. ই-এ গ্রহণ করা হয়।

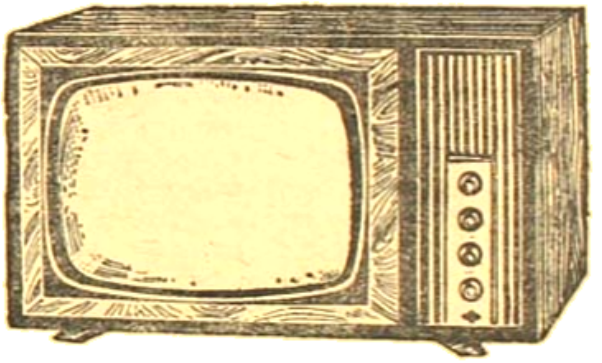

ইনস্টিট্যুটের হস্টেলে ১৫ মাসের ট্রেনিং বা ফ্যাক্টরীতে নিবিড় হাতেকলমে ট্রেনিং সহ পত্রযোগের পাঠক্রমের পরে চিকাগো ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন কর্তৃক তাদের স্বীকৃতি নম্বর/ডিপ্লোমা ৫০০, হইতে ১০০০, পর্যন্ত চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। ইনস্টিট্যুট বিরাট ভবনে অবস্থিত ও বৃহত্তম বাণিজ্যনগরে ও উচ্চযোগাযোগকেন্দ্র এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক সমন্বিত। আধুনিক সুবিধাদি সজ্জিত ভবনে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ন্যূনতম অতিরিক্ত সময়ে পূরাদস্তুর ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার করিবার জন্য বাণিজ্যনগরে ও ফ্যাক্টরীতে নিবিড় হাতেকলমে ট্রেনিং-এর উপর অধিকতর লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বাস ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে তাদের চাকুরীর দোলা হইবার অনন্য "মেয়েদের পক্ষেও" সুবর্ণ সুযোগ। বিশব প্রদর্শনীসমূহের জন্য টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের নিকট ২, মাস অন্তর/সেমিস্টার অন্তরে পাঠান।

চিকাগো ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজী

এ-৭, ইস্ট পার্ক, নিউদিল্লী-১৬ (রোজ)

পাগল হবে? সব বিক্রি করে দিলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব?

অনেক করে স্ত্রীকে কাছে ডেকে কোলহাস বলল, এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। যে দেশের সরকার জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করবে না, যেখানকার লোক অন্যায়ে প্রতিবাদের প্রতিকার নেই, সেখানে বসে না করে অন্য দেশে ভুখুর হয়ে থাকার চেয়ে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে সমর্থন করবে।

ক্রিস্টিনের চোখ মুছে বলল, তোমার অমতে আমরা যাব না। আবার চেষ্টা করব। আমি রাজার কাছে যাব। মেয়ে ছেলে সকলের কথা বলব। তিনি শুনবেন।

স্ত্রীর প্রস্তাবে কোলহাস খুশি হয়েই চুপ করে। শুধু বলে দিল, তুমি নিজে যখন হাতে আর্জি দিতে পারবে তখন যাবে।

ক্রিস্টিনের একটু বেশী এগিয়ে এসেছিল। দেহরক্ষীর ধাক্কায় হাতলের পাশে দাঁড়ায়। ঘোরেই ফেলেছিল। আর কথা বলতে পারে নি ক্রিস্টিন। মুখ দিয়ে উঠে এসেছিল অনেক গলগ রক্ত। রাতের মুটো ফোনে আত্মজিনী নিয়ে গেল একজন সভাসদ। বাড়ি ফিরে কয়েকদিন মাত্র বেঁচে ছিল। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারে নি। কোলহাস যেন মর্মাহত সঙ্গে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করল। সব কাজ হয়ে গেছে, কোলহাস কনিষ্ঠ পুত্রকে কোলে করে সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে তার ভিয়তমা স্ত্রীর অকালিক মৃত্যুর কথা ভাবছিল, এমন সময় রাজদরবার থেকে লোক এল চিঠি নিয়ে। লিস্বেন থে আবেদন দিয়ে এসেছিল তার উত্তর এসেছে। কোলহাসকে আবেদন করা হয়েছে, সে যেন ঔদ্ধত্য দুর্গ থেকে তাঁর ঘোড়া নিয়ে যায়। তাঁর এই ব্যাপার নিয়ে সে যদি আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করতে যায় তাহলে তাকে জেলে যেতে হবে।

রাজার বিচারের রায় পকেটে পুরে সে বাড়ি ফিরে এল। ভিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর বিভীষিকা নীরবে মুছে ফেলল মুখ থেকে। মনে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে। ঔদ্ধত্য দুর্গের কর্তার কাছে সে অভিযোগপত্র পাঠাল। তিন দিনের মধ্যে ঘোড়া দুটি নিয়ে কর্তাকে আসতে হবে কোলহাসের বাড়ি, নিজের হাতে আইনের পরিচর্যা করে ঘোড়া দুটিকে আগের মতো নাদুস-নুদুস করে দিতে হবে।

তারপর ছেলেদের পাঠিয়ে দিল ডেসডেন এক আত্মীয়ের বাড়ি। বিক্রি করে দিল নিজের সব সম্পত্তি। সামান্য কিছুসংখ্যক সহচরকে নিয়ে কোলহাস চলেছে কাল মোকাবিলা করতে। কর্তা তখন ইয়োর-বাদুসের সঙ্গে কোলহাসের অভিযোগপত্র নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল। হঠাৎ কোলহাসকে সশস্ত্র সঙ্গী সহ দরবার কক্ষে ঢুকতে দেখে থাবড়ে গেল। গলার একটা দরজা দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হল কোলহাস, তাকেও ধরে ফেলতে আর পেল না। দুর্গে আগুন ধরিয়ে দিল; ধ্বংসলীলার আর সোনাদানা প্রাণ হারাল। কিন্তু আসল শত্রু থেকে পালিয়ে।

কোলহাস সর্বত্র ইস্তাহার প্রচার করতে লাগল। সৌক্সনর জমিদারের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে; সবাই যেন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

সৌক্স বেহিকে ছেয়ে গেলে পর কোলহাস সেদিকে যাওয়া করে। দলে অরও অনেক নতুন লোক যোগ দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে শহরে ঢুকে আগুন লাগাতে শুরু, বাড়ির পর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সর্বত্র আতঙ্ক। কবে কোথায় কোলহাসের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নাগরিকরা ভয়ে উন্মত্ত। পুলিশ, সৈন্য কিছু করতে পারে না। কোলহাসের গোস্তার পড়ে। সৌক্সর জমিদারকে তোমরা আমার হাতে তুলে দাও, আমি আর কিছু চাই না, কারো ক্ষতি করব না। মুখে মুখে প্রচার হতে থাকে কোলহাসের প্রতি অবিচারের কথা। জনসাধারণের সহানুভূতি তার দিকে। সৌক্সর জমিদার তার আত্মীয় রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুবিচারের পথ রুদ্ধ করেছে। কারো বুঝতে বাকী নেই। তাই তারা চায় সৌক্সর শাস্তি হোক, কোলহাস শান্ত হবে, দেশে শান্তি ফিরে আসবে। জনসাধারণ কোলহাসের পক্ষে বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষও কিছুটা ঘাবড়ে গেছে।

কোলহাসের দলে অনেক লোক যোগ দিয়েছে, শক্তি বেড়েছে; একটা দুর্গ দখল করে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিজ্ঞানগর। ওয়ার্টেনবার্গের গভর্নমেন্টের পরিচালনার সুব্যবস্থা এবং সত্যাগ্রহী গায় হবার পূর্বে হয় নি। কোলহাস চেয়েছিল, সমাজের দাবিতে পৃথিবীর অন্যান্য ভিয়তমা জনসাধারণ এক হবে, সংঘবদ্ধ হোলেন করবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

একদিন বিখ্যাত স্যাক্সোনি রাজসভার লুথারের ইস্তাহার চোখে পড়ল কোলহাসের। একটি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা কাজের জন্য শত শত অধিকার হচ্ছে, নিয়মতান্ত্রিক শাস্তি পাচ্ছে। কোলহাস যে-সব অধিকার করছে ঈশ্বর কি এর জন্য তাকে শাস্তি দেবেন না?

কোলহাসের অন্তর স্পর্শ করল লুথারের এই প্রশ্ন। সে ধার্মিক, বিচার নিজের জন্য চায়, চায় অন্য সকলের জন্যও। একদিন রাত্রিতে ছদ্মবেশে উপস্থিত হলো লুথারের বাড়ি। তাঁর উপদেশ কী?

লুথার পরিচয় পেয়ে রাগে জ্বলে উঠলেন। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। তোমার নিশ্বাসে মহামারী, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সর্বনাশ।

—প্রভু, আমি পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করতে চাই যে, আমার চিরতমা পত্নী ন্যায় বিচারের দাবিতে প্রাণ দিয়েছে, কেবলো ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নয়।

লুথার একটু নরম হলেন। বললেন, জমিদারকে ক্ষমা করে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলেই কি ভালো হয় না?

কোলহাস তাতে রাজী নয়। বিচারের দাবিতে তাকে এত বড় মূল্য দিতে হয়েছে, এর পরে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। সবাইকে ক্ষমা করা সম্ভব, কিন্তু জমিদারকে নয়। ঈশ্বর নিজেও কি তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করেন?

লুথার বিরক্ত হলেও গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখে দিলেন যেন কোলহাসের অভিযোগের আবার বিচার হয়। এবং বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে যেন কোন শাস্তি দেওয়া না হয়, মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা পায় সে। লুথারের এই সুপারিশ মেনে নিল সরকার। নতুন করে বিচার হলো। সেই বিচারে কোলহাসকে জেতা হলো প্রাপ্য।

নির্দিষ্ট দিনে বন্ধুভূমিতে গিয়ে কোলহাস দেখতে পেল তার সেই কালো ঘোড়া দুটি ঘাস খাচ্ছে; অযত্নে অভ্যাসে নাদুস-নুদুস হয়েছে। আনন্দে বুকের ভেতর ভরে গেল। জানতে পারল সৌক্সর জমিদারির কারারুদ্ধ হয়েছে তার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য। একদিনে কোলহাসের দাবি পূর্ণ হলো, অন্যায়ের বিচার হলো। এবার সে হাসিমুখে ঈশ্বরের সামনে মাথা নোয়াতে রাজি।

কিন্তু কোলহাসের সমস্যাটি মানুষের পক্ষপাতের জন্য বিচারে পূর্ণ হয়ে যায়। মন প্রসন্ন হয়ে যায়, আইন ভঙ্গ না করলে কি কোলহাস বিচার পেত? বিচার আদায় করে নি। কোলহাস ভিয়তমা পত্নীকে বিসর্জন দিয়েছে, কত প্রিয় সহচর প্রাণ হারিয়েছে, গ্রাম নগর পুড়েছে। আর সর্বোপরি, নিজের জীবন দিয়ে বিচার দেখে হয়েছে। আইন ভেঙে আইনের বিচার পাওয়া গেল।

এর নাম হলো, এক অবিস্মরণীয় নাম।

বিপ্লব ও বিপ্লবী বুলির চুলকানি

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গে রোগ চুলকানি। আর যখন বিপ্লবী বুলির চুলকানি লোককে পেয়ে বসে, তখন সেটা খুব চোখে দেখলেই অসহ্য কষ্ট লাগে। আলোচ্য চুলকানিতে যে রোগে সে পরিষ্কার, রোগজ্বালা, অস্বাভাবিক এবং স্নেহশীল জনগণের যে কোন প্রতিনিধির কাছে তর্কাতীত সত্যাসত্যিকে বিকৃত করে তোলে। এই বিকৃতিটা প্রায়ই ঘটে সর্বোত্তম অবতম ও উন্নততম অনুভূতি থেকে, নিতান্তই অকর্মণ্যদের তাত্ত্বিক মহলে অপরিসাধারণত্বে, অথবা তাদের আনাড়ি ছেলেদের ছাত্রসমাজে, ছাত্রসমাজের অপ্রাসঙ্গিক পুনরাবৃত্তির ফলে, কিন্তু তাতে করে চুলকানিটার অবর্ণতা কমে না।" (ভি. ই. লেনিন রচনাবলী, ৩৫শ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা) ১৯১৮ সালে লেনিন বিপ্লবী বুলির চুলকানিগ্রস্তদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি প্রসঙ্গে সেই কথা প্রযোজ্যের মত সময় আর আসে নি। লেনিন এই চুলকানি-গ্রস্তদের সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্যে বলেছেন, এদের স্নানাগারের পরে জলে ফেলাই বিধেয় হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই এই পথ প্রয়োগ হবে কিনা সেটা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কথা, কিন্তু তার আগে এই চুলকানিগ্রস্তদের চেনা ও চেনা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কম করে দেড় ডজন, আর এই দেড় ডজনের অন্তত বিপ্লবে বিশ্বাসীর সংখ্যা প্রায় পৌনে দেড় ডজন বলা যায়। এই পৌনে দেড় ডজন দলের মধ্যে বেশীর ভাগ দলই মনে করে, আজ যা কিছু চলছে তা ঠিক চলছে না, কাই ঢের বদলা এবং সব কিছুই ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন। শুধু তা এতটা নয় মনে করে না বিপ্লবের ঢেউ প্রস্তুত, জনগণও প্রস্তুত, এখন শুধু, শুধু, একটা ধাক্কা দেওয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরী হয়ে গেছে এবং এই দলগুলিই বিপ্লবের কাজ সফল করে তুলবে।

বিপ্লবের ঢেউ প্রস্তুত—তাই রাজনীতি শুধু বোমা, গুলী চলছে, মানুষ মরছে, পুলিশকে সর্বশক্তিমান এবং অনিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী দেখানো হচ্ছে। পুলিশের হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে রাজনীতি জনজীবনের যেখানের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে। দেয়ালের লেখা থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত সবই পুলিশের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়েছে। মানুষ ভয়ে, সন্ত্রাসের হাতে সবলে মরছে। যে যাকে খেতাবে পারছে মারছে; পথে, ঘর-কারখানায়, বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে সর্বত্র মারা পড়ছে, নুনের মতো গলে যাচ্ছে দিনের পর দিন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সামনে স্বামীকে, মায়ের কোলে ছেলেকে, রাস্তায় পথচারীকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষককে, ইউনিয়ন অফিসে শ্রমিক নেতাকে হত্যা করা হচ্ছে। বাড়ীর মুরুব্বি মার আর সেই সঙ্গে বাড়ীর পুলিশ, সি-আর-পি, সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর শক্তি। এর মতো শক্তির মদত বিতর্কিত করে দূরে যাবে, তুলে ধরবে—বিপ্লব আসছে, বিপ্লব এল বলে।

বিগত যুক্তফ্রন্টের চেষ্টায় বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, বিগত কংগ্রেস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তথা কিছু অন্তত চুরি-উৎপাদনে পৌঁছবে বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল—সেই শক্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নতা রাজনীতির উন্নত স্তরের মতো অন্তত তথাকথিত বামপন্থী দল। বিগত যুক্তফ্রন্টের চেষ্টায় যাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, সেই কংগ্রেসও আবার আসনে নতুন

[illegible] তিরিশে আনা হচ্ছে। শুধু ও একা নয়, এককালে যে যুক্তফ্রন্টের শরিক ছিল এখনে কারা [illegible]। শুধু যুক্ত ওরা নয়, সেই শরিক দলের [illegible] ও [illegible] ছুটে চলেছে। [illegible] [illegible] [illegible]

নাম এঁদের মধ্যে একজনও উচ্চারণ করা যায় না। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর সি পি এম থেকে বেরিয়ে যেসব বিপ্লবী বিপ্লবীদের এক সমন্বয়-কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি পার্টি (মেদিনীপুর-তমলুক-কাঁথি) ছাড়া আর কোনও পার্টি বা গ্রুপ কোনও সময়ে এক সঙ্গে একত্র হয়ে কোনও একটি সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। এমন কি সমন্বয়-কেন্দ্রের সভায় এই নতুন দলের জন্ম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু দল সৃষ্টির পর, বেশীদিন আগে নেই দল ভেঙে দল ভারী হয়ে গেছে। এরা কেউ কারো সঙ্গে মেলে না কেউ কারো দ্বারা দাবিয়ে যায় না, এরা সবাই সবাইকে কিল মারে। শ্রীঅসিত সেন ও শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে শ্রীযুক্ত নক্সালবাড়ীর স্থান আর শ্রীযুক্ত চারু মজুমদার ও শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্যীর কাছে শ্রীঅসিত সেন, শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্য ও শ্রীকানাই ভট্টাচার্য সকলেই ভট্টাচার্য-বংশধর।

নক্সালবাড়ী-সোনারপুরী কম্যুনিষ্ট দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে যে কথাটা প্রথম করা হয় তার মূলে কথা হল ভারতে বিপ্লব সৃষ্টির ভার কাদের নিতে হবে। যে নেতারা এই বিষয়ের মোল এজেন্সি নিয়েছেন, তাঁদের কারো অতীত কখন যা পার্টি জীবনের কার্যধারা বড় বিপ্লবীদের পরিচিত ছিল না। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে থাকাকালে এঁরা কিছু বিপ্লবী কাজ করে থাকলে তা অত্যন্ত উপলক্ষীয় বিষয়। এঁরা কেউ কোনদিন সংসদীয় নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী করেন নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে অবশ্য মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এঁরা কখন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নি, তখন বিধানসভায় থাকতেন, কখনও জয়ী, কখনও পরাজিত, কখনও আবার ১৯৬৭ সালের পর বিধানসভা বাইরে বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। আবার এই নেতৃবৃন্দের কিন্তু চিরকালই সশস্ত্র আক্রমণ বা যুদ্ধজয়ের পথে বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, এখনও তা।

১৯৬৮ সালের ২২শে নভেম্বর ঐক্য সংসদ জনতা কোঅর্ডিনেশন কমিটির এক সভায় কানাইবাবু ও তাঁর কন্যা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীকে এই ঘটনা বলি। এই ঘটনার সাত দিন পর সিদ্ধান্তকমিটির শ্রীযুক্ত মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনে (২৭শে নভেম্বর) বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন আন্দোলন কিছু হবে না—এঁরা নক্সালপন্থীদের মতামত মত তার অস্তিত্বের মানে কিন্তু এই মত বলেন দেন, তার ফলে দেশব্রতী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে সমর্থ হলো মতামত তালিকা। শুধু মতামত তালিকা নয়—সেদিনটাকে বেছে নেওয়া শ্রীযুক্ত মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু মতামত তালিকা নয়—সেদিনটাকে বেছে নেওয়া শ্রীযুক্ত মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নক্সালবাড়ী-সোনারপুরী কম্যুনিষ্ট দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে যে কথাটা প্রথম করা হয় তার মূলে কথা হল ভারতে বিপ্লব সৃষ্টির ভার কাদের নিতে হবে। যে নেতারা এই বিষয়ের মোল এজেন্সি নিয়েছেন, তাঁদের কারো অতীত কখন যা পার্টি জীবনের কার্যধারা বড় বিপ্লবীদের পরিচিত ছিল না। কম্যুনিষ্ট পার্টিতে থাকাকালে এঁরা কিছু বিপ্লবী কাজ করে থাকলে তা অত্যন্ত উপলক্ষীয় বিষয়। এঁরা কেউ কোনদিন সংসদীয় নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী করেন নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে অবশ্য মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এঁরা কখন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নি, তখন বিধানসভায় থাকতেন, কখনও জয়ী, কখনও পরাজিত, কখনও আবার ১৯৬৭ সালের পর বিধানসভা বাইরে বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। আবার এই নেতৃবৃন্দের কিন্তু চিরকালই সশস্ত্র আক্রমণ বা যুদ্ধজয়ের পথে বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, এখনও তা।

১৯৬৮ সালের ২২শে নভেম্বর ঐক্য সংসদ জনতা কোঅর্ডিনেশন কমিটির এক সভায় কানাইবাবু ও তাঁর কন্যা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীকে এই ঘটনা বলি। এই ঘটনার সাত দিন পর সিদ্ধান্তকমিটির শ্রীযুক্ত মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনে (২৭শে নভেম্বর) বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন আন্দোলন কিছু হবে না—এঁরা নক্সালপন্থীদের মতামত মত তার অস্তিত্বের মানে কিন্তু এই মত বলেন দেন, তার ফলে দেশব্রতী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে সমর্থ হলো মতামত তালিকা। শুধু মতামত তালিকা নয়—সেদিনটাকে বেছে নেওয়া শ্রীযুক্ত মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কেন্দ্র নিয়ে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি আর রাজ্যের প্রায় সব বিপ্লবী দলের আন্দোলন ভর-কেন্দ্রী হয়েছেন, তবে অনেকে চুলচেরা আর নক্সালপন্থীরা সাহসভরে। সেটা বলেছেন। এইদিক দিয়ে নক্সালপন্থী দল অনেক বেশী সাচ্চা ও সাহসী। যাদের জোরে দলটা গড়ে বুদ্ধিজীবী মধ্যে করে অন্য দলের কর্মীকে হত্যা করতে কেউ মুখ পিছিয়ে নেই, তবে দোষটা বেশী পড়বে নক্সালপন্থীদের ওপর।

বিপ্লব করছেন নক্সালপন্থীরা। কি বিপ্লব, কিসের বিপ্লব—সেই কথা সাধারণ মানুষ জানে না, অন্তত আমাদের কখন মানুষ যারা হচ্ছে—কিন্তু কেন আমি জানি, আমি বঞ্চিত, আমি লাঞ্ছিত, আমি কুণ্ঠার্ত, আমি বিপ্লব করতে চাই—হাঁ, আমার কথার আর মেঠোরার হাত থেকে ছেড়ে নিতে চাই কিন্তু কে আমার হাত ধরে, যে আমার সঠিক প্রতিপক্ষ, কাকে ঘরে করলে আমার দুঃখ, দারিদ্র, আমার প্রতি অন্যায় অবিচার দূর হবে, তার হবে। কে সেই শত্রু? একজন জোতদার, একজন ১৫০ টাকা মাইনের অফিসার, একজন ১৬০ টাকা মাইনের স্কুলশিক্ষক, একজন প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এদের মধ্যেই কি আমার অতীতে লাভ হবে? কজন মানুষ মাথায় বা করেছেন কালী পটকা, বাবী পটকা অথবা বোমা-বন্দুক হাতে পেলেই কি আমার শত্রুকে খতম করতে পারবো? কজন খতমের মাধ্যমেই কি দেশের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে বোমার ধাক্কায়, হাসপাতাল বন্ধ হচ্ছে বোমার আক্রমণে—তারপর কি হবে? স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল বন্ধ হলেই কি বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে? লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে নেই—আমি এতখানা বেরিয়ে পড়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তাই দিয়েই কি সব পরিবর্তন করে ফেলবো? আর কোথায় পরিবর্তন করবো? পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একটা গলিতে বা মেদিনীপুরের একটা গ্রামে, সমস্ত ভারতবর্ষে তার কি মূল্য আছে? পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটা গ্রামে না হয় সাময়িক পশ্চিমবঙ্গের হয়ে আসলেই বা কি হবে? তারপরই কি পশ্চিমবঙ্গের অফিসটা গ্রাম অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের অংশ-পাশের রাস্তা বা অফিসটা গ্রাম?

বিপ্লবের জন্য আরো যে সব এজেন্সী পশ্চিমবঙ্গে আছে, সি পি এম, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস ইউ সি তার অন্যতম। আলাদা-আলাদাভাবে বিচার করলে যে সব দোষ ও বিচ্যুতি নক্সালপন্থী কম্যুনিষ্ট দলে আছে, সে সব বিচ্যুতি এই সব দলেও আছে। নক্সালপন্থীরা মুখে ভাঙা চালাচ্ছে ও চলবে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে—এরা সেটা করে না। কিন্তু সুযোগ পেলে নাম ও বেনামে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ, প্রতিপক্ষ দলের কারো খুন কাটায় এঁরা ও কেউ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য নন। কিন্তু অল্প-বিস্তর সব মাছেই খায়, তবে দোষ হয় শুধু ছোঁয়া মাছের। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যের অরাজকতা অনাসৃষ্টি ও অশান্তির জন্য নক্সালপন্থীদের দোষী ও দায়ী করা হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর থেকে এই দলগুলিও বিপ্লব করছে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে, গণ-জাগরণ আর শ্রেণীসংগ্রামের নামে যা করছে ও করছে সেটাও নক্সালপন্থীদের কাজ থেকে খুব উন্নত মানের নয়। কলকাতা সহ সারা রাজ্য দেখতে হলে মানুষকে পরিষ্কার করা, সমাজবিরোধীদের দলের তকমা পরিয়ে বিপ্লবী তৈরী করা এবং সেই সমাজ-বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষী দেখে গৃহবিপ্লবের

অ্যাটর্নীজনারা বেশের পাওয়া—সবই এক লাল বিপ্লবের পক্ষপাতী। এই বলশেভিক মনোভাব ছেলে বড় হল—সি পি আই-এর বিপ্লবী পার্টিপার্টির অবস্থাতে এসে এমনের যে, একদিকে তাঁরা সিপাহীদের অন্তরের, অন্যদিকে, সংগঠন চালাবার সময়ের কল্পনা এক পায়ে দেখে বসছেন (যেমন জোতদারের অন্যায় প্রসঙ্গে), আবার কেরলের নির্বাচনে দু ভাই সি পি এম ও সি পি আই বিপক্ষের অন্তর্ভুক্ত ঘটিতে কেউ লাল, কেউ সিপিআইকে মনের মতো নিজের অন্তরাত্মাকে ছিধা করে নিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গেও পরিস্থিতি একরকম। সমস্ত প্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তদের মত দু ধরনের আলাদা সৃষ্টি করা হয়েছে—বিপ্লব ও বিপ্লবের প্রস্তুতির নামে। বিপ্লব এজন্য এসিয়ার লোক যে, ১৯৩৯ সালে গ্রাণ্ডকেনী আইন প্রণয়নে চাল-চাহের পশ্চিমবঙ্গে অর্থের দিকের প্রায় ৪০ বছর পিছনে টেনে আনা হয়েছে এবং সি পি এম বলেই বিপ্লবসম্ভবে নির্বাচিত সদস্যরা ছেলে আসে থাকেন এবং ছেলে ছোট ছোট আন্দোলনে মেলে পথে আন্দোলন চিল ছোড়ে। (ইন্দোকুলালের রাজের বুকমার্ক খানা ছেলে ছোট আন্দোলন চিল ছুড়েছিল, আরো অনেক কিছু নিটোরেছিল)। এই হল বিপ্লব। সি পি এম বলছে ইসলামি ছোট সার্টিফিকেট ছেল গত বছ বছর, রাজা মোদ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎগুপ্তরাও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন, এই সব হল বিপ্লবের লক্ষণ। কেরলের নির্বাচনে সি পি এম ছেড়ে দেয়, কৃষ্ণাঞ্চলে নিজেদের আন্দোলনের ভুলত্রুটি স্বীকার করতে হয়েছে—কলকাতাকে ছোটও ভারত চলাচল অচল করার ডাক ছেড়ে দেয়। সব কিছুর শেষ কথা হচ্ছে নির্বাচন চাই। সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র-যুব সকলেই আন্দোলনে নামেন, কিন্তু শেষ কথা হল নির্বাচন চাই। একদিকে নির্বাচন, নির্বাচনের পরীক্ষে ছতরাল, বর্ষাকে আর অন্য দিকে বিপ্লব ও সংগ্রামসমূহের ডাক—এই দিয়ে এক অদ্ভুত ছোঁয়া সৃষ্টি হয়। তবু এর মধ্যে নিজেদের সাচ্চা বিপ্লবী বলে এবং বিপ্লবের জন্যই সব করা হচ্ছে—ছোলার বিরাম নেই। এই বিরাম সরকারপক্ষকী কর্মসূচিই আর সি পি আই-এম সব এবং কারণকী সব একই ছোলের আলী। বিপ্লবের সব চেয়ে বড় শত্রু, মূল বিপক্ষী শত্রু। তাও সে-কথা আর আর কলেজের পরিচয়েই একমাত্র বিপ্লবী ভাষার অত ভুল ও ছোলামী নেই। ছেলিন কলেজের পরিচয়ী বাদ দিয়ে প্রায়শই বিপ্লবী পার্টির বাদি চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বাদ বিপ্লবের কথা বলে সুনিল ও সি-আর-পির অতিমাত্রার মধ্যে অনেককে টেনে নিচ্ছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে ছোলিয়ের আরো অনেক কথাই উল্লেখ করা যায়। ছেলিন—ছেলিন বলেছেন, পশ্চিম বুর্জোয়া ও ছিন তার একটা পরিবর্তন হল বিপ্লবী বাঁচাতে যাবে। বহুদলীয় বাদ বিপ্লবে হবে প্রোলেটারিয়েট হেজেমনি বা শ্রেণীবাহিনীর নৈতিকতা।

মাওয়ের ছোট, অনেক কথা বলে ছেলে, অনেকের মধ্যে চলমূর্তি ছেলে—তবে কথা ছাড়ার কথার মুহূর্তের পরের ছোলা অথবা নির্বাচনে ছেলে নিয়ে বিপ্লবের চলমূর্তিতেই আবার নির্বাচন হয়ে হল বিপ্লবী দল প্রকাশ করা—এই সম্বন্ধেও ছোলিন বলেছেন, পরিবর্তে অনেকটা মাওয়ের এসব বাদি কিন্তু তাদের চীন ছেলে, এই হল বিপ্লবী বাদির মূল কথা। পশ্চিমবঙ্গে এখন ছেলে বিপ্লবী বাদির চলকাবিতেই ঘুরছে।

আমার কাছে প্রায়ই নালিশ আসে যে, নজরুল ইসলামের গান বিজ্ঞাপনের ও বিচিত্র সুরে কেন গাওয়া হয়? বইতে লেখা ছাড়ার সুরে গীত গানের ছাড়ার ওপরে—এমন কি, অনেক সময় অন্য গীতিকারের গানও নজরুলগীতি বলে চালিয়ে দেওয়া—এই সব ঘটনা প্রায়ই ঘটে, ফলে চলমান 'নজরুলগীতি' নিয়ে এক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সম্প্রতি লেখা গান 'নজরুলগীতি' বলে চালাবার চেষ্টা কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি নিজেই দেখেছি। "ডিঙী নায়ের টানা হাওয়ায় পরাণ আমার কাঁদে গো" —গানখানি কবি রমেন্দ্র দত্তের লেখা—'নবনজরুল' নামক 'কালিপদ পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রকাশিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন গায়ক গানখানি 'নজরুলগীতি' আখ্যা দিয়ে অবলীলাক্রমে "অকাল-বাদী" মারফৎ গেয়েছেন। অনেক "নজরুলগীতি" প্রতিযোগিতায়ও কয়েকটি প্রতিযোগীকে গাইতে শুনেছি। অবশ্য আমি যে যে প্রতি-যোগিতায় বিচারক ছিলাম সেখানে গান-খানি গাইতে বাধা দিই ও অন্য গান গাইতে বলি। আর একখানা গানের কথা বলি—"বিদিরা ভেকো না মরুয়া মনের পাখী"—এটি কবি ধ্রুব রায়ের লেখা ও কমল দাশগুপ্তের সুর দেওয়া। কয়েক বছর আগেকার কথা,—গ্রামো-ফোন রেকর্ডে মানব মুখোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বরবাবুর শিক্ষকতায় গানখানি "নজরুলগীতি" বলে রেকর্ড করেন—কিন্তু আমার সম্মানিত হস্তক্ষেপে এই ভ্রান্তিকর ত্রুটি শুধরে নেওয়া হয়। এর পরেও কয়েক জায়গায় গানখানি "নজরুলগীতি"—আখ্যা দিয়ে গাওয়া হয়েছে—জানি।

একদিন রেডিওতে ফিরোজা বেগম জ্ঞান গোস্বামী মহাশয়ের গাওয়া বিখ্যাত গানখানি—"আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়" "নজরুলগীতি" বলে চালিয়ে দিলেন—আসলে কিন্তু এখানি কবির লেখা নয়।

এই সব দেখেশুনে "নজরুল-গীতি"—বর্তমানে একটি পিতৃমাতৃহীন শিশু বলে মনে হয়।

অথচ রামপ্রসাদী, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ডি এল রায় ও অতুলপ্রসাদের গানের মত "নজরুলগীতি"কেও আমরা একটি বিশিষ্ট স্থান দেবার সঙ্কল্প নিয়েছি—কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্যকরী করতে যে সব বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেই সম্পর্কেই এখানে বিশদ আলোচনা করতে চাই।

প্রথমেই ধরা যাক,—কোন একটি সঙ্গীতকে "মান"-এ তুলতে হলে তাকে একটি বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বাঁধতে হয়, তবে গায়কীর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আনতে হয় যা অন্যান্য সঙ্গীত থেকে আলাদা। কী কণ্ঠে, কী বাদ্যযন্ত্র পরি-বেশন কালে এর রূপ শুনে বা দেখেই এক কথায় একে চিনতে পারা যায়। যেমন ধরা যাক "রামপ্রসাদী গান"। এ গানের কথা, সুর ও গাইবার বিশেষ ঢঙ শুনলে চিনতে মোটেই কষ্ট হয় না। আমার মনে হয় এটি সম্ভবপর হয়েছে, যেহেতু এক ব্যক্তিই গানটির কথা, সুর ও গায়কীর স্রষ্টা। রবীন্দ্র সঙ্গীতও ওই একই কারণে চিনতে দেরি হয় না। ডি এল রায়ের গান বা অতুলপ্রসাদের গান শুনেও বুঝতে পারা যায় কোনটি কি। কিন্তু নজরুল ইসলামের সৃষ্ট গান-গুলিকে "নজরুলগীতি" আখ্যা দিয়ে একটি শ্রেণীবিন্যাস করতে গেলে অনেক-গুলি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করবার আগে নজরুলগীতি রচনার উৎস সম্বন্ধে কিছু জানা উচিত।

কবির বেলাতোলাক, গজল, কীর্তন, বাউল, ঝুমুর ও শ্যামাসঙ্গীতগুলি আমার মনে হয়, 'নজরুলগীতি' আখ্যা দিতে কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে না, কবিও তাঁর স্বদেশী আমলের কিছু গানে "ডি এল রায়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় আবার কিছু গানের সুর মুকুন্দ দাস এবংস্বরের দেওয়া—তথাপি এগুলির মধ্যে কবির নিজস্ব ছাপ সম্পূর্ণ বর্তমান। তাঁর প্রথম আমলের গজল গানগুলি দিলীপকুমার রায় মহা-শয়ের গায়কীকে ভিত্তি করে রচিত এবং দিলীপবাবু এইগুলি গেয়ে বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেন। গান-গুলির মধ্যে আছে—(১) বাগিচায় বুল-বুলি তুই ফুল খাসনে দিসনে আজি দোল, (২) আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে যে বঁধুয়া, (৩) এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে, (৪) সখী বলো বঁধুয়ারে নিরজনে, (৫) কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে প্রভৃতি।

আমার একখানা ছাত্রের সামনে ভাসে শনিবারের চিঠির পাতায় আঁকা শ্রীযুক্ত বাবুর নজরুল ইসলামের গজল গান গাওয়া অবস্থায় কাটুন ছবি।

কবির লেখা গানের বই (বুলবুল, ১ম খণ্ড), যার মধ্যে বেশির ভাগ গানে সিদ্ধ এইসব গজল যা দিলীপবাবুর নামে উৎসর্গ করা। বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

ঝুমুরের ঢেউ লোক তিনি, তাই তাঁর ঝুমুর গানগুলি অপূর্ব এবং এগুলির মধ্যেও

তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কীর্তন, ভজন ও শ্যামাসঙ্গীতগুলি কবির অমর সৃষ্টি বা কীর্তি বলা যেতে পারে। বিখ্যাত কীর্তনীয়া রামকমলের কীর্তন ও আখর তাঁকে প্রথম কীর্তনে অনুপ্রাণিত ও অনুপ্রেরিত করে। কবির ঠুংরী, দাদরা বা নৃত্যসঙ্গীতের বহু গানের সুর ওস্তাদ জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ বহু সাহেবের খাম্বাজ সুরের গানের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেও তিনি লিখেছিলেন। আরবী প্রকৃতির সুরের ওপর যে সব গান রচনা করেছেন সেগুলির সুর পেয়েছিলেন ওস্তাদ আবদুস-সালাম সাহেবের কাছ থেকে। যেমন:—

(১) চমকে চমকে ধীরু ভীরু পায় পরীবালিকা কলসে যায়।

(২) লুকানো পাতার মধুর গানে নাচিছে ঝিঁঝিবালা।

(৩) মমীর ঘোমটা মোমের পুতুল নেচে যায় প্রভাতে।

শিবাবু কাওয়াল ও কালু কাওয়ালের গাওয়া গানের সুরের ওপরও অনেকখানি গান তিনি রচনা করেন।

একদিন সে সুরের একখানা বিখ্যাত ইংরাজী চলচ্চিত্র "দেখার আগে যা দেখতে চোখের কবির সঙ্গে। কবির নায়ক গ্রামোফোনের কণ্ঠে "কখন টু মি হোয়েন দি ফ্লুন সিলন্" গানখানি শুনে তিনি পাগল হয়ে গেলেন। গানটি শোনার পর থেকেই প্রথম লাইনের সুরটি সেখানে বসেই গুনগুন করে গাইতে লাগলেন, বাকী ছন্দটা আর কবির কাছ দিয়ে ঘেঁষাই হল না। তারপর বাড়ি ফেরার পথে মুখে মুখেই রচনা করলেন, "সুদূর স্বপ্নবাসিনী চিনি তোমারে চিনি"। কিন্তু এ গানখানি সে সময় শেষ করা হয় নি। কিছুদিন পরে

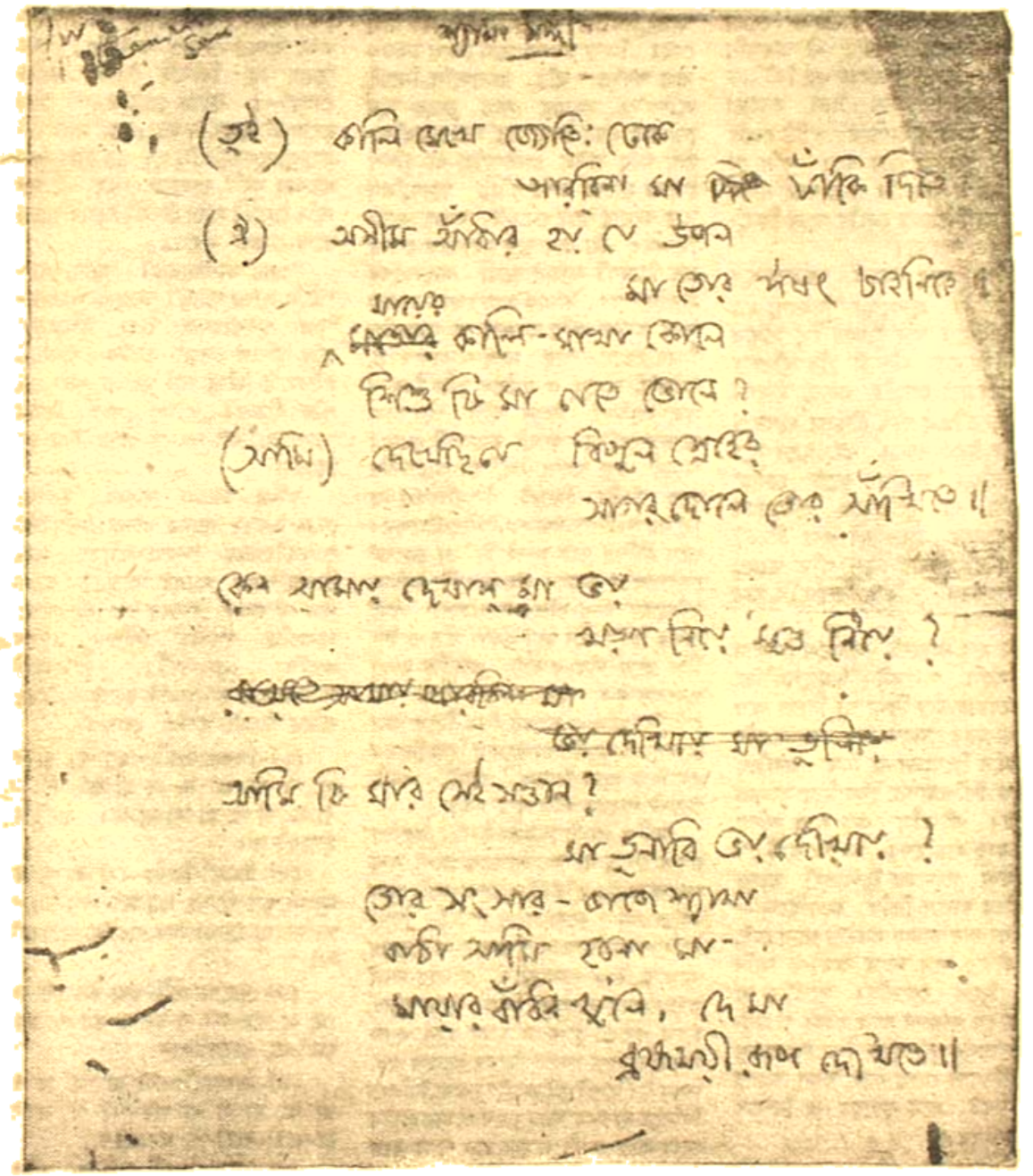
শ্যামা সঙ্গীত

(দুই) কালি রেখো তোমি: লোকে
আমিনা মা কিছু বলিবে দিবে
(২) এমনি আঁধার হয়ে সে ভবন
মা তোর দখং চাইনিকে
মাগো
কালি-মাগো কোলে
শিশু টি মা নেও তোরে?
(তৃতীয়) দেখেছিলে বিশ্বে শ্রেষ্ঠে
সাধন তোমার কে সাধিতে॥

কেন মাগো দেখাস্ না তা'
মাগো নিয়ে যেতে নিয়ে?
~~কখনই সাধন তোমার~~
~~তোর দেখিয়ে মা তুলিয়ে~~
আমি কি মাগো সে সন্তান?
মা তুমারি তো দেখিয়ে?
তোর সংসার - তোর শ্যামা
কভি সাধিয়ে হবেনা মা-
মাগো আঁধার হবে, দেখা
বুঝাবো কত লোকে॥

একখানা "টাইটিল" রেকর্ড কিনে আনলেন—যিনি তাঁর নাম বংশের মনে হচ্ছে "ইন্দ্রাণিলতা"। "আমি চুপি চুপি গানখানির সুরে এই গানটির খুব মিল ছিল। এই গানের মিউজিক ও সুরের ঝঙ্কার খুব আশ্চর্যজনক" এতদিন শেষ হল। রবিবার রাত্রে মহাশয় আমি রেকর্ড থেকে মিউজিক তুলে নিলেন। তাঁদের হিজ মাস্টার্স ভয়েসে গানখানি রেকর্ড করানো হল ১৯৩৬ সালে। পরবর্তী কালে ১৯৪১ সালে পুনরায় আমি ঐ গানখানি আমার সুর ও মিউজিক বজায় রেখে সুরশ্রী গেরীতে নিয়ে বসন্তশ্রিরা রেকর্ডে গাওয়াই। বর্তমানে ফিরোজা বেগম এইচ-এম-ভি-তে আবার ঐ গানখানি গেয়েছেন কিন্তু শুনলাম এর মিউজিক এবং সুরের রেকর্ডিং ভিন্ন প্রকার। সেইজন্য নজরুল ইসলামের সৃষ্টি থেকে বরফট আলাদা মনে হয়। কবি যে চমৎকার এ গানখানি রচনা করেছিলেন তার দ্বারা ফিরোজা বেগমের গানে কিছু-মাত্র পাওয়া যায় না।

কবির গানে আরো অনেকে সুর দিয়েছিলেন। সুরেসাগর "হিমাংশু দত্ত কবির বিখ্যাত গান "কোন সে সুদূর অশোক কাননে বন্দিনী তুমি সীতার সুরে সংবেদনা করেন। এছাড়া উমাপদ ভট্টাচার্য, ধীরেন দাস, প্রিয়তমা দাসগুপ্ত ও আমি নিজে কবির বহু গানে সুর দিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ড করিয়েছি বা রেডিওতে গাইয়েছি। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এবং শ্রীমতী দীপালি ভালুকদার (নাগ)-গীত গানের সুরের ওপরও কবি কতকগুলি গান রচনা করেন।

এই সব কারণেই নজরুল ইসলাম রচিত সকল গানকেই 'নজরুলগীতি' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তা বিচার করে দেখা দরকার। অবশ্য যে সব গানে কবি নিজে সুর দিয়েছেন বা নিজ তত্ত্বাবধানে সকলকে শিখিয়েছেন, সেগুলির সংখ্যাও কম নয়। এইগুলি এক সময় কবির অর্থের কারণ হয়েছিল। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ সমক্ষের উদ্যোক্তারা সভায় সভাপতির আসনে তিনি বলেছিলেন—"সাহিত্যে গান আমার কতটুকু জানা নেই, তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

কবির সঙ্গীত সৃষ্টির সময় মাত্র ২২ বছর। এই সময়ের অবশ্য কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। অবশ্য তাঁর দেখে। দলে থাকার সময়টি এর মধ্যে ধরছি না। ১৯২১ সাল থেকে ২৫/২৬ সাল পর্যন্ত তিনি যে সব গান লিখেছেন সেগুলির বেশীর ভাগ নিপীড়িত অথচ ঘুমন্ত মানুষ ও সমাজকে জাগিয়ে তুলবার গান। এই গানগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ।

এর পরের কয়েক বছর অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রচুর গান রচনা করেন এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এগুলিও বিশেষ স্থানের অধিকারী। এই ১০ বছরের রচনাগুলিকে "নজরুলগীতি" আখ্যা দিতে কোন বাধা নেই। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর রচনাগুলি নিয়েই মুস্কিল। অন্যের কাছ থেকে সুর নেওয়াটা এমন কিছু নয়, কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাউল, ব্রহ্মসঙ্গীত বা বিদেশ দেশের সুরের ওপর রচিত গানগুলির সুর অন্যের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। ডি এল রায় মহাশয়ও শোনা যায় বিদেশী সুরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কবি নজরুল যে গানগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, ঝুমুর ও বাউল তাঁর নিজস্ব সত্তা বর্তমান, কিন্তু তাঁর আধুনিক গানের বেশির ভাগই ফরমাশী লেখা। অনেক সময় অবশ্য এগুলির কয়েকটির সুর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন বা নিজের স্টাইলে অন্যকে শিখিয়েছিলেন। তবে বেশির ভাগ গানই বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীর কর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন গায়কের জন্য রচিত হয়েছিল। এবং কখনও তিনি মনে মনে একটা সুরে ও ছন্দ ঠিক করে তার ওপরই এগুলি রচনা করতেন, এবং গায়কের হাতে পড়ে সেগুলি সুরে ও ছন্দের দিক দিয়ে অন্য রূপে রূপায়িত হয়েছিল। লেখার দিক দিয়েও এগুলির মধ্যে অনেক গানই একটু নিম্নস্তরের বলে মনে হয়।

কবির একটা অভ্যাস ছিল, রাস্তায় যেতে যেতে বা অন্যলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর হঠাৎ হয়ত একটা ভাল লাইন মনের মধ্যে এসে গেল। তিনি সেটাকে একটা আলাদা খাতায় বা টুকরো কাগজে টুকে রাখতেন। তারপর যখন গ্রামোফোনে কাজের খুব চাপ পড়ত, তখন একসঙ্গে ৩।৪ খানা গান ৩।৪ জন গায়ককে দেবার জন্য দরকার হত, তখন তিনি ওই "টুকরো" থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে বা তার মাঝে মাঝে দু'চার লাইন যোগ করে একটা পুরো গান খাড়া করে দিতেন। এই গানের দু'একখানা উদ্ধার গেলেও কিছু গানে প্রায়ই থেকে যেত কিন্তু প্রয়োজন মেটাবার জন্য তিনি এই কাজ করতে বাধ্য হতেন। এই সব গান অন্যের দ্বারা সুরারোপিত হত; সুতরাং এগুলিতে কবির বৈশিষ্ট্যের ছাপের অভাব থাকত। আবার এমনও ঘটতে দেখেছি যে, গানের যখন বিশেষ প্রয়োজন অথচ হাতের কাছে গান নেই, তখন তিনি নিজের সুরে কয়া গান, যা হয়ত আগেই আমাদের শিখিয়েছেন বা যার স্বরলিপি বিভিন্ন পত্রিকায় বার হয়ে গেছে, বাধ্য হয়ে কোন গায়িকাকে দিয়ে-ছেন। সেই গায়িকা নিজের মত সুর করে নিয়ে এই সব গান রেকর্ড করিয়েছেন—এমন গানের সংখ্যাও অল্প নয়। যেমন "মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা"—। কবির প্রদত্ত দেশী টোড়ী রাগে এই গানখানি ভারতবর্ষে প্রথম ঘটক প্রযোজনায় স্বরলিপি সহ বার হয়। কিন্তু সুরকার কমল দাশগুপ্ত পরে এই গান-খানি ভৈরবী সুরে শ্রীমতী শান্তা আপ্তের কণ্ঠে রেকর্ড করান।

"যখন 'হাসনুহানা' আমি গো"—"আমি সন্ধ্যা যমুনা বনছায়া অঞ্চলে"—"তবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যালোকায় তুমি করিবে প্রণাম"—প্রভৃতি গানগুলি এইভাবেই কবির সুরে ছাড়াও অন্য সুরে গীত হয়েছে। এইসব গান কিভাবে "নজরুলগীতি" পর্যায়ে ফেলা যায় তাও বিবেচ্য।

কবির ১৯৪০ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৪২ সালের রচিত গানগুলিকে স্বার্থহীনভাবে "নজরুলগীতি" আখ্যা দেওয়া যায়। কবির বিদ্রোহী যুগের গান বা গজল গানের মত এই সময়ের গানগুলি ভাবধারায় বিভিন্ন সম্পদ। এগুলি রাগাশ্রয়ী। কতকগুলি গানের সুরে দু'-তিনটি রাগের সংমিশ্রণে কবির নিজের সৃষ্টি। যেমন:

(১) শিবরঞ্জনী—(দো পা সা গা মা, দা পা, জ্ঞা মা দা পা সা—সা গা মা, দা পা মা জ্ঞা দা সা। বাদী মা, সম্বাদী সা)

(২) উমানী ভৈরব—(সা কো পা দা, জ্ঞা মা, জ্ঞা পা সা, কো সা—কো সা গা জ্ঞা রা, গা রা জ্ঞা সা। বাদী-মা, সম্বাদী-সা)

(৩) অনুরঞ্জনী—(সা জ্ঞা পা জ্ঞা পা, দা সা—সা গা দা পা জ্ঞা ঝা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

(৪) দেবযানী—(সা রা পা, গা মা, রা পা, পা ধা না সা—সা গা রা পা রা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-রা)

(৫) কল্যাণলতী—(নো সা জ্ঞা রা সা, পা মা পা, গা ধা মা, পা না সা—

সা না ধা পা ঋা ঞা রা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

(৬) অনুত্তরঙ্গিণী—(ধা ধা সা ঋা ঞা পা ধা, ধা পা, পা ধা সা—সা ধা ধা পা ঞা ধা পা ধা পা ধা ঞা সা। বাদী-ধা, সম্বাদী-সা)

(৭) আশা-ভৈরবী—(সা ঋা ঞা সা ঋা ধা, পা ধা পা পা ধা সা—সা ধা সা ধা ঞা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

(৮) শিবানী ভৈরবী—(সা রা ঞা পা, ধা সা—সা রা ঞা রা সা ধা পা পা, ঞা ঞা সা। বাদী-সা, সম্বাদী-ধা)

(৯) হুসেনভৈরব—(সা ঋা ঋ ধা পা সা—সা পা ধা পা ঋা ঞা সা। বাদী-ধা, সম্বাদী-ঋা)

(১০) বনকুন্তলা—(পা ধা সা ঋ, ঋা পা ধা পা, ধা সা—সা ঋা ধা পা, পা রা, পা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-রা)

(১১) বেদুকো—(সা রা ধা, পা ধা ধা, পা ধা ঋা, পা ধা সা—সা না পা ধা ঋা, পা রা ধা সা। বাদী-ঋা, সম্বাদী-সা)

(১২) জীরাক্ষী—(ধা ধা সা পা রা ঋা ঞা পা, পা ঋা পা ধা সা—সা ধা ধা মা পা, ধা পা মা ঞা রা, পা সা। বাদী-রা সম্বাদী-পা)।

(১৩) মোক্ষিণী—(সা ঋা ঞা ঋ, ধা পা, ঋা পা পা ধা পা সা—সা না ধা পা, পা ঋা ঞা, ধা, ঋা ঞা ঋা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

(১৪) ক্ষমকরী—(সা পা পা না ধা সা—সা না পা, পা পা পা ঋা পা, পা রা। বাদী-পা, সম্বাদী-না)

(১৫) নির্ঝরিণী—(সা পা পা ঋা পা সা—সা ধা পা ধা পা ঋা ধা ঋা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

(১৬) মোহন চম্পা—(সা ধা ঞা পা, ঋা ধা না ধা, পা না ধা সা—সা না ধা না ধা পা ঞা পা, ধা রা রা সা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

(১৭) হুসেনজুরী—(সা ঋা ধা পা না সা—সা না ধা পা, পা ঋা রা না, ঋা রা না ধা। বাদী-পা, সম্বাদী-সা)

এই রাগগুলি রচনাকালে কবি বলেছিলেন—"আমি স্বপ্নে এই সব রাগ শুনেছি।"

রাগ সৃষ্টি ছাড়া তিনি আর একটি প্রচেষ্টা সুরু করেছিলেন যা সম্পূর্ণ করতে পারলে বাংলা সঙ্গীত সমাজে এক অপূর্ব জিনিষের সন্ধান মেলে যেতে পারতেন। হিন্দীতে যেমন লক্ষণ-গীতি আছে, (অর্থাৎ যে গানের ভাষার মধ্যে রাগের সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তার আরোহণ, অবরোহণ, বাদী, সম্বাদী, গাইবার সময়, বাদ্যযন্ত্রিক স্বর, বিবাদী স্বর প্রভৃতি উল্লিখিত থাকে), কবি বাংলা ভাষায়ও সেইরূপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন। মাত্র দুটি তালের ওপর একটি করে মোট দুটি গান রচনা করেন। তার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে আমরা দুর্ভাগ্যবশত এক অপূর্ব সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলাম। রচনা কয়টির বিশ্লেষণ সমেত উল্লেখ করা গেল।

১। (আশাবরী তাল) আশাবরী তিতাল।
যে নট ভৈরবী আশাবরী।
ঐ যে করুণ সুরে বিসরি॥
(দুঃখ পা ও নি বর্জিত)
প্রতীক্ষায়ও ধরা-স্বপনে,
(বাদী-ধা, সম্বাদী-গা)
ঝরে আঁখে জলধারা নয়নে,
তীব্র নিষাদ-তাপ কোমল করি॥
(নি, ধা ও গা কোমল)
পল্লবে কোরেলিয়া করে ঘায়
(পঞ্চম ন্যাস স্বর)
প্রথম প্রহর দিবা ঘরে যায়
(গাইবার সময়)

শুধু গগনা দিতে আসে ঐ
দুখ তার কবি ও মনোমনী তোড়ী॥
২। (কল্যাণী তাল) প্রবীণ কি—তেওরা।
প্রবীণ কি জানিল আমার।
দিন কি যে শেষ হল মোর
নিরাশার॥ (গাইবার সময়)
বিরহ যাপন কি যে দুরূহ
বৈকালি ধরে ওদু অভাবে,
উঠিবে কি চাঁদ আর হবে না আঁধার॥
সে কি যে রাজারে ভাজিয়া
চলেছে (অরোহণে রে ও ঋ বর্জিত)
অরোহিবে মধুরার তরে?
অনুনয় আবার কি বাঁধিবে মোরার?
৩। (খাম্বাজ তাল) রাগেশ্রী—ত্রিতাল।
তার অনুরাগে ত্রিভুবন উজলে।
কার, সুখে অনুদিন বঞ্চিলে
চঞ্চল॥
(সা পা পা মা ধা না র্সা)

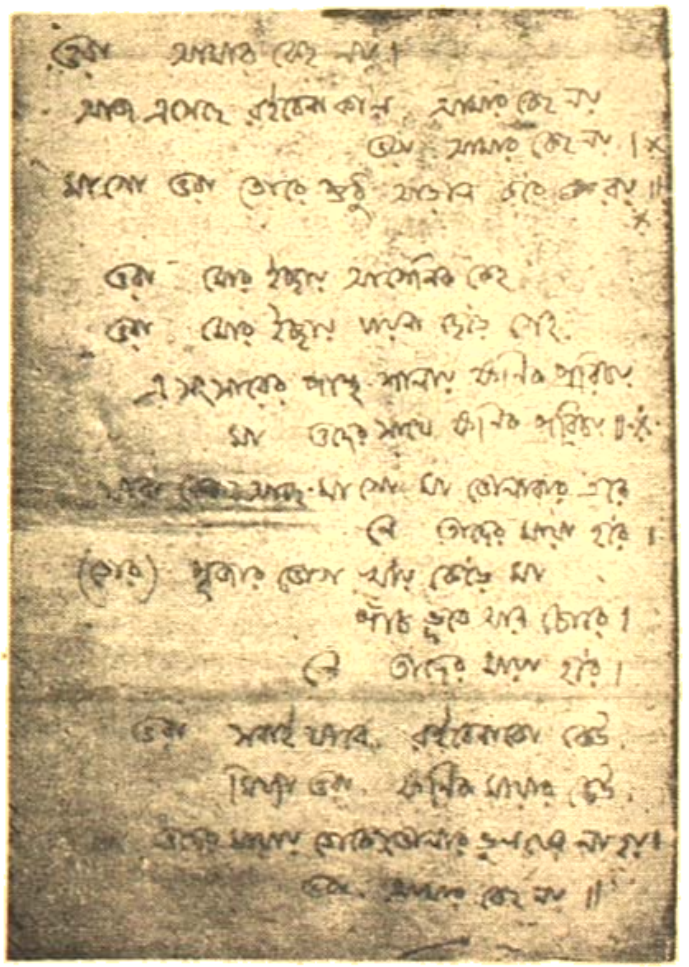

কবির হস্তাক্ষরে স্বরলিপীর

হে নাথ তোমার কুসুম নিশাদ-
পর (ছুই মি লয়ের)
ধরে যে প্রাণি কেন সকলে
হলাহল॥
যে, সাধের মুখের খনি কুহু, পঞ্চম
তানে (পঞ্চম স্বরের পর না লাগে)
যে নিলো চুরি সে যে না কেন নাহি
চুরি (কিন্তু এ স্বরে না বর্জিত)
তোমার নাম কাম তোমরী
কোন দীন নিল বাঁধি—
(আরোহীতে কোমল ধা ও নি)
সব গরল প্রভু—(সা রে গা মা ধা)
তার, সুধা আজি গরলানি হইলে
বিধির॥ (সা ধা মা গা রা সা
পা ধা অবরোহী)

৪। (বেলাবল ঠাট) সপ্তরা—ত্রিতাল।
সপ্তর সুরে পঞ্চম আওল।
চিরদিন মোর আঁখি চেয়ে
বিভাওল॥
ওঠালে ত্রিতালে
(ঋষভহীন, সা মা, গা পা, পা না
ধাসা)
নীল বনে পুষ্প
(না, পা, ও (রা) না গা)
পঞ্চ স্বর সঙ্গে করি সপ্তরী
গাওল॥ (সা ধা পা ধা নি)
মোদিনীরা ভবে, পরে বিরস বুদ্ধি
(মা পা না রা—বোধ হয়ে হয়)
আয়া-ঢেলে রাতে ঘেরে পায় খুঁজি
(সা পা না)
হেরি নিলাক পাখি
মুখে, ঘোচা তাঁরি
দিকবসনে হোরির আছে ঢাকা
নুকাওল॥ (রে ও ধা বর্জিত)

৫। (কল্যাণ ঠাট) পূর্ণ কল্যাণ—
একতালা।
নিত্য পূর্ণ কল্যাণ রূপে আছো
তুমি মোর সাথে।
আজ নিবিড় সন্ধ্যায় যেই পথ ভুলি
বা হয়ত॥ (সা ন্যা ধা—গাইবার
সময়)
প্রভাতে স্বরূপ-রূপে
(পা ধা সা, সা রা গা পা সা)
প্রকাশো করুণা তবে,
সিদ্ধ শান্ত চোখ হতে প্রভু আবরণ
পড় ফেলতে॥ (রূপের অন্তর্নিহিত
ভাব বা রস)
আজ ওতিয়ে যে আছ প্রভু খেলার
চলে তলে (অবরোহীতে ম ও নি
বর্জিত)
পূর্ণ মুখে হেসে আসো তার
মধুর পথ ভুলে। (অবরোহীতে
সম্পূর্ণ)

অভাব হও তু পালিতে চেয়ে
(পূরের রূপ তুলনীয়)
হেন অনুনয় পরে রহ কভু
(কাফী সা, সম্পাদী রে)
দুখ পরশে বিরাজো যে স্বামী
সুখে জানালা ভরাতে॥
(অবরোহীতে কাফী বা, সম্পাদী গা)

৬। (মেঘোয়া ঠাট) বিলম্ব—মাত্রা।
ধরালী পরানী ঘন-অলস চরণে
১ ২
(প্রচলিত নাম—কিলাঙ্গিত গতি)
১ ২
কে পূর্ণ যুবতী সো চলে নীর
ভরণে॥ (পূর্ণ রূপ বা সম্পূর্ণ)
কেশী বিলম্বিতা উতলা অনাবৃতা
(ঝঞ্ঝাতে)
দেখলার ভোলাহত চল ধনি জল হরণে॥
১ ২
(আরোহীতে দেখলার—মা ও নি দুর্বল)
১ ২
পূর্বাচল বিভাসিত সো তব
গৌরী রূপে (পূর্বাচলে গৌরী)
আজ তুমি কি বিরাজ কর
গোপী ভাবের সুখে।
(গা পা মা ও ধা-এ সংগত)
পঞ্চমে পাপিয়া যেমনে
(পঞ্চম নাদ স্বর)
চমকি ঘনে তরুতলে
সরসী নীরে কমল রূপে তব
অরুণ বরণে॥
(কমল দিনে ফোটে—অর্থাৎ রাগটি
দিবাভাগে গেয়—সূর্যোদয়ের পর)

এই রচনা কয়খানি (নজরুলগীতি) সুরে নিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছিলেন, অভিপ্রায়ে অন্যান্য ঠাটের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ওপর আরও লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতাপুরুষ সে সুযোগ আর দিলেন না। মাত্র কয়টি ঠাটে কয়টি রাগের ওপর কয়খানা গান রচিত হয়েছিল—সেগুলি অন্য একবার রেকর্ডে নুটিহীন করতে চেয়েছিলেন—তাও সম্ভবপর হল না। তাঁর ইচ্ছাটুকু ইচ্ছা হয়েই রয়ে গেল—রূপ আর পেল না। আমরাও এক অপূর্ব সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হলাম। এটা বাস্তবিকই দুঃখ বাঙলার দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

"নজরুলগীতি" রচনার কিছু ইতিহাস দিলাম—এইবার সেগুলির বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলব।

আমরা রেকর্ডের মারফৎ, রেডিও মারফৎ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে গান-গুলি এখন শুনছে সেগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি বেঠিক তা নির্ধারণ করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে গায়কগণ কয়জনে নিজেদেরকে "নজরুলবিশারদ" বলে জাহির করেন (তাঁরা আমাকে মাপ করবেন) তাঁদের অনেকেই হয়তো কাজী নজরুল ইসলামকে চাক্ষুষ খুব কমই দেখেছেন বা তাঁর কাছ থেকে শেখবার সুযোগ একদমই পান নি। যে স্বরলিপি বই-গুলি বাজারে চলছে তার অনেকগুলিই ভুল সুর বা ভুল কথার ভরা। কবির সহকারী বা সঙ্গী হিসাবে একদিন যাঁরা কাজ করেছেন, আজ তাঁরা উপেক্ষিত। শ্রীজগৎ ঘটক মহাশয়েরই কথা বলি। ১৯৩২ সালের পর কবির প্রায় সকল গানের স্বরলিপিই জগৎবাবুর। "ভারতবর্ষে"-র বিভিন্ন সংখ্যা, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, বা তাহারও পূর্বে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা মারফৎ আমার এই অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। অথচ বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্তমানে জগৎবাবুকে উপেক্ষা করে এবং তাঁর কৃত সেই সব স্বরলিপি বিকৃত করে অন্য স্বরলিপির সৃষ্টি হচ্ছে বা নাম-করা শিল্পীরা বিভিন্ন জায়গায় গাইছেন। এখন ভাববার কথা সাধারণ কোন্ স্বর-লিপি বা সুরে অনুকারী চলবেন?

কবির গানের প্রথম স্বরলিপি বই করেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। বইখানির নাম "সুরমুকুর"। নলিনদা যখন এই বইয়ের গানের স্বরলিপি করেন তখন কবি সুর এগুলি শেখেন বা সুর সংযোজিত করেন। এক কথায় এটি সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, যাকে বলে 'অরিজিনাল' এবং এই অবস্থায়ই নলিনদা গানগুলি স্বর-লিপিবদ্ধ করেন। পরে ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কে, মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্ট গায়িকা ও গায়কগণ এ গানগুলি তাঁদের কণ্ঠে রেকর্ড করেন। কবির তত্ত্বাবধিতেই অবশ্য এগুলি রেকর্ডেও হয়। এই সময় দেখা যায় তাঁদের গীত সুরগুলি "সুরমুকুরের" লিপিবদ্ধ সুরের থেকে আলাদা। এই আলাদা হওয়ার কারণ—রেকর্ডে গাইবার সময় গানগুলিতে উক্ত বইয়ের সুরের ওপর কিছু রং ফলিয়ে বা কোন কোন জায়গায় একটু-আধটু অল-বদল করে গাওয়া হয়—গানকে আরও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য (অবশ্য কবির অনুমোদনক্রমেই) এই কাজ করে-ছিল। অতএব এক্ষেত্রে নলিনদা বা গায়ক-গায়িকার দোষ কাউকে দেওয়া যায় না, যদিও শ্রোতাদের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কবির বিশ্বস্ত জাতীয় সঙ্গীত "মুক্ত ঝিরি ঝরনার বন্ধু"-র যে স্বরলিপি সুরেন

হুকুমে" ঈষৎ ভিন্ন ভাবে সেটিকে একটু অদল-বদল করে আমি কবির অনুমোদন সহকারে ১৯৪১ সালে প্রীতিভাজন চৌধুরী, রেবা সোম প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা রেকর্ড করাই। সেই সময় পুরাতনপন্থী কয়েকজন আমার এই কাজের সমালোচনা করেন—কিন্তু প্রীতিভাজন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন গুণী,—যাঁরা একবাক্যে কবির খুব সান্নিধ্য লাভ করেছেন—আমার প্রশংসাই করেছিলেন। বর্তমানে এই সুরটিই প্রচলিত।

সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী ও অন্যান্য রেকর্ডিং কোম্পানী কবির রচিত কয়েকখানি বিখ্যাত গান অধুনা গায়করা শিল্পীদের কণ্ঠে রেকর্ড করিয়েছেন। পূর্বে এই গানের অনেকগুলি আপ্তবেহালা, ইস্রাজ প্রমুখ শিল্পীরা স্বরা রেকর্ড করিয়েছিলেন। দেখা যায়, বর্তমানে গাওয়া সুরগুলি অনেকের গাওয়া সুরের থেকে কত তফাৎ। পূর্বের সে-সবের অভাবনায় এই সব গানে মেলে কি না সন্দেহ। তার ওপর কথা ও সুরের অনেক তফাৎ দেখা যায়।

শ্রীসন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গীত "অরুণি লহ মোর নমস্কারে" গানখানির দ্বিতীয় লাইনে গেয়েছেন, "তোমায় যে সুন্দর বন্দিতে"। অথচ অসল গানে আছে "তোমারে সুন্দর বন্দিতে"। শেষ লাইনে "তোমায় পদতল রঞ্জিতে"-র জায়গায় গাইলেন "তোমায় পদকমল রঞ্জিতে"।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় উচ্চারণ করলেন "মুমা কুমা মুমা কুমু", কবির লেখা গানের কথাগুলি হচ্ছে "মুমু কুমু মুমু কুমু"। অবশ্য ইস্রাজ রেকর্ডে এই ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সেই ভুল-টির পুনরাবৃত্তি সমালোচনীয় বিশেষের সতীনাথবাবুর মত একজন শিক্ষিত শিল্পীর মুখে। সুরেরও অনেক বিচ্যুতি লক্ষ করলাম তাঁর গানে। "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে"—এ গানের কথার ভুল প্রয়োগ—সুরেরও ত্রুটি আছে। গানটির অন্তরায় "দিবা চলে যায় বলাকা পাখায়"-র জায়গায় গাইলেন "বেলা চলে যায় বলাকা পাখায়"। "বেলা শেষে বহু ডাকে নবমী" এই জায়গায় অসল সুর বদলে নিজের খেয়াল-খুশীমত সুর লাগালেন। সম্প্রতি "বীরেন বসু" নামে একজন শিল্পী "যাই চিনিলে আমায় তুমি রইব অনেক দূরে" গানখানি রেডিওতে গাইলেন। কবির কাছে আমি এই গানখানি যে সুরে ও তালে শিখেছিলাম—বীরেনবাবু তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য সুরে ও তালে গাইলেন। আমার জানা সুরেই গান-খানি একবারে কবির নিজস্ব টোনে-এ রেকর্ডে গীত হয়েছিল। "তুমি কেমনে আজিও যে মনে বেদনা সনে রহিস আঁকা" গানখানি কবির বড় প্রিয় গান ছিল। যখন এ গানখানি শেখান, আমাকে বলেছিলেন—"দেখ! এ গানখানির মজা এই যে, লয় ঠিক রেখে দুই একটা তাল (ইংরাজীতে বিট) ও একটা কাঁক হতে বেরিয়ে যা। আমি তাল রেখে করে গানটি গাইছি—তাল ও কাঁক একই লয়ে বরাবর রেখে যাবি—যেন বেতাল না।" সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। একবার চতুর্মাত্রিক ছন্দে (আধার ছন্দে) ও পরেই ত্রিমাত্রিক ছন্দ ও আবার চতুর্মাত্রিক এই-ভাবে বদলে বদলে গানখানি গাইলেন—একবারও তোথাও তালে ঠোকর খেলেন না। রেকর্ডে "ফিরোজা বেলায়" গান-খানি গেয়েছেন—দেখলাম তালকেরজ জায়গাগুলো মিউজিক দিয়ে মোজাসিক করে নেওয়া হয়েছে, তার ওপর লয়ের যে মাত্রুর্য কবি দেখিয়েছিলেন—অর্থাৎ চার মাত্রার সময়ের মধ্যে তিন মাত্রা গাওয়ানো—সে মাত্রুর্য কোথায়! রেকর্ডের গানখানি শুনে মনে হল এ যেন আর এক গান।

মানব মুখোপাধ্যায় গাইলেন "এত জল ও কাজল চোখে"—নিজের ইচ্ছামত সুর ও গায়কী লাগিয়ে।

যে সব শিল্পীর কথা বললাম এঁদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব এঁরা যা গাইবেন, বর্তমান শ্রোতারা সেইটাই অসল বলে মেনে নেবেন। এইভাবে কাজী নজরুলের অসল সুরের বদলে নকলগুলিই অসল বলে চলবে। ফলে কবিসৃষ্ট নজরুলগীতির সমাধি-লাভ হবে। জানি না, এতে করে কবির মর্যাদা আমরা ঠিকমত রাখতে পারব কি না। প্রকৃত নজরুলগীতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে কি না।

হয়ত অনেকে বলতে পারেন যে, পূর্বেও তো নজরুল ইসলামের গানের সুর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়েছে—তবে কেন বর্তমানে আমরা তা করতে পারব না? এর উত্তর হচ্ছে—সে সময় গানের সুর অদল-বদল করে কবির সম্মতিক্রমে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা হত কিন্তু বর্তমানে তা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া বর্তমানে যে সব অদল-বদল দেখা যায় "নজরুল ইসলামের" গায়কীর বিলুপ্তির ফলে সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের এখন উচিত—কবির মুখে গানগুলির প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে কবিকৃত অবস্থায় রেকর্ডে পরিবেশন করা। ফলে ভাবীকাল ঠিক বেছে বিচার-বিবেচনা করে তাতে কিছু না ঘষামাজা হোক পারে—কারণ কবির এ বিষয়ে কোনদিন আপত্তি ছিল না—কিন্তু বর্তমানের মত হাঁকো-নল্চে-বেদল পাল্টানোর সবলেরই আপত্তি আছে। বিখ্যাত গায়ক বীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে দিয়ে যখন আমি "নীলাম্বরী শাড়ী পরি", "সাওন আসিল ফিরে", "কূলের জলসাঘরে" প্রভৃতি গানগুলি রেকর্ডে গাওয়াই কিন্তু অসল সুরের ওপর যা কলিয়ে গানগুলি এত সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন যে, কবি শুনে বলেছিলেন "আমার এ গানগুলি যে এত সুন্দর রূপে ধরবে তা আমি কোন দিন ভাবতে পারি নি।"

বর্তমান গায়ক-গায়িকা যাঁরা "নজরুলগীতি" গেয়েছেন—তাঁরা অবশ্যই ভাল শিল্পী বলেই খ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গানগুলির বাণী ভুল গেয়ে ও সুরের বিকৃতি ভাবে কবির মর্যাদা কিন্তু ঠিকমত দিতে পারেন নি। এ বিষয়ে তাঁদের অবশ্যই অবহিতহাল থাকা উচিত।

বর্তমানকালে প্রচলিত "নজরুল-গীতি" সম্বন্ধে অসুবিধাগুলির কিছু কিছু উল্লেখ করা গেল, এখন আমাদের দরকার এই সব অসুবিধা দূর করা। আমার মতে একমাত্র যাঁরা কবির প্রকৃত সহযোগী, সহকারী ও আত্মীয় ছিলেন, সেই সব সঙ্গীতজ্ঞ এক জায়গায় মিলিত হয়ে এই সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এঁদের নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত একটি "বোর্ড" গঠন করা প্রয়োজন। তাঁরা সর্ব-সম্মতিক্রমে গানগুলির জন্যে একটি নির্ধারিত সুর স্থির করবেন এবং গায়কেরা ঠিক সুর ও ঠিক কথা বজায় রেখে গাইছেন কি না তাও লক্ষ করবেন। স্বরলিপির বই, কিম্বা রেকর্ড ও রেডিও মারফৎ প্রচারের পূর্বেই গানগুলি পরীক্ষা করে অনুমোদন করবেন। মনে হয় এই উপায়েই আমরা নজরুলগীতিকে বাঁচিয়ে রেখে কবির গানগুলির প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিতে পারব।

ধ্বংজানাস্তি জগৎসর্বং

রনজিৎ কুমার সেন

শারদ পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যায় মহাকালীর অর্চনা। শ্যামাসাধকদের কাছে এটি একটি বিশেষ দিন। শারদ লক্ষ্মী থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রকৃতিতে জ্যোৎস্নার যে বর্ণবিলাস, তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে অমাবস্যার কালো-কাজল প্রহরে এসে বিলীন হয়ে যায়। ভগবতী মহাকালী মহাকালীর রূপ ধারণ করে সংহারবিনাশে মহেশ নৃত্যে এগিয়ে চলেন। তিনি অমানিশার ভগবতীর রূপবিলাস। শুম্ভ-নিশুম্ভের সংগে যুদ্ধের চণ্ড-প্রচণ্ডালে অম্বিকার ললাট থেকে ইনি উৎপন্না হন এবং রক্তবীজের সমস্ত রক্ত পান করে তার বিনাশ সাধন করেন। অসুরের দম্ভ-হরণ গন্ধকালে সতী এই রূপ ধারণ করেন। এই মূর্তি সংহারিণীর অন্তর্গত। এই মূর্তি ত্রিনয়নী, চারহস্ত, মুক্ত কেশিনী, মুণ্ডমালিনী, লোলজিহ্বা, চতুর্ভুজা ও শবাসনা। বসন নেই, অঙ্গ নেই, পর্দা নেই, লজ্জা নেই, সমস্ত দেহকালের ওপার —অন্ধ দেহকুলই বিস্তীর্ণ যে মহাকালের ছায়া—তাকে প্রতিফলিত করে করে অন্নময়ী কৃষ্ণা করালবদনা মহাকালী কোটি কোটি মুণ্ডমালা গলায় ধারণ করে অন্তর্বাসনে বন্দী করেন। পৃথিবী টলে ওঠে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে ওঠে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। কে বুঝবে এই মহাকাল-লীলা? দেবকুল বিচলিত হয়ে পড়েন। শিব তখন শব হয়ে বিকৃতি-আক্রান্তি বুকে টেনে নেন মহাকালের পদপ্রান্তরে। লজ্জায় অপন পদস্পর্শদোষে নিজেকে ধিক্কার দেন মহাকালী। শান্ত হয় মহাকালীলা।

অসুরের এই বিকটি হাজার বছর ধরে শাস্ত্রমতে তান্ত্রিকী জীবনে মিশে গেছে। হিন্দু-পুরাণশাস্ত্রে দেবীর নানা বর্ণনা আছে। কখনও তিনি বীণা-পাণি বাগ্দেবী, কখনও তিনি দশভুজা-ধারিণী চণ্ডিকা দুর্গা, কখনও তিনি ত্রিভুবনবিহারিণী লক্ষ্মী, কখনও বা করালবদনা চতুর্ভুজা কালী। দেবী ভাগবতে আছে যে, একমাত্র আদ্যাশক্তি ভগবতী এই সংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে মহা-সত্ত্ববতী, মহালক্ষ্মী এবং মহাকালী এই তিন শক্তি দান করে তাঁদের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করতে আদেশ দেন। মহানির্বাণতন্ত্রে পরমাপ্রকৃতি দক্ষিণা-কালীর বন্দনা শিববাক্যে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ওঁ পরা প্রকৃতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপা
পরমাত্মনঃ।
ব্রহ্মা ভাবে জগৎ সর্বং যা জগদ্ধাত্রী
শিবে॥
মহাকালস্বরূপস্থঃ সংহরেৎ সকলাচরম্।
ত্বমেবাসি মহাবিদ্যা মহাকালি জগন্ময়ি॥
ত্বয়া ধার্যং জগৎ সর্বং ত্বং ধাতা জগতি
কল্পনে॥
ওঁ কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী
ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী
কমলালয়া।
সর্বশক্তি স্বরূপাসি সর্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সৃষ্ট্যা স্থূল ত্বং ত্বমাদ্যে-
স্বয়ূপিণী।

নিরাকারাপি সাকারা কস্মাৎ
স্তোতুমহীশ্বরী॥
উপাসকানাং কার্যার্থং ভেদতোঽপীহ্যসি॥
জ্ঞানবানাং বিনাশায় ত্বমসে
নানাবিধাস্তনুঃ॥

সর্বশক্তিময়ী এই মহিমময়ী জগজ্জননী স্তব করেন তাঁর 'জগদ্ধাত্রী' রূপে। যে স্থাণুশক্তির অনুপ্রেরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, যাঁর মহিমায় চন্দ্র-সূর্য দীপ্যমান, যাঁর প্রভাবে ধরিত্রী অন্নপ্রসবিনী শান্তি-সমাহিতা, যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি লয় হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা যাঁর আরাধনা করেন, যিনি অন্তর্বিনাশিনী সর্বপাপ-জ্বলনাশিনী মোক্ষদায়িনী, তিনি যে—

স্মরা হৃত্বা বাসং বপুরসলিলস্যেন
মনসা।
জরীরার্ধং সম্ভোক্তরমণি জনে
হৃতনভূঃ॥
তথা যি ভূতেশ সকলং অরূপোঽস্ত
বিদিতম্।
কুচাভোগাক্রান্তং কুটিল শশিচূড়ালং-
কুরুতে॥

আগম রুদ্রযামল পঞ্চরাত্রে এই দেবীকেই বর্ণনা করে বলা হয়েছে—'অখিল জগদীয় কর্মলিনী বামেচ্ছা ত্রিবিধোদ্যোগখেলার অনন্য কুচবন্ধা—দেবাদেবেশানী সাধকসন্তোষে সাকারা গৌরীস্তোত্রে।' —তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালিনী, মুক্তকেশী, তিনি খড়্গিনী বরধারিণী, তিনি ভয়ানক ভীষণাস্যা, হেলায় তিনি মহাসুরের খেলছে বেড়ান, ডাকিনী যোগিনী তাঁর পার্শ্বচারিণী, শিবাকুল তাঁর মহাকালের শবহৃৎগর্ভে প্রহরে প্রহরে ঘোষণা করে চলে। মহাকালীর এই রূপই ভারতীয় কল্পনালোকে প্রতিভাত। কিন্তু তাঁর আর-একটি রূপও বড় মধুর। তিনি বেদবতী মহালক্ষ্মী, ত্রিনয়নী ত্রিকালদর্শিনী; এক হাতে তাঁর বরাভয়, অন্য হাতে আশীর্বাদ, এক হাতে তাঁর কল্যাণ, আর-এক হাতে ক্ষমা। চতুর্ভুজা তিনি, চার হাতে চতুর্দিক তিনি রক্ষা করছেন।

গভীর নিশীথরাতে তাঁর অর্চনা। ঘরে ঘরে তখন দেওয়ালী উৎসব। শারদ বিজয়ার মানুষে মানুষে যখন প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হয়, তখন সেই প্রেমের রাতে ঘরে ঘরে দীপাবলী সজ্জিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারের গর্ভ থেকে একটি একটি করে প্রদীপশিখা জেগে উঠে ঘোষণা করে একেশ্বরীনী মহাদেবীর মাহাত্ম্য। দেবীর কাছে মানুষের যে চিরন্তন দাবি—সেই সত্যেরই পুনঃ ঘোষণা তাঁর উপনিষদে: 'অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়'—অসত্য হতে আমাকে সত্যতে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে

আমাকে অসৎপথে নিয়ে যাও, মন্দ হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও।

অনোনাদিনী অন্তর্যামী জাগবেন আমীর্বাদে তাঁর সৃষ্টি আবার নতুন করে জেগে ওঠে। সারা ভারতে এই দেবী তাই সমাজাদৃত: এই দেবীর তুষ্টিসাধনে ভক্তসাধকদের যত্নের ত্রুটি নেই। তিনি শক্তিরূপিণী বলে শাক্তসাধনার তাঁকে মানাভাবে আঁকা আর যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৈলে ও শ্যাম এক হয়ে কালীকে শ্যামা রূপে রূপায়িত করেছে। তাই তিনি কৃষ্ণবরণী হয়ে বৈষ্ণবীয় ছোঁয়া থেকে ভক্ত হয়ে রয়েছেন। সবই ভক্তের মনের প্রকাশ। আর সমাজ এভাবে যে যে মানসিক বাঁধনে আবদ্ধ পরিচালিত হয়ে দেবীর রূপপ্রকল্পনা করেছে, হিন্দু পুরাণশাস্ত্র সেই সেই যুগেরই নানা ইঙ্গিত করে সমাজমানসের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কি ভক্তবীর রামপ্রসাদ, কি পরমহংসদেব এই দেবীকেই ধ্যান করে দেবী মাহাত্ম্যের ভক্ত দিয়ে জীবমুক্তির সন্ধান করেছেন।

ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে উপাসনার গোড়া থেকে শুরু করে এই দেবী নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। বাংলার কালী-কীর্তন থেকে শুরু করে শ্যামা-সঙ্গীতের ছড়াছড়ি। রামপ্রসাদের গানে সমস্ত বাঙালাদেশ সজাগ হয়ে আছে। তাঁর সঙ্গীতে বাংলা গীতি-কবিতার জন্মের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—যেমন উঠেছে রজনীকান্তের মাতৃসঙ্গীতে। গীতি-সাহিত্যে রূপ নিয়ে প্রসাদ-সঙ্গীত বাঙালী জীবনে অমর হয়ে আছে। অতীতী অন্তর্যামীকরার মতের একটি গানে কালীর পূর্বোপর রূপটি বিশেষ-ভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন—

"শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিশ্ব শ্মশান
এ জগতে কোথা গেলি?
জেন্ সে দেখা কি হয়েছে,
তিন কোটি সব পড়ে আছে,
তবু তৃপ্ত হোসনা মনে,
তাদের ভক্ষণ করে কেলি।
তৃপ্ত শিবের ঘাড়ে যেতাল
নাচে আর তাধিন তাধিন গায়,
তাদের আর কেহ পালা
এটা ধরি ওটা ফেলি।
আর না দেখে নারব পালা,
শব হয়ে শিব পা ছড়ে ও
তবে জানবে জানবে মনে,
দেখবে তখন কালা বেলি।"

শ্যামাসঙ্গীতে মুসলমান কবিদের দানও অসামান্য। অষ্টাদশ শতকের হুগলী জেলার গরীব আলী বা ছেড়ে শুরু করে বর্তমান কালের কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বহু মুসলমান কবি ও গীতিকার এই জাতীয় শ্যামা-বিষয়ক গান রচনা করে বাংলার ভক্তি-হৃদয়ের গীতি-সাহিত্যের সমৃদ্ধি করেছেন। কাজী নজরুলের 'কল রে কল' বলে 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে রাঙা পা আমি শ্যামের নাম, মহাকালের কোলে এসে মৌনী হলো মহাকালী' প্রভৃতি সঙ্গীত বাংলা ভক্তিগীতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। কেউবা শ্যামা-সঙ্গীতের যে প্রচুর, তার কারণ এই, সঙ্গীতই হার মনের।

কিন্তু আধুনিক সমাজে শ্যামা পাড়ায় যখন পুজোর-উৎসব হৈচৈ-হৈচৈ তখন মাইকে শ্যামাসঙ্গীতের পরিবর্তে অধিক মাত্রায় শোনা যায় চলচ্চিত্রের হেরোদের। এটা জাতীয় চরিত্রের অবোগতির লক্ষণ ছিন্ন আর কি: এই সব সঙ্গীতাশ্রিত পুজোর উদ্যোক্তাদের মাতৃ-গত প্রত্যয়ের পরিচয় এখানে প্রায়ই বিরল। তবে কি বুঝতে হবে—মাতৃ-আরাধনা কিছু নয়, ব্যাপারটাই এদের জীবনে ও মনে প্রবল? যাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রী, যাঁরা দেবী পূজার বিশ্বাসী নন, তাঁদের কথা অবশ্য। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মধ্যে যখন ধর্মের ভাঁড়ামী ও কর্মের নির্লজ্জতা লক্ষ্য করা যায়, তখন স্বভাবতই মনে বিকার জন্মে। অথচ এই দেবী-আরাধনা জনমনের চারিত্র শক্তির উৎস। এখানে লালসাকে ধর্মের পরিধান করেও লৌকিক ধর্মের যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, তা উপলব্ধি করার মতো। যুদ্ধের ওলোট পালোট মধ্যে নবীন অলোকোজ্জ্বল সঙ্গীতীরের সন্ধান করছে কবিকুলচূড়ামণি। তেমনি দেবী-মূর্তির মধ্যে ভক্তরা খোঁজে, খুঁজি, পশুত্বের বিনাশ, স্বর্গীয় ভাবের উদ্বোধন, লজ্জা ও গ্লানিহরা এবং শুভঙ্করের উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে প্রশ্ন জাগে অবশ্যই মানবজীবনের সার্থকতা। এ উদাহরণ ইসলামে নেই, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের নেই, কোনো দেশের কোনো ধর্মেই মানবজীবনের এত বড় সার্থকতার ভিত্তিটা এত গভীরভাবে ফুটে ওঠে নি। সেই সার্থকতা রয়েছে একমাত্র ভারতীয় শাক্ত-দর্শনে যেখানে আরাধনা দেবীকে ভক্তি-বিগ্রহরূপে বলতে পারি—'যং জ্ঞানিনি জগদম্বেতি ন যং জানাতি কশ্চন।'

হৃদয় আছে বলেই

সুনীল আচার্য

হৃদয় আছে বলেই মানুষকে চেনা যায়
পৃথিবীর অপরিচিত মুখ
আকাশ মাটি হয়ে পড়িয়ে আছে
পাথরের নিঃশ্বাসে
কোথাও অন্ধকারের আলো নেই;
সমস্ত এখানে সাদা অন্ধকার মানুষের ভয়ে,
অন্ধকারে মানুষ অমানুষ—
অন্তর্যামী, এ নশ্বরীর খেলে-বেলাভরে,—
মানুষ পৃথিবীর অবক্ষয়ের চিহ্ন
মানুষ—দিক নির্ণয়ের মাস্কাতি
মূল্য বা অন্য কিছু নয়।

কদাচিৎ

সাধনা মুখোপাধ্যায়

যে কোন অন্বেষণে,
হাসির ঘরের মুখে,
তোর পাশে বড়:

যে কোন আলাপই,
চৈত্রীর পর্যায়ে যেতে
ঘটনার ছোট বড় ইট হয় জড়ো

যে কোন মুহূর্তে,
স্নেহের গভীরে ডুবে সমস্ত বন্ধ দ্বন্দ্ব কথা,
থামলেই বুঝি হয় মনতার ছুটি ভরো ভরো।

অভাবেই অনগ্রসর মনে বিদ্রূপতার সৃষ্টি হতো। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রচারে ছুতো করে তাঁরা মেয়েদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করতেন। সাফল্যের যে মাত্র করতেন না তা নয়। ছাত্রপ্রাপ্তির সুযোগ থাকলেও মিশনারীরা ধর্মের ব্যাপারেই উৎসাহিত ছিলেন বেশিমাত্রায়। বাইরের এই স্ত্রীশিক্ষা এবং জনকল্যাণের মুখোস অনেকেই বুঝে পড়লো, যখন তাঁরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মের স্পষ্ট নিন্দা এবং বাঙালীদের পথে পথে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন। মিশনারীদের মনোবৃত্তি প্রকাশ পেলো আরো স্পষ্টভাবে 'জোতিন্দ্রিয়ন' নামে একটি পত্রিকায়। মূলের ছাপা, চেহারার ভালো, তার ওপরে লেখা হইলো "স্ত্রীলোক ও বালকদিগের জন্য।" এতে বিচিত্র ভাবে-ভঙ্গিতে "সত্য ধর্মের" জয়গান করা হতো। বীরাঙ্গনা নাম দিয়ে আদামতাকেও অহল্যা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, জনকনন্দিনী, সীতা ইত্যাদি কাহিনীর মেয়ে একটি করে নীতিবাক্য বোঝানো হয়েছে। সীতা-র কাহিনীর শেষে শিক্ষিত-বাঙালি বেশ তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাবে মন্তব্য করে: "উক্ত কাহিনীর বিষয়ক পাঠ করিলে কে না স্বীকার করিবেন যে, যদি বিবাহ রামচন্দ্রের অভাবে বনবাস প্রভৃতি নানা অনর্থের মূল কারণ। যদি সীতার পক্ষে বিবাহমূলে গ্রহণ মেয়ে মেয়ে না হইতেন, তবে কি সীতার এমন দুর্দশা হইত, না, রাজা রামচন্দ্র আপনিই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেন।"

বর্তমানেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে চলে ছাঁট ইত্যাদি ভাষায় বিষয়। "বাঙালী মহিলা", "কলমের আঁচড়", "মীরার উকিল", "ঘরের লক্ষ্মী", "সোনার প্রতিমা", "আদর্শের ছবি" ইত্যাদি করে আদর করে মেয়ে বলা হচ্ছে যদি মেয়েরা সুন্দর সুখ-শান্তির ঘর করে—

"পরের বরণ করহ আদর
অন্তরের গাঁঠ বাঁধহ দরদের।"

হিন্দুদের সব কিছুই খারাপ: তারা পৌত্তলিক, তারা "জন্তু পূজা করে", কিন্তু যদি তারা এসব ছেড়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে, তবে আর কোন কথা নেই। অবশ্যই তারা নিশ্চিত সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একেবারে সাহেব।

"সিভিল সার্ভিসে যদি হবে আপিসার
খৃষ্টান জাহাজে তবে চড়িবে এবার।
পাস করে কোট পরে ফিরে এলে
বেশে
বোম্বাই সাহেব বলি পরিচয় দেবে।"

কিন্তু এত প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলেন না। এমন কি, বথার্থ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বীটন বালিকা বিদ্যালয়কেও যে দীর্ঘদিন এর জন্য ভোগ করতে হয়েছে, তা আমরা আগেই দেখেছি। "কিন্তু এত অবিরাও মিশনারী পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ ইহাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টা যে অবিমিশ্র সদিচ্ছাপ্রসূত ছিল না, খৃষ্ট ধর্ম প্রচারই যে মুখ্য লক্ষ্য ছিল, তাহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং উচ্চ বিদ্যালয়[illegible]তে একমাত্র বাধিত করের —অনেকক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের ছাড়া কোন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যোগদান করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বাধা সর্বপ্রথম দূর করেন সরকারী শিক্ষা সংসদের সভাপতি, ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন)। তিনি রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ এদেশের কয়েকজন সম্ভ্রান্তের সহায়তায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে কলিকাতা স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয় (বর্তমানের বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন।" (যোগেশচন্দ্র বাগল।)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সংবাদ প্রভাকরে একে অভিনন্দিত করেছিলেন। "জননী-জন-পুত্রের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন, বরং স্থিরতা ও ধৈর্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারেন, অতএব তাঁহারা বিদ্যাধারিণী হইলে সাংসারিক লোক-যাত্রা নির্বাহসূত্রে প্রতিপন্ন হইবেক।" ঈশ্বর গুপ্তের একা, "বেথুন এসে দেশ করেছে" বলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে বিদ্রূপ নিতান্তই সাংবাদিকতা, তার 'বাইজীবী সুরের গানে—তার বাই থাক, তাঁর মনের তথা ছিল না, স্ত্রীশিক্ষার সোচ্চারতাই তিনি করেছিলেন।

মেয়েরা ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন। উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মহিলারা এগিয়ে সম্ভব ছবি আমরা পাই। তাঁদের এক আলোকপ্রাপ্তা মেয়ের বিবরণে জানা যায়ছে, মেয়েটি নাকি অসাধারণ বিদুষী। বিয়ের পরে সে তার স্বামীর বিদ্যার যথার্থতা পরীক্ষা করবার জন্য তাকে "সরস্বতী" অক্ষর বানান করতে বলেছিল, কিন্তু স্বামী বানানটি ভুল বলায় তার নিজের জীবন সম্পর্কে বিচার করেছে। বাপের কাছে সে খেদ করে বলেছে। "এমন মূর্খের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার জীবন নষ্ট করে দিলে.....।"

এসব সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারলো না, তার প্রমাণ আজকের দিনের মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার অগ্রগতি। আজ মেয়েরা কলেজে পড়ার জন্য আন্দোলন করে—কিছুদিন আগেও এ জিনিস আমাদের কল্পনাতীত ছিল।

॥ পঞ্চাশ ॥

[১৯২ পৃষ্ঠার পর]

অওয়াজ হলে ওরে ওটাও ছেলেমানুষ। তাকাই কোথাও পালাতে যাবে না এটা তুই যেমন বুঝে [illegible] তেমনি, আমরাও কি কিছু বুঝি নাকি? ওদেরকে বন্দী করে রাখার পিছনে আমাদের যেটুকু যে ওরে দিচ্ছে।

তোকে বলতে আমার লজ্জা করবে না। কিন্তু আমাদের ওদেরকে চোখে-চোখে রাখতে পারি না কথাটা। আমি কাজলের চোখে বাঁধনে কেউই আরও করেছে, আর যে চুলি-চুলি কলকাতা এসে তিন-চারটে বাবুর বাড়ি বাসন মেজে দিয়ে যায়।

কি করবি, তোকে থাকতে হবে তো।

কিন্তু তাকেও কি ভুলতে পারছি, তিনটিতেই বাচ্চা, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুটো মানুষ, পাঁচটা মানুষের মন তোমার কি চাহিদা কথা। এদের সামান্য বাজারের অবস্থা বন্ধুর, সাই-সাই করে। জিনিস-পত্রের দর কেবল চড়ছেই চড়ছেই—এর যেন আর নিষ্পত্তি নেই।

ঐ তো বলায়, চুরি-ডাকাতি করা ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর পথ রাখছে না গভর্নমেন্ট।

গভর্নমেন্ট তো আমরাই—হারান এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলছিল, কেরোসিন তেল স্বাধীনতা নিয়ে এখন আর কোনোদিকেই সামলে দিতে পারছি না। সাহে কি আর বাস-কারবার বলছে ইংরেজ রাজত্ব ভাল ছিল, ছাটিকের আমলে অনেক ভাল ছিলাম নাকি আমরা?

অনেক ভাল ছিল বেশ। ফটিক এক কথা বলে ফেলেছিল। এখন ঘরে ঘরে কেবল চোর-ডাকাত-খুনে-জালিয়াত তৈরি হচ্ছে—উপায় কি, সেই তো লম্বা-সরু জেল-জরিমানার কথা শুনবে না।

হারান চুপ করে ছিল।

ফটিক চুপ ছিল না।

তা না হলে, চোখের ওপর তো দেখছি, বছরের ছতন টি-বি হয়ে মরতে হবে।

লাল শাড়ি-পরা একটা মেয়ে কেমন যেন দোলন ছন্দিতে তখন রাস্তা পার হচ্ছিল। কটমট করে হারান তাই দেখছিল। ফটিকের যেন মনে হল, হারান পেছন থেকে ভোলা মেয়েটিকেই দেখছিল। কিন্তু আসলে হারান অন্য কিছু ভাবছিল। একটা ভয়ঙ্কর কথা ভাবছিল, পরে বোঝা গেছে।

কাজেই বলতে হয়, ফটিক কতিন যেটা ভাবছে, রাস্তায় যুবতী বয়সের সুন্দর মেয়েদের দেখলে অসুখের মতন যেন আর তাদের জ্ঞান থাকে না! অমন চন্দন রাস্তায় পাঁচজন ছাড়া ছাড়া দাঁড়ালে কিছু এক-একজনের। কিন্তু তা হলে হবে কি। থাকে মনে পেটের চিন্তা। অন্য-চিন্তা। সব চিন্তা ওরে ওরে যেত।

লাল শাড়ি-পরা মেয়েটাকে তখনও দেখা যাচ্ছিল। কল্ করে মোড়ের থেকে চোখটা সরিয়ে এনে হারান ফটিকের চোখে চোখ রেখে বলছিল, তুই যে বলেছিলি কখনের টি-বি হয়ে মরাটাই ভালো, কিন্তু বাবারাঃ কিছু নেই, একবারে ভাজা জলজ্যান্ত মানুষে মারা যেতে সে-বড় বাঁধন?

ফটিক চমকে উঠেছিল।

"আমাদের জানাশোনা কেউ? সিমেন্টের মেটাল ওয়ার্কস-এর কেউ?"

হ্যাঁ যে হ্যাঁ, সেই যে আমরপাড়া থেকে আসত ছোঁড়া, রাধাকান্ত, রাধাকান্ত যে, একটা লাল প্লাস্টিকের চিরুনির কৌটো থাকত সঙ্গে, মনে পড়ে? অমন-ধন্ত চেহারা।

হুঁ, হুঁ, খুব মনে পড়ে। বাদুড়

"গভর্নমেন্ট তো আমরাই—হারান এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলছিল...

ঝোলা চেহারা ছোঁড়া, সেবার কাজ কিছুতে কোম্পানীর সাথে ঝগড়ার সিমেন্টের মেটাল ওয়ার্কস-এর মাল দেওয়া হয়। রাধাকান্ত একাই তিনটে ঘোল করেছিল। মনে পড়ে বৈকি। কি হয়েছে তার?

ফটিকের মুখে ভাত থেকে একটা মরে নি। বৌ, বাচ্চা সেকোটাকেও ঐ ঘাটে শেষ করে যেতে।

চন্দনের গম্ভীর হয়ে যেতে পারত ফটিক, কিন্তু সে হাসছিল। যা ভেবে পেয়ে পরিবারসুখে আত্মহত্যা করেছে। বেটা বুদ্ধু। আমি হলে লোকের মাথায় বাড়ি দিয়ে টাকাকড়ি আনতাম। মারা-ফলিডল খেয়ে মরা হবে না।

সবাই সব কিছু পারে না। হারান লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিল। তা তুই কি করছিস বলিস না তো, চলছে কেমন করে?

চলছে বেতাবে হোক, না হলে চলা-বেচা করছি কেমন করে। তোর সঙ্গে হেসে কথাও বলছি। আর অবশ্য হাসছিল না সে। হারানের সঙ্গে দৃষ্টিতে।

তাহলেই কোথাও কাজকর্ম করছিস তা হলে। হারান প্রশ্ন করেছিল।

হুঁ, একটা ব্যাপারে আছি। ফটিক উত্তর করেছিল। যা হোক ঘোরাঘুরি চলে যাচ্ছে।

চলে যেতেই হবে। হারান যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

চালাতে হবেই, তা বলে কি কখনের ঘরে টি-বি হয়ে মরব। রাধাকান্তের মতন পরিবারসুখে বিষ খেয়ে মরে হবে?

আর কিছু বলে নি ফটিক। আর রাস্তায় সে চলে গিয়েছিল।

হারান যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে হেঁটে চলে গেছে।

মোটের ওপর হারানের সাথে মোটর কথা বলে অবশ্য-অবশ্য খবর জানা গিয়েছিল। একটা ভাত টিপতে হাড়িসুদ্ধ ভাতের খবর জানার মত। সিমেন্টের মেটাল ওয়ার্কস লক-আউট হয়ে জোরান জোরান বেকার টি-বি হয়ে মরছে, বিষ খেয়ে মরছে, লুকিয়ে বৌকে বিষ খেতে বাড়ি বাসন মাজছে, কিসের কারখানায় কাজ করছে কেউ, আর তুমি ভালা ঘরবেলা, চাল মরার জায়গা পেয়ে না। আমার ছেলের ম্যানেজারির চাকরি গেছে, অর্ক-টিপস্ত সিগারেট খাচ্ছ, চৌখন-চৌরিঙ্গটের জমা-প্যান্ট চড়িয়ে ছেলে পড়ে বসিয়ে মৌজ করে চা খাওয়া—

আমি হলপ করে বলতে পারি বাবুর ওরাসন ভাড়িয়েদের গলে ছিলেছে। তা না হলে এমন ছেলেছেলে চেহারা কিছুতেই হতে পারে না। যেন ভাল ঘরের আদরে

হয়েছে। তার পরনে কপড় কিন্তু, তার এক রকম আছে। তার সেই নকল চোখ রয়েছে। এদের কী বাহার! মানুষটা ঠিকই রয়েছে। ঘড়ির মধ্যে যেমন! এদের যে এত আদরের হয়েছে বুঝতে পারে? ভূতের কথাটা বিশ্বাস করবে না।

একটা বাচ্চার ছেলেমানুষ সকলে ঠিকা বাড়ি করিয়ে সে নেয় পড়ল। ছেলেটার চোখের সঙ্গে কিন্তু বাবাজীবনের নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা যে মেয়ে নিয়ে এখানে বসে আছে, কে জানত। শুধু এ ঘিয়ে বেরিয়ে আসছে হল।

হক সে, এখন ছেলে বছরে-বিরিবিনি সেই ভয় খাচ্ছে। তার মনে নিরিবিলি এক খেয়াল মনে আজ সকলের ছেলেমানুষি নিয়ে সে একটু ভাবছে চাইছিল। পাগল টাকা। খুব খারাপও না, আবার খুব ভাল ছেলেমানুষও বলা যাবে না। কাল বলেছে পাঁচটা মাইকেটে এক দুর্লভ ছেলেমানুষ মনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তত আজানারী খুঁজছিল? খুব নিজের হাতটাকেই তার কমজোরে ইচ্ছে করছিল। ঢোক জমা। অন্ধ ছেলে ঘটা লাগছে এ ছেলেমানুষ কিছু কিছু কিনা থাকে হয়েছে হয়েছিল। তবে একটা ভাল জিনিস উঠে এসেছিল এ ঢোক আজ পরনের সঙ্গে। একটা গাইডিয়ান। ছেলেমানুষ ঠিকিয়ে। তবে পকেটে। ছেলেমানুষ এটাই তার লাভ হয়েছিল তো বলা যায়। না হলে একটা ছেলেমানুষ করে, এত সময় কাউ

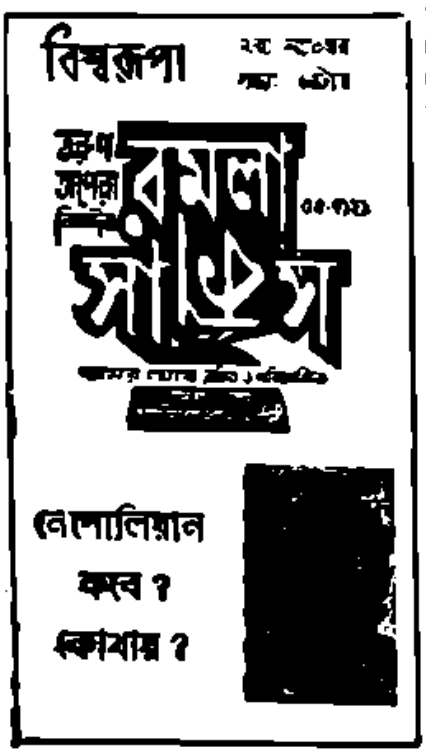

করে। তার পরনে কপড় কিন্তু, তার এক রকম আছে। তার সেই নকল চোখ রয়েছে। এদের কী বাহার! মানুষটা ঠিকই রয়েছে। ঘড়ির মধ্যে যেমন! এদের যে এত আদরের হয়েছে বুঝতে পারে? ভূতের কথাটা বিশ্বাস করবে না।

একটা বাচ্চার ছেলেমানুষের সকলে ঠিকা বাড়ি করিয়ে সে নেয় পড়ল। ছেলেটার চোখের সঙ্গে কিন্তু বাবাজীবনের নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা যে মেয়ে নিয়ে এখানে বসে আছে, কে জানত। শুধু এ ঘিয়ে বেরিয়ে আসছে হল।

হক সে, এখন ছেলে বছরে-বিরিবিনি সেই ভয় খাচ্ছে। তার মনে নিরিবিলি এক খেয়াল মনে আজ সকলের ছেলেমানুষি নিয়ে সে একটু ভাবছে চাইছিল। পাগল টাকা। খুব খারাপও না, আবার খুব ভাল ছেলেমানুষও বলা যাবে না। কাল বলেছে পাঁচটা মাইকেটে এক দুর্লভ ছেলেমানুষ মনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তত আজানারী খুঁজছিল? খুব নিজের হাতটাকেই তার কমজোরে ইচ্ছে করছিল। ঢোক জমা। অন্ধ ছেলে ঘটা লাগছে এ ছেলেমানুষ কিছু কিছু কিনা থাকে হয়েছে হয়েছিল। তবে একটা ভাল জিনিস উঠে এসেছিল এ ঢোক আজ পরনের সঙ্গে। একটা গাইডিয়ান। ছেলেমানুষ ঠিকিয়ে। তবে পকেটে। ছেলেমানুষ এটাই তার লাভ হয়েছিল তো বলা যায়। না হলে একটা ছেলেমানুষ করে, এত সময় কাউ

হয়। তার পরনে কপড় কিন্তু, তার এক রকম আছে। তার সেই নকল চোখ রয়েছে। এদের কী বাহার! মানুষটা ঠিকই রয়েছে। ঘড়ির মধ্যে যেমন! এদের যে এত আদরের হয়েছে বুঝতে পারে? ভূতের কথাটা বিশ্বাস করবে না।

একটা বাচ্চার ছেলেমানুষের সকলে ঠিকা বাড়ি করিয়ে সে নেয় পড়ল। ছেলেটার চোখের সঙ্গে কিন্তু বাবাজীবনের নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা যে মেয়ে নিয়ে এখানে বসে আছে, কে জানত। শুধু এ ঘিয়ে বেরিয়ে আসছে হল।

হক সে, এখন ছেলে বছরে-বিরিবিনি সেই ভয় খাচ্ছে। তার মনে নিরিবিলি এক খেয়াল মনে আজ সকলের ছেলেমানুষি নিয়ে সে একটু ভাবছে চাইছিল। পাগল টাকা। খুব খারাপও না, আবার খুব ভাল ছেলেমানুষও বলা যাবে না। কাল বলেছে পাঁচটা মাইকেটে এক দুর্লভ ছেলেমানুষ মনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তত আজানারী খুঁজছিল? খুব নিজের হাতটাকেই তার কমজোরে ইচ্ছে করছিল। ঢোক জমা। অন্ধ ছেলে ঘটা লাগছে এ ছেলেমানুষ কিছু কিছু কিনা থাকে হয়েছে হয়েছিল। তবে একটা ভাল জিনিস উঠে এসেছিল এ ঢোক আজ পরনের সঙ্গে। একটা গাইডিয়ান। ছেলেমানুষ ঠিকিয়ে। তবে পকেটে। ছেলেমানুষ এটাই তার লাভ হয়েছিল তো বলা যায়। না হলে একটা ছেলেমানুষ করে, এত সময় কাউ

হয়। তার পরনে কপড় কিন্তু, তার এক রকম আছে। তার সেই নকল চোখ রয়েছে। এদের কী বাহার! মানুষটা ঠিকই রয়েছে। ঘড়ির মধ্যে যেমন! এদের যে এত আদরের হয়েছে বুঝতে পারে? ভূতের কথাটা বিশ্বাস করবে না।

একটা বাচ্চার ছেলেমানুষের সকলে ঠিকা বাড়ি করিয়ে সে নেয় পড়ল। ছেলেটার চোখের সঙ্গে কিন্তু বাবাজীবনের নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা যে মেয়ে নিয়ে এখানে বসে আছে, কে জানত। শুধু এ ঘিয়ে বেরিয়ে আসছে হল।

হক সে, এখন ছেলে বছরে-বিরিবিনি সেই ভয় খাচ্ছে। তার মনে নিরিবিলি এক খেয়াল মনে আজ সকলের ছেলেমানুষি নিয়ে সে একটু ভাবছে চাইছিল। পাগল টাকা। খুব খারাপও না, আবার খুব ভাল ছেলেমানুষও বলা যাবে না। কাল বলেছে পাঁচটা মাইকেটে এক দুর্লভ ছেলেমানুষ মনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তত আজানারী খুঁজছিল? খুব নিজের হাতটাকেই তার কমজোরে ইচ্ছে করছিল। ঢোক জমা। অন্ধ ছেলে ঘটা লাগছে এ ছেলেমানুষ কিছু কিছু কিনা থাকে হয়েছে হয়েছিল। তবে একটা ভাল জিনিস উঠে এসেছিল এ ঢোক আজ পরনের সঙ্গে। একটা গাইডিয়ান। ছেলেমানুষ ঠিকিয়ে। তবে পকেটে। ছেলেমানুষ এটাই তার লাভ হয়েছিল তো বলা যায়। না হলে একটা ছেলেমানুষ করে, এত সময় কাউ

অর্থ হবে না তা সে বুঝে নেছে। অফিসের সময় গম্ভীর হয়ে থাকে। গম্ভীর মানে মুখ ভার করে থাকে। তাতে মুক্তা একটু মুষড়ে মুষড়ে যেতায়। কত বয়স হল ওর? বাইশ-তেইশ? তার বেশি না। বিয়ের সময় ঊনিশ ছিল অন্তত। তাই তো শুনেছে সে তখন। তারপর, হুঁ, চার বছর সাড়ে চার বছর পার হয়েছে। বিয়ের বছরই তাদের কন্যা আসে। ছেলের এখন কত বয়স হল? তিন সাত পেঁচিশে বুমলার টু'য়ান হবে খুব জোর।

হুঁ, মুক্তা ভার করে রাখে অন্য প্রসঙ্গই। দেখে প্রথম প্রথম তার খুব খারাপ লাগত। এখন অবশ্য অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তোরা লেখাপড়া একটু জানে। মনে ফটিকের চেয়ে বেশি জানে। ফটিকের বিদ্যে ক্লাস এইট পর্যন্ত। অঞ্জলি স্কুল ফাইনাল পাশ। তাতে হয়েছিল কি, গোড়ার দিকে, অর্থাৎ সিনেমের স্টাইল বাবদানা ঠিক আউট হবার পর দু' মাসের মধ্যেও যখন কারখানার মজুরা খুলল না, ফটিক ঘরে বসা, হাতের বেলটাও পুরোপুরি আনতে পারা যাচ্ছে-না, অঞ্জলি চাকরির জন্যে বেরোবার জন্য ছটফট করছিল, কোন একটা ওষুধের কোম্পানীতে নাকি তার এক সখী আছে, তার পেছনে আছে, অঞ্জলি একবার তাকে ধরলেই সেখানে কাজ পেয়ে যায়। সত্তর-আশী টাকা মাইনে দেবে। শুনে ফটিক তাকে রাগে একটা ধমক লাগিয়েছিল। তারপর আর অঞ্জলি কোনদিন মুখে আনে নি।

উঁহু, কিছুতেই সে অঞ্জলিকে বাইরে চাকরি করতে দিতে রাজী না। তার কারণ, একটা কারণই তার সামনে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, অঞ্জলির চেহারাটা ভীষণ মিষ্টি, এমন মিষ্টি চেহারা সচরাচর বড় চোখে পড়ে না, অন্তত ফটিকের চোখে তো পড়ে না। যতদিন সে ওর চেহারায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে। যাই হোক, ফটিক বেশ বুঝতে পারে, ঐ চেহারা নিয়ে অঞ্জলি যদি একবার বাড়ি থেকে বেরোতে আরম্ভ করে, প্রেমিক পুরুষের দল মাছির মত তার চারদিকে ভনভন করতে লেগে যাবে। অফিসে, অফিসের বাইরে, এই শহরের কিছু আর চিনতে-জানতে ফটিকের বাকি নেই। তা ছাড়া এমন চমৎকার হিপাঙ্গিপে গড়ন, এমন টকটকে গোলাপী রং, অঞ্জুকে একলক্ষ দেখামাত্র যে-কোনো বেটাছেলের ভালবাসা জন্মানো স্বাভাবিক, পরীর চেহারার এক-একটা মেয়ে এমন থাকে, যাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের ভাল লাগে। অঞ্জু তো আর এত সব বোঝে না। তার ধারণা নেই যে, এই কলকাতা শহরে এখন আর মানুষ বলতে মানুষ নেই, জন্তুর ফর্ম আর লোকের ভরে গেছে। হুঁ।

মাথা ঝাঁ নিয়েই ও বলাইদের চাকরি করবে। সপ্তাহের অন্তত তিনদিন। ফটিক কিছুতেই রাজী না।

তারপর থেকে তোরা মুখ আরও ভার। হোক। তাতে কিছু যায় আসে না। পুরুষ সে। বেরোবে পাঁচে সংসার চালাবে। চালাচ্ছে না কি? বেশ ভাল করে হচ্ছতো সব দিক, সব অভাব মেটাতে পারছে না। কিন্তু তা বলে উপায় থাকছে না তো কেউ। যেমন তোরার দিকে তাকানো বন্ধ হয়ে গিয়ে বেকার হবার পর মাস দুই তাদের খুবই কষ্ট গেছে। কিন্তু তারপর বেরোবেই সে উপায় করুক, টাকা মোটামুটি চলছে, আটকাচ্ছে না। ঘরভাড়াও নিয়মিত পাওয়ার ফলে বাড়ল এবং হস্তার বেলও বন্ধ হচ্ছে।

চালাক মেয়ে অঞ্জু।

একটা কিন্তু যে ও আট না করলে এমন না। ওর চেহারা দেখে ফটিক টের পায়। কেন না, হপ্তাটা পাঁচ টাকা বদ টাকা—বুঝে-পাঁচন যা হোক ফটিক ঘরে আনছে। অন্য নিয়মিত যেমন কারখানায় কাজ করার সময় হপ্তা হিসাবে টাকা পেত সে যা এখন যদি প্রাইভেট কোনো কারখানায় কিছু কারচোল লুটিয়ে থাকে তো তার একটা মাসিক উপার্জন থাকবে—সে সব দেখছে না, অন্তত ফটিক রোজগার করছে, কাজেই অঞ্জুর মনে কিছুটা সন্দেহ উঁকি দেওয়া অস্বাভাবিক কি। তার ওপর হাতে মুখে এমন অফুরন্ত সব জিনিস সে ঘরে আনছে। যেমন ক্রিম। পর পর

...তার চিবুক ধরে আদর করে ছেলেটার গালে চুমু খেয়ে বের।

তিনদিন ধরেই কলম কটিক বাড়ি নিয়ে যেতে। কলম দিয়ে কী হবে? কটিক তো কোনোদিনই লেখাপড়ার ধার ধারে না, অঙ্কেরিয়ও তার এখন লেখবের পাট নেই। তিনটে কলমই কটিক অবশ্য পরে চোরাগোপ্তায় বেচে দিয়েছে, কিন্তু অঙ্কেরি তো জিনিসগুলি চোখে দেখল। নিশ্চয় মনে মনে তখন ভেবেছে, কলম নিয়ে আসে যেন তার স্বামী, কোথায় পায় এসব? লাইটারটা দেখেও নিশ্চয় তাই ভেবেছিল। কিন্তু ওওয়ার পয়সা সব সময় জুটেছে না, অন্তত কটিক একটা জমকালো লাইটার কিনে আনল। এই জিনিসটা অবশ্য কটিক না ফেরত দিয়ে রেখে দিয়েছে। তার একদিন রোজ এক টিফিনের পয়সা দেয়ে মনিব্যাগের ভিতর দু টাকা চল্লিশ পয়সার সঞ্চয় আর জমান করে হুক ব্লাউজের টিপকল কিনে দেল। যে জন্য মনে মনে সে ভেবেছিল। কি, না অঙ্কু খুশি হবে। তার এই ভাবনাটাই ভুল হয়েছিল। বাড়ি গিয়ে যখন সে টিপকলগুলি ও হুক কটা অঙ্কেরির হাতে দেয় কেমন একটা চেহারা করল বেরে। যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ, কখনও কখনও কটিককে বলল, হুক, টিপকল দিয়ে আমি কী করব?

—কেন, ব্লাউজ আমার লাগবে।

—ব্লাউজ তো ব্লাউজ, খুলেই দেখল হুকগুলো সবই একটানা ব্যবহার করে এখন মেলে নেওয়ার সময় হল, এসবের জন্যে নতুন ব্লাউজ, নতুন হুক!

কটিক ঘাবড়ে গিয়েছিল। অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল।

—রাস্তায় কুড়িয়ে-টুড়িয়ে পেয়েছিলে বুঝি, না কি ট্রামে-বাসে ভুলে কেউ ফেলে গিয়েছিল, তুলে নিয়ে এলে। অঙ্কেরি অনেক খুঁটে খুঁটে জানতে আগ্রহী হয়েছিল।

শুনে কটিকের মাথাটা গরম হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করছিল ঠাস করে ছেলেটার গালে চড় বসিয়ে দেয়।

রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে, ট্রাম-বাসে কেউ ফেলে গিয়েছিল, তুলে

ফিরে এসেছে। ইলাদেবী মেয়েদিকে কাউকে কেন খুঁজতে পাঠাচ্ছিল। অর্থাৎ যেন কিছুদিনের জন্য সপরিবারে বাড়ি-ছাড়ার ঠেলায় রাস্তের ধারের ফিরনি ছুঁয়ে ফিরে বেরিয়ে পড়ছিল। ফটিকও তখন ঠাহর লাগাতে পারে নি, বাঁচিয়ার বাপাচ্ছিল, রাস্তের ঘর, চেঁচামেচি করতে পারছিল না, পাশের ঘরের মানুষে শুনতে পাবে, চোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুখ বিঁচিয়ে চাপা গলায় সে উত্তর করেছিল —হুঁ, ঘুঁচিয়ে আনব কেন, পকেট মেরে এনেছি, আমি যে এখন সোকের পকেট মেরে সংসার চালাচ্ছি। আপনি কবে থুনি এটা কখন আগেই বুঝতে পেরেছে —মানুষের পকেটে টাকা-পয়সায় সঙ্গে অন্য কিছুনিও থাকে, দরকার বুঝলে সে সব ঘরে নিয়ে আসি, নয়তো রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিই

মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল অজুর।

তবে কিনা, বেশ বেশকে পরে সামলা দিতে ফটিক একমাত্র হেসেছিল, ফটিক বুঝতে পারছিল অজুনার সামনে দাঁড়িয়ে এই বিদ্যুটে হাসি দেখে তার নিজেরই ভেমো লাগত। কিন্তু তখন সেরকম করে না হেসে যেন উপায়ও ছিল না। তা ছাড়া একটা ঔদ্ধুকের মানিব্যাগ মেরে মাত্র দু' টাকা চৌদ্দ পয়সা সেদিন রোজগার করেছিল, ভেতরে ভেতরে এই জলুনিটাও তাকে কম কষ্ট দিচ্ছিল কি? তার ওপর বৌয়ের এমন নুন ছেটানো কথা। বিদ্যুটে হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সে বলেছিল, হুঁ, আমি চুরি করে এনে খাওয়াই আর খুন করে এনে খাওয়াই, সেই সময় তোমাকে পেলে যম, যমও মহাবরের গলপ শোন নি।

তারপর ঘরে গম্ভীর হয়ে মুখ মোষড়া-করে-থাকা-মেয়েটাকে সে বুঝিয়েছিল, বাইরের ওপর বেকার আছি, হয় তো করে খুঁজছি, কাজকর্ম জোটাতে পারছি না, উপোস থেকে তো মরা যায় না। তবে তুমি যদি বলো, সচ্চরিত্র হয়ে থাকতে পারি, কিন্তু খুব পেটপিচন এভাবে বাঁচা যাবে না, ফাঁসিতলা যেতে হবে, তোমাকেও ফাঁসিতলা দিতে হবে, কষ্টটুকেও খাওয়াতে হবে।

অবশ্যিস কি অত্যাচার শুনেছিল? অন্ধকারে বিছানায় ফটিক যখন এসব যোক্তাছিল অত্যাচার খালিসে মুখ গুঁজে গুঁজিয়ে কাঁদছিল।

অর্থাৎ চোর আমীর জন্য ছেড়ে তার যেতা লাগছে, অসহ্য লাগছে, এই দুঃখে ও কাঁদছে। বুঝতে পেরে ফটিক ইচ্ছা করে 'সচ্চরিত্র' কথাটা ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু তখনও অজু ফোঁপাচ্ছিল।

তাই ফটিক যৌয়ের পিঠে হাত রেখে আবার বুঝিয়েছিল, তবে কিনা চাকরির আশা যখন নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়, লোকসানটে খোলা যায়, কিন্তু পুঁজি কোথায়। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি বলো খুপ-মাঠি, চিনাবাদাম, মুড়ি, খাজা, শাঁখা-চাউমি ফেরি করে রোজগারের চেষ্টা করতে পারি। তবেনক বুঝতে হয় অজু, রোজ কল মাথায় নিয়ে সারাদিন কলকাতার রাস্তা চষে বেড়াতে হবে, এই করে কবে একদিন ধরা পড়ে যাব, তারপর ফাঁসিতলার অভাবে, ভাল আদার অভাবে টেসে যাব।

—তবে আর এত লোক বেঁচে আছে কি করে, ফোঁপানির গলায় বলে ওঠে।

—কেউ বাঁচবে না অজুমণি, এক-এক করে সবাইকে মরতে হবে। হয় ফাঁসিতলা যাবে, নয়তো টি-বি হবে, হাঁটবে বাত। যারা আর একজনের মাথায় বাড়ি দিতে পারে বা ছুরি করতে পারে, আর একজনে পকেট মারতে পারে। এখন চোর খুনে-দের রাজত্ব। ফটিক আবার সেই অদ্ভুত হাসি হেসেছিল। অজুলি অন্ধকারে দেখে নি। অজুলি আর কথা বলে নি। আর একদিনও কিছু বলে নি। আদের মতন খুন মেরে ফেলেছে। আর ফলে বাইশ বছরের যুবতীকে বাহান্ন বছরের বুড়ি বুড়ি দেখায়। মিষ্টি মুখখানা শুকিয়ে গেছে, লালচে করে দিয়ে পরীটো কাঠ কাঠ দেখায়। কর্তার সিল্কাড়া ফেলে ফেলে ফটিক এখন ভাবছে, আজ রোজের জন্য একখানা শাড়ি ও একটা ব্লাউজ কিনে নিয়ে যেতে হবে। এক সপ্তাহ পরাণটা টাকা পাওয়া গেল। দুটো ও টিপকল কাটা আরও ঘরে পড়ে আছে। এর মধ্যে এমন টাকা সে পায় নি যে, বাড়ি-ভাড়া বা রেশন ও বাজারের খরচ মিটিয়ে অজুলির জন্য জামা-কাপড় কিনবে।

[শেষাংশ ১০০৭ পৃষ্ঠায়]

ফটিক যৌয়ের পিঠে হাত রেখে আবার বুঝিয়েছিল।

শহর কলকাতা

মিশেন.

সেই যে ওই রাজা বেদু, মন্ত্রী সুবোধ আর সেনাপতি, এ পর্যন্ত তার আর কোনো সাড়াই নেই। এই কলকাতা শহরটা এমনই বিচিত্র, এখানে একটা বেড়ালও মানুষের সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে তুমি তার ডাকও শুনতে পাবে না। সেই যে ভূতনাথ ভূতনাথ আমাদের এখানে এসে যে কোথায় লুকিয়ে পড়ল, তারপর একটি দিনের তরেও তাকে আমাদের সামনাসামনি হতে যেতে দেখা যায়নি, কিন্তু এই কলকাতার কোনো কোণে-কানাচে সে নেই, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। শুধু তাকে একটু-আধটু দেখতে পাওয়া বলেই নয়, অনেক দিন ধরে নিজের আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের তাকে মাঝে মাঝে ডাকতে হয়। তাই কি মুশকিল, ডাকলেই যদি সে আমাদের সামনাসামনি হয়ে যেতে পারত তাও হয়তো সহ্য করা যেত। আসল মুশকিল হল বাল্মিকীর ছেলে, আমি জানোয়ারের বাল্মিকী। বেদু বেড়ালটা, আমি কুকুরদের সাবেকী। অবশ্য উত্তর কলকাতার বনেদী-আনা অনুযায়ী নই। উত্তর কলকাতার কিছু কিছু মানুষের যেন আজও চোরাকারবারের পয়সায় ঝাঁঝালো ঠাট্টা তোষা। পয়সা উড়িয়ে গাড়ি-ঘুড়িয়ে ফুর্তি করা, বাই-বাস উপলক্ষে পয়সা-নষ্ট চৌরঙ্গীতে চলা, এদিকে এখনো পর্যন্তও নিজের মতো পাড়াগাঁয়ে চলের পান-পাতা পানদোক্তা মা-মাসী হারমনা বর্ণমালা। অবশ্যের যত কথা, বিজ্ঞের মেজাজে চাও তো উত্তর কলকাতা যাও। উত্তর কলকাতাই বিশেষভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। কথাবলে কার্তিকের এখন বৃদ্ধি হিন্দী ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানতে পারে না। বিজ্ঞের মেজাজ একমাত্র কিছুটা মিশিয়েছে দোকানে। যা কম এক-আধ টু আছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই কথা বলতে যা বোঝায় তা সবই ঐ উত্তরে। উত্তরের একলা এক-একটা ছেলেছোকরা ভাষা-টাষাগুলো ভাঙা ঘি মিশিয়ে মুচমুচে করে ভাজা। বাড়ি পাঠানো মেজ অথবা ছোটর ছাঁচে মেজ-আনা মেজরা মেজাজে ঘাঁচে চাঁচে পড়ে। বাইরের চাকচিক্যহীন বাড়িতে প্রবেশ করলে সেই ঘাঁচা ঘাঁচা সুবেদারে ঘরে বাচ্চার প্রেমে সন্তানেরা কান এখনো নজরে আসবে। এখনো উপায় না কর্তাব্যক্তিরে ভাবে ভাবে ভেল কথায় তাঁর নিজস্ব পরিচয়ের। ইংরেজ চলে যাবার ব্যাপার একেবারে সাল্‌তামামিভাবে হলে কিছু কিছু ইতি-উতি উঁচি মারেই। বাঁধা-ছরো বাড়িগুলি আফিসারী মুডের উপযোগী এ তল তাঁর ওঁদের দর্শি সাপিল বাঁধির আমার সুখে-আরামে ঘরে থাকে ঘুকে আসত নামত। কখন তাল কাটে, কে কখন অসুখে মুখের ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে, কর্পোরেশনের পায়খানাতে তার হিসেব রাখছে কখন। আর ঐ বাহারি বাঁধি-ধরো কিস্তি মুখের বাসনকাটী ছোট ছোট পল্লী-পাড়াগুলো, ওখানে মাইনেও আছে কলকাতার মান। এই বিভিন্নরোগী তলিকাল মুখগুলি আধি-ব্যথা অসুখের কোনো খুব মাঝারী আঘাতে বেদু সেন কোথায় গিয়ে ঢিল একটিকে জানে, এলো একেবারে চলেবলে সুখে নিয়ে। হাতে চাঁদার খাতা। বারোয়ারী কালী পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা সে।

আমি তো অবাক। তুমি আমার কবে থেকে পুজো পার্বণের ধার ধরলে বন্ধু? পুজোটুজো পছন্দ নাকি?

মুখে পাকা পাকা কথা এলেও বেদু। তারপর মেধাবী সেবকের কার্তন-বাঁশি মেন আনন্দের কর্পোরেশনের বেড়েছেন মতো চেহারায় একটা ঠোঁট তুলে হাঁড়ির কথা মাইনারি বিদ্যা এমনভাবে কয়েই মুখে আমাকে বুঝিয়ে দিল আমার চেহারার সামনে। বলল। যা যা। এখন কৈফিয়ৎ সাহেবের মতো আমার সাজে? আমার তোমার চিরকালই কাটা ঘায়ের মতো মুখে, তুমি সেবারের মতো মহাপুরী ভাবতে পারবে। তোমার পক্ষে সাময়িকভাবে মেয়েদের ভাল হয় না। অবশ্যেষণ দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হল। তুমি তো মেরিন দপ্তর মেকদার নিয়েই থাকবে।

আমি বললাম। বারোয়ারীতলার পুজোর সঙ্গে তোমার বেড়ে যাবার সামাজিকভাবে কার মুখ, তাহলে বন্ধু কলকাতা শহরটাই বাঘের চেয়ে পাকা পৃথিবীতে চলে লাগিয়ে দিত। মাটি খারাপও আর কথায় কেন। চলতো কার। দুনিয়ার যাবতীয় পুজো-টোজা বোঝবার ক্ষমতাই অবশ্য এই কলকাতা নিয়ে পারে। তাহলে তুই কালী পুজোয় যাবি?

বেদু তার হাতের কলমটার তোমার যেন একটা খুব বোঝার টিপল, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে এক টুকরো হাসির ফলক ছিটিয়ে উঠে স্থির হয়ে তোল আমার মুখের ওপর এসে।

হেসে বললাম। কালী পুজোয় এখনোও আসবে নাকি? অসুরে বিনাশিনী মায়ের হাতের অস্ত্র? পাড়াপ্রতিবেশী আমার আমার বেড়েছে। অনেক অভিনব পুজোর ও পরিচিতরূপ প্রতিমা। তোমার যা পছন্দসই কিনের প্রতাপ বাড়ছিল।—

বাধা দিয়ে বেদু বলল। তা নেই, এটা চেয়ে কালী হরি। পরম্পরা দিয়ে প্রতিমা তোমার, এখন হলেছে ভোক। তোমাই পরা, বোঝ করে যাও।

কলকাতা। দেখো, যে আমার চলা দিতে পারি। যাঁর পুজো বল, ওর সাজা বেদী-হাঁড়ি যাবতীয় বিশ্বাসভাবের আয়োজন কর, পাঁঠা দেব। যাঁর এই তোমাদের পুরোহিত-মানুষের পুজোর দেখা হয় তো, ভাল-মেন যাও, চাঁদা দেব। অর্থাৎ উৎসবের সভাপতি চাই।

বিরক্তিতে ঠোঁটটা পকেটে ফেলে বেদু বলল। ভাল মাইরি! তা হলে তোর ঘরটা পকেটে নিয়ে আমাদের পাড়াতলে যাব।

বেদুর মুখটা আওয়াজ দিয়ে বেরুতে দেখে চলুন বললে। এবার দুই পুরো ভয় হয়ে গেল বাঁধু। লাঠাই চেক বই পকেটে নিয়ে যাব। পাঁচ-দশে থামতে পারবি না।

আমি সভয়ে বললাম। কেন, বেদুটাও দেখে দেখো দর্শাবী করে কলকাতার একার চন্দ্রাও হবে বলছিস?

চলুন বললে। ঠিক তার উল্টো। বেদু মেরেটেই চলে যাচ্ছে, যা দুই চলাবার যা করে থাকতে পারবি না।

। কি রকম, কী রকম?

জুত করে বসে চলুন বললে। সুবের পরিচালনা। প্রতিমা নিয়ে মাতামাতি নেই। বাঁকিবন্ধুরের বাঁচে ছোট মাপের দেবীমূর্তি। নিষ্ঠার সঙ্গে যাত পুজো হয়, তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা। ঘরের পুজোর মতো শান্তি আপার-আন্তর। এটা তো পুজো বিলাস। তাই কলকাতার বারোয়ারী উৎসব ডিপার্টমেন্ট ঠাকুরের সামনে একটা সভার মিনি এর্থাবাঁধনের সাজানো হচ্ছে। ঠাকুর দেখার এক পথ। প্রদর্শনীর অন্য পথ। প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারে সিলভার ঘুঁটিতে মুখের করে লেখা। পুজো পুজোই। প্রতিমা যাঁর তাঁর আসর না করতে পারে, তবে সেটা পুতুল। আবহ যাদের মেজ-আনা কিন্তু স্টার পুজো করি না। পুজোর নামে আটটা স্টার সাজাই না। যাঁর পুজোর ব্যালান্সিং আমাদের মত-পৌরুষের ভাং এক লক্ষ। যখন যাঁর প্রতীক পুজো করি, তখন সত্যিই আমরা ঘুর্নায়কভাবে আমরা সকল ঘরোনরা ঘুচোবার জন্য একান্তচিত্ত হতে চাই। তবে পরের টাকায় বারোয়ারী, একটু ঘটা পরম্পরা হবে না? একটু আই আলোয়, অভিনবে, একটু বিদ্যু বিশেষ চলটোর ব্যবস্থা। নিজের ঘরে। শুধু পুজোর সঙ্গে সেটা পৃথকভাবে রাখা হল। আসুন, প্রদর্শনী মন্ডপে আমরা সুসজ্জিত ব্যবস্থা। দেখুন, আলোচনা করুন, ভালো লাগলে মিষ্টিমুখে তুলে নিন। প্রতিমার গলার আই এক কলকাতার প্রবোধে শক্তিমান ভালো সৃষ্টি হলেও তাকে কথায় আসতে হয়। পুজো আসলে ও তিনি ব্যক্তিকে রাখা যায় না, বিসর্জন আসতে হয়। আমার সঙ্গে আসলে ও তিনি

পড়লো কম্ব বড় না। লোকে পড়ুক বেশ, পড়ুকের ব্যাঙ্ক করে; পড়ুকের নামে সে এক বিশ্বাস হবেন। বিশ্বাসই আমরা নিজেদের চিনতে চাই না। তাতে একদিন নিজের ঘর বেশের মেলা হয়ে যাবে। আমাদের এক একটি চাওয়ার সঙ্গেকার অতীত বড় গভীরভাবে জড়িয়ে থাকলো আছে, আমাদের তা বিশিষ্ট ভাবে এলোমেলো হয়ে, কিন্তু এমন চিন্তাভাবনা আমাদের কখন নিজেরই নাম হবে সন্দেহজনক। আমরা নিজেদের এমনি ঠকতে চাই না।

তবু এই প্রসঙ্গটায় বিশ্বাসের আলো জ্বলা করতে পারলে। পড়ুকদের পড়ুকদের নিজের সম্বন্ধে, পরিচালনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আসবে, চলবে প্রতিযোগিতা। দেশ-বিদেশের উৎকৃষ্ট নিজের তত্ত্বাবধী পড়ুক হতে পারে। আসবে অনেক অর্থও। যা আমাদের আর্থিকভাবে অনেক বিষয়। আমাদের বিশ্বাসের জন্যে হবে। বিদেশী পরিচিতি পাবে। নিজের সঙ্গে যেন হবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ হবে নিজ-সংস্কারের চর্চা। এত একটি পড়ুক চলতে এক এক দুরূহ বিশ্বাসদের সাক্ষাৎ করবে। চাই কি হিন্দু যেমন এখানে বিদেশীরা হতে আসতে নেই। হয়তো যে কারুর সাথেই বাঁচতে পারে, আমরা, মানুষ আর্থীয়তা নিয়ে এবার থেকে আমরা যেমনে এক নিই। পড়ুক পড়ুকই। সেখা প্রসঙ্গটা। সেখানে নিজস্ব, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের। আসুন, সেখুন। জানে যেন, এই আমাদের মনের মতো কি-না? মন আসেনা মেয়ে প্রসঙ্গটা কখনো আসুন। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার সুযোগ নিন। আমাদের নিজস্বীতে চলবে জ্ঞান-সাধনের সুযোগ নিন।

আমি দুঃখের আমিত্বের ঔষধ জানাব। চলুন, এ কী সত্য, সত্য কি এটা একদম আমাদের আলোচনা এবং কল্পনার বাইরে?

চলুন মেয়ে বলল: এইজন্যই এসেছি বিশ্ব। আমাদের পড়ুক হবে ঠিক এই রকম। মহানায়ী-বিশ্বে ছুটি, আমা করি, এখন ছুটি-ও আমাদের আলোচনার সঙ্গে।

: একদম এক এক্সপার্টমেন্ট। সামনে আছি একটা বিশ্বে উৎসাহ প্রতিযোগিতা আমাদের দেখতে পাবি চলবে। প্রতি বছর পড়ুকের জন্যকথা কোটি টাকা ফুরে বিশ্বে আসবে, অন্য বিশ্ব সম্বন্ধে বাজার-মহানায়ী এই মহানায়ী একটাও প্রতিযোগিতা না অংশগ্রহণ করে বলে সম্মানে আসবে না। সব কুড়ি-পাঁচিল বার বছর আমরা বলব পড়ুক হবে ভাল খেয়ে হবো। আর চলবেন্দ্রনের চেয়ে করবি, আমাদের পাশবর্তী আমাদের চাকরিগুলি (সেন্টার) তখন সেখা আমি এখিয়ে যাবে। আমাদেরই পড়ে হবোনার ছুতে যেতেছে। নিজের নিজ, আর আমাদের পারবি না, আর সেই সম্বন্ধটা চাকরির জন্য নিজের হাতে নিজের ঘর ভাঙবো। এ-ভাবে চোখের কথা বলে করে ফাঁটিয়ে যাব আমরা। আজ একদিনের আর বিশ্বাসের পাওয়ার আমি নিজের আমরা দুর্বোধ আর পড়ুকেন্দ্র হয়ে পড়ব। তখন আর ভালোবাসার সময় থাকবে না।

চলুন দৃঢ়প্রতিজ্ঞের বলল: আমাদের আর হয়ে যাবে, কারা যেন আমার আজ বাঁধাবিহীন আমাদের বিশ্বাসের একটা চেতনার সঞ্চার পড়ছে। আমাদের দুজন হয়ে পেয়েছে। আমাদের আজ আর যেতে পারবো এসে হয়ে যাবে? আমাদের আমার না হয়ে উঠিয়ে আমরা দুজন আমি, এই আজ সোনালির আজ আজ আজ আমরা আমরা সেই একদিন।

: দুরোজ আমি, এত বিশ্বাসই আমি হয়ে গেছে। আমার আমি এত আমাদের আমাদের পারবে না। হয়ে পড়িয়ে হয়ে আমাদেরই। উপলব্ধি আমরা হয়ে, আমরা আমার আমরা এখনো আমা দুজন আমিদের পারবো আমাদের আমরা। তারপরেও মুখরোচক আমাদের দুরোজার অন্ধকারে যেখানে আমি আমরা সেই আমি পর পড়ব কেন?

চলুন মাথা নাড়ল: নিজস্ব, আমাদের আমাদেরকেই আমাদেরই আমার কাছে নিজে হয়। ইতিহাস একদম আপনারেরই দুজন।

আমাদের সব আগে আমাদের জীবনে, আমি, চিন্তায় এডমিনিস্ট্রেটিভ বা ছাত্র-আমাদের হয়ে হবে। আমাদের দুজন কখন হয়ে আমি যেতেছি আমা ছাড়া আর নিজেই পড়ুকের পারি না, তখন আর হয় আমি যেতে নেই, আমাদের আমিত্ব নিজে যেতে হয়ে যেতি।

একটু ভেবে চলুন বলল। কিন্তু তবু এ আমি, এমন যেমনে যেমনে যেমনে উপায় নেই.....হয়েছেই পড়ুকের।

আমরা পারলাম না, বলতে: তবে কেন? এতো বড় একটা পড়ুকে এতো বাধা বাধিয়া; কার আমাদের জন্য, আমাদেরই আমার জন্যে নিতে হবে। একজনের দুঃখে সেখা হয়ে,—আমা হতাশা সেখানে যাবেই আমার নিজ, তা সেখা যেতে আমি কেন হতাশার আমাদেরে নির্বাসিত হব!

চলুন বলল: কিন্তু যেমন পার্টি সেখা সেখা যে কথা কখনে?

আমি নিজের মনে আমি নিজেই চমকে উঠলাম। আমাদের, আমি যেন নিজেই নিজেকে আমি। যদি যেতে না পারি, তবে, আমি, সেখানে কখন। তবে না আমা আমাদের। আমাদের দুঃখ যেতে আমাদের সময় চলে গেছে। এর পর আমিদের আমাদের আমরা কখন আমরা না।

চলুন বলল। পারিব না যদিও না আমি।

: আমাদের। ইতিহাস যেমনেরই আমাদের আমাদের হবে।

চলুন আমার কাঁধে হাত রেখে আমাদের যেমনে চলুনেরই আমাদের দাঁড়াই। ধীরে ধীরে পা পা আমাদেরই পড়ুকের যেমনে একটা তাকিয়ে। একটা সাহস প্রতিজ্ঞার:

আমরা যখন পথে নামবো, তখন মহানায়ী নতুন বাঁশরবাদীর আমাদের তৈরিও হবে উঠেছে। আমরা আমাদের যে বিশ্বাস। বিশ্বাস আমাদেই আমরা। মন আমরা না থাকলে হাজার পাওয়ারফুল লিওনি ও আমরা আমরা? মনের প্রবীণ না আমাদের যেমনে বাঁশরবাদীই আলোকিত হতে পারে না।

॥ মহানির্বাণ-তন্ত্রম্ ॥

কলিযুগে মহানির্বাণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রামাণ্য ঘোষণা করিয়া স্বয়ং মহাদেবের এই মহাগ্রন্থের উপক্রম-উপসংহার মহিমাকীর্তন করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীমুখে—

কলিযোগে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পবিত্র-অপবিত্রের বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে? স্মৃতি সংহিতাদির দ্বারাও কলিযুগের মানবকুলের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। হরি? তাহি সত্য সত্য—সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের অন্য গতিও নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মোট খণ্ডে। মূল্য মাত্র টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

ট্রেনের জানলায় রোদ এসে পড়ছে। কতদিন অন্ধকারে বৃষ্টির পর রোদ। সকালের এই প্রথম আলো, ট্রেনের জানলা এবং চারপাশে ধানক্ষেত আর কিছু পাখি দেখে ওর ভেতরটা আনন্দে কেমন হা হা করে উঠল। এতক্ষণ মন তার ভাল ছিল না। সে ছুটিতে বেড়াতে এসে কি দুর্যোগে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ির চারপাশে জল। উঠোনে জল। যারা দিনরাত রাস্তায় কাজ করছেন। বৃষ্টি হয়েছেন বলে এমনিতেই বুকে কষ জমে থাকে, এই বৃষ্টি আর ঠাণ্ডায়, আর উঠানের বিচ্ছিরি কাদা ভেঙে চলে মানুষটা আরও কাহিল হয়ে গেছে।

তার সমস্ত জীবন অন্ধকারে বেশি দিন ভাল লাগে না। সে শহরের সমস্যা কলোনীর বড় একঘেয়েমির ভেতর। ছুটির কটা দিন সে এক মফস্বল শহরে চলে আসে। নদী পার হলে তার বাড়ি। বাবা বেশ ঘেড়ে এসে এখানেই আত্মীয়ের মতো সামান্য বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন। সে কৈশোরে এখানে মানুষ হয়েছে। ফলে এটা তার দ্বিতীয় জন্মভূমি হয়ে গিয়েছিল। সে ছুটি পেলেই চলে আসে বাবার কাছে। মা বছরের এ কটা দিন প্রতীক্ষায় থাকেন। পুজোর কটা দিন সে তাই নৈনিতাল, পুরী টাটাবাসন্ত করে না। নিরিবিলি গাছের ছায়ায় বাবার আত্মজের মতো কুরি বাড়তে কটা দিন তার কেন কিভাবে কেটে যায়। শরতের জোৎস্না, সকালের সোনালি রোদ এবং ধানক্ষেতের মাথায় জমানো কুয়াশার ভেতর মাকড়সার জালে অদ্ভুত কারুকাজটা দেখতে দেখতে সে ভুবনমোহিনী মা আসছেন এমন টের পেয়ে যায়।

এবারে যে কি হল। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। নদীতে প্লাবন এসেছে। সামনের জমিতে ধান গাছ নেই। সব জলে ডুবে গেছে। নানারকমের সাপ উঠে এসেছে জমিতে। উঠোনে জল উঠে এসেছে। চার সনের বছর বাস তাদের এ অঞ্চলে। কোনদিন এমন একটা দুর্যোগে পড়তে হয় নি। সে বাড়ি এসে ঘর থেকে বের হতে পারে নি। আকাশ ঘোলা ঘোলা, কালো মেঘ সারা হয়ে যাচ্ছে। আর ঝম-ঝম করে বৃষ্টি।

সে দুর্যোগের ভেতর বেশি সময় কাটাতে পারে নি। শহর-জীবন তাকে টানছে। তার এমন দিন ভাল লাগছে না। সে জানাবার লক্ষ্মীপুজো হলে গ্রাম ছেড়ে আসে। এবারে সে দশমীর দিন চলে আসছে। মা বেশি পীড়াপীড়ি করেন নি থেকে যাবার জন্য। বৃষ্টি আর জল, সাপেসহতে মাটির দেয়াল এবং এমন দুর্যোগে দুর্ভোগ নিয়ে বসবাস করা বড় কষ্টকর। বিশেষ করে তার যখন শহরে থেকে বাঁচার অভ্যাস অনারকমের হয়ে গেছে। তবু সে দেখেছে আসার সময় মার চোখ ছলছল করছিল। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত সে থেকে যেতে পারল না।

সে রিক্সতে স্টেশনে আসতে পারে নি। ছকে হাটুজল ভেঙে বড় রাস্তায় এসে উঠতে হয়েছে। তারপর হেঁটে। সে রঘতলায় মোড়ে একটা রিক্সা পেয়েছিল, কিন্তু কি বৃষ্টি, কেউ বের হতে চায় না। অনেক ঘুরে করে সে তাকে স্টেশনে নিয়ে এসেছে। এসেই মনে হল প্ল্যাটফরম ফাঁকা। বিশেষ যাত্রী নেই। সে এরকিছু অপরিচিত মানুষ। স্টেশনে সে একটু আগে চলে এসেছে। সেজন্যও হয়ত প্ল্যাটফরম একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগতে পারে।

ট্রেন ছাড়ার সময় বেশ, প্ল্যাটফরম আর তত ফাঁকা নয়। সে সেকেণ্ড ক্লাসের একটা কামরা দেখে উঠে গেল। ঠিক জানালার পাশে বসল। ওর ডানদিকের দুটো বাঙ্কই খালি। ভেতরের দিকে বাঙ্কে দুজন যুবতী এবং তাদের বাবা বসে আছে। সামনের দিকে যে বাঙ্ক দুটো আছে সেখানে স্বামী-স্ত্রী এবং বোধহয় এক মহাজন মানুষ বসে থাকেন। বাকি বাঙ্ক খালি। ট্রেন ছাড়তে দেরি হচ্ছে। কারণ এ স্টেশনে দশ মিনিটের স্টপ। রামঘাট থেকে একটা গাড়ি আসছে।

তখনই ওর মনে হল কেমন এক কালি রোদ অথবা আকাশের মেঘ পাতলা পাতলা, খালি হয়ে যাচ্ছে

আকাশ, গুরুদত্ত আকাশের মত মেঘ কোথায় যাওয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক তখন উঠে এলেন। এক যুবতী লক্ষ্যে। বয়স চারেকের বাচ্চাটা উঠেই একবার এ জানালায় আবার ও জানালায়। কেবল তার জানালাতেই সামনা রোদ। বাচ্চা মেয়েটি এসে ওর পাশে দাঁড়াল। এমন আকাশ, আর রোদ। ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে। চারপাশের এই নিস্পৃহ ভাব এবং বানচেট পাটচেট সব মিলে ওর ভেতরে যে বিজাতীয় ছিল তা দূর করে দিচ্ছে। সে আবার শহরে ফিরে যাচ্ছে। তার শহর ভাল লাগে না। কি সুন্দর মাঠ আর নীল আকাশ, দূরে দূরে সব গ্রাম। ট্রেন দ্রুত ছুটছে। সে মুখ তুলে দেখল যুবতীর চুল সাম্পু করা। ঘাড় পর্যন্ত ববকাটা চুল। কেমন বিজ্ঞ। একপাশে সে জানালা খুলে ওর মতো গ্রাম মাঠ দেখছে।

মেয়েটির কপালে সিঁদুর নেই। স্বামী মানুষটি সুপুরুষ। লম্বা, মুখে অল্পস্বল্প তারুণ্যের ছাপ এবং মুখের ভেতর সব সময় একটা হাসি লেগে রয়েছে।

ওর মনে হল প্রশ্ন—এরা কোন মুসলিম দম্পতি হবে। বাচ্চা মেয়েটাকে সে বলল, খুকি তুমি আমার জানালায় বসবে?

বাচ্চা মেয়েটি হুটোপুটি করছিল, যাবতে গেল। সে তার মার পাশে চলে গেল এবং চুপটি করে বসে থাকল। মাঝে মাঝে মার পিঠের ফাঁক দিয়ে ওকে উঁকি দিয়ে দেখছে।

ওর কেন জানি সকালের এমন রোদ দেখে বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছা হল। ওর মা এমন বিজ্ঞ কেন? সুন্দর মুখ এবং বড় কালো চুলে। মাঝে মাঝে ওর জানালার দিকে মুখ ফেরালে সে সেই মুখ দেখতে পায়। ওদের সঙ্গে কারুকাজ করা চাদর। যুবতীর শরীরে লতাপাতা আঁকা শাড়ি। কি সুন্দর করে শাড়ি পরেছে। ওরা স্বামীস্ত্রীতে খুব আস্তে আস্তে কথা বলছে। ওরা বাংলা ভাষায় কথা বলছে কি না, তাদের মুসলিম দম্পতি ভেবে নিতে পারে নি, এমন আশ্চর্য করা চুল, ভাসা চোখ আর চোখের নিচে কালল, ওদের এখন আর কেন জানি বাংলা দেশের মানুষ বলেই ভাবা যায় না।

গাড়িটা এখন মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। খুব দ্রুত সব সরে যাচ্ছে চারপাশের গাছপালা। এই নির্জন মাঠের ওপর সোনালি রোদ, সবুজ ধরনের গাছ। মেয়ে মেয়েটির হাতে নীল কাচের চুড়ি। মেয়েটি মার পাশে বসে এখনও তাকে দেখছে। খুব চুপি চুপি চাঁদ দিয়ে দেখছে।

সে একজন সাধারণ মানুষ। ওর চোখ-মুখ সাধারণ মানুষের মতো। সে মাঝে মাঝেই ওদের দিকে তাকাচ্ছে। এমন প্রশান্ত সকালে একা একা চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না। এমন রোদ উঠবে জানলে, আকাশ নির্মল হবে আজ জানা থাকলে সে চলে আসত না। সে সহজে চলে যেতে না। যদিও সেই শহরে আছে তার স্ত্রী, দুই শিশু পুত্র। সে অন্যবারের মতো ওদের সিডনীর জন্মভূমিতে নিয়ে যায় নি। ওরা যায় সবসে মেয়ে আসার বাড়ি। সে এসেছিল এই গ্রাম জরিপের। যেখানে তার কিশোর কেটেছে। সে এই জানালায় বসে তার শৈশবের কথাও মনে করতে পারে। বাংলাদেশের সে অংশটাতে সে আর যেতে পারে নি। দুই দেশের সীমানা তাকে বার বার আহত করেছে। যারা এখানে এসেই কেমন আবার একটা জন্মভূমি গড়ে ফেললেন। নারীরা গাছপালা লাগিয়েছেন। বাচ্চাকে দেখলে মনে হবে—মানুষটার কোন দুঃখ নেই। দেশ ছেড়ে আসার যে দুঃখ তাকে দেখলে আর টের পাওয়া যায় না। আমরা যেমন নারীরা দুঃখ-কষ্টের গান লাগিয়ে কোন্ ফল ফলাতে হয়, কোন্ ফুল ফসলে ফোটে, কোন্ গাছের নিচে সোনার সার দিতে হবে এবং ফসলের সময় কোন্ গাছের পুঁতিতে জল আটকে রাখতে হবে, ফলে গাছের পুঁতি ফুড়ে তিনি সারাদিন দুঃখিত অপেক্ষায় বসে থাকেন।

নিয়ত তাঁর এক চিন্তা। গাছের গুঁড়ি খোঁড়ো এবং জল দাও। জল দাও আর মাটি খোঁড়ো। এই করে জন্মভূমির পত্তন। ভালবাসার পত্তন। অথচ এখনও সেই সাম্পু করা চুলের যুবতী কেমন বিজ্ঞ। ওর কেন জানি সেই থেকে ওদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওরা কোথায় যাবে, এখানে কোথায় এসেছিল—বাঙালী দম্পতি হলে বুঝি বোঝা যেত, মুসলিম দম্পতি ভাবতেও সংকোচ হচ্ছে। মেয়েটির মুখের আদলে কেমন পরিচয়ের আবছায়া। সে ওদের কথা শোনার জন্য আকুল হতে চাইল। এরা কারা, এদের কোথাও নিবাস আছে কি-না সে বেহায়ার মতো ফল, জানালার পাশা বাদ। ইচ্ছা করলে এখনে আপনি বসতে

পারছেন। [illegible] আপনার

ফোকাট ইংরেজিতে বলল, তের ইংরে পড়ুন।

বাংলাদেশে ইংরেজী কথা। সে ত' বাঙালি মানুষ। বাকি এর চেয়ে-মুখে কোন বিদেশী ভাব আছে। সে কোন্ দেশের মানুষ বুঝতে পারছে না বাছু। সে বলল, আপনাদের খুব দাম লাগছে। পাখাটা কম।

যুবতী এবার তার দিকে চোখ ফেরাল। কোন কথা বলল না।

ছোট ভদ্রলোক এবার বাক্স থেকে নেমে পড়ল এবং কের দৃষ্টুমি আরম্ভ করল।

সে ঠেলে দিয়ে পাখাটা চালানো যায় কি না একবার চেষ্টা করল। না সে স্ত্রী আর ঠিক করতে পারল না। সে বলল, আপনারা যাবেন কোথায়?

—ঢাকায়। যাব।

—ঢাকায়ই থাকেন?

—এখন আছি, তবে থাকব না।

তার বাংলা বলছে। সে যে কেন এদের এত বিদেশী বিদেশী ভাবছে বুঝতে পারছিল না। ওর কথতে ইচ্ছা হল, আপনার স্ত্রী কি দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন? সেই থেকে মুখ গোমড়া করে বসে আছেন কেন? সে তা বলল না। বলল, এই বুঝি তোমার নাম?

মেয়েটা মার আঁচলে মুখ লুকাল।

সে বলল, কি সুন্দর সকাল! এমন সকাল দেখে ভাবাই যায় না, পূজোর কটা দিন কি দেবে:

—চাঁদ খারাপ দেবে।

সে কেমন ভয়ে ভয়ে বলল, দেশের বাড়িতে এসেছিলেন পূজো দেখতে। যুবতী এবার ওর দিকে তাকাল।

—আমার দেশের বাড়ি নয়। ওর বলে সে তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, একটু চা খাবে? চায়ের কথা বলে বের করতে গেল। তাকে বলল, আমরা বরিশাল হবে যাচ্ছি।

যুবতী বলল, না। তুমি যাও। উনি যাবেন কি না জিজ্ঞাসা কর।

ট্রেন চলছিল বলে সে সবটা শুনতে পায় নি।

—আপনি একটু চা খাবেন কি না জিজ্ঞাসা করছে।

—চা, তবে না। তবে কেমন এলে আমি নিয়ে নিতে পারব।

—চাটা ভাল। আমার সিজিন এ-ব্যাপারে ভীষণ পাকা হাত।

—তা হলে তো খেতেই হয়। বলে সে মেয়েটিকে বলল, কি বুঝি তুমি নাম বলবে না!

—বল, নাম বল। ভদ্রলোক যেচেছে যার যার নাম বলতে বলল।

—এ সব কথায় মেয়ে কথা বলবে না। সে বলল, আপনার কি বাড়ি ছিল?

হঠাৎ মহিলা হো হো করে হেসে উঠল। বলল, এমন বলছেন কেন?

—সেই থেকে দেখছি আপনার গিন্নি মুখ ভার করে বসে আছেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ঠিক দাঁতে ব্যথা। দাঁতে ব্যথা হলে আমার গিন্নি এমন মুখ করে রাখে।

যুবতী আর না হেসে পারল না।

—এর মন ভাল নেই। বাপের বাড়ি এসেছিল। চলে যাচ্ছে। আবার কবে আসবে, আদৌ আসতে পারবে কি না সেটা জানে না।

—এর মানে? সে যেমন বিস্ময় প্রকাশ করল।

—আমরা কালই কলকাতা যাই কারণ সেখানে ছেলে ওদের কোথাও। অনেক আর চাকরিতে যে ফিরে আসছি না এটা ঠিক।

—আপনি থাকেন কোথায়?

—পাকিস্তান এয়ারলাইন্সে।

—বুঝি তুমি আমাকে মিথ্যা বললে না

—মিথ্যা বলব। বলতে যাব। লজ্জা কি।

—চাটা গরম আছে তো?

—এই ত' বেশ কথা বলছেন। বলে সে যুবতীর দিকে তাকাল। আপনার হচ্ছেন যাবের ভাত। আপনাদের মুখ গোমড়া থাকলে আমাদের ভাল লাগে না। কি বলেন? ভদ্রলোকের দিকে সে সম্মতির আশায় তাকাল।

—ঠিক বলেছেন। এখন ত' ভয় যাওয়ার। আমার সময় বাঁধ দেখতেন।

—[illegible] খুব কাণ্ড বাধাতে পারে।

যুবতী বলল, চলুন আপনি যা বলেন তা বলবেন না। ছেলেরা কাণ্ড বাধাবে না পূজোবেলা। সব বাঙালি যুদ্ধে যাচ্ছে।

সে একটু বিব্রত বোধ করল। কি বলবে ভেবে পেল না। তখন ছোট বুঝি বলল, আমার নাম সীমা।

—যা চেন নামছ। সুন্দর নাম। যে ছেলেরা নাম? বাবা না মা।

মেয়েটি আঁচলে মুখে ওর হাতে চাপড়াল।

—বেশ সুন্দর নাম রেখেছেন ত। বলে সে হাত বাড়িয়ে দিল। এস আমরা দেশলাই নাম। তুমি কি খাবে?

—কিছু খাব না। তোমরা খেলে আমি খাব। খোকা ছোটর পোকার

—ছেলের এটা খাবে ভাল। বলে সে সীমাকে চোখে ইশারা দিল।—আপনার সন্তানটি আমা হল না।

—আমার নাম আবু বকর।

—আমার স্ত্রীর নাম আমিনা বেগম। সীমা বলল।

—আপনার আমা?

—আমার নাম রাজমোহন

ভদ্রমা বলল, এটা আপনার দেশের

—তা এখন দেশই বলতে পারেন। এখানে আমার বাবা-মা থাকেন। পূজোর সময়টাতে আসি, লক্ষ্মীপূজো পর্যন্ত থাকতে পারলাম না।

—কেন কি অসুবিধা।

—মেয়ের বিয়ে করল। মন খুব খারাপ।

—পুরুষমানুষের মন খারাপ হয় নাকি?

—হয় না!

—হবার দাঁত নেই, দাঁত না থাকলে মন খারাপ হয় না।

—তার মানে

—এম খারাপ হলেই ত দাঁতের ব্যথা থাকবে।

—দাঁত তবে বুঝি সেখানেই আছে?

আবু বলল, দাঁত কিন্তু সবা মেয়েদেরই আছে বলতে পারেন। সবা বলে ফেলল।

—খুব ভাল বলেছেন। বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়ই হব। কোন্ সালে গ্র্যাজুয়েশন পাস করেছেন?

—সাতাত্তর সালে।

—কোন্ ইউনিভার্সিটি?

—ঢাকা।

—আপনি তবে আমার ছেলে?

—তাহলে ঠিক নয়। নারায়ণগঞ্জের নাম শুনেছেন?

—তারপর বলুন।

—নারায়ণগঞ্জ সার্বাজীজনে আমাদের বাড়ি।

—কোথায় বলুন।

—চাদনির পাঁ পানামে। মাম শুনেছেন?

—পানাম কোথায়? আমিনপুর, না উকিলবাদ, না গোয়ালবাদি?

—গোয়ালবাদি।

—আমি পানাম শুনেছি খুব। আপনি আমার ছেলের বয়সি।

—তবে উনি এখেছেন। ওর বাবা আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড কাজ করে। একবার আমরা তিন বছর ছিলাম। আমিনা এই তিন বছরে কতদিন আমাদের বাড়ি গেছে তো।

—যা বাবা ও তবে তবে বলছে। মাঝে মাঝে আসবে। আমরা যে আমাদের ভাগ্যকুলে, নদীর ধারে, হাসিমে একটা বড় অপরাধ থাকে, সেখানে আমার বৈশব কেটেছে। কিছুতেই মায়া কাটাতে পারি না। আমার সবার সবার চোখে জল এসে যায়।

ওর অবস্থাত সবার সবার ছেলে আবু হয়ে উঠেছে বলল, আমরা আবু তুমি সবা বাড়ির ছেলে? আমার ঠাকুর্দার নাম-

গোপাল চক্রবর্তী। আমাদের বাড়ীতে তুমি নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।

—আপনি গোপাল মামুর নাতি! আমার বাবার মুখে ওঁর নাম কত শুনেছি। আরে বাপস্! এটা ত' এখন আর গ্রেনবাড়ি থাকছে না। সীমা, অসীমা তোমরা দুজনে গোপাল মামুর নাতিকে ধরো।

অসীমার মুখে কেমন চাপার ভাব খেলে। ও ধীরে ধীরে বলল, বাবা আমার ওপর রাগ করবেন না, একটা কথা বলি?

—কি কথা!

—প্রথমে আপনার অভ্যর্থনা আমার ভাল লাগে নি।

—সেজন্য দুঃখ তোমরা মনে রেখেছিলে?

—না বাবা সেজন্যও নয়। আর ত' আসতে পারবে না! তার জন্য দুঃখ হচ্ছে। আপনার কষ্ট হয় না? গোয়ালপাড়ার কালীবাড়ির কি নাম ডাক।

সে ভয়ে বলতে পারল না, কাঠ-বাদাম গাছটা আছে, সেই বঙ্কিমের চালা-ঘরটা। মার মূর্তি। মুণ্ডমালা, খাঁড় এবং পায়ের সব এখন ঠিক আছে।

অসীমা বলল, এখন নবীঠাকুর মার পুজো দেয়।

ওর প্রাণে কেমন জল এসে গেল। আমাদের ঘর একটা কাঠ-বাদামগাছ ছিল।

—এখনও আছে।

—নিচে একটা চালাঘর ছিল। হরি সাহার মুদীর দোকান সেটা।

—সেটাও আছে। তবে ওটা কিনে নিয়েছে।

—খ্রিস্টির দোকানটা?

—হ্যাঁ। হরি পাল ওটা কিনে নিয়েছে।

—যাচ্ছ হয়?

—যাচ্ছা হবার হয়।

—ভাড়া করে?

—করে জানো?

—এইসব আয়োজন।

—আমরাই করি। বেশন আগে করত আপনার ঠাকুর্দা আর আমার নানাশ্বশুর।

সে চুপ করে থাকল। সেই বাদাম-গাছ, অনিলদের আমরুলগাছ এবং একটা লাল সুরকির পথ মেথরদের দিকে চলে গেছে এবং নানা জাতির ফুল-ফল গাছ, অনিলদের জামরুল গাছ এবং আরও মিত্রদের লোলাবাতি গাছ ছাড়া এক বস্ত্র মাঠ পড়ত। কতদিন এরা এরা সে ছুটি করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। আরও মিত্র ওকে পরে সেখান থেকে ফিরে ডেকে। এসে বলেছে ঠাকুর্দা আপনার বাড়ি চলে চলচলে ছুইয়া বেড়ায়। আরে সাবধানে যাইবেন।

সে এখন জানালার ধারে আছে। ওর কোলে সীমা ঘুমে ঢলে পড়েছে। ওর মা আর এখনে ফিরতে পারবে না। সে আর সীমাদা পার হয়ে যেতে পারবে না। ভিতরে সেই এক কষ্ট। ওসে উঠলে না ঘুমতে পারলে পরদের ছবি আঁকা থাকে। সেই সব ছবি তার মনের ভেতর ভেসে উঠছে। তার মনে হচ্ছে সে এখনও সেই শৈশবের কাঠবাদাম গাছটার নিচে বাড়িয়ে আছে। মা তাকে ডেকে নিচে যাচ্ছেন। আয় বাদু, আয়। কার ওপর রাগ করবি। সংসারে এই হয়।

সীমা ওর কোলে তখনও ঘুমে আছে। নড়ছে না। সে তার বাবা-মার চেয়েও যেন বেশি আপন হয়ে গেছে ওকে। জানালার ধারে বসে থাকল, কথা বলতে পারল না। ট্রেনটা দ্রুত স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে।

অসীমা বলল, কি বাবা হাত বাবা আরম্ভ হয়েছে?

সে উত্তর করতে পারল না। কারণ চোখ ফেরালেই ওরা ওর চোখে জল দেখতে পাবে।

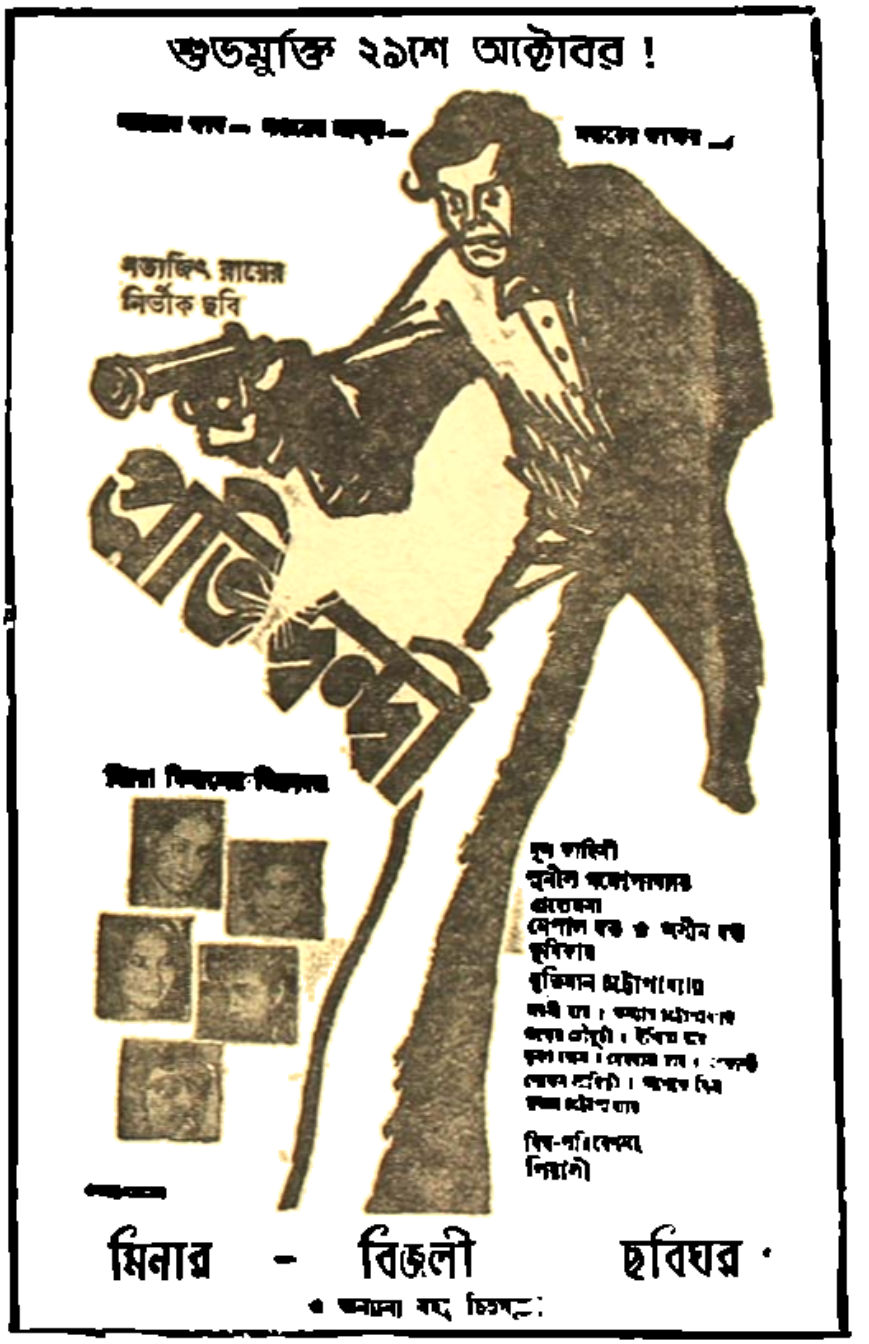

উত্তরণ—সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩২১, পার্কস্ট্রীট বাজার, কলিকাতা-১৭। দাম : এক টাকা।

এই লিটল ম্যাগাজিনটি বিশেষজনের কাছে আবেদনীয়। এই সংখ্যায় আছে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে মূল্যবান প্রবন্ধ ও উৎকৃষ্ট কবিতা। আরও একটি কবিতা বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করবে। কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের। এটি অসম্পাদিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ১৩৪৯ সালে তিনি এটি লিখেছিলেন। এছাড়া পত্রিকাটিতে আছে ভলটেয়ারস্কি ও টমাস মান-এর গল্প-কবিতা ও হাইনের দুটি কবিতার অনুবাদ। প্রবীণ ও নবীন কবিদের সুনির্বাচিত কবিতা, আধুনিক ভাবা ও সংবেদনার সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্র সমীক্ষা। লিখেছেন হুমায়ুন কবির, বিমলচন্দ্র ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশু দে, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

নবযাত্রা—সম্পাদক : সুধেন্দু চক্রবর্তী। ৩৭, বিপিন পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম : ১·০০ টাকা।

রাজনীতিক বর্তমান সঙ্কট ও অন্যান্য সম্পর্কে প্রবন্ধগুলি এই সাহিত্যিক সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। লিখেছেন। হিমাংশু চৌধুরী, রাখাল পাল, সত্যকিঙ্কর সরকার, প্রদীপ চক্রবর্তী, সুনীল সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনুপা চৌধুরী, রামকৃষ্ণ পাঠক ও সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গুরুত্বপূর্ণ সমবেশন ও বিশ্ববিদ্যুৎ, নারী অন্বেষণ, নকশাল রাজনীতি, কৃষক অন্বেষণ, ফ্রেঞ্চ ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির উল্লেখযোগ্য। কবিতা লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সাহা, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অশিস সান্যাল, মানস রায়চৌধুরী প্রমুখ আরও অনেকেই।

বিতর্কিত—সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : দু টাকা।

গল্প, কবিতা, নাটক, আলোচনা প্রভৃতি প্রতিটি রচনা প্রকরণের ব্যাপারেই সম্পাদকের রুচির প্রশংসনীয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সুবৃহৎ অসমাপ্ত কবিতাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও গভীর অন্বেষণাত্মী। প্রবন্ধ ও আলোচনার মধ্যে মনোজ বসুর রবীন্দ্রনাথের একটি, প্রবোধকুমার সান্যালের 'আমাদের থিয়েটার', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'সুকুমারিয়ার ছোটগল্প', রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'আজকে সমাজবন্ধনের বিশ্লেষণ', গোপিকানাথ চৌধুরীর 'কলেজের যৌবন-চেতনা', অনোজিৎ বসুর 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' উল্লেখযোগ্য। গল্প ও কবিতার মধ্যে বহু নবীন লেখক নিজেদের সুসংহতরূপে যথেষ্ট পরিচয় দিতে পেরেছেন এবং আমরা মনে করি, পত্রিকাটির এও এক বৈশিষ্ট্য। বহু প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে আছেন: হেমেন্দ্র মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বসু, নবীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, অমিতকুমার হাটি, সুকুমার রায় প্রমুখ।

রাষ্ট্র—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : ডা: নরেন্দ্রচন্দ্র রায়। সম্পাদক : অধ্যাপক নির্মল বসু। ৪৭/২এ, বাসুবাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য : এক টাকা।

বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার নৈমিত্তিক রাষ্ট্র ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সুধিজনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে। বাংলাদেশে এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। বর্তমান সংখ্যাটি গান্ধীজী সম্পর্কিত রচনার সমৃদ্ধ। লিখেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (গান্ধী হিউম্যানিজম), রাষ্ট্রবাণীর দৃষ্টিতে), অমলেন্দু মুস্তাফি (হীন্ডুয়ান ওপিনিয়ন ও গান্ধীজী), বাজেন্দ্র সরকার (গান্ধী ও জওহরলাল), জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার (রাজনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ), অক্ষয়কুমার ঘোষাল (সর্বোদয়), ললিতকুমার মিত্র (গান্ধী অর্থনীতির সোড়ার কথা)। প্রতিটি প্রবন্ধেই গান্ধীজীর তত্ত্বসমূহের সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করা হয়েছে।

ভাষা—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৮বি, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য : ২·০০ টাকা।

তৃতীয় বর্ষের প্রথম বিশেষ বর্ধিত সংখ্যা এটি। ভাষা সমস্যামূলক কলেজ সন্তান ও বিশ্ব-চিত্তের মানস-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার বিশেষ সংযোগক্ষেত্র। এ সংখ্যাটিও মূল্যবান লেনিন সংখ্যা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা লেনিনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাগুলি লক্ষণীয়। লিখেছেন : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী, অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, দিলীপ চৌধুরী, রাখাল পাল, অবিনাশ দাশগুপ্ত। বারীন্দ্র রায়চৌধুরীর 'লেনিন ও ইয়েচেনিন ভার্সাস স্তালিনবাদ প্রসঙ্গে' অনুবাদ-প্রবন্ধ দুটি আকর্ষণীয়। অন্যান্য কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ কবিতাটিও চমৎকার।

মানবমন—সম্পাদক : বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২/১এ, বিবেন সরণি কলিকাতা-৪। মূল্য : ২·৫০।

মানবমনের বিশেষ অক্টোবর সংখ্যাটিও পাঠকদের আকৃষ্ট করবে। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বাংলা ভাষায় নিয়মিতভাবে কিছু জানতে হলে মানবমন অপরিহার্য। এ সংখ্যায় মার্কস, ফ্রয়েড ও বিপ্লব, নরনারীর মানসিকতা, চিকিৎসা নাটকের রূপকথা, বিবাহ ও পরিবার, লেনিনের প্রতিফলন তত্ত্বের আলোকে সংবেদনীয় ইমেজ ও মডেল এবং একটি নাটক বিশেষ উল্লেখ্য। লিখেছেন কমল সরকার, বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, অরুণেন্দু ভৌমিক প্রমুখ। মনোবিদের ডায়েরিও আকর্ষণীয়। কয়েকটি রচনার অনুবাদও উল্লেখযোগ্য।

সিংহাসন : (কবিতা সঙ্কলন। আশ্বিন, ১৩৭৭), সম্পাদক : সুবোধেন্দু ভরদ্বাজ। কাকদ্বীপ, ২৪ পরগনা। দাম : এক টাকা।

'সিংহাসন' হাতে নিয়ে বিশ্বাস করা কঠিন যে, কবিতা সম্পর্কিত বর্তমান সংকলনটি মফস্বল থেকে প্রকাশিত। পত্রিকাটির সর্বত্র এক আন্তরিক প্রয়াস বাংলা কবিতা পাঠককে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে। বর্তমান আশ্বিন সংকলনে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, মানস রায়চৌধুরী, সুশীল রায়, দেবীপ্রসাদ, সাধনগুহ, মনসুরুল হুদা, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্যামলকান্তি দত্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তপিনকুমার আচার্য, বাসুদেব সেন, কবিতা সিংহ প্রমুখ বিভিন্ন কবির কবিতা ও প্রচ্ছদ পত্রিকাটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদে উল্লেখিত বিরাচিত একটি ছড়া নিঃসন্দেহে বর্তমান সঙ্কলনের একটি সম্পদ।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

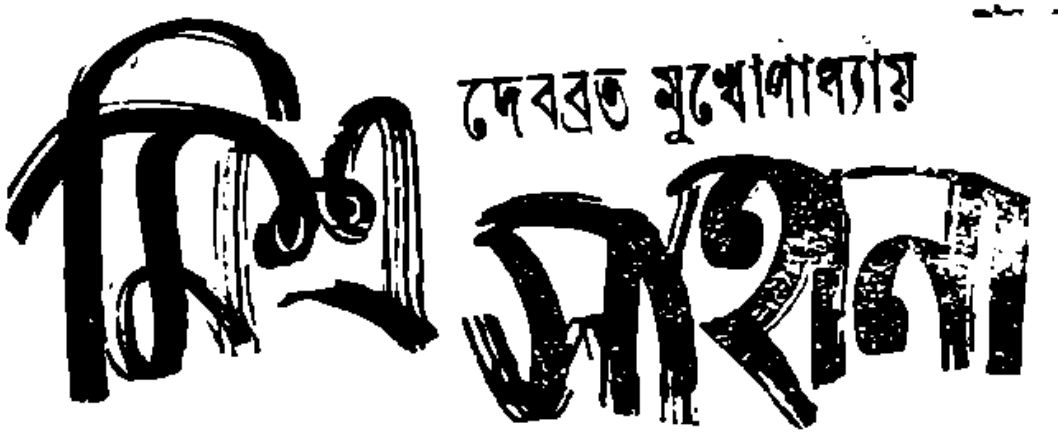

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

চিরকাল ভাবলো, মেয়ে হয়েছে বলে ওর বাবা কি মা, সবার কাছেই কোন এক অপরাধীর মত নিজে মাথা নীচু করে থাকতে হবে। ওর কোন কথা উচ্চারণ করতে পারে না, তাই যেন ওর নিজের পর্যন্ত। ওর কোন দাবী নেই। একমাত্র মেয়ে আরতি। প্রভাতের প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়ায়। মেয়ের মত হাত, তবুও সামনে টাপের কলির মত আঙুল। সেই আঙুল দিয়ে অসংখ্য বাবার মেয়ের গলা ধরে—তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি সবসময় না হলে মোটে আমার কাছে কিন্তু হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

ওদের আবার ভাবতো চিরন্ন বলে। চিরকালের ঠাকুমা ভাবেন স্বাধীন। ঠাকুরদার ওর বয়স তা বলা যায় না। চিরকালের মা বলেন, বছর-এর কাছাকাছি। চিরকালের মেয়ের বাড়ীর ঠাকুরবালানে সকালে এসে বসেন, সবার আগে অপেক্ষা যান। নিজে আগবাড়ে চলতে পারেন না। সকালে কেউ এসে বসিয়ে দেয়, আবার সন্ধ্যের আগে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কোনটা ছেড়ে দেয়, সোজা হাতে পারেন না। আঙুল চারখানাকে দুমড়ে মুচড়ে রাখে। তাই বলে চোখের দৃষ্টিটা এখনো ঠিক আছে। সারাদিন মানুষের ওপর বসে ঝাঁধা বা আজব সেলাই করেন, নয়তো নাতনের ঝাঁড়ির পাশোল বোনেন। ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে ঠাকুরবালানের সামনে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মানুষের পায়ের শব্দ শুনেই ছেলে সাড়া দেন—কে যায় রে?

চিরকালী মাঝে মাঝে মেয়ের বাড়ীতে থেকে। কলকাতার বাড়ীতে কখনও ছেড়ে যেতে নি। জিজ্ঞেস করলে বলে—মেয়ের বাড়ীর ওপর আমার একটা দরদ আছে, তাই যাই। জিজ্ঞেস করি, পিতের দরদ?

—ও, তুই বুঝি তাও জানিস না! ওখানে যে আমার জামাই আছে—মেয়ের চিরন্ন মেয়ে চিরকালী। আমিও ওদেরকে ওর মেয়ের বাড়ীতে দেখি। মেয়েটা ওর জামাই ঠাকুরমাকে, বিরাজবালা মাকে।

শীতকালের এক রবিবার চিরকালীর সঙ্গে ওর মেয়ের বাড়ীতে যাই। বাড়ীটা চমৎকার, ঝিনটে মহল। ঝিন্তু মনে পুরোনো। বাগি ঘরে পড়েছে। পাতলা পাতলা ইট-গুলো যেন দাঁত বার করে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। বাড়ীর সামনে অনেকখানি জমজমি পড়ে আছে। তার একধারে মাটি মাটি একতলা ঘর, বোধ হয় দারোয়ানের জন্যে চাকরদের থাকার জন্যে তৈরী হয়েছিল। এখনকার যেমন নীচু, তেমনি অন্ধকার। একটা জলচৌকি আর দুখানা চেয়ার ছাড়া ঘরে কিছু নেই। জমাদার ঠাকুরবালান। এক থালা ছেড়ে পড়েছে। কতটা ঘাস এখনো বাঁচিয়ে আছে। ঘাসের ইটগুলো বিছুতে দোল করে চলে। ঠাকুরবালানের সামনে বাড়ীতে ভাগার নেই। বড় বড় ঘরে বড়ো ইটের স্তূপের মত পড়ে আছে। কোন একালে যার বড়োর হবেরো নেই লাগানো ছিল, এখন তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

মেয়েটা পেছনের বাড়ীতে ঢুকেছে চিরকালী বলল—ওই ঠাকুরবালানের কাছে ফিরে যাও, আমি পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছি। ঝগড়াটা বাধল চিরকালীর ঝিনবিনিয়ের বাবার সঙ্গে চুকে পড়লো। বাড়ীটার দুর্দিকে পুরোনো ঝিনের ঐশ্বর্য বজায় রয়েছে। দেওয়ালের একটা ছায়া-ঘন নারীমূর্তি কেন ছেলে কোঁচ মাটির পড়ে আছে। আগে এর সেই নারীমূর্তির মনো-মনাত্ত রূপে দেখেছি, ওঠার মনে হল আমার এর হাতটার কে যেন লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করল। ফিরে ছেলে দেখি বাবার মত একটা লোক তার লোহার মত হাত দিয়ে আমার এর হাতের কব্জিটা জোরে চেপে ধরেছে। লোকটার আঘাত আর কথা শুনে প্রথম কটায় আমার বাক রুদ্ধ হয়েছে। হাতের আঘাতে যে ইটি পড়েছিল তার মত, মাঝখানে হাতের মত। আমার কপালে ঘাম ফোটে। হাত একটা কথা কথা-এর সৃষ্টি করে। ঝুড়িটা হাতে ওপরে উঠেছে। আমার আমার বাকই নেই। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত হাতটা ঘরে মেয়ের কাঁধটা দিয়ে কোন উত্তর—এই, কে তুই? কোথায় থাকিস? চুরির মতলব, না? আমাদের ঝিয়ের চোখে অনেক উঁচুতে রয়েছে। এই চোখেই মহাজনের অমন অবলা-সেবা ঘাঁড়ো ঘুরি ঘরে ফেলে।

আমার কথা বলার কোন প্রয়োজন না দিয়েই হাতটা একটানে ছিনে কোন উত্তর—এবার বিশ্বাস না হয়। বাড়ী, চুরি করার মতলব ছেড়ে ঘর করছে। চোখে কুয়াশা আর ছেলে। পুরোনো ছেলে থাকতে ঝিন-পুরোনো ছুটে। অনেক কষ্টে কথার ঘর বার করে বললাম—চিরকালীদের... ঁ কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ঝনঝনা ঝিঁচিয়ে কোন উঠল—আর পড়ে এসব চিরকালী, এসব ছোকে ঘরে কুয়াশার ফেরে ঝিয়ে আসি। কেউ চৌটি পারে না। কত ছেলেকে ওখানে ফেলে মারা হয়েছে জানিস? মানুষের আমার ঝুঁটি ধরে হাতে ঝাঁকি দিয়ে আমাকে পাঁচিলের কাছে টেনে আনল। আমি তখন প্রাণপণ শক্তিতে ওকে ধাক্কা দিয়ে বলি—চিরকালী, ও চিরকালী! ঝনঝনের ওপাশ থেকে উত্তর দেয় চিরকালীর ঝনার শব্দ শোনা যায়—এই যাইরে, ঝিয়ে একলাফে ছেলে ফেলেছে। চিরকালীর ঝনা যেন ঝনঝন করে যায় কানে। চোখটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে দুজনে ধরল। হাত যেন কয়ে ঝি-ঝি করে ঘামতে লাগল। ঝনঝনে—তুমি —আপনি আমার সামনে এসেছ? ঝনঝনে শরীরটা কাঁপছে, ছেলেমানুষের ঝনার ঝিনায় —তুমি? চোখটা হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝিয়ে এসে ঝনঝনে—তুমি আমা পরে ঝিয়ে পার? ঝনঝনে একলাফে ঝনে পড়েই হাত ঝিয়ে

[illegible]
বিলাস। লোকটা
ঘুরে ফেরে দিল।

হঠাৎ চিন্তাহরণ ঘরে-পাশের একে হাসির হুল। হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে, লোকটার মন রেখে কাঁকড়ার জাল ভালোটা উঠে দেখে। চিন্তাহরণকে কাঁকড়া দেখতে বলায়—পালাবে নাকি?"

চিন্তাহরণ লোকটার কথা শুনেই, ঘরে যেতে যা চড় মারিয়ে দিয়ে বলল—"টিকটিকি, তুই আবোলতায় হয়ে বসিল। তা হাতটা অত জোরে ঝাড়লি কেন?" লোকটা ভেংচি দিয়ে বলে। হি হি করে হাসতে হাসতে জবাব দিল—"তোমাদের মেয়ে" চিন্তাহরণ বাঁ দিকে ঘুরে ঘুরে লোকটা বল করে মারিতে বলে পড়ল। হাতটা নাড়িয়ে নিয়ে চিন্তাহরণ বলে উঠলো—"আরে। দিব্যি-দুপুরে তোর ভূত করতে আসে?" লোকটা উঠে পড়ে জবাব দিল—"আমি যে, মাস্টারের অমন খাবার-দাবারা বাঁচাটা দেখিস ভূত হয়ে গেছে"—তুই ভূত করে তেড়ে দিয়ে সেই পয়লার পাঁজা দেখাবি?"—বলে চিন্তাহরণ চিকুলালের দিকে হাসতে লাগলো। লোকটা পিছু পিছু এসে ঘরে আসতে আসতে —"তবে?" চিন্তাহরণ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—"তবে?"

লোকটা হি হি করে হাসতে হাসতে বলল—"তার আগে পয়লা দিবি?"

—"পয়লা কি করবি? খাঁজা খাবি?"

জিজ্ঞেস করল চিন্তাহরণ। লোকটার মত দেখে দেখে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। হি হি করে হাসতে হাসতে বলল—"না শীত পড়ছে। কাল দু-এক দিনিস না হলে শীত যাবে না—খাঁজা খেয়ে একদিন বসে থাকতে হবে বাড়িতে"—বলে চিন্তাহরণ একটা টাকা লোকটার হাতে দিয়ে এগিয়ে গেল।

চিকুলালের সামনে দাঁড়িয়ে সুরে সুরে ডাকল চিন্তাহরণ—"জামাই।" বৃদ্ধি জামাইবাবু বাড়ি যাচ্ছে বার করে একগাল হেসে বললেন—"আরে, এলি?" তার কথার ভাঁজে একগাদা পান মুখে ছেড়ে বেরিয়ে আসলো ওপর পড়ল। একটা বল-হাত আসছে ছোট্ট করা হয়। তারই একটা তার বৃদ্ধি মুছিয়ে মত করে পরে পা দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে বসে আছে। উঠোনে সম্পূর্ণ আবছায়ায়। মুখটা আইয়ের মতো লম্বা হয়ে এসে উঠতে চেয়েছে।

চিন্তাহরণ উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরে পালে, কপালে, আর একটার পর একটা চুমো করতে লাগলো আর বৃদ্ধি চিন্তাহরণের মাথার হাত বোলাতে বোলাতে-বৃদ্ধি মুখ [illegible] কথা—"তোর মেয়েটার [illegible] অনেক ভালোই ছেলে-মানুষ। চুমুকের পালা শেষ হলে চিন্তাহরণ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বৃদ্ধি দাঁত হাতে চিন্তাহরণের পিঠে একটা চড় মেরে বলল—"আমাকে লাগল না?" চিন্তাহরণ বৃদ্ধির কোলের ওপর শুয়ে পড়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল—"জানিস সুমন, এ ঘরেটার ওপর আমার বড় লোভ।" বৃদ্ধি হেসে জবাব দিল—"এখন আর লোভ করার কি আছে বল? হাঁ, সে ছিল বটে একদিন। তোর ঠাকুরমা ঐ ঘরে আসতে যাবে চাবি না দিয়ে তোমাও দিতে বেত না।"

চিন্তাহরণ বৃদ্ধির কোল থেকে উঠে পড়ে বলল—"জানি, সুমন তোমাকে দেখতে এসেছে।" বৃদ্ধি মুখে একটা পান করে বলে উঠল—"এখন আর কি দেখবে ভাই। এখন তো খুকনো পানার। তেমনও যেমন কুচকুচে মাজা ছাড়া আর কিছুই নেই, বাড়িটারও তেমনি হাড়মোড় বেরিয়ে পড়েছে। ছিল কটা বোদ্ধেলো মানুষের আসন। মহীপতি চৌধুরীর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।"

এর প্রসঙ্গে এই মহীপতি চৌধুরী অবশ্য মহীপতি চৌধুরী। আইন-আদালতের ধার ধারতেন না। নিজের হাতেই সাজা দিতেন। মোল খুনোখুনি সাজা। কারো মাথা কামানো, কারো বা কানমলা। পঞ্চম গ্রামের চাবকেও চলতো। খুনের অপরাধে অপরাধীর মতো ছেলে দেওয়া হত। কুরোটা পাড়ের ওপরে একটা মাথার খুলি আর হাড় দেখাবে আসত। অপরাধীর হাত-পায়ের বেঁধে একেবারে মুন্সো-বৌয়ের সামনে উপস্থিত হল। মুন্সো-বৌ তখন কাপড়-আসা খাটের ওপর বসে বিকেলের পড়ন্ত রোদের আরামে চুল শুকাত। সাহেব অপরাধীকে ছেড়ে উঠতে দেখেই ভয়ে চীৎকার করে উঠতেন। মেয়েরা ধাত্রী ছুটে এসে অপরাধীকে দেখতে পেয়ে হাত ধরে টানতে টানতে মহীপতির কাছে নিয়ে যায়। কিছুরে ঠিক হয়ে অপরাধীকে অন্ধ-কুয়োর ভেতর ফেলে দেওয়া হবে। মেয়েরা টানতে টানতে নিয়ে নিয়ে অপরাধীকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। মুন্সো-বৌকে তিন দা করকর মাথের ওপরে ফেলে হাত-পাও সাতদিন বন্ধ করে রাখে মহীপতি। অপরাধের আত্মীয়েরা পুলিসে নালিশ জানায়। সেকালের পুলিস-সাহেব তদন্ত করতে আসে। মহীপতি তার সেরা ঘোড়াটা সাহেবকে দিয়ে খুশি—"সাহেব, এ ঘোড়াটা তোমাকে দিলুম। তোমার ছেলে চড়বে।" সাহেব তদন্ত করে রিপোর্ট দিল, নালিশ সম্পূর্ণ মিথ্যে।

এমন অনেকদিন আগেকার কথা। মহীপতি তখন বেঁচে। বৃদ্ধির ছেলে মহীপতি। বৃদ্ধির বাবাকে চোখে দেখে নি। মায়ের কাছে গল্প শুনেছে। সুরোপতির হাতটা দেখেছে। ছোটবেলার আহ্লাদে গোছ বলতো—"দাদা"। চিন্তাহরণ গল্প করতে করতে—সুরোপতি কিন্তু তাদের চোখে। যা জানবে তাই ভয়ের। বৃদ্ধির ছিল পাটোয়ারী বুদ্ধি। সুরোপতির লম্পট মেয়ে বড়লোক হল। আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে ভরসে বিয়ান জমিদারী।" নাবিত্রী বৌদি হাসতে হাসতে বলে ওঠে—"ঐ জন্যেই তো বাপু আজকালের বিয়ে হাজার আর পাবে না, শুধু রাজকন্যাই বিয়ে এস। আমরা পেটপুরে একদিন খাই।" চিন্তাহরণ বলে—"তখন, আমার কি পাটোয়ারী বুদ্ধি নেই নাকি?" বৌদি হেসে ফেলে বলে—"তা থাকলে তো রাজার আর রাজকন্যা এসে যেত এতদিন। আছিলে বসে পাটোয়ারী বুদ্ধি জাহির করতে হবে না।" —"মেজো বউ আসিল তো?"—বলে চিন্তাহরণ কথা প্রসঙ্গে ঘোরাবার চেষ্টা করে।—"তা হবে না। বিয়ে কেন করবে না করতে হবে,"—বৌদি হেসে ওঠে।

—"তবে বলো আমি বিয়ে করবো না?"

—"তবে দেখে নেবি?"

—"দেখে বলবো আমি, তুমি যেন মেয়ে ঠিক করবে?"

—"যেন তো, তুমিই ঠিক কর।"

চিন্তাহরণ যেন অত্যন্তগীরভাবে বলে—"আমি কিন্তু বিয়ে করবো।"

—"যেন তাই কর।"

—মুখটা মনহারের মত করে চিন্তাহরণ বলে—"কার কী অছে? সে যে একলা অবলা।" সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠে।

সুরোপতির মৃত্যুতেই মেয়েদের অন্তরাল, সুরোপতিকে পায় নি। সেই ক্ষোভে কি অন্য কোন নিগূঢ় কারণে অন্তরাল নিজেকে অন্য আর আবদ্ধ রাখেন নিরবধি। চতুর্থ দিনে মা থেকে বেরিয়ে মহীপতি খোঁজ করেন। মহীপতি, ছোটাও মুখে মা পেয়ে গান-বাদ্যিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, মহীপতি পাল্কি-বেহারা নিয়ে সাহেব গেছেন। অন্তরাল সাহেব গেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে মহীপতির সন্ধান পেলেন সুরোপতির বাসায়। মহীপতি সুরোপতির দু-মাসের ছেলে কোলে করে বসে আছেন। অন্ত হাসির অন্তরাল নেমে টুপটাপ করে ছেলেটার গায়ে পড়ছে। কিন্তু মায়ের গায়ের কাছে উপড়ে হয়ে পড়ে আছে। অন্তরালের কাছে কিন্তু উঠে এলো। তাঁর স্নেহের মেয়েলী কিন্তুর নৈবেদ্য ফেলে রেখে অন্তরালের হাতের ছেলেটা কোলে নিয়ে উঠল। তিনি মুখটা নীচু করে মহীপতির উদ্দেশে

নতুন : • স্বাদ • রূপ • আকার

গুণগতিতে ও বেশী

কোলে

গুণে শ্রেষ্ঠ, চাহিদাতে বেশী

ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট

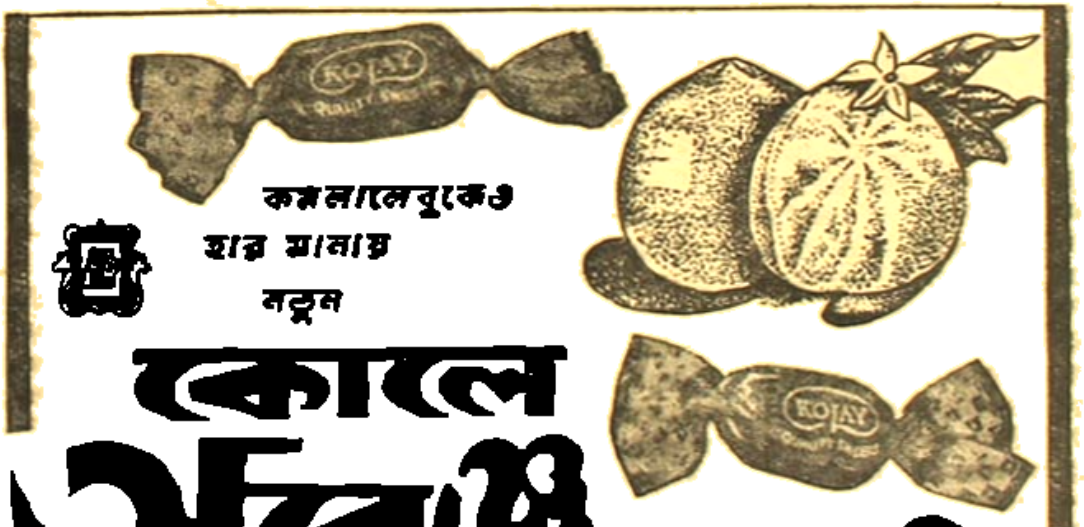

কমলালেবুকেও
হার মানায়
নতুন

কোলে অরেঞ্জ ক্যান্ডি

সব দোকানেই পাওয়া যায়
খুচরা দাম মাত্র ৪ পয়সা

হয়েছে—বাড়ী চল।" কথা শুনে তার ভারী আনন্দ হল। বুড়োটা হারামি ছেলে আর কথা বলে না—পরিমলকে ফেলে আমি যাই কি করে?"

অন্নদাচরণ বললেন—"পিন্টু, আয় যাদু।"

কিন্তু সেই এক উত্তর—"এ ছেড়ে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।"

যদু ঠেকাবার যখন কিন্তুকে নানান ভয়ঙ্কর কথা বলে না তখন যা শুনেছে দু-একজন ছেলেকে কিন্তুর কাছে ডেকে আনে। কিন্তুর আদুরে ডাকনাম তখন বুড়িয়ে গেছে। পরিমলের কথায় কিন্তু বলে—"ওর মেজ মেসো তোমাদের পড়ুয়ের জন্য আছে। ওকে নিয়ে কি করবে? খেয়ে ফেলবে?"

অন্নদাচরণ কিন্তুকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে ফেলে উঠলেন। বললেন—"তোমায় কখনো ছিল আমাকে আর ছেড়ে যাবিনি। আজ দু আর আমি ঐ পুতে বাড়ীটায় যাবি। দুই তো আছ যা। ছেড়ে দেব, আ হয়ে কি করে আমি সন্তানকে ছেড়ে থাকি। এদিকে আমার কিছু নে। তারো আজ নেই একে আমার কাছ থেকে কিনিয়ে নেয়। বুকে করে আগলে রাখবো। এর আগে কিন্তুই আমি আমার কিন্তুকে ছেড়ে থাকব।"

মায়ের চোখের জল কিন্তুকে টলিয়ে দেয়। ছেলেকে মায় কোল থেকে নিয়ে আদুরে আদুরে বাপের দিকে এগোয়। ছেলে-সুখে হাত দুটো বাপের দিকে প্রসারিত করে। অন্নদাচরণ অবাক হয়ে যান, ফাল ফাল করে চেয়ে থাকেন। বাঁড়ুটা হাত ছেড়ে পড় যায়। অনেক কষ্টে মুখে একটি কথাই জিজ্ঞেস করেন—"আমাকে চিনিস?" কিন্তুর অভিমানিত জবাব—"হাঁ, তোমাকেই চিনি।" পিন্টু আমি যে শুনেই—অন্নদাচরণের মনে হলো ছেলের মুখে।

—"ঠিক হয় শুনে ফেলো।"—বলে ছেলেকে বুকের কোলে তুলে নেয় কিন্তু। দুজনের কিন্তুকে বুকে জড়িয়ে ধরে অন্নদাচরণ হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠেন।

কিন্তুর ছেলের বয়স মাত্রামাত্রা ছিল, অন্নদাচরণ তাই নাম রাখেন বন্ধুবর্তী। নিত্যি-ব্যাজারামের আদরে মানুষ হতে থাকে বন্ধুবর্তী। বন্ধুবর্তীর বয়েসকালের অভাবনীয় লোক তাঁদের কিন্তু কিন্তু বলার উপায় নেই। অন্নদার নজরের মণি। যখন ছোট ছিল, তখন চাকরেরা মাঝে মাঝে নিয়ে আসতো কিন্তুর কাছে। কিন্তুর কাছে এলে বন্ধুবর্তী আর কিছু ছেড়ে চাইত না। কিন্তু যখন বুঝিয়ে বলত—"পিন্টু বাবা, যাদু আছেন।" তখন কাঁদতে কাঁদতে চাকরের কোলে উঠত। বন্ধুবর্তীর মুখের সুরেলাপির ছেলের মেয়ে কিন্তুমোহিনীর নিত্যকার আসরে এসেছিল যোগ।

অন্নদাচরণ আজকাল ছেলের যে আসরটা ভাঙা অর্থাৎ অন্নদাচরণ সেটা কিনে নিয়ে কিন্তুর নামে। বন্ধু পর্যন্ত কিন্তু এই বাড়ীতেই কাটায়। অন্নদাচরণের বাড়ী থেকে যে রাতে সুরেলাপির হাত ধরে যোগের আসে তারপর একদিনের জন্যেও আর সে বাড়ীমুখো হোক নি কিন্তু। বন্ধুবর্তীর যখন কিন্তু যে সুরেলাপি তখন ইহলোকে আর নেই। অন্নদাচরণও ঊর্ধ্বলোকবাসিনী। অনেক সাধ-সাধনা করেও ওকে ও-বাড়ীতে কিন্তু আনা যায় নি। বন্ধুবর্তীর কিন্তু করে বৌ নিয়ে থাকে প্রণাম করতে আসে। কিন্তু ছেলের বৌকে বুকে টেনে নেয়। সুরেলাপির ছবিটা বৌমার হাতে—"প্রণাম কর, তোমার শ্বশুর।"

সন্ধ্যাবেলা কিন্তুর মন্দির হয়। নিত্যিকার কি নিত্যির পরিহাস। মাসিমাকুলের অভিশাপ কিন্তু যোগের সুরেলাপির ওপর। তার প্রস্থানের পর কিন্তু। মায়ের মৃত্যুর পর বন্ধুবর্তী সেখানে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এক নারীমূর্তি। অনেকেই জিজ্ঞেস করতো, ওটা কোন্ দেবীর মূর্তি? যে যার মনমতো উত্তর দিত। পথ চলতে চলতে কিন্তুকাল আগের মন্দিরটা দেখা যেত। সাদামেটা ঘরানার মূর্তি। ভেতরে দুজনের ধ্যানযোগের ছবি পড়ত। আরো এগিয়ে গেলে দেখা যেত নিরক্ষকালো পাথরের এক দেবীমূর্তি বেদী ছেড়ে ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রয়েছে। মন্দিরের নিচুতে একটা সাদা পাথরের ফলকে লেখা—"কন্যু-বন্দিনি, সেবক বন্দু.....।" বাকীটা ছেড়ে গেছিতে গেছে। আজ আর সে মন্দিরের ছিহ্ন নেই। সেখানে কোন সৌখিন বাবু তৈরী করেছেন অবসর বিনোদনের জন্যে বাগানবাড়ী।

বাবাকেশ্বরের ওপর দিয়ে ছেড়ে ছোড় একটা বিরাট বাগানওলা বাড়ী দেখিয়ে চিরঞ্জীবিবা জিজ্ঞেস করল—"এটা কি জিনিস?" বাড়ীটার দিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললাম—"এটা তো একটা বাড়ী দেখছি।"—"হাঁ, মোনা মিত্তিরদের বাগানবাড়ী।" অবাক হয়ে চিরঞ্জীবিবার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"মোনা মিত্তির! সে আবার কে?"—"তুই হারামি, মোনা মিত্তিরকে চিনিস না?"

—"না তো।"

—"তুই চিরকালটা শুধু আকলা হয়ে রইলি। কলকাতার বাসিন্দা, মোনা মিত্তিরের নাম শুনিস নি! কালী মিত্তিরের ছেলে। এখন কলকাতার ঔঁচড় কাউন, বিরাট লোহার কারবার। প্রতি সন্ধেয় অন্তে কলকাতার কোন না কোন বারে দেখা যাবেই।" স্টীয়ারিংটা একহাতে ধরে একটা নিশ্বাস টেনে বার করে টেঁচিয়ে নাচিয়ে আমাকে বলল—"মোনাদাটা অনল তো।" নিশ্বাসটা আশ্বাসবোধ করার পর একটু থেমে ছেড়ে বলল—"আমার সঙ্গে আলাপ আছে। তোকে একদিন নেমন্তন্ন করবে।"

মেজাজ মোনা মিত্তিরকে। আলাপ-পরিচয় হওয়ার ছুপসী চেহারার তখন নতুনত্ব। বলার ভঙ্গিতে ভালো অভিনয় সুন্দরীর মেয়েলী লাজুকতার মধ্যে পুরুষের চিত-হরণের কৃতি। প্রাক্‌পুজোর জেল্লাদার ফোলসের হুই হাই দশ আর এক-নাম্বার ফিলিপস্ খুলেন। আবেশ মাখানো এই পাঁচমেশি আলুথালু মেয়েরা কাপড় আর মাঁদ বা-এর হাত সাঁট পরে সম্মুচিত অর্ধাঙ্গভঙ্গে চিরঞ্জীবিবার পিছু পিছু ঢুকলাম। কোণের দিকে একটা টেবিলে বসে চাপা গলায় চিরঞ্জীবিবা বললে—"আমাদের ডানদিকের একেবারে কোণের টেবিলে কালো সুট-পরা আছে দেখছিস, ঐ মোনা মিত্তির।" আড় চোখে দেখলাম। হাঁ, উঁচিত ভাক্তনই বটে। টেবিলটা ঘিরে জনা-তিনেক মহিলা ও জনা-দুয়েক পুরুষ পান-ভোজন এবং হৈ-হল্লোড় করছে। তাদের মধ্যে মোনা মিত্তির মনোযোগ বড় বলে মনে হচ্ছে। মনোরঞ্জন মিত্র, লোহার ব্যবসায়ী। মোনা মিত্তির নামেই খাতা। সারাদিন ঐ কঠিন বস্তুটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাই বোধ হয় সন্ধের পর থেকেই কোমলের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত আকাঙ্ক্ষা।

নিজের জন্যে হুইস্কি আর আমার জন্যে কোল্ড ড্রিঙ্কস্-এর অর্ডার দিয়ে চিরঞ্জীবিবা সিগারেট ধরালো। সারিত-বারে এই আমার প্রথম আগমন। চারদিকে আড় চোখে চেয়ে দেখছি। অবশ্যই যে মেয়েটি এতক্ষণ নাচছিল আর গাইছিল তার নাচ এবং গান ভালো। মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলাম। আহা, ওর বড় বর্ষা! ওই তো চোখে, কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। তার ওপর নাচ-গানের এই পরিশ্রম। মেয়েটির দিকে চেয়ে ভাবছি, হঠাৎ মনে হল ও যেন ইশারায় আমাকে কিছু বললে। তাড়াতাড়ি চিরঞ্জীবিবাকে বললাম—"চিরঞ্জীবিবা, ওই মেয়েটা আমাকে যেন কিছু বললে।" —"পিন্টু বলে নি। তুই ওর দিকে চাইছিস কেন?"—জবাব দিলে চিরঞ্জীবিবা। বললাম—"আমি দেখছিলাম, ওই পুরুষে ও অত পরিশ্রম করে কি করে।" —"তোর অত না ভাবলেও চলবে। ও দিনের পর দিন ঐ করে, ওতে ওর পরিশ্রম হয় না।" সিগারেটের শেষ অংশটুকু ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিয়ে চিরঞ্জীবিবা বললে—"তুই চিরটা কাল কাঙ্গা-কাঙ্গা ভাল ছেলে হয়ে রইলি। কিছুই জানলি না, কিছুই দেখলি না।" ইঙ্গিতটা বড় আমাদের টেবিলে পানীয় রাখতে ফিরে এল।

বেয়ারা চলে গেলে কিন্তু কিন্তু আড়চোখে মোনা মিত্তিরের দিকে চাইলাম। বেয়ারা দুজন মহিলা আর পুরুষে দুজন উঠে গেলে

দেখলেন। সোনা মিত্তিরের পাশের চেয়ারে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল একটি মহিলা। মাথার বড় বড় চুলগুলো কেশবিহীন মাথাকে ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। তার থেকে কিছু কিছু খড়ের কুচো নিচের দিকে ঝরে পড়ছে। সেই আলো-আঁধারির মধ্যেও ভদ্রলোকের ঠোঁটের লিপস্টিক আর গালের রুজ যাদের চামড়াকে পরিহাস করে যেন ফুটে উঠেছে। মহিলাটির পরনে শাড়ী। কিন্তু সেটা এতই পাতলা যে ব্লাউজ-স্লিপ যার ওপর ব্লাউজের প্রতিটা রেখাকে দেখা যাচ্ছে।

চৌকিদার পর্দা ফেলে করে সোনা মিত্তির আসতে আসতে আবার চৌকিদারের দিকে এগিয়ে এল। সঙ্গে সেই মহিলাটি। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—"আপনি চৌকিদার, তুমি কতজন?"

—"এই তো আমি,"—চৌকিদার বলে।

—"কতক্ষণ থাকবে?"—সোনা মিত্তির জিজ্ঞেস করে।

—"এই কিছুক্ষণ। তুমি চলে যাবে?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে কি! কথা হয়েছে?"

—"পাঁচটা।"

—"তাহলে এর সঙ্গে যাবে কেন? বল।"

সোনা মিত্তির আবার চৌকিদার একটা চেয়ারে বসে মহিলাটিকে বসতে বললে। মহিলাটি আপত্তি করেও বসল। চিত্রগ্রাহকের দিকে নিজেকে-একটা এগিয়ে দিয়ে তার আরও নিচে ঝুঁকে করে সোনা মিত্তির বলে উঠলো—"তারপর চৌকিদার, এই ন্যাংটোটাকে কবে থেকে জোটালে?"

চৌকিদার একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর ইংরিজীতে বললে—"ব্যাকটেরিয়া নয় ওয়ার্ম বলে দিন আপনি ডাক্তার,—মহিলাটির দিকে চিত্রগ্রাহকের অঙ্গুলি-নির্দেশ।

মহিলাটি এতক্ষণ মুখ ভার করেই বসে ছিল। এবার সেই ভারী মুখটা হাঁড়ির মত করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—"মিস্টার, তুমি যাকে লোকের সামনে বসে বসে বলা হল, আমি যাচ্ছি।" সোনা মিত্তির চিত্রগ্রাহকের কথাটা শুনে বেশ্যার একটা লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বললে—"যাবে? আচ্ছা, তুমি এসো, আমি আসছি।" মহিলাটি ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়নাটা বার করে মুখ দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল।

মহিলাটি বেরিয়ে যাবার পর সোনা মিত্তির বলে উঠলো—"তোমার মুখে শুনেছি কিন্তুই আটকায় না।" চিত্রগ্রাহক চৌকিটা বেরিয়ে জন্য ছেলে বললে—"এটা কি আর প্রথম অভিজ্ঞতা স্যার?" তারপর হাতে একটা সিগারেট তুলে এনে জিজ্ঞেস করলে—"আপনি কবে এর শুটিংয়ে যাচ্ছেন?"

—"আজই সন্ধ্যে বেলা,"—সোনা মিত্তির উত্তর দিল। আমি আসছি,"—বলে সোনা মিত্তির উঠে দাঁড়াল। আমার একটা লম্বা হুইস্কি দিতে সোনা মিত্তির সকলকে বলে উঠলো—"সকলের ভাগ্যদেবীর সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠতা আছে। খুব ভাল ফলাফল। বলে—"চৌকিদার, আমার যাবার আগে একটা কিছু খেয়ে যাবে।" বলে সোনা মিত্তির বেরিয়ে গেল।

ঘটনার ঘনঘটায় কঠিন বাস্তবের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি !

দীনেশ দে প্রযোজিত

সাবিত্রী চ্যাটার্জি
বিশ্বজিৎ
বিকাশ রায়
অনুপকুমার
অনুভা গুপ্তা
নবদ্বীপ হালদার
ছবি বিশ্বাস
রবি ঘোষ
শ্যাম লাহা
তরুণকুমার
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
শ্যামল ঘোষাল
সন্তোষ সিংহ
সুখেন দাস
পীযূষ গাঙ্গুলী
অজয় দাস
রমেশ যোশী
সুবোধ গাঙ্গুলী
অনিল চট্টোপাধ্যায়
অজিত চট্টোপাধ্যায়
শৈলেন গাঙ্গুলী
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র
অরুণ মুখোপাধ্যায়
সন্তোষী মুখোপাধ্যায়
সুনীল চক্রবর্তী
বাবলু চ্যাটার্জী
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনা বৌদি

কাহিনী-সুখেন দাস
চিত্রনাট্য-পরিচালনা-পীযূষ গাঙ্গুলী
সংগীত-অজয় দাস
ব্যবস্থাপনা-রমেশ যোশী

দীনেশ চিত্রম নিবেদিত-পরিবেশিত

নেপথ্য কণ্ঠে ঃ শ্যামল মিত্র ঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় ঃ সন্তোষী মুখোপাধ্যায়
সুনীল চক্রবর্তী ঃ বাবলু চ্যাটার্জী ঃ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ বসুশ্রী ঃ বীণা ঃ মিত্রা-য় মুক্তি আসন্ন ॥

হয়েছে।" বলে মেজো মিত্তির চিন্তামণির মুখের দিকে তাকাল।

—ও সব আমার আর ভাল লাগে না।

—যেতেছ কি তোমরা! তোমার জ্যোতিশ্চন্দ্রের আজ্ঞা কি আজ পূর্ণিমা? তুমি যদি এই সব কথা তো আমরা যাই কোথায়?"

—আ রে, এখন তো ছেলেমেয়েই দিব। আমি তো বাত-রোগে হয়ে পড়েছি। তোমার শুনলাম তুমি বাড়ি এক ঠোকরে বসে বুড়িটা সেদ ভাঁজছে। সবাই বলছে, বুড়োর বড়ো তোমার নিত্য-নতুন সাধ-আহ্লাদ। এসব আর আমাকে মানায় না।"

—বুড়িটা সেদই বল আর নতুন সাধ-আহ্লাদই বল, তোমার কাছে আমরা কিন্তু। মেজো-মিত্তির কাছে থেকেই যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ বুড়ো তোমারই কথা। ও তো হেসেই ছেলে একেবারে হাদুহাদু খাচ্ছে।"—জোল মিত্তিরের মেয়ের আহ্লাদ এর আগে একবার শুনেছিল। কথাগুলো একটু অন্যরকম জড়ানো।

চিন্তামণি ছেলেবারির দিকে মিত্তির দিল। তখন ছেলেবারির বাইরে অন্ধকার এখান, তবে ঘরে গ্রাস বলেই। মেজো মিত্তিরকে তখন দেখায় ভেদো। চিন্তামণির চেয়েও বয়ে হঠাৎ বলে উঠল—"চৌধুরী, চলো আমরা মার্বাতেলের বাড়ি যাই।"

—না রে, আমি এখন একবার জল-বন্দরের যাব,—চিন্তামণি জবাব দিল।

মেজো মিত্তির বলে উঠল—না রে ভাই, তোমার ছেলের আজ বাসরঘরের মধ্যে দেখবার পর্যন্ত নাই। তা ছাড়া কথাগুলো বলে চিন্তামণির হাতটা ধরে একটু টানল। চিন্তামণি হু-এর পা এদিক দিকের পায়ের ভরা হয়ে গেল। পরিত্রাণ পেতে চিন্তামণিকে জানাল—আমি তাহলে আজ যাই?"

সেদের ব্যবস্থাটা খুলে দিয়ে চিন্তামণি বলল—দুই ছেলের উঠে যেন। একজনের যাবো। অন্যের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।" কথা না বাড়িয়ে সেদের সাঁটে দিয়ে বেরিয়ে এল। সাহেবের ব্যবস্থাটা খুলে দিয়ে মেজো মিত্তিরকে বলল চিন্তামণি—এস মিত্তির।"

মিত্তির অফিসের গাড়িতে বসেছে—আমার গাড়িটার কি হবে বল?"

—তোমার গাড়ি তো পরিবি-এ আসবে বাড়ি না, আবার সময় ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।—চিন্তামণির কথাটা শেষ হতেই মিত্তির গাড়ির ভেতরে এসে সামনে দরজাটা বন্ধ করল।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা চৌরঙ্গির দিকে আনা মিত্তির বলে উঠল—চৌধুরী, আমি ভেবে ঠিক করে পাই না, একটা ছেলেমানুষের সঙ্গে তুমি কেন অযথা ঝগড়া করতে গেলে?"

—না, ওর ভেবো না। তোমার বাঁচিতে তো কেবল হয়েছে।" চিন্তামণি বলল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে গাড়িটা পড়ল। সাহেব ড্রাইভারকে নামিয়ে উঠে চিন্তামণির দিকে ফিরে মেজো মিত্তির বলে উঠল—"ঠিক বলছ? ভেদো হয়েছে? মোদা মিত্তির কি ভেবেছে যে, কথা ভেদে সেটে পড়লেই সে ঘায়েল হবে। মোদা মিত্তির কলকাতার ডাকসাইটে ঘায়েল। বোতল বোতল জলের মেদে ভেবো, ওর ভেদে কিন্তু ঠিক ভেদে থাকে। সে ভেদা জল, তার ভেদা হয়। আমি আমার" কথাগুলো বলেই ধপ্ করে ডান হাত দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরে ফেলল মেজো মিত্তির। অসাবধানে স্টিয়ারিং-এ ভেদো পড়ায় গাড়িটা বাঁ দিকে বেঁকে গেল। চিন্তামণির ভাগ্যিসই রাস্তা ফাঁকা ছিল না হলে গাড়িটা নির্ঘাৎ, নিদে গাছা মানুষের ঘাড়-পায়ের ওপর গাইই দোতো।

ছেলেবারির ঢুকতেই ম্যানেজার সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানালো। দেখলাম, এরা এই ছেলেবারির পুরনো এবং বড় খদ্দের। চৌরঙ্গি বলে জলটা খুব খারাপ লাগছে। সমস্ত ভেদে কি বর্ষায়! এই গাতাল বড়োর পিছু পিছু ঘুরে আমার কী লাভ! অফিস-ভেদে চিন্তামণির কাছে গিয়েছিলাম। কিসের সেটে বসে আছে, সমস্ত সুদের অঙ্ক কষে বসে আছে সর্বাদা। চিন্তামণি ভেদে হয়ে আপনাকে অনুরোধ করে বলল—সুরেন, দুই কিছু ভেদে দে।"

ম্যানেজার বলে উঠল—আমার কিছু সমস্যা সমাধান নেই। তুমি আজকাল ঘরে বেশি ভাল, নইলে আমি চলে।"

—ও রকম করবিস কেন? ভেদে নে সব বিলিস। তোদের ভালো বিক্রিবাটা, কখন কোথায় কাজে আসে, তা কি বলা যায়?" কথাগুলো খুব আলাদের সঙ্গে বলল চিন্তামণি।

ওদিকে আর চা সেটে পড়ার ভয়ে-ভাবনা শান্ত হল। নিজের মনেই চিন্তা করছি, এই লোকগুলো কিসে কত পয়সা খরচ করে, আর আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের দুবেলা ভাল ভোটে না। মাঝে মাঝে চিন্তামণি আর মেজো মিত্তিরকে দেখছি, পানের পর পয়সা বিলোন করে দিচ্ছে। হঠাৎ দুজনেই চৌরঙ্গির ওপর ভেদে পড়ল মনে। মোদা মিত্তির বলছে—আমি বিলের টাকা দেবো। তুমি একদিনও টাকা দিতে পার না।" চিন্তামণি বলছে—আমি পয়সা পয়সার জন্য খাই না। অবশ্য এ খাওয়ানো আমার একটা মিটিংকের আদায় ভেদে খাওয়ানো হয়েই এল। চৌরঙ্গি রায় বাহাদুর টাকাই তুলে নিল। আমার বাকি টাকাটা ছুঁচোপানি আমাকে ভেদে দিয়ে বলল—"এরা প্রতিদিন হলে টাকাটা তুমি দিয়ে দিও।"

ভেদোবারি বাইরে বেরিয়ে এসে চিন্তামণিকে বললাম—তুমি যাবে তো চল, নইলে আমি চলে যাই।" কথাগুলো একটু দুঃখই দিল।

মেজো মিত্তির আমার মুখের দিকে ভেদে ভঙ্গিতে বলল—"কিছু মনে করলে ভেদে যাও। যাবে তো যাও না। তোমাকে কি আমরা ভেদে দিয়ে রেখেছি?"

চিন্তামণি গাড়ির দরজাটা খুলে দিতে বলল—দুই বড় ভদ্রলোক সুরেন। পৃথিবীটাকে ভেদে ভেসে ভেদে না।"

—আর মাতালের সঙ্গে আমার আর পৃথিবী চিনে ভেদার নেই—বলে গজগজ করতে করতে গাড়িতে উঠি।

এতদিন লক্ষ করেছি কোন মর্জালসে যা এমন কোন জায়গায়, যেখানে মাতালদের পানের সুব্যবস্থা আছে, যাবার আগে চিন্তামণি ফোন করতো আমাকে সঙ্গে নেবার। এমনও হয়েছে এর আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছে, বন্ধুরা গাড়ি পাঠিয়েছে নিয়ে যাবার জন্য। একদিন চিন্তামণিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমরা চিন্তামণি, আমি তো মদ খাই না, তবে তুমি আমাকে সঙ্গে নাও কেন?" জবাবে চিন্তামণি বলেছিলেন—সঙ্গে একজন এমন বন্ধু থাকা দরকার, যে মদ খায় না। মাতালের কথনের মাতালকে বিশ্বাস করে না, ভরসা। মাতালের মাতালের কথা অবশ্য মনে থাকে না। তাই তোকে সঙ্গে নিই। জানি, তোর চিন্তামণিকে তুই সহজে ভাঁড় দিয়ে ভদ্র করবি।"

মার্বাতেল নামটা মাঝরাতের আঁধারে ভদ্র—সোডিয়াম তখন রাত সাড়ে বারোটা, ভোর দেখে। গাড়িটা ভদ্রই পড়ছি। দোতলায় একটা ভাঙা মার্বাতেলে আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ভোরে দরজার মাঝে দিয়ে দাঁড়াতে মোদা মিত্তির। দাঁড়িয়েছিল পর দরজা খুলে মার্বাতেল বেরিয়ে এল। মুখে বিগলিত হাসি। চিন্তামণিকে দেখেই বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ উৎসাহ হয়ে মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল।—চৌধুরী, এস এস," বলে আমাদের ভেতরে আসার জন্যে আহ্বান জানালো। সামনের ঘরে কয়েকটা বেত পাতা, আর মাঝখানে একটা ভোল টেবিল। তার ওপরে নানান রকমের পরিষ্কার পড়ে রয়েছে। চিন্তামণি আর মেজো মিত্তির দুজনে ঘরটা বড় ভোল বলে আমাদের ভেদে ভিতর ঘরে পড়ল। আমি একটা ভেদে বসে পানের পাত্র ভরবার আয়োজন। মার্বাতেল বলল আমার সামনে ভেদোবারো সমস্ত পাত্র নিয়ে। ভ-

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন, আর দুজন পরস্পরের সম্মুখে আবির্ভূত হতেন। এক-একদিন আমি আড়চোখে মার্গারেটকে দেখি, আর এক-একদিন ও আমাকে দেখে। কেউই কথা বলি না। এ একটা বিশ্রী অবস্থা। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটার পর মার্গারেটই কথা বলল প্রথম। বলল—শুনুন, তোমাকে আমি চিনি না। দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখন বাসর ঘর-টর সব ফেলে আমার উদ্ধারে এসেছ। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার সময় তোমার ঘরে বসে আছি—কথাটা বলেই মার্গারেটের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ও বাক্যটা কিছু ভুল হয়ে গেছে। মনে বড় কষ্ট হল। ভাবলাম, কী দরকার ছিল ওকে আঘাত দিয়ে ঐ কথাটা বলার। না বললেই হত।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্গারেট বাক্যটা ভুলে বলল—শুনুন, আমি খারাপ ছেলে, বড় কাজও করে। এখানে হাত কাটলে এদের সন্দেহ হবে। এরপর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে সকালের আগে এরা উঠবে না। মার্গারেটের কণ্ঠস্বরের বড় করুণ শোনাল।

একটু আগে নিজের যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল সেটাকে ঢাকার জন্যে কর্তৃত্বপরায়ণ স্বরে ধমকের সুরে বললাম—আমি কি করতে পারি বলুন? আমার জন্যে মার্গারেট যেন অনেকখানি ভরসা পেল। বলল—এ অবস্থায় চৌধুরী গাড়ি চালাতে পারবে না। আমি একটা মোটর-গাড়ির ব্যবস্থা করছি তুমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাও। মিঠাইকে আর একটা গাড়ি করে আমার ভাবনা পৌঁছে দেবে। আমার কথার মিঠাইকে ডাকি ডেকে। বললাম—কিন্তু চৌধুরীর গাড়ির কি হবে? মার্গারেট হেসে জবাব দিল—কোন ভয় নেই। গাড়ির কোন ক্ষতি হবে না। সামান্য ছেলে আমি পাহারা দেবো। সকাল এগারটায় এসে চৌধুরী গাড়ি নিয়ে যাবে।

মার্গারেট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একা সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে নিজের সময় এক অপরিচিত মেয়েকে রক্ষা করে ধন্য হয়ে গেছি। সামনে দুজন উচ্চ-বংশজাত বিলাসী মানুষ বেশবাস ঘেঁটে বসেছেন। কে এই মেয়ে মার্গারেট? বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি বলে ওর পেশা বুঝতে কিন্তুই সময়ের কিছু পরের ওর বাস। এই মানুষ দুটোই বা কি বস্তুতে এল? নিজেদের ঘরে নিজেই ওদের অপমানের জবাবদার অধিকার ছিল না। তবে? এই সব ভাবছি, এমন সময় মার্গারেট ঘরে ঢুকলো। আমার সামনে এসে যেন অনেক সাহস করেছে এমন একটা ভাব চোখের ভাষায়—তা যায়, বহু অর্থে দুটো গাড়োয়ানকে রাজী করিয়েছি। এই রাত-দুপুরে তাদের কি দায়! নিজের আমার ওরা ভালবাসে তাই মুখের ওপর না করতে পারলো না। চল, চৌধুরীকে ওর ঘরে আগে নামানো যাক। তোমার পেছনে উঠে চিত্রাঙ্গদার সামনে এসো। সমস্ত মুখটা চিত্রাঙ্গদার দিকে ফিরে উঠছে। চশমার একটা ডাঁটি খুলে এসে ঝুলছে। মার্গারেট সামনে বাঁহাতের কব্জিতে জলে ফেলল। তারপর আমাকে বলল—একটু দাঁড়াও—বলেই পাশের ঘরে একটা তোয়ালে নিয়ে এসে চিত্রাঙ্গদার কাছে দাঁড়াল। হাঁটুদেড়ে বসে প্রথমে চশমাটা খুললো। তারপর তোয়ালে দিয়ে চিত্রাঙ্গদার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে আমার চশমাটা পরিয়ে দিলে।

বশমাই পরে চিত্রাঙ্গদা। তাকে টেনে তোলা বড় সহজ আমার পক্ষে। বহু কষ্টে দুজনে ধরে চিত্রাঙ্গদাকে দাঁড় করালাম। দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চলতে লাগলো চিত্রাঙ্গদা। চলতে চলতে একবার মৃদু অনুচ্চারণে বললো—সুরেনদা কখন ফিরলে—হাঁ, আমি আছি। তুমি চলো। সিঁড়ি পার করানো যেন খুবলোই কঠিন হল। কতবার নোড়া করিয়ে দিই তবুওতাই চিত্রাঙ্গদা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিরক্ত হয়ে শিষ্টে এক ধাক্কা দিয়ে বললাম—ঠিক হয়ে চলবে তো চল, নইলে আমি পারবো না। সিঁড়িতে পড়লে কিন্তু একটিও দাঁত আস্ত থাকবে না। তখনি মার্গারেট আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—এমন করে বলা ঠিক না। ওর কি এখন কিছু ঠিক আছে। পেটে কি পরিমাণ তাতেই প্রতিক্রিয়া। একবার বলেছি—চৌধুরী মদ খেয়ো না। আমার কথা কি কানে তোলে। তুমি ছেড়ে দাও, আমি একাই নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমি ছেড়ে দিলাম। তখন চিত্রাঙ্গদার বাঁ হাতটা নিজের কাঁধের ওপর নিয়ে আর ডান হাতটা চিত্রাঙ্গদার পিঠের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে মার্গারেট ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। সিঁড়ি পার হয়ে বিশ্রামের মুহূর্তে আমরা আবার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। গাড়োয়ানরা ঘুমে ঢুলে পড়ছে। তোয়ালে দিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে ভাল করে ঢেকে দিলে। মার্গারেট আমাকে ঘরে গিয়ে মুখটা ধুয়ে আসতে বললো—তুমি কিন্তু চৌধুরীকে বাড়ির দোরে দিয়ে তবেই বাড়ি যেও, তুমি যে তা আমি জানি না। তোমাকে বিরক্ত করার আমার বাসর ঘরে আসতে আমার সাহসও আমার নেই। শুধু একটা কথা জানিয়ে তোমাকে। তোমরা যতটা সময় আমাদের ভাব, ততটা মূল্য আমরা নই। গাড়োয়ানদের ডেকে তুলিয়ে দিলে। মার্গারেটকে কোন কথা বলার অবকাশ দেওয়ায় না।

বাইরে জনহীন রাজপথ যেন বহু শতাব্দীর রূপের ঘর পড়ে রয়েছে। চারদিকে বিরাট স্তব্ধতা বিরাজ করছে। শুধু মাঝে মাঝে কিছার টুং-টাং ঘণ্টা আর আমাদের গাড়ির ঘোড়াটার খুরের একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ সেই স্তব্ধতার বিরতি ঘটাচ্ছে। ভেতরে আমরা দুটি প্রাণী। একজন অচৈতন্য আর একজন সম্পূর্ণ চেতনায় সুরাকে যেন অতলে। গাড়ির ঝাঁকুনির ওপর নির্ভর করে চিত্রাঙ্গদাকে এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছি। মনের মধ্যে কত ঘটনাই আসছে আমার ঘোলাটে চেতনায়। আমার জন্মটা যেন প্রক্ষিপ্তের পর্যায়। হয়তো সেই পর্যায় মার্গারেটের ঘটনাটা ঘটে উঠলো। মনে হল, মার্গারেটের মতো সুন্দর চোখে দেখবার মতোই কি সে হতে পারে? আমাকেই যখন তোয়ালে দিয়ে চিত্রাঙ্গদার মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছিল, তখন তো ওকে নারী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। সবার যখন পরমাত্মীয়ার মত করে করে চিত্রাঙ্গদাকে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছিল তখন তো তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতার আভাস দেখতে পাই নি। অনেকটা ওর সেই করুণ আত্মাহুতি, আমি যেন চিত্রাঙ্গদাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাই। তবে? নারী-সম্বন্ধে অনেক কিছু উদ্ভাবন

...ঘর ছেড়ে দুই বাড়ির ছাদ ও তোর বাড়ির ছাদে ঘর
যেখানে দুই পা বাড়াবি সেখানে পিঞ্জর ...."

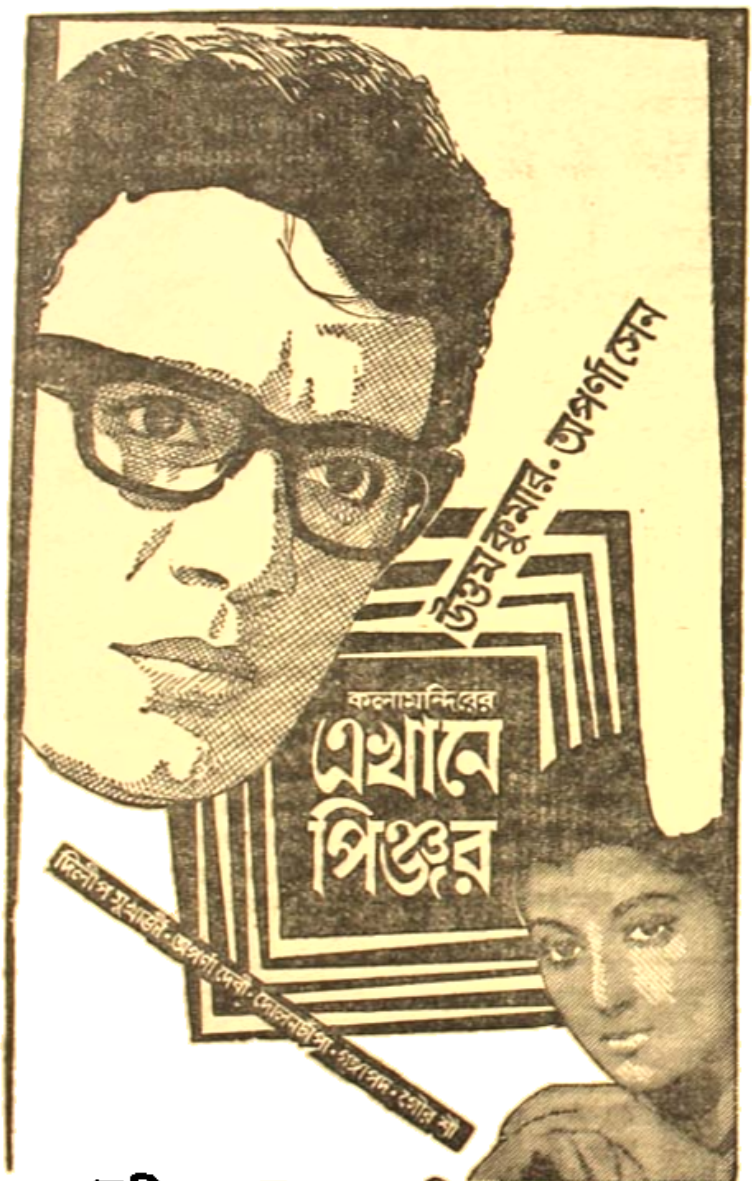

॥ শুভমুক্তি আসন্ন ॥

...ছিল না। সমস্ত ব্যাপার ঠেলাগাড়ির ...ল দিয়েছিল, কিন্তু এই অন্ধকারে ...ঠেলাগাড়িকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায় না।

...ঠো খুব ভারি করে তুলে চিত্রভানুর ...ঠো হাত দিয়েছি, পরে ওরা সিঁড়ির ...ায়গাটা অন্ধকার হয়ে উঠলো। লোডশেডিং ...য়ে সেকেন্ড একটা জন্য মনে ভাড়াভাড়ি ...ছে দেখা। কোনরকমে সিঁড়িটা পার হয়ে চিত্রভানুর ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় চিত্রভানুকে শুইয়ে দিয়ে ভদ্রলোকটি পা ...থেকে জুতো খুলে দিলাম। চশমাটা টেবিলের ওপর রেখে আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বিশ্বজিৎ বেরিয়ে এলো। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে আসতেই মনে হলো কে যেন পেছন থেকে মৃদু স্বরে ডাকলো—শুনছেন? থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি মহিলা। একটা হাতের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। লক্ষ্মীশ্রীর সোয়েটার ওপর একটা কালো রং-এর শ্রেসিং গাউন পরা। মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো কাঁধের কাছে এসে ঝুলছে। আস্তে আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এসে আইভিল জিজ্ঞেস করলো—ওঁনাকে কি আজ খুব বেশি ওষুধ খেয়েছেন? বললাম—হ্যাঁ। তখনই মনে হলো ওর মুখটা যেন বাসন্তীর মতো। আমার মুখের দিকে চেয়ে আর্তকণ্ঠে বললো—ওঁনাকে বাঁচাতে পারবেন না? বললাম—আমরা ডাক্তার, আমরা চেষ্টা করি। —উঁহুমার কথা শোনেন না বুঝি? আমার কথাও শোনে না। কত বারণ করি মদ খেও না, কিছুতেই শোনেন না। বেশি খেলেই কাশি হয়, আরও বেশি করে মদ খায়। কথাগুলো বলতে বলতে আইভিলের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। রাত-দুপুরে বাড়ির পাঁচিল টপকে ডাকাত কিংবা চোর ঢুকছে বলে মনে হচ্ছিল। চোখ দুটোও মুছে মুছে আরশিনগর। বললাম—আজ আসছি, আমি চলি। —হ্যাঁ, এসো—বলে আইভিল আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

রাস্তায় নেমে গাড়ীটা তুলে চিত্রভানুর ঘরের জানালার দিকে তাকালাম। দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে। আমার সঙ্গে করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। তবে কি ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে নিজেই আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে অচেতনা মুহূর্তগুলো পরিক্রমা করে নিজের বাসনা কিছুটা চরিতার্থ করতে। তাকে জানতে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম,—অদ্ভুত মানুষের জন্য, অদ্ভুত তার দুঃখ। হয়তো সারাজীবন ও সুখোদয় না, কারো মনে চিত্রভানুর রেখা আঁকবে। যার জন্যে সে নিজের সুখানিদ্রা ভঙ্গ করে রাত জাগবে, সে হয়তো জানতেও পারবে না। সকালে উঠে হয়তো রাতের কথা আর মনেও আসবে না। কিন্তু আইভিলের হৃদয়ে চিত্রভানুর রেখা আঁকার আনন্দে আমি বিভোর। চেতনার স্তরে স্তরে সমস্ত ও পরম না, আইভিলের অন্ধকারে নিবিড় আলোটুকু জ্বেলে দেয়ার জন্যে আমরা পরমাত্মা।

ক্রমশ ।

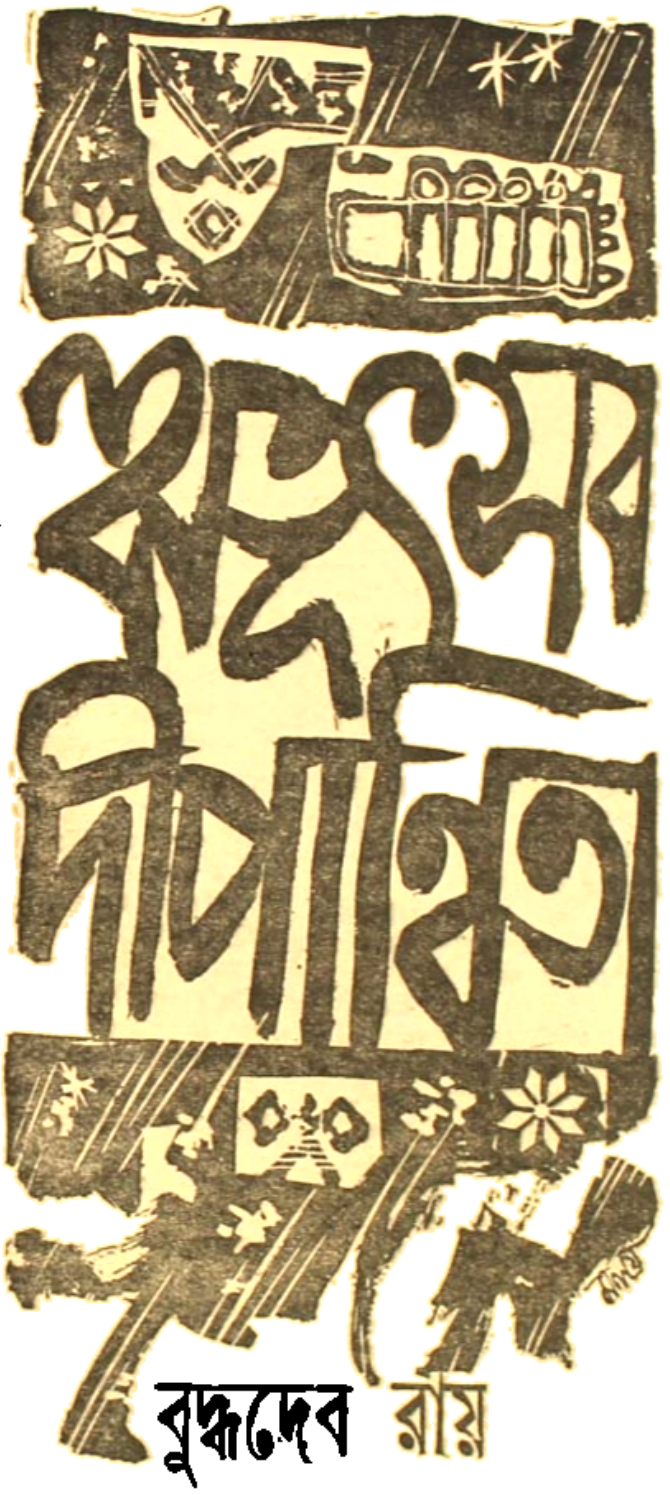

গ্রাম বাংলার পুজো-উৎসব, পরব-পার্বণ, ব্রতকথা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সাধারণের চিন্তায়। কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে ভাবান্তর ঘটে সেই প্রেক্ষাপটে চৈতন্যের উন্মেষেই বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজোর প্রচলন। গ্রাম্য দেবতা—কালী, চণ্ডী, ভৈরব, ভৈরবী, মনসা। প্রকৃতিকে খুশী করতে পারলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়—এটাই হল গ্রামের অনক্ষরাচ্ছন্নের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আজকের নয়। প্রাচীন বাংলার আদিবাসীদের ভয়-ভাবনা, বিপদ আর বিপদমুক্তির অনেক কিছুই আজো আমাদের মধ্যে টিকে আছে। দেবদেবীর পুজোর প্রচলন আদিবাসী কোমদের থেকেই আমাদের মধ্যে এসেছে।

সপ্তম-অষ্টম শতকের আগেই বাংলা দেশের নানাস্থানে শক্তিপুজো প্রবর্তিত হয়েছিল এবং পরবর্তে শাক্তধর্মের অনেক দেব-দেবীর রূপ কল্পনা হয়েছে বৌদ্ধধর্ম থেকে। পালপর্বে যে সৌত্রান্তিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার দেখা যায় সেনপর্বে তা আরো প্রসারিত হয়েছে। কার্তিকী অমাবস্যার কালী-পুজো ও দীপান্বিতা উৎসবের ব্যাপক প্রসার হয় এই সেনপর্বেই।

কৃষিপ্রধান আমাদের এ দেশ। তাই কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পোপাদনের আশা নিয়ে ঋতুতে ঋতুতে নিত্য নিত্য নতুন দেব-দেবীর পুজো-উৎসব, পাল-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠানের প্রবর্তন আমাদের এই দেশে।

অগ্রাণ হল গৃহলক্ষ্মীর মাসিত্ব। তাই বাংলার বিভিন্ন উৎসবগুলি বিভিন্ন দেবতার নামে ও পুজোর সঙ্গে যুক্ত হলেও সবগুলোর মূল উদ্দেশ্য হল ভালো ফসল বা শস্যোৎসবে মেতে উঠেছে।

দীপান্বিতাও এই ধরনের হেমন্ত ঋতুর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। ক্ষেতের পর ক্ষেত—মাঠের পর মাঠ সবুজে ধানের শীষে ভরে যায়, তখন চাষীর মনে আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে—এতদিনে সার্থক তাদের শ্রম। তাই তো এত আলো—এত আনন্দ হেমন্তের এই দীপান্বিতা উৎসবে।

কার্তিকী অমাবস্যার দীপান্বিতার দিনে সন্ধ্যায় গ্রাম বাংলায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে লক্ষ্মীপুজোর প্রচলন আছে। লক্ষ্মী হলেন ধন-প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির দেবী। এই লক্ষ্মীপুজো হল ধনলক্ষ্মীর পুজো—ধানের ছড়াছড়ি ছবি আঁকা ঘটের পুজো।

এই পুজোর মূলে রয়েছে যে সব কুসংস্কার—যে সব লৌকিক কাহিনী তা থেকে বোঝা যায় যে, স্তরের স্তরে ধান আর অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লক্ষ্মীর এই মানমূর্তি কবে লৌকিক লক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে। দীপান্বিতার এই দিনে লক্ষ্মীপুজোর আগে অলক্ষ্মীপুজোর প্রচলন কোথাও কোথাও দেখা যায়। আগের দিন অলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীপুজোর ঘরে প্রস্তুত করা হয়। গোবরে প্রস্তুত অলক্ষ্মীর মূর্তি তৈরী করে কুলো বাজাতে বাজাতে আনুষ্ঠানিক ভঙ্গি কাটতে শোনা যায়—

'অলক্ষ্মী কাটতে যাই,
মা লক্ষ্মী ঘরে আসুন।'

এখানে মা লক্ষ্মী অর্থাৎ শস্য ও ধনধান্যের প্রাচুর্য ও সুখের দেবীর

প্রতিটি দিনের মধ্যে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন পরাজয়
কাছে এসে জড়িয়ে সময়
মেয়েলি মায়ার মত
জন্ম এক গভীর আকাঙ্ক্ষা
জীবনের গাঢ় অনুভব।

প্রতিদিন পরাজয়
শুধু এক কেন্দ্রবিন্দু
জীবনের অন্বেষা নিয়ে
আমাদের থাকখানে
আকাশ সরোবরে ছোটে রৌদ্রের বিদ্যুৎ
সবুজ বিচ্ছে হয় মনে মনে
ধারালো আলোর।

ও-যেন সুউচ্চ কোন পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে
সূর্যাস্তের শেষ খেলা দেখা।

কথাই বলা হয়েছে। অলক্ষ্মীপূজোর আবহে অলক্ষ্মী অর্থাৎ অমঙ্গল, অশুভ সব কিছুকে ঘর থেকে প্রচুর ও সমৃদ্ধের দেবী লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করা হয় দীপান্বিতার এই দিনে। হৈমন্তিক ফসলের উদ্দেশ্যে মশা-মাছি, পোকা-মাকড় ও অশুভ অলক্ষ্মীকে ঘর থেকে দূর করার জন্যই দীপান্বিতার এই আয়োজন।

প্রবল বর্ষণে বাংলা দেশে বর্ষাকালে খাল-বিল, নদী-নালার প্লাবন দেখা দেয়—প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে নানা রকমের। মড়ক লাগে গ্রামে গ্রামে। কিন্তু বর্ষার শেষে প্রকৃতি হেসে ওঠে। সবুজ ও হরিদ্বর্ণে। মানুষের মনে জাগে দোলা। এতদিনে দুঃখের বৃষ্টি হয়েছে অবসান। তাই গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ আজ আলোকের রোশনাই জ্বালিয়ে অলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এল কার্তিকী অমাবস্যার দীপান্বিতার এই দিনটিতে। প্রতিটি গৃহস্থের মনে জেগে ওঠে নতুন ধানের স্বপ্ন—বহু প্রতীক্ষিত আসন্ন নবান্নের ছবি মানুষের মনের আলোকের রোশনাই দীপান্বিতার আলোয় ঝলমল করে ওঠে।

পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কার্তিকী অমাবস্যার দীপান্বিতার এই দিনে গো-জাতির কল্যাণার্থে যে লৌকিক উৎসব বহুল প্রচলিত তাকে 'অহীরা' উৎসব বা 'বাঘনা পরব' বলা হয়।

পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্তে, বর্ধমান জেলার আসানসোলে, বিহারের ধানবাদ জেলায়, সাঁওতাল পরগণা জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে এই 'অহীরা' উৎসব বা 'বাঘনা পরব' বহুল প্রচলিত। এই উৎসবে যে গান গাওয়া হয় তাকেই অহীরা সঙ্গীত বলে। অহীরা সঙ্গীত পশ্চিম বাংলার অন্যতম বহু প্রচলিত লোকসঙ্গীত।

প্রত্যেকটি গৃহস্থের বাড়িতে ও অন্যান্য কার্যের জন্য গো-পালন করা হয়। তাই কৃষিকার্যের জন্য অপরিহার্য হল গো-জাতি। গো-জাতি কৃষির প্রতীক। তাই এই 'অহীরা' উৎসব প্রত্যক্ষভাবেই কৃষি উৎসবেরই অঙ্গ। এই উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ—যেমন গরু জাগানো, গরু নাচানো ইত্যাদি। পুরুলিয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গরু জাগানো অহীরা গানের কয়েকটি ছবি—

জাগো, মা লছমি, জাগো মা
ভগবতী,
আজিত অমাবস্যা রাতি,
জাগে কা প্রতি ফল,
দিব গো মহাদেব,
পাঁচ পুতোর ধন ফেন্দু খাইরে॥

গরু নাচানোর গানটিও পুরুলিয়া থেকে সংগৃহীত—

অহীরে—
ঝুলি ঝুলি খাতে ঝিলি
নাচিরে খোঁলিরে
তোরি সিঁরি হার ভাকিরা ঘুঘুরা।
তোরি সে ঘরে আছে পাঁচঘড়ে
লছমন
তাহাকে জাগাই মোরা যাব॥

মানভূমের অধিবাসীদের অমাবস্যার দীপান্বিতার রাত্রে গাইতে শোনা যায়—

আমি যে যাইতেছিলি কুলি বন
ঝুলিরে বাবুহো,—
রাঙ্গি গাই আনল ঘুরাইরে।
না কাঁদ না কাঁদ ও রাঙ্গি গাইরা
সরেহগ পাতালে ঘুলো উপরে॥

অর্থাৎ,

'আমি তো কুলি খাটবার জন্যই যাচ্ছিলাম, কেবল এই রাঙ্গি গাই তো (লাল রং-এর সুন্দর গাভী) আমার ফিরিয়ে আনল। সুতরাং ও রাঙ্গি গাই তুমি আর দুঃখ করো না। তোমার পায়ের ধুলো স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত যায় ঘুরে।'

যে গরু চাষ করে মাঠে ফলায় সোনার ফসল—ঘরে তোলে ধান, সেই গরুকে আদর করে মেদিনীপুরের ঝাঁশ পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদের গাইতে শোনা যায়—

অহীরে—
এখনে ত নে ত ভালা সের ভরি ধান,
চলি যাব দূরের ঘুরার।
ধান ত দেলে ভালা সুপ ভরি ভরি।
তেল বিনা মন নাহি পায়
অহীরে, এখনে ত নে ত ভালা
সের ভরি ধান।

বলাবাহুল্য এই কার্তিকী অমাবস্যার দিনে অনুষ্ঠিত অহীরা উৎসবের একটি গানে গরুর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার বন্ধনের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। কার্তিক মাসের শিশির গরুর মাঠে যেতে কষ্ট হওয়ায় তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে রাখাল বলছে যে তার সাথের জন্য সে সব ব্যবস্থাই করবে—

খুকড়া মা ভাকি দেল উপল
বিহান গো,
শ্রীগাই তো ঠুকের কাঁয়ার।
উঠরে অহীরা জাগরে অহীরা
শ্রীগাইকে খুলত মরদান।
নাই হাম্মে উঠব নাই,
হাম্মে জাগমো গো,
কার্তিক মাসে শিশির গা কাঁপে,
অঙ্গ মোর হইবে মিলন,
ধরে যে দিব আহিরা মহরী
চাদর গো,
পায়ে যে দিব আহিরা রেশমের
জুতা গো।
মাথায় দিব আহিরা ঝিলিমিলি
টুপি গো,
হাতে যে দিব আহিরা টইনীর
বাঁশী গো,
শ্রীগাইকে খুলত মরদান॥

কার্তিকী অমাবস্যার দীপান্বিতা উৎসবটির পেছনে নিশ্চয়ই পৌরাণিক ও ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা আছে, তবু বাস্তবের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দীপান্বিতা আসলে হৈমন্তিক ফসলোৎসব। তা ছাড়া কার্তিকী অমাবস্যার এই দিনটিতে আমাদের পল্লী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব লৌকিক পূজো-উৎসব ও অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ষার দুঃখ-ক্লেশে দেশবাসীর আনন্দোচ্ছ্বাস—নতুন ফসলের আশার আলোই হল হেমন্তোৎসব দীপান্বিতা।

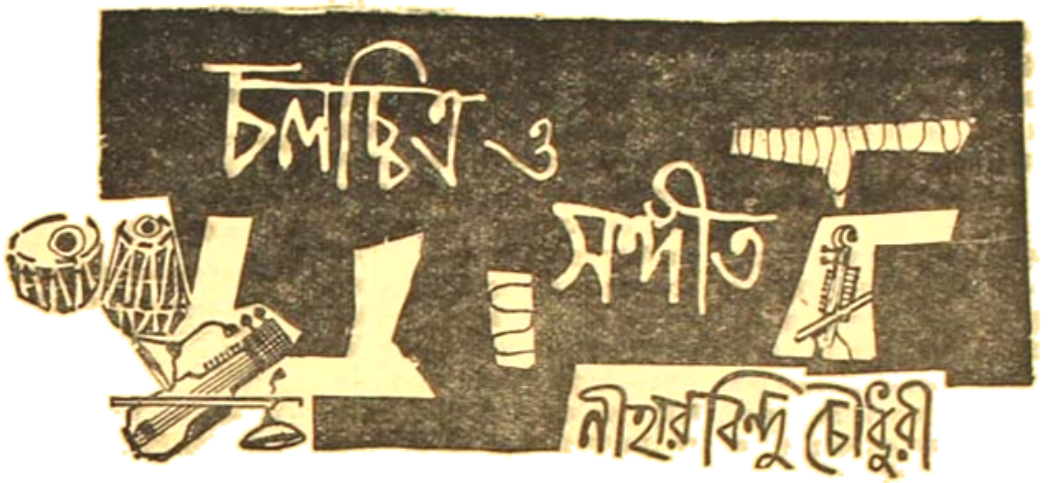

চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্লেষকের এক বিস্ময়-কর অবদান। সঞ্চারের আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নৃত্য-গীত, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, সাহিত্য ও আবৃত্তি প্রভৃতিই ছিল রসানুভূতি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্বাক চিত্র শিল্পজগতে এক অভিনব যন্ত্রযুগের আত্ম-প্রকাশ করলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানুষের সৃজনাত্মক প্রতিভা শিল্পজগতে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিল। সাধু শিল্পে নির্বাক চলচ্চিত্র শিল্পানুরাগী ও জন-সাধারণের নিকট অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। লিখিত-অলিখিত আপামর জন-সাধারণের মনের উপর সেকালের নির্বাক আলো-চিত্র এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো। প্রসঙ্গত বলা আজ যে, তখন-কার দিনে সিনেমা কথাটি ভদ্র শ্রুতিমধুর ছিল না—তখন চলচ্চিত্রকে বলা হতো বায়োস্কোপ বা বায়োস্কোপ।

চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে (মোটামুটি ১৯১০-১৯২০ সাল পর্যন্ত) বায়োস্কোপ প্রদর্শনকালে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে পিয়ানোবাদন প্রথা (কখনো কখনো অর্কেস্ট্রা সহযোগে) কর্তৃপক্ষের চিত্রাভিনয়ের কথা হতো। আমাদের দেশে বোম্বে ও কলকাতার মতো বড় বড় শহরে বায়োস্কোপের সঙ্গে যে সঙ্গীত যুক্ত হত তা ক্রমে ক্রমে জন-প্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। চলচ্চিত্রের আদি যুগে কলকাতায় আমরা কোম্পানীর একটি অনুষ্ঠানে তিনি অর্থাৎ ছিল—যা থেকে আমাদের সঙ্গীত বায়োস্কোপের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য শহরে নির্বাক আমলে চিত্রের প্রদর্শনকালে সিনেমের সঙ্গে অর্গান, হারমোনিয়াম, বেহালা, তবলা, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সাঙ্গীতিক বাদ্যবৃন্দ থাকতো। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি সঙ্গীত আবহসঙ্গীত কাজে ব্যবহৃত হয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন এবং সঙ্গীত-শ্রোতাদের কাছে এইগুলির আবেদন বড় কম ছিল না। বাংলার সঙ্গীতের উপরও এই ব্যবস্থাটির গান-বাজনা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই হল নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের সঙ্গীত সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তারপর এলো সবাক চিত্রের যুগ। সবাক চিত্র সিনেমাজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আজ থেকে বিশ বছর আগে সিনেমা শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতি অভাবনীয় রূপ নিয়েছে। সবাক চিত্র আজ এক নতুন শিল্পমাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। সিনেমার প্রসার আজ অনস্বীকার্য। মূকযুগে শহরে-অঞ্চলেও সিনেমা শিল্প আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সিনেমা সঙ্গীত আজ সর্বত্র শ্রুত, সুপরিচিত ও অনুকৃত। সবাক চিত্রের আবির্ভাবে নির্বাক চিত্রের যুগ সমাপ্ত হয়েছে। সবাক চিত্র আবির্ভাবের অনুপ্রেরণারূপে চলচ্চিত্র-শিল্পের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের সহযোগিরূপে সঙ্গীতেরও এক নতুন বিরাট ভূমিকা দেখা দিয়েছে।

চলচ্চিত্রসঙ্গীত এক নবোদ্ভাবিত সঙ্গীতশৈলীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর সঙ্গে পূর্বতন সঙ্গীতশৈলী ও সঙ্গীত পরিবেশনার কোন সাদৃশ্য নেই। চলচ্চিত্র সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুযায়ী সঙ্গীত-পূর্ণ। ফিল্ম সঙ্গীতের প্রাথমিক যুগ শেষ হয়েছে। বর্তমানকালকে এর রৌপ্যোজ্জ্বল যৌবনকাল বলা যেতে পারে। শেক-সিঙ্কের যুগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সিনেমা সঙ্গীত আজ অগ্রগতির সোপান বেয়ে চলেছে।

১৯২৬ সালে সাউন্ড ট্রাকের আবিষ্কারের ফলে চিত্রসংযোজনার কলা-কৌশল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতে সিনেমার সঙ্গে সহজ সঙ্গীত ও সবাক অভিনয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। অবিচ্ছেদ্য টেম্পো ও ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক (আবহসঙ্গীত) চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একদিকে এতে ভাষাচিত্র ও শব্দের মূক সাক্ষ্যবহনে সহায়তা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ সিনেমা আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। বহু সঙ্গীতশিল্পী আজ সিনেমাজগতে ও রাজনৈতিকভাবে পাশাপাশি সিনেমা শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে। এরা ছাড়া সঙ্গীত পরিচালক, সেতার কণ্ঠশিল্পী, অর্কেস্ট্রা পরিচালক ও যন্ত্রবাদক প্রভৃতি সকলেই আছেন। সিনেমা আজ সঙ্গীত-শিল্পীদের একমাত্র জীবিকার্জনের পথ সুগম করেছে। অনেক নেপথ্য কণ্ঠসংগীতশিল্পী আজ অনেকাংশে চলচ্চিত্রে উপনীত।

মূকী সিনেমার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাথমিক যুগে (১৯৩০ সাল থেকে যার শুরুতে হলো ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, রুশ প্রভৃতি সিনেমাজগত থেকে) চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ব্যাপক প্রয়োগ দাবিত হয়ে আসছে এবং এর ঢেউ আমাদের দেশে ও প্রায় সেসময়ে এসে স্পর্শ করলো। পাশ্চাত্যের বহু প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী সিনেমা সঙ্গীত শিল্প সৃষ্টির কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। আমাদের দেশেও কতিপয় সঙ্গীতশিল্পী সিনেমা সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হলেন। বোম্বে ও কলকাতার মতো আধুনিক সঙ্গীত সম্বলিত চলচ্চিত্র প্রযোজিত হতে লাগলো।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতের সিনেমা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যে ছবির গান সোনালিয়ে—সেই ছবি বহরের পর বছর একটি সিনেমাগৃহে সমারোহের চলতে থাকলো। এর স্বাভাবিক ফিল্ম সঙ্গীতের চাহিদা অনুভূত হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সিনেমার গান গুনগুন করে বিকৃত বা অবিকৃত সুরে সব সময় গেয়ে থাকে। এটা যে আজ শুধু শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তা নয়—মফস্বল পল্লী-গ্রামেও সিনেমার গান হরহামেশা শোনা যায়। সিনেমা সঙ্গীতের প্রভাব আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সিনেমা সঙ্গীত সঙ্গীতশিল্পের এক

প্রথম বাক্যাংশে সংক্ষিপ্ত নাম থাকে। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আসল চলচ্চিত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত করে। বিষয়বস্তুর থেকে পুরোদস্তুর পর্যন্ত নিখুঁত সম্পাদনার প্রয়োজন। শব্দ সম্পর্কে ছবি এবং আর আইকে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। পুরোপুরি ছবি ছাড়াও ফটোগ্রাফ ও বিজ্ঞাপন চিত্রাদিও সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কিন্তু সম্পাদনার সাধারণভাবে দুভাগে বিভক্ত। এক প্রকারের ছবি আছে—যাতে বিষয়বস্তুর বিচারে সুরের সংযোজন হয় এবং প্রেমের-দৃশ্যের নায়ক-নায়িকার মুখ থেকে ডে-ব্যাক দ্বারা গান শোনান হয়, এবং কখনো কখনো নানা সুরের ও ভঙ্গীর ব্যাক-গ্রাউন্ডসহকারে উপর লক্ষ্য রেখে আবহ সম্পাদনা আরোপিত হয়। ছবির প্রারম্ভের প্রায় সব ছবিতেই টাইটেল বিভিন্নিক ও সংযোজিত হয়। আবার কোন কোন ছবিতে একটি বিশেষ সুরকে (থেমেটিক) প্রধান চিত্র কিম্বা-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই সুরটিকেই বার বার ব্যবহার হয়। একে Thematic music বলা হয়—অর্থাৎ এর দ্বারা ব্যবহারিক বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীয় ভাবকে (থেমেটিক দিয়ে) সম্পাদনের মাধ্যমে চিত্রায়িত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সম্পাদনা অর্কেস্ট্রা (ব্যাকগ্রাউন্ড) এক ভাবপরিমিতে ভূমিকা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলিতে সাধারণ বাদ্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায় (শোনা যায়)। পাশ্চাত্য ছবির সুন্দর সম্পাদনা একবারে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির অনুশাসিত এবং অনুমোদনে নির্ভর করে।

আর একটির চলচ্চিত্র নির্মিত হয়—যাতে সম্পাদনাই চিত্র আকর্ষণের সমার্থক হয়ে থাকে। এই পর্যায়ের ছবিগুলিকে সাঙ্গীতিক চিত্র বলা যেতে পারে। ১৯২৭ সালে এই পর্যায়ের প্রথম চিত্রের প্রযোজনা হয় আমেরিকায়। ছবিটির নাম "The gazz Singer"—এতে কথা ও সম্পাদনা ব্যবহৃত হয়েছিল। এর প্রযোজনা ছিলেন অলজনসন্। চলচ্চিত্র ছবি-এর মূকাভিনয় উপস্থাপিত ও অনুষ্ঠানিত হয়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় ছবিতে হাত দিলেন। ছবিটির নাম "The singoig fool"। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে এই দুটি ছবিই সাঙ্গীতিক চিত্রের মূল ভিত্তি বলে গণ্য হয়। পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য আভিজাত্যের ও বহুবিধ চিত্র-পরিচালকেরা এই দিকে তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত করেন এবং অনেক বিভিন্নধর্মী অর্কেস্ট্রা সমন্বিত চিত্রে রূপ দান করা হয়। ১৯৩৬ সালে আর ছবি বানিয়ে-এর "Top Hat" (প্রধানে Fred Astaire and Ginger Ro-জোড়া) বাদ্য সম্পাদনের বিশেষত্ব চিত্রিত হয়েছে এর অনুকরণে নানা আমাদের চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যের চিত্রশালায় বিভিন্ন অপেরা ও বাদ্যযন্ত্রের সম্পাদনসূত্রে চিত্রায়ণ দেখা যেতে লাগলো। এই ধরনের সম্পাদনাবিযুক্ত কিছুদিন সম্পাদনাপদ্ধতি চিত্রযোগাযোগ করে নিতে লাগলো। তারপর কিম্বদন্তিত সুকুমার ও আয়ত্ত-বাবর্তনের জীবন্তচিত্র কেন্দ্র করে নানা ধরনের ঘাঁতাপিতের মধ্যে বাজারে বেরুতে সক্ষম হলো। এর মধ্যে মুখার্ত ও জোহান শ্ট্রাউস্-এর সাম্পাদনিক জীবনকে ভিত্তি করে যে চিত্র দুটি উপস্থাপিত হয়েছিল—সেগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের এবং সুষ্ঠু নির্মাণসূত্রে হয়েছিল। পরে অবশ্য এই ধরনের আরও অনেক সুন্দরতর চিত্র তৈরি হয়েছে। স্থানাভাববশত এর মধ্যে শুধু ছবির নাম বার দিয়ে আলোচনা করেকটি সংযোজন করা হল মাত্র।

(১) আমেরিকা—(১৯৪০) এই ছবি-এ অন্তর্ভুক্তিত বহুসংখ্যক সম্পাদনা-বিশারদকে একত্রিত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেরই গায়ক, বাদক, সুকুমার, অর্কেস্ট্রা পরিচালক প্রভৃতি সবাই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এত বেশি সংখ্যক সম্পাদনাজ্ঞী ইতিপূর্বে কোন চিত্রেই দেখা যায় নি। এতে অবশ্য বহুকারী কয়েকজনের নাম দেওয়া হল। এঁরা সকলেই বিশ্ব-বিখ্যাত। ব্রুনোওয়াল্টার, লিলি পন্স্, হিলদা সিম্রাতিমোর্স্কি, হাইফ্ হিটেন্স্, আর্তার রুবিনস্টাইন, হ্যারী-জেম্স্, আরতাড্ টুরিন্ স্কাইন, ওরিও পিনজা, মোশা হাইফেজ (বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক), জন সিল্পলি, লিওপোল্ড স্টক্ওস্কি ও অন্যান্যরা।

(২) এন্রিকো কারু সো (১৯৪১)—বিখ্যাত ইতালীয়ান গায়ক কারু সোর জীবনী-চিত্র।

(৩) এরোইকা—(১৯৪৮)—সম্পাদনা-বাদনিক বিটোফেনের জীবন-চিত্র।

(৪) ফ্যান্টাসিয়া—(১৯৪০) ইউরোপের প্রখ্যাত সুকুমারদের সম্পাদনা-সাঙ্গীতিক ছবি। প্রযোজক—ওয়াল্ট ডিজনে। ডিজনে-চিত্রে বিশ্বের মোলিক অর্কেস্ট্রা দ্বারা বাদিত ও লেওপোল্ড স্টক্ওস্কি পরিচালিত।

(৫) (ক) দ্যে ফিফ্থ অফ্ বিথোভেন—(১৯৪২)—কৃতবিদ্য জার্মান সুরস্রষ্টা বিথোভেনের জীবন-চরিত অবলম্বনে।

(৬) (খ) দ্যে ওয়ল্ড্—(১৯৩৮)—জর্মানির অধিনায়ক সুকুমার শ্যাটনের জীবন নিয়ে করা হয়েছে ছবি।

(৭) সঙ্গ্ অব্ বার্ন—(১৯৪৭)—প্রতিভাবান জার্মান সুকুমার লিস্ট্ সুরের ও তাঁর প্রেমিকী প্রমার প্রেমোপাখ্যানসহকারে সম্পাদনাচিত্র।

(৮) এ সঙ্গ্ টু রিমেম্বর—(১৯৪৯)—সুরকার শুনি জর্জিনীত শ্যাতন্যমা সোপিন পিয়ানোবাদক ও সুরকার প্রেমোপাখ্যান সোপার জীবনী।

(৯) সঙ্গ্ অব্ মাই হার্ট—(১৯৫০)—বিশ্ব-বিশ্রুত সুর সম্পাদ প্রতিষ্ঠা সিগোর ফ্রাইবুর্গের জীবনী অনুসরণে তোলা ছবি।

(১০) সঙ্গ্ ইন্ দ্যাভিড্—(সাম্প্রতিক (১৯৫১) হেনেরীয়ান সিয়ানোবাদক ও সুরকার ফ্রাঙ্ক লিস্টের সম্পাদ-জীবন।

আমাদের দেশেও সাম্পাদনিক চিত্র কিছু কিছু রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। সংগীত-সম্বলিত অর্থাৎ এক-গানে অনুষ্ঠানই বাঙালি জনসাধারণের কাছে খুবই সমাদৃত। আমাদের দেশের তথা বাংলার সাধারণ প্রকৃতিই সম্পাদ-ভক্ত প্রাণ; কাজেই সম্পাদনাশ্রিত চিত্রগুলি যে স্বাভাবিক আকর্ষণীয় হবে তাতে আর বিচিত্র কি। তারপর সম্পাদ নায়ক-নায়িকাদের জীবনাবলী ছবিও আমাদের দেশেও তোলা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—তানসেন, মীরাবাঈ, বৈজু-বাওরা ও বহুতর প্রভৃতি চিত্রগুলি।

ভক্তিমতী সাধিকা মীরাবাঈ-এর জীবনী অবলম্বনে যে ছবি তোলা হয়েছিল—তা আমাদের দেশের সাম্পাদনিক চিত্রগুলির এক অবিস্মরণীয় চিত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এতে দক্ষিণ ভারতের খ্যাতনাম্নী বিদুষীকণ্ঠী এম্ এস্ সুব্বলক্ষ্মী নামভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তাঁর ভক্তিভাবাপ্লুত সুললিত ভজন-সম্পাদনাদি আজও উপভোগ্যের মনে পড়ে।

তানসেন ছবিটিও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সম্রাট আকবরের প্রধান সভা-গায়ক জগদ্বিখ্যাত তানসেনের সাম্পাদনিক জীবন অবলম্বনে এই ছবিটি রচিত হয়। এই ছবি বাদ্যযন্ত্রী বহুবিধের জটিলতর ও সুমধুর গান নিয়ে অবতারণা। পরলোকগত সুগায়ক কে এল সায়গল্ তানসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনয় ও গান করেছিলেন। তানসেনের বিপরীত ভূমিকায় শ্রীমতী খুরশিদবানুও চমৎকার গান গেয়েছিলেন। তানসেন ছায়াছবির গান অবশ্য কোথাও কোথাও শোনা যায়—এখন এর অনেকই এ বই-এর লোকোত্তরত্ব প্রদর্শিত হয়। তানসেন ছবির সম্পাদ পরিচালনা করেছিলেন—সম্প্রতি ফেডারেল প্রডাকসন্স।

উচ্চাঙ্গের ক্লাসিক সম্পাদ-জগতে যেন সমস্ত ভারতের মুখপাত্র হয়ে সম্পাদনাচার্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জীবনালেখ্য এই চিত্রটিতে যত্নে সংযোজন করা হয়েছে। সম্পাদনাচার্য ওস্তাদ

পরিচালক হিসেবেও। ছবির চারটি গানই সলিলের সুরে।

বহুচর্চা সঙ্গীত-চিত্রগুলির মধ্যে ১৯৫৯ চিত্রবছরটির এক উল্লেখযোগ্য অবদান। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীতের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভূত করে এই ছবি প্রযোজিত। এতে নায়কের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বাংলার সঙ্গীতজগতের ইন্দ্রনাথস্থানীয় যেহেতু। এই ছবি আলোয় অনেক প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছেন। শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখার্জীর জন্য এই ছবির অন্তত একটি কারণ ছিল। তাঁর গানগুলিও এই সঙ্গীতগুলির মধ্যেই উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গীত পরিচালক শ্রীনচোদ্রা মুখোপাধ্যায়। উপরি-উক্ত চিত্রগুলি ছাড়াও অনেক সঙ্গীতপ্রধান ছবি তাঁকে দিয়ে হয়েছে। সুরা-গীত-বাদ্যসমৃদ্ধ চিত্রও কিছু কিছু হয়েছে। তাঁর মধ্যে কয়েক কলি গানের সুর যোজনা-সংযোজনের মধ্য যেহেতু প্রযোজনা ও পরিচালনার অনুপ্রেরণা (মাননীয়া ছায়াদেবী শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়), কালজয়ী প্রচার ছবিগুলির উচ্চ মানসূত্রে। 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধা' ও 'ওপারী' বিশিষ্টা চিত্রগুলির সঙ্গীতের জন্য সুচিহ্নিত।

সবাই জানেন যেহেতু হল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম কেন্দ্রভূমি। যেহেতু ভারতের খ্যাতকীর্তি সঙ্গীত পরিচালকের নাম এখানে দেওয়া হল। এদের মধ্যে প্রবীণ-নবীন সবাই রয়েছেন। সরস্বতীদেবী, রামচন্দ্র পাল, জ্ঞান দত্ত, পঙ্কজকুমার মল্লিক, নৌশাদ ও গুলাম হায়দার, অনিল বিশ্বাস, শঙ্কর-জয়কিষণ, সলিল চৌধুরী, মদনমোহন, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, রাহুলদেব বর্মণ, রবি প্রমুখ।

সবার চিত্র বর্তমান যুগে নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কিছু কিছু নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পীর নাম নিশ্চয় দেওয়া গেল। এঁরা হলেন—লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গীতা দত্ত, সুমন কল্যাণপুর, মহেন্দ্র কাপুর, উদিত নারায়ণ (উপনামধন্য), মুকেশ প্রমুখ।

বাংলা দেশ সঙ্গীতের জন্য চিরবিখ্যাত। কলকাতাও ছিল চিত্রের পীঠস্থান। বাঙালী সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালকেরাও সারা ভারতে সমাদৃত হয়েছিলেন। বাঙালী সঙ্গীত পরিচালক শ্রীসুধীন দাশগুপ্তের ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের পরিচয় প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি অসম্ভব হয়ে যাবে। বাংলার মৃত্তী সঙ্গীতকার তথা সঙ্গীত নির্দেশক হিসেবেও নাম নীচে লিখিত হল। এঁদের মধ্যে অনেকে আমার যেহেতুর চলচ্চিত্র জীবনে অবদান করেছেন। এঁদের নাম। পঙ্কজকুমার মল্লিক, নজরুল গীতি, রাইচাঁদ বড়াল, কমল দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখো, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনিল বাগচী, শচীন বিশ্বাসগুপ্ত, সুবীন দাশগুপ্ত, সুধী মেহ, রামেন মজুমদার, শ্যামল মিত্র, অনুপম ঘটক, সুবল দাশগুপ্ত, কালীপদ সেন, তিন বন্দ্যোপাধ্যায় (তিন অবশ্যই হলেও বাংলাই তাঁর কর্মক্ষেত্র) প্রমুখ।

বাংলার চলচ্চিত্র জগতের যেসব কণ্ঠ-শিল্পীরা আজ ভারতে জনপ্রিয়। ভারতের বাইরেও তাঁদের গীতাবলী সমাদৃত। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল। যেমন: সায়গল, কানন দেবী, সন্ধ্যা মুখার্জী, ভিক্টর মুখার্জী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্নাদে, মুকেশ মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সুধা মালহোত্রা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্ধিতা চৌধুরী, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেনগুপ্তা, সুচিত্রা সেন, সুবীর মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখার্জী, অনুরাধা দেবী প্রমুখ।

এঁ ছাড়া অন্যান্য গায়ক-গায়িকা ও অনেক চরিত্রাভিনয়ে অভিনেতা পরিচালক ফিল্ম-সঙ্গীতে যুক্ত হয়েছেন—তাঁদের কাজ দেখেছে বোঝা যাবে এঁরা চিরকালই দেখতে থেকে যান।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের দেশের বিখ্যাত একক বন্ধসঙ্গীতাভিনেতা শ্রীরবিশঙ্কর, প্রতিভালী অভিনেত্রী খাঁ ও বিলাসে খাঁ চলচ্চিত্র সঙ্গীতের পরিচালনা ক্ষেত্রেও তাঁদের অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রবিশঙ্করের সাথে পাঠালী ও কাথেলীওয়ালার সঙ্গীত সারা বিশ্বের সঙ্গীত সমালোচকদের প্রশংসাধন্য হয়েছে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর—ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতজগতে এক কথায় অবদান। ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর অলাদাকর ও সুদূর ছবির সঙ্গীত পরিচালনা অতীব উচ্চস্তরের ও অনন্যসাধারণ। অসাধারণ তবুও সঙ্গীত পরিচালক বাহাদুর খাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিরেখা ছিল সুদূরপ্রসারিত।

চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ইতিহাসে এও দেখা গেছে যে, চিত্রপরিচালকও কখনও কখনও সঙ্গীত পরিচালনা করেন—যদিও এই দুটোর মধ্যে খুব বড় পার্থক্যরেখা থাকার। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের চার্লি চ্যাপলিনই ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্; কিন্তু সিনেমাজগতে বাঙালী চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের চিত্র সঙ্গীত পরিচালনা করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীত-পরিচালনা এক কথায় অনন্যসাধারণ। শ্রীরায়ের পরিমার্জিতবোধ তাঁর চিত্র-সঙ্গীতকে পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রযুক্ত করে তুলেছে। চলচ্চিত্র-সঙ্গীত যে এত উচ্চমানসম্পন্ন ও চিত্তাকর্ষক হতে পারে তা শ্রীরায়ের সঙ্গীত না শুনলে অনুমান করা যায় না। শ্রীরায় হলেন সঙ্গীতের সত্যজিৎ। পাশ্চাত্যের পরিচালক তাঁদের নিজেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীত অনেকদূর এগিয়ে চলেছে। এর বিকাশের আরও এ সম্ভাবনার অন্তরীক্ষ নেই। তবেও কেবল জানতে আমরা অন্তরালে সঙ্গীত যেমন যেন যায়—এমন শোনা যায়: কিন্তু এই অভিযোগ ও বিরোধিতা যেহেতুর ছবি সঙ্গীতাভিজ্ঞ অনেক সময় শিল্পী-মনকে প্রভাবিত করে পরিবর্তে প্রদর্শিত করে তোলে। বাস্তবের দেশীয় চিত্র-সঙ্গীতে প্রথম সময় সঙ্গতাঙ্গের বিদেশী সঙ্গীতের ধর্ম অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গতাঙ্গ সঙ্গীতের অনুকরণ প্রচারীয় কিছুই; কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে তা আত্মসাৎ করাই সমীচীন। ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতে সঙ্গতাঙ্গ সঙ্গীত ও সঙ্গীত-যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও অনুপ্রয়োগ অনেক বিদেশ যেহেতু বিদেশি সঙ্গীতজ্ঞের কর্মক্ষম নির্দেশ হয়েছে। ভারতীয় চিত্র যখন আমরা দেখব বা তার সঙ্গীত শুনব তখন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিজস্ব ভাবে একান্তভাবে রক্ষণীয়।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় সঙ্গীত-কলার ঐতিহ্য মহান ও সুপ্রাচীন। ভারতীয় সঙ্গীত বিশ্লেষণকলা-উদ্ভাবনে এক অনুপম। তাকে চলচ্চিত্র সঙ্গীতে নতুন রূপদান করাই আমাদের সঙ্গীত পরিচালকদের কর্তব্য ও ব্রত হওয়া উচিত। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও নিন্দা-প্রশংসাকে তুচ্ছ করে ভারতীয় চলচ্চিত্র ও তার সঙ্গীত নিজস্ব ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ভারতীয় অবয়ব অক্ষুণ্ণ রাখতে এদের প্রতি উপসংহারে এই প্রার্থনাই করি।

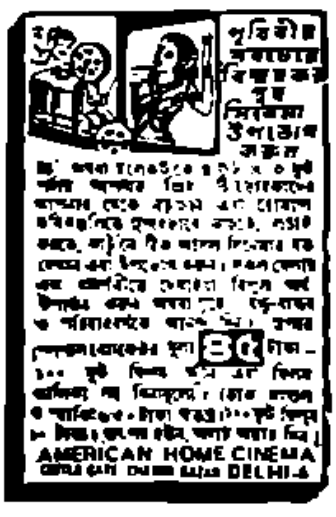

জার্মান থিয়েটার ঃ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ইমপ্রেসনিজমের সেরা উদাহরণ পাওয়া যায় কয়েকটি নাটকে—আর এক্সপ্রেসনিজমের অনেকটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে জার্মান-দের কাজে। ইমপ্রেসনিজমের আসল বোঝাতে গেলে এক ধরনের মুডকে বা এক ধরনের মেজাজ প্রস্ফুটনের প্রচেষ্টাকে। এ ধরণের নাটকে কোন বিশেষ ধরনের ছক বা চরিত্রের বহুলতা হয় না (অবশ্য ইম্প্রেসনিস্ট নাটক বা শব্দ-নাটকের কথা আলাদা)। এক্সপ্রেসনিজমের বেলায় কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ধরনের ছকা পদ্ধতি অনুসরণ করে নাটকের বিষয়বস্তুকে সাজাতে হয়। ইমপ্রেসনিস্টরা যা বাস্তবতা মনে করেন যে, রিয়ালিস্টরা বাস্তবের সার্থক মুখোশ খুলতে চোখ দিয়ে বাহ্যিক জগতকে দেখে, মন দিয়ে ভাবে না—ফলে বাস্তবের যে চেহারা তারা আঁকে, তার ভেতর সাধারণের বাস্তবের নমুনাও থাকে না। বাস্তবের যথার্থ মুখোশ হয় চোখের সঙ্গে মনকে যুক্ত করে দেখলে। অর্থাৎ চোখের সঙ্গে মনের প্রয়োগে শিল্পীর যে ধারণা হয়, তাকেই মুখোশিত করতে পারলে আসল বাস্তবকে পাওয়া যাবে। নাটা রচনার বা প্রযোজনার এই পদ্ধতির অনুসরণের জন্যেই সাঙ্কেতিক মুখোশাবলী, নাটকীয়তোর্ণিত অলঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। আরও এক-ধাপ এগিয়ে গেলে, অর্থাৎ শিল্পীর মন যখন চিন্তার গভীর অন্তর্দেশে বিলীন হয়ে যায়, তখনই শিল্পী এক্সপ্রেসনিস্ট বা অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীতে পরিণত হন।

ইউরোপীয় নাটকে অভিব্যক্তিবাদের প্রবেশ দেখা যায় ১৯১০ সালে এবং ১৯২৪ সাল অর্থাৎ এই ধারার নাটা রচনা চলতে থাকে। এর পর পশ্চিমের নাট্য-কারেরা মুখোশে পড়েন—পৃথিবীর যে সোনালী ভবিষ্যতের ছবি তাঁরা একদিন কল্পনায় সৃষ্টিতে দেখেছিলেন—তাদেরকে তার মুখোশ খুলতে সম্পূর্ণ বিস্মরীভূত-ভাবে। এই অভাবের জন্যেই তাঁদের আলোকন ভেঙে যায়। এ বিষয়ে জার্মান কবি হাসেনক্লেভার লিখেছেন:

The hatred of war and the hope that after the war a new and better world would be built up became the central idea of Expressionism. The troubled time after the war involved the failure of their ideals and a breakdown of the movement was inevitable. The stabilization of Europe along lines that did not correspond to their hopes brought the movement to an end about 1924 — [Expressionism — by Samuel and Thomas.]

রবীন্দ্রনাথের চারটি নাটক—অর্থাৎ মুক্তধারা [বৈশাখ ১৩২৯, ইং ১৯২২], রক্তকরবী [১৩৩০, ইং ১৯২৩], অচলায়তন [ভাদ্র ১৩৩৯, ইং ১৯৩২], ডাকঘর [ভাদ্র ১৩৪০, ইং ১৯৩৩] —সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিবাদী ভঙ্গীতে রচিত।

অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, আগে থেকেই প্লান করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধারার নাটকগুলো রচনা করেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় পৃথিবীর সব দেশেই শিল্পীদের চিন্তা-ধারাও একই খাতিরে, একটা নির্ধারিত পথ ধরে চলেছে। সহজ কথায় একে বলতে হয় collective activity displayed by writers and artists of the world.

জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমাদের চোখে পড়বে যে, সাহিত্যে নানা ধরনের প্রোলীলন এবং আন্দোলনসহ বিভিন্ন সৃষ্টির আগেই পাশ্চাত্যের জার্মান সাহিত্যের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় বিশ্লেষণের আগেই সৃষ্টি হয়েছে স্টর্ম এণ্ড স্ট্রেস্, ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, বীডার্মায়ার, নাচুরালিজম, ইমপ্রেসনিজম, নিওরোমান্টিসিজম প্রভৃতি শিল্পসংগঠনের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ। বিবর্তনের দিক দিয়ে এর পরের যুদ্ধটাই হোলো এক্সপ্রেসনিজম বা অভিব্যক্তিবাদের যুগ।

১৯১০ সাল থেকে ১৯২৪ সাল—অর্থাৎ প্রায় পনের বছর অর্থাৎ এই নতুন আন্দোলনটি পুরোদমে চলেছিল। এই সময়ে ইউরোপে বাদুড় যুদ্ধের সময় দেখে—যাতে আগের এবং শেষ সর্বনাশা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। এই মহা-যুদ্ধের আগে থেকেই এক ধরনের চিন্তা-শীল লেখক দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা মানবিকতার মানুষের জীবনধারা, রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দেশের শাসন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে একটা বিরাট অসন্তোষ সৃষ্টি করে এমনকি চেষ্টা একটা আমূল পরিবর্তন আনবার প্রচেষ্টাও মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলেন। অভি-ব্যক্তিবাদী শিল্পীদের কাছে বিষয়বস্তু লাগছিল নিম্ন-রোমান্টিক স্তরের কোন পর্যায়ে—'its cult of the past, its mystic adoration of nature, its worship of the esthetic personality, its dissection of the soul, its aristocratic approach to art.'—R. Hinton Thomas: Expressionism.

অভিব্যক্তিবাদীরা চাইলেন জীবনকে এবং সমস্ত জার্মাটকে সমস্যার সমাধান আলোকময় মিলিয়ে পুনর্গঠনে নেবতে। সৌন্দর্যকে জীবন থেকে আলাদা করে নিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টাটাই যে একটা অবাস্তবতা এবং এক ধরনের এস্কেপিজম্—তাদের নিজেদের রচনায় এই সত্যের ওপরেই তাঁরা জোর দিতে লাগলেন। তাই বলে তাঁরা কিন্তু বাস্তববাদী বা ন্যাচারে-লিস্টস্ ছিলেন না। তাঁদের দেখবার ভঙ্গীটা ছিল সাঙ্কেতিক।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা যেন আগে থেকেই অনুভব করছিলেন যে, এক মহা সঙ্কটের সময় এগিয়ে আসছিল। সেই হিসেবে তাঁরাই যেন ইঙ্গিত দেন, আসন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে। স্বভাবতই যুদ্ধের সময়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জীবনে এই ধরণের লেখকদের প্রভাব খুব বেশিভাবেই পড়তে থাকে। যুদ্ধ নায়কীয় ক্ষমতার এবং তা সর্বতো-ভাবে অমানবিক; যুদ্ধের ফলে পৃথিবী আবার নতুনভাবে, সুন্দরতরভাবে গড়ে উঠবে—এই ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল যে, অভি-ব্যক্তিবাদীদের নির্ধারিত আদর্শ পথে পৃথিবী মোটেই এগিয়ে চলছে না। ফলে তাঁদের আন্দোলনটা আপনা থেকেই ভাঙতে সুরু করে এবং ১৯২৪ সালে সে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটলেও যে ভাব-ধারার ফলে জন্মের সত্য, তা কখনো সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হতে পারে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপে 'এক্সপ্রেস' নয় বেরোনো এবং আরও নতুন ধরণের এক্সপ্রেসনিজম-এর জন্ম নাটক বিশেষ পর্ব দিয়ে প্রকাশ হয়ে সাহিত্যের চিন্তার ঘোরাফে

প্রযোজনায় এবং অভিনয়ের দোষে ব্যর্থতায়ের 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকের অনাগ্রহতাও হয়তো কেউ দেখেছে।

যাক, আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে মানুষ যেন আত্মিক সততার পাকা গাঁথুনি ভেঙে ভূলতে গিয়ে ধর্ম, রাজনীতি, যুদ্ধ, আরো সব কিছুকেই বিসর্জন দিয়ে নিজেকে করে ফেলেছিল ফল-তৈরি পুতুলের মতন। এইসব পুতুল-মানুষের কান্না দিতে গিয়ে টি. এস. এলিয়ট লিখেছিলেন :

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with
straw! Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over
broken glass
In dry cellar.... ইত্যাদি

ঠিক নাটকার হিসেবে, জীবন নাট্যকার ধর্ম যাইবার, থ্রোপার ও হাসেনক্লেভার তাঁরের কয়েকটি বিখ্যাত নাটক লিখেছেন এক্সপ্রেসনিস্টিক স্টাইলে। আমেরিকান নাট্যকারদের ওনীল তাঁর 'দি হেয়ারি এইপ'-এ সোফী টেডব্রেল 'অ্যাসেনেস'-এ জন হাওয়ার্ড লসন 'রোজার ব্রুমার' ও 'প্রোসেসনাল'-এ এবং এলমার রাইস 'দি এ্যাডিং মেসিন'-এ ও 'দি সাব্-ওয়ে' নাটকে অভিব্যক্তিবাদী কলা-কৌশলেরই আশ্রয় নিয়েছেন।

সাধারণতঃ এ ধরনের নাটকের পাত্র-পাত্রীরা হয় কয়েকজনের মানুষে। নাট্যকার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এইসব মানুষের ভেতরকার আসল চেহারাটা সবার সামনে তুলে ধরেন। আজকের সমাজ ও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার বক্তব্যটাও তাঁরা ইঙ্গিতে-ইশারায় স্পষ্ট করে যেন পাঠক এবং দর্শকদের কাছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই চাপেকের 'আর্-ইউ-আর্', কাইজারের গ্যাস, রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি এবং তাসের দেশ নাটকের বিচার করে দেখা দরকার। রক্তকরবীতে ছাদের বাহক হিসাবেই সংকেতের ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে লেখার ধারাটা এক্সপ্রেসনিস্টিক—সিম্বলিস্টিক নয়।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী জীবনের প্রতিলিপিকার নন—তিনি হচ্ছেন জীবনের ভাষ্যকার। অর্থাৎ চিত্রায়িত বিষয়ে কাহিনীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে, তিনি নাটকে ছন্দ আনেন না, বা মনোকণীয় বক্তব্য বর্ণনা দেওয়াটাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। চরিত্র বা ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরাটাই হল তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

মুক্তধারা নাটকে দেখি, রণরোল বিকৃতি অন্তর বিকৃত ব্যবহারে শুধু শিবতরাইয়ের প্রজাদেরই সর্বনাশের কারণ ঘটান নি—এই বন্ধ তৈরি করতে গিয়ে উত্তরকূটের প্রজাদেরও বহু দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে। এইসব অত্যাচারের স্বরূপকে দুটি ছোট সংকেতের সাহায্যে কবি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে ধরেছেন—প্রথমে বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনি—'মরল, আমার মরল.....' এবং বটুকের সাবধান-বাণী—'সাবধান বাবা, কেউ না ওপারে—খাদ থেকে.....নড়বেন।'

এইরকম কৌশলপূর্ণ সংকেতের ব্যবহার দেখেছি এলমার ইউনিপিডসের 'দি স্ট্রেঞ্জার ইজেবেল' নাটকে। যুদ্ধের যে নিষ্ঠুর বাস্তবতার বিরুদ্ধে হোমার তাঁর মহাকাব্যে বিদ্রূপভাবে সম্পাতের ব্যবহার পরিবেশন করেছেন, ইউনিপিডস তাকেই আশ্চর্য কলা-কৌশলের সাহায্যে ছোট একটি সিম্বলের চেতর দিয়ে রূপায়িত করেছেন—একটি বিষাদময়ী একাকিনী নারীমূর্তি এবং তার বক্তব্যকে মৃত শিশুর চিত্রে—'In the lonely figure of a pitiful old woman sitting on the ground with a dead child in her arms.' যুদ্ধধারা পড়তে গিয়ে আমার বারবার শেক্সপীয়রের Measure For Measure-এর এই লাইনগুলো মনে পড়ে।

'...drest in a little brief
authority,
most ignorant of what he
most assumes,
His glassy essence—like
an angry ape
plays such fantastic tricks
before high heaven
As make the angels weep.'

অভিব্যক্তিবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এলমার রাইস বলেছেন।

Expressionism attempts to go beyond mere representation and arrive at interpretation. The author attempts not so much to depict events faithfully as to convey to the spectator what seems to be their inner significance. To achieve this end, the dramatist often finds it expedient to depart entirely from objective reality and to employ symbols, condensations and a dozen devices which to the conservative must seem arbitrarily fantastic?

[ক্রমশ]

বেকার সমস্যার সমাধান ?

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে কুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অবশ্য অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিষয় নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রায়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়
বি. সি (আমেরিকা), এম. এস. সি. আই. সি. এফ (লণ্ডন)
লিখিত সচিত্র
আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং
দাম মাত্র চার টাকা।
ডাকমাশুল অতিরিক্ত দেয় নয়

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

চলচ্চিত্র ও দর্শক

অপর্ণা রায়—'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে

চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকের যেমন ঘনিষ্ঠতা, আর কোন শিল্পের সঙ্গে হয় তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। ছবিকে বাঁচিয়ে রাখে দর্শক, আবার দর্শকের জীবনের ওপর প্রভাব ছবির। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয় একটা ছবি নির্মাণে। আজকাল কোটির অঙ্কও ছাড়িয়ে গেছে। প্রযোজক এই মোটা টাকা লাগান করেন দর্শকের ভরসায় বুকে। প্রযোজক এক কোটি খরচ করে দুই কোটি ঘরে আনতে চান। দর্শক যদি ছবি গ্রহণ না করে, তবে তাঁর সুক্ষ সর্বনাশ! কিন্তু প্রযোজক মোটামুটি দর্শকের মন-মেজাজ বুঝে কাজ করেন। তাঁকে সব সময় লোকসানে পড়তে হয় না। আর ছবি মানে তো কেবল গল্প নয়, তাতে গান, নাচ, কমিক, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দরী নারী, তার সঙ্গে আজকাল আরো কিছু দেওয়া হয়—যাতে দর্শকরা যে যা নিতে পারে বা যে ভাবে আনন্দ পায়। কিন্তু সব কথার আসল কথা দর্শক। দর্শকই ছবির আসল নিয়ন্ত্রক শক্তি।

আবার দর্শকের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব কি ভাবে তা আর নতুন করে বলার কি আছে? এক চিত্রতারকা কোথাও এসেছে শুনলে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে লোকারণ্য। পুলিসকে লাঠিপেটা—এমন কি টিয়ার-গ্যাস পর্যন্ত ছুড়তে হয় জনতা নিয়ন্ত্রণের নামে। চায়ের দোকানে একজন গায়ক, ছিপ-কাটা মাঝারের কথা এই ভিড় হয় না। বাঁধও শিল্পসূত্রের দিক থেকে ওঁরা তথা-কথিত চিত্রতারকার চেয়ে অনেক বেশি উঁচু শিল্পী। ছবির গান, ছবির মেয়েদের ছাপা শাড়ি পরে, তাদের ছাঁটা বা কথা বলার ভঙ্গি কত সহজে দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েরা তারকাদের অনুকরণে শাড়ি-ব্লাউজ পরে, ছেলেরা চুল ও জামাকাপড় অনুকরণ করে। অভিনয় ছবিতে থাকে কেবল প্রেম, সংসার পথে ভাড়া সামাজিক কোন সমস্যা বা জীবনদর্শনের কথা ছবি দেখে ভাববার কথা নয়, তার কোন প্রভাবও মনের ওপর পড়ে না।

আমরা যে সমাজব্যবস্থায় বাস করি, তাতে ছবি হচ্ছে প্রথমত পণ্য, মুনাফার মাধ্যম এবং এত নিয়ন্ত্রণতার ব্যবসায়ীদের হাতে। ছবিকে তাঁরা বলেন আনন্দের মাধ্যম। সুতরাং চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের মানদণ্ডে অনেকে চলচ্চিত্রকে নিম্নপর্যায়ের শিল্প বলে থাকেন। কিন্তু যেখানে চলচ্চিত্র ব্যবসার পণ্য নয়, সেখানে চলচ্চিত্রকে বলা হয় লোকশিক্ষার মাধ্যম। আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলার কাজ করে ছবি। সেখানে ছবিকে নিয়ে মানুষের ইতর প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলা হয় না। তা অন্যায় বলে গণ্য হয়।

এই রকম দুই দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি তৈরি হয়। দুই রকম ছবিরই দর্শক আছেন। এই দুই দল দর্শকের একদল পথা-চলচ্চে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর একদল শিল্পসৃষ্টি-সম্পন্ন ছবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একদল ছবি দেখে হাল্কা আনন্দ করছে, জীবনটা তো দু'দিনের, ভোগ করে নাও। আর একদল ছবি দেখে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাচ্ছে—মনে জিজ্ঞাসা জাগছে, জীবনকে সুন্দর করার কথা ভাবছে।

এই দ্বিতীয় দর্শকদলকে তয় করে ছবির ব্যবসায়ীরা, ওঁরা। কারণ, দর্শক-মনে যত জিজ্ঞাসা জাগবে, তত ব্যবসায়ী-দের অসুবিধা, তাঁদের ছবির দর্শক কমে যাবে। তাই তাঁরা শুধু হাল্কা বিষয়-বস্তুতে না থেকে ছবিতে দেন-জীবনের যা কিছু তার কিছুই বাদ রাখছেন না, নারী-পুরুষের জীবনে যা একান্ত গোপনীয়, যা পরিচালক তাকে ওঁরা কোকেদার বাজারে উপস্থিত করছেন পণ্য হিসাবে। এর পরে ওঁদের দেবার কিছু নেই। দর্শককে সেই সীমায় এনে পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় দলের দর্শকের সংখ্যাও বাড়ছে। পৃথিবীতে যে ছবিগুলিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি বলা হয়, সেই ছবিগুলি এই দ্বিতীয় দলেরই মনোনীত ছবি। চলচ্চিত্র-শিল্প যে বিজ্ঞানো-শ্রিত শিল্পমাধ্যমের শিল্প, তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় এই ছবিগুলির মাধ্যমে। সুতরাং দ্বিতীয় দলের দর্শকরা আসল সমঝদার দর্শক। তাই এত গতানুগতিক প্রযোজনার মধ্যেও সৃজনশীল পরিচালকদের ওঁরা চিনে নিয়েছেন, মর্যাদার আসন দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বছরে প্রায় তিনশটির ওপর ছবি তৈরি হয়, তার মধ্য থেকে যারা নিছক ব্যবসায়ের তাগিদে আর যারা সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে ছবি করেন দর্শকরা ঠিকই চিনে নেন।

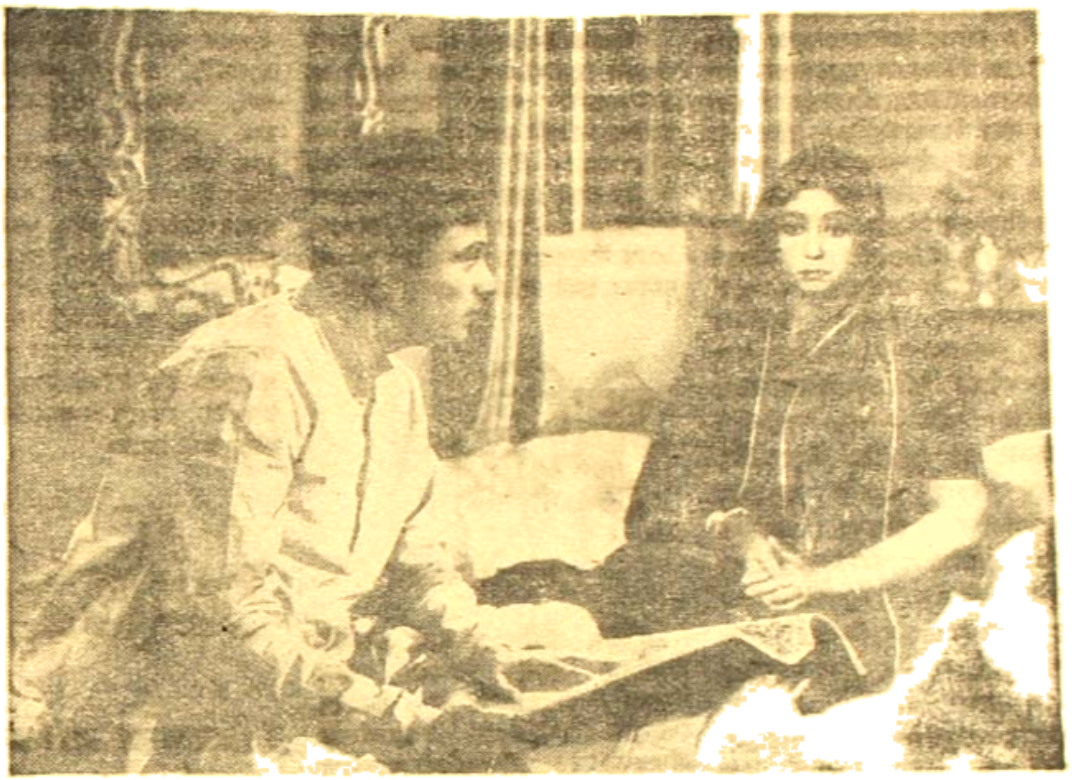

অগ্রদূত পরিচালিত সাম্প্রতী অপেরা ছবিতে উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র যেমন বাংলা ছবির অগ্রসর হচ্ছে, দর্শকও তেমনি অগ্রসর হচ্ছেন। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনের পরিবর্তন হয়, তার চাহিদা বদলে যায়। ছবিকে এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়, নতুবা ছবি দর্শকের সমর্থন পায় না। দর্শক আর ছবির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

—সুজন।

অগ্রদূত অপেরার মেগোলিথস যাত্রা পালায় সুপ্রিয়াদেবী ও বনশ্রী

নাটকের কথা

কুশীলব-এর নতুন নাটক

'কুশীলব' নাটকগোষ্ঠী সাম্প্রতিককালের অন্যতম চিহ্নিত নাট্য প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এই সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয় নৈহাটী রেলওয়ে ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ধীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বিদেশ বন্ধু'; অপরটি একাঙ্ক আসফুকের 'পতাকা'র অনুবাদ। দুটি নাটকই প্রায় দশ বছর আগে অনেকটা সদ্য গড়ে ওঠা সাধারণ নাট্যপ্রেমী দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর কুশীলব-এর এই চেষ্টা নন্দনীয়।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রোজেনবার্গ দম্পতিকে বিদ্যুৎ-চেয়ারে বসিয়ে মারা

হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা প্রসাধনী কোম্পানির বিজ্ঞাপন-কৌশলের গুরুত্ব প্রতিটিতে ইউনিলিভার কাছে পাঠায় করে দিয়েছেন। এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে তখন সারা বিশ্ব উত্তাল প্রতিবাদের ঝড়। মূলত এই ঘটনাকেন্দ্রিক সংলাপ-নির্ভর নাটকটি আজও কত আকর্ষণীয় তা দুর্লভ-এর অভিনয় দেখলেই বোঝা যায়। মোট চারটি চরিত্রের ত্রিমুখার্ক মোট নাটকমুহূর্তকে খুব জমে রেখেছিল। এছাড়া পরিচালনার কুশলতা, আলোকসম্পাতের সহজতা এবং আবহসঙ্গীতের পরিবেশ রচনার দক্ষতা প্রশংসনীয়। অভিনয় করেন অনুপকুমার বোস্টনমেপ-এর ভূমিকায় তরুণ মৈত্র, হেয়ের ভূমিকায় দীপালি বানার্জী, ব্লাড-প্রতিনিধির ভূমিকায় গোবিন্দ বানার্জী এবং পি. ডি. টেলিসের ভূমিকায় অরুণেশ চৌধুরী। পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৌধুরী স্বয়ং।

'অভীকে'র অন্য—একটি নাটকটির অভিনয়ে রয়েছেন তাপস চক্রবর্তী, সুবোধেন্দু কুণ্ডু, সরোজ সেন এবং শীতল বন্দনাতীর্থ অভিনয় উল্লেখযোগ্য। একটি কথা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আরও রিহার্সালের প্রয়োজনীয়তা। এটির পরিচালনার দায়িত্ব অরুণেশ চৌধুরী গ্রহণ করেন।

অভীকে কয়েকটি

আগামীর নতুন নাটক

'আগামী'-র নতুন নাটক আসছে শেকে। ফ্রেঞ্চ ফেস্ট-এর কর্মোদ্যোগে চক সার্কেস প্যারা অনুপ্রাণিত এই মৌলিক নাটকটি লিখছেন দিগিন চট্টোপাধ্যায়। এই নাটকটিতে দেখা যাবে বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগ্রামী চেহারা এবং উত্তরণের পথ। আগামী ১১শে নভেম্বর মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হবে।

স্টুডিও খবর

রবীন্দ্রনাথের 'ছবি'

পরিচয় সাহা ও মৃদু চক্রবর্তী প্রযোজিত মৃদু ফিল্মসের প্রথম নিবেদন 'ছবি'-র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্র-কবিতা অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক মৃদু চক্রবর্তী। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীচক্রবর্তী নিজেই। সম্প্রতি কিলাকে মৃদুলের যা এ-ছবির সুরকার। কণ্ঠদানে রয়েছেন কিশোরকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অনুপকুমার, মিলনে মুখার্জী, রবীন বানার্জী, সুবোধ দাস, তপন চ্যাটার্জী, প্রবীর রায়, প্রবীর সরকার, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় (ছোট), গীতা দে, অনিতা বিশ্বাস, রুমা মুখার্জী, ধীমান চক্রবর্তী, সতীন ও সন্ধ্যারাণী অভিনয় প্রতিযোগী-খ্যাত জয়শ্রী রায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সুবোধ বানার্জী, অরুণ ভৌমিক ও গৌর পোদ্দার। এ ছাড়াও রয়েছে বিশেষ পরিচালক ও ইউনিট নিয়ে বিরাটাকারে, রাজস্থানীয়, বোম্বাই ও জামসেদপুরের বাকের ছবির আউটডোরে।

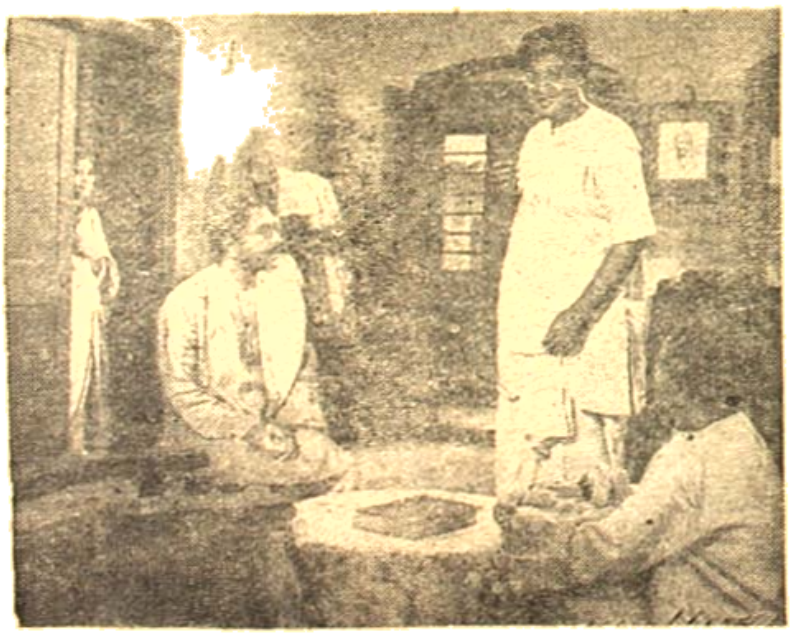

মৃদু ফিল্মসের প্রথম ছবি 'ছবি'র মিলনে মুখোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায় ও অরুণা চৌধুরী।

সঙ্গীতকথা

অপেরা রীতিতে 'চণ্ডালিকা'

গত ১৮ই অক্টোবর চারুপ্রভা মুখের নিকট নবনাট্যমঞ্চে অরুণ মহল-এ রবীন্দ্র উদ্যোগে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'চণ্ডালিকা' বহু আলোচিত নৃত্য-নাট্য। বাংলাদেশের সঙ্গীত-রসিকদের এই নৃত্যনাট্যের কাহিনী ও গান জানা হয়ে গেছে। এদিক থেকে নামকরা শিল্পী-সমাবেশ না হলে চণ্ডালিকা-র আকর্ষণ হেরে থাকার কথা নয়। কিন্তু রেনেসাঁসের চণ্ডালিকা-তে পেশাদার শিল্পী সমাবেশ না থাকলেও নতুনত্ব ছিল এবং উপভোগ্য হয়েছিল। এই নতুনত্ব ও সার্থকতার জন্য যাঁরা প্রশংসা পাবেন, তাঁরা হলেন পরিচালক ও নৃত্য পরিকল্পক অমিত চট্টোপাধ্যায় এবং শিল্পী পূর্ণিমা বানার্জী ও অর্পিতা ঘোষাল।

এই চণ্ডালিকা-র নতুনত্ব এই যে, সাধারণত যে রীতিতে চণ্ডালিকা অনুষ্ঠিত হয়, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই চণ্ডালিকা ছিল অপেরা রীতিতে। শিল্পী-দের নৃত্যাভিনয় আর নেপথ্যে অথবা মঞ্চের পেছনে সঙ্গীত ও আবৃত্তির যে রীতি, তার পরিবর্তে প্রকৃতি ও নৃত্যাভি-নয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠে তাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। এখানেই নতুনত্ব, অর্থাৎ অপেরা-রীতির অনুসরণ। এই রীতিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতনাট্য যা রীতি-

পাঁচের দশকের শেষভাগে রঙ্গমঞ্চের জগতে নিজস্ব ঘর ও মঞ্চের দাম

পূর্বে দেখেছি এবং তা পরম উপভোগ্য বলে হয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রাবলী-র মত নৃত্যনাট্যের অনেক দৃশ্যের রূপায়ণ বড় কঠিন ও দুঃসাহসিক কাজ। কারণ, নৃত্যের ভাষায় যে পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে সঙ্গতি পরিবেশনে অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া নৃত্য এবং সঙ্গীত দুয়েরই পরস্পরের এমন নিপুণ সাযুজ্য সম্ভব হয় যা। আনন্দের কথা, এখানে পরিচালনা এবং অভিনয়ের যত শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা নাচ এবং গান দুয়েই সমান দক্ষ। পাঁচুনীর নাচ আমরা ইতিপূর্বে কয়েকটি অনুষ্ঠানে দেখেছি, নাচে তিনি প্রত্যেকবারই চমৎকৃত করেছিলেন। এবার তাঁর সঙ্গে কণিকার বেহুলানিপুণার সঙ্গে রূপায়ণে অপূর্ব রবীন্দ্র-সঙ্গীত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাঁর এই দক্ষতায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। পরিচালনা সুসংহতিতেও আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর চোখের ভাষার যাঁরা একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পরিচয় প্রকাশ করেছে। মাত্র কয়েকজনের সুযোগ পারিবেশে পরিচ্ছন্ন-ভাবে মুহূর্তে তাল সুর রক্ষা করা যে কি কঠিন কাজ, সেকথা আমরা সেদিন অনুভব করেছি। এই দুজন শিল্পীকে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই অনবদ্য নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা অমিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি মঞ্চ-সজ্জাতে নতুন পরিকল্পনার পরিচয় ইতিপূর্বেও দিয়েছেন। তাঁর "অভিসার" ইত্যাদি নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জার নতুনত্বের জন্য নতুন অভিনন্দন। অবশ্যই এ অনুষ্ঠানটিতে একটিকে তিনি যেন নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে উপস্থাপনার জন্য যেতে এক ইতিহাস

অদ্ভুত চরিত্র! অভিনব অভিব্যক্তি॥ অপূর্ব উত্তমকুমার!!!

উত্তমা মাহিত্রী

নতুন পথ

শ্রীযুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী ০ প্রাচী ০ ইন্দিরা ০ পদ্মশ্রী

অশোকা । মোহনমায়া । মায়া । মায়াপুরী । ঐরিক । জ্যোতি কৈরী । স্নেহ । জয়শ্রী । চন্দা । চিত্রালয়

উপরি উক্ত কথা বলা যায় না। আমাদের মনে হয় অনুপম বাবুর অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে [illegible] তিনি [illegible] এবং মাঝের [illegible]

[illegible] ৬ টাইটেল অপেক্ষাকৃত ভালো প্রশংসা করি এবং উপভোগও করেছি, কিন্তু তবে দেখা দরকার, এই বাঁচিতে শিল্পীর উপর যে চাপ পড়ে, সে কথা নেওয়া উচিত হবে কি না।

সন্দিপ মেন পরিচালিত 'সাগর ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণী

সংবাদ কণা

"ডিফেন্স কাউন্সেল ডিলয়ানভ" সোভিয়েতে অভিনয়

সোভিয়েত রাশিয়ার একটি স্বকপোলকল্পিত অবলম্বনে নিয়ে রচিত নাটক "ডিফেন্স কাউন্সেল ডিলয়ানভ" সম্প্রতি লেনিনগ্রাদের গর্কি থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয়।

সাধারণ আদালতে লেনিন যখন সহকারী ব্যারিস্টার হিসেবে আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেন, তখনকার একটি ঘটনা নিয়ে এই নতুন নাটকটি রচিত। নাটকার এ. ভিনোগ্রাদভ ও এম. ইরোস্ট্রেটোমিন যুগ্মভাবে নাটকটি রচনা করেছেন।

বিশিষ্ট সোভিয়েত নাট্য-পরিচালক ডি. তোভস্তোনোগোভ ও তাঁর সহকারী ওরাই. একসেলড এই নাটক পরিচালনা করেছেন। তারুণ্যের প্রতিভার রাজনৈতিক জগতে তরুণ সাধারণজীবী হিসেবে লেনিনের আত্মপ্রকাশই এই নাটকের মূলবস্তু।

বিজয়া সম্মেলন

১৮ই অক্টোবর, ১৯৭০, রবিবার ২/২, বৈকুণ্ঠপাড়া লেন, হাওড়া-১—ঠিকানায় "পরিচিতি সাহিত্যিক গোষ্ঠী" কর্তৃক বিজয়া সম্মেলন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্পাদক শ্রীমতী হওল সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর পর ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাস হতে 'পরিচিতি' পত্রিকা ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশ হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রেখা মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে "সুর-ছন্দ" শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক "অতুলনা" নৃত্যনাট্যটি। এছাড়া "মণিপুরী" নাচ দেখান কুমারী রচনা চ্যাটার্জী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী তনি বসু, কুমারী তনিমা দত্ত। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীপরিমল-কুমার গুপ্ত ও শ্রীদেবব্রত দাস।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

সংগঠনী আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সংগঠনী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০। আবেদনপত্র বা অনুসন্ধানের জন্য সাধারণ সম্পাদক, সংগঠনী, উদয়পুর, পোঃ নিমতা (বেলঘরিয়া), কলিকাতা-৪৯—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কল্য প্রকাশিত হইল। অদ্য প্রকাশিত হইল।। অদ্য প্রকাশিত হইল।।।

শ-ওসাদি রচিত

অন্তরালের শত্রুব্যূহ

একালের সমাজের নানা অজানা দিকের এই সবাকে চিত্র উদ্ঘাটন করা হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখকের গভীর সমাজচিন্তার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ কবি জনাব উদ্দীন বলেছেন—আপনার পুস্তকে জাতির কল্যাণকর বহু কথা আছে।

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১২

॥ লড়াই ॥
[১০২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মাথার তেল, সাবে মাখার সাবান, একটু ভাল স্নো বা ক্রিম—অনেক কিছুই বেচারা এখন নিয়মিত ব্যবহার করতে পারে না।

পাশের ঘরের ওরা কাঁদিন ধরে খুব ইলিশ মাছটায় খাচ্ছে। লোকটা বুঝি কোনো মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে। পুজোর বোনাস পেয়ে বৌকে ছেলে-মেয়েকে নতুন জামাকাপড় কিনে দিয়েছে। বস্তির আরও দু-এক ঘরের মানুষ কোথাও কোথাও চাকরি করে। তারাও বোনাস পেয়েছে।

ফটিকের ঘর চুপচাপ। খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ। বেসবারের কোনোরকম ঝেলা নেই। কারখানা বন্ধ। সবাই বাসায় ফিরে গেছে।

তা হলেও ফটিক তো ঘুমে বসে থাকে না। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে। একটা কিছু চিন্তা করছে। মানুষটা বড়ই শান্তিপ্রিয়। পাশের ঘরের একটি বৌ একদিন অভিমানে ঝিলেস করতে অজুহাত খুঁজি করে উকুন বিছিয়েছিল, কন্টুর মা এসে বড়মানুষের ঘরে দাঙ্গাবাজির ব্যবস্থা করছে।

সেদিনই রাতে ঘরে ফিরে অঞ্জলির মুখে কথাটা শুনে ফটিক হাসছে খুশি। সত্যি তার বৌ বুদ্ধিমতী। চমৎকার উত্তর দিয়েছে।

তার সামনে মুখ ঝোমড়া করে থাকে, মান অভিমান করে, সময় সময় ঝগড়াঝাটিও করে, কিন্তু আসল দরকারের অঞ্জলি ঠিক। আর তাকে কিনা ফটিক বলেছিল, একটা গ্যারেজে কাজ নিয়েছে। দালালির কথাটা বললে সুন্দর হত। মানাত।

দু' দিন আগে একটা পকেট মারতে সোটা দশেক টাকা সে উপার্জন করেছিল। সংসারের জন্য এটা-ওটা খরচ করে এবং আজ সকালে ঘোরাঘুরি করার পর সে দেখল তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার মতন রয়ে গেছে।

খাবার দোকান থেকে বেরিয়ে ফুট-পাথের একটা জামা-কাপড়ের দোকান থেকে একটা ব্লাউজ কিনে ফেলল সে। চিন্তা করেই কাজটা করল।

আসলে অঞ্জুর জন্য আজ একটা শাড়িও সে কিনতে পারত। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোট-ভাঙানো এখনই প্রকাশ্য রাস্তায় ওপর খুলতে সে সাহস পেল না। দোকানের মানুষটির পকেট মারা হয়েছে অনেকক্ষণ, তা-ও সেই হাতুবাবুর বাজারে। তা হলেও একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে তখনও লেগে রইল। মনে হয় কেন, এই জামার দোকানের মালিকই হয়তো এমন কেউ দাঁড়িয়ে আছে, যে কিনা সেই মানুষের বাজারের ভিড়ে মানুষও ছিল এবং এক ভদ্রলোকের পকেট কেটে এক পকেটমার যে পঞ্চাশ টাকা তুলে নিয়েছে মানুষটা তার সাক্ষী হয়ে আছে। এবং ফটিককেও সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। এখন জামার দাম দিতে গিয়ে ফটিক পঞ্চাশ টাকার নোট-ভাঙানো ক্যাশ থেকে ঠেলে বের করার সঙ্গে সঙ্গে যদি লোকটা তাকে প্রশ্ন করে বসে, মশাই, টাকাটা আপনি পেলেন কোথায়—অবশ্য এমন বড় একটা হয় না—ফটিক তো খাসী আসামী না যে ঠিক তাকে নিয়ে সন্দেহ করার জন্য একটা রাস্তা তার পিছু পিছু কেউ ছুটে আসবে!

তা হলেও একটু সাবধান থাকা ভাল। কোনো সময়েই কারো পকেট মারার পর ফটিক ৪৪ করে তাড়াতাড়ি জায়গার টাকাটা বের করে তখন-তখন কিছু কেনাকাটা করতে চায় না। হয়তো কাপড়ের নোটের ওপর কেউ কোনোরকম দাগটাগ দিয়ে রেখেছে, একটা কিছু চিহ্ন রেখে দিতে পারে। পকেট থেকে সে টাকাটা বের করার সঙ্গে সঙ্গে যদি চিহ্নটা দেখে কেউ তাকে ধরে ফেলে। কাজেই পকেট মারার পর টাকাটা নিয়ে সে আগে বাড়ি যায়। তার পরদিন কি তারও পরদিন সেটা ঘাঁটা-মুছে খরচ করতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ এমন একটা সময় নিয়ে সে চুরির টাকা খরচ করে যাতে যদি নোটের গায়ে কোনোরকম চিহ্নও থেকে থাকে তো ধরা পড়ে গেলেও সে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে, হাত বদল হয়ে কারো চুরি যাওয়া নোট যদি তার হাতে এসে পৌঁছোয় তো ঐ চুরির জন্য সে দায়ী হতে যাবে কেন? চুরি করার পর ছোঁয় সেই টাকা কিছু ধরে নিয়ে বসে থাকে না। টাকাটা সে খরচ করবেই। কাজেই পাঁচটা মানুষের হাত বদল হয়ে হয়ে সেটা বাজারে ঘুরতে থাকে। টাকার এই ধর্ম।

কচি পাঁঠা। রঙের ব্লাউজটা অঞ্জলির পছন্দ হবে। কন্টুর জন্য এক প্যাকেট লজেন্স কিনে ফেলল। বাড়ির কাছাকাছি পরিচিত দোকান থেকে কন্টুর লজেন্সটা কিনল।

বস্তির ঠিক সামনে নিমগাছটার নিচে একটা ট্যাক্সি। যেন এইমাত্র কে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেছে। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ট্যাক্সি করে কে এলো?

ট্যাক্সি বড় একটা এখানে আসে না। মানুষ ভাড়া নিয়া আসে। বস্তির ভেতরে অসুখ হলে রিক্সা করে ডাক্তারের কাছে যায়, হাসপাতালে যায়। রিক্সা করে ফিরে আসে। আর আসে এম্বুলেন্স।

আজ হঠাৎ ট্যাক্সি চেপে কেউ এসেছে ভেবে ফটিক ঘাবড়ে গেল।

হতে পারে, পুজোর বোনাস পেয়েছে, গরম হয়ে কেউ ট্যাক্সি করেই হয়তো বাজার-সওদা করে ঘরে ফিরল।

হুঁ, একশো কিম্বা দেড়শো টাকা হাতে পেলেই বস্তির মানুষের মাথা গরম হয়ে যায়। বৌভাত কেন, বৌয়ের জন্য রেশমের শাড়ি কেনে, ছেলেমেয়েদের জন্য দামী দামী কে কত বেশি খরচ করল পুজোর আর কে কত বেশি খরচ করল পুজোর জামা-জুতো, শাড়ি-কাপড়ে। এমন কি পাশের ঘরের মানুষকে টেক্কা দেওয়ার জন্য রেডিও বা খাট-আলমারী কিনে ফেলে কেউ। তারপর চলুক না সারা বছর কষ্টা-মুখ ভাল আর পুইশাক। কত দেখল ফটিক।

তাছাড়া আজ যে বোনাস পেয়ে বড়-মানুষী করছে, কাল যদি কারখানার স্টাইক চলতে আরম্ভ করে? অফিসে তালা ঝুলতে থাকে? একটার পর একটা তাই তো হচ্ছে। তবু চালচের হুঁশ নেই।

থাক সে, পরের ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

ফটিক বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর তার পায়ের শব্দ ভারী হয়ে এল। একটা সুখের হাসির শব্দ হচ্ছে না ঘরে?

উঁহু, অঞ্জুর হাসি না, কন্টুর তো নয়-ই, তেল না মেখেছেলের গলা। কিন্তু এ বাড়ির কোনো ঘরের বৌ কি তেল তো এত শব্দ করে হাসে না।

ফটিকের মনে হল যেন কোনো একদিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের কাউকে এমন করে সে হাসতে শুনেছিল।

এই জন্যই সে এমন চমকে উঠল। তার হাঁটু মচকে গেল। রীতিমত ঘাম দেখা দিল শরীরে।

তার ঘরে আজ কে এল? এমন অনেক-অনেক থাকে, তবু সারাক্ষণ ঘোমড়ামুখ হয়ে থাকে, কন্টু আর তেমন ছটফট করে না। খেলাধুলো একেবারে কমে গেছে। বাপের কাজ না থাকলে, চাকরি চলে গেলে মন

ওদের ছেলে-মেয়েদের এই অবস্থা হয়। ওর বউয়ের বৌ এসে কাজে এটা সে বোঝে। এখন লোকের সঙ্গে মেশে সে সংসার চালাচ্ছে না কি ঠিকই বাঙালী বাবুরা করছে, না মানুষের গলা কেটে মুখে হাসি মাখিয়ে মাঝে মাঝে বল-বিল-পল্লাশ টাকা ধরে আনছে তারা তা জানে না। জানে না বলেই এই ঘরের বৌ-ছেলে এমন সুপ্রকাশ, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। সাঁঝা বাঁশ ফটিক টাকা-বাবে, বাজারে-দোকানে লোকের সঙ্গে মেশে মেয়ের তো এর পরিণাম যে কী হতে পারে বুদ্ধিমতী আছে, কি সে চিন্তা করছে না?

সেদিন এই পাড়ার এক সিঁদেল চোর ধরা পড়েছিল। আর একদিন ঐ বস্তু বাজারে মোড়ে হারাধনের বিরিঞ্চি দোকানের সামনে এক পকেটমার ধরা পড়ে।

কেমন ভয় পেয়েছিল ছেলে দুটো? ফটিকও কি ঘাবড়ে যায় নি? পাড়াসুদ্ধ লোক জানছে, সব পুরুষ ছুটে দিয়ে চোর ও পকেটমারকে কিল, ঘুষি লাথি মেরেছিল। মারতে মারতে বাড়ি মেরেছিল। মানুষের ছোটে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। নাক দিয়ে ফরফর করে রক্ত পড়ছিল। জামাটা ছেঁড়া ফেলেছিল। এ বাবদে বৌ-ছিনুর সঙ্গে ওরা কিছু কিছু কথা কৃষ্টি কিছু শুনেছে। তাদের পাড়া বৌ-ছেলেদের চোর সম্বন্ধে ধারণা ঠিক উল্টো করে দাঁড়িয়ে?

যেন সাংঘাতিক কিছু, ভয়ঙ্করকাণ্ড জন্য ওদের মনে মনে কষ্টও হয়েছিল। কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু মেয়েদের মনের জন্য পুরুষের মন হাত গুটিয়ে নেয় নি। তারা চোরটাকে আরও জোরে মারতে আরম্ভ করেছিল।

আহা রে! বুদ্ধি ঘরে বৌ-ছেলেদের আছে, অভাবে পড়ে চুরি করতে এসে ধরা পড়লে আর এমনভাবে মার খাচ্ছে।

যেন ভিতরে ঘরে অস্ফুট আর্তনাদ করছিল কেউ। ফটিক শুনেছিল। ভিতরে ঘরে ওর শুনে ফটিকের মেজাজ খুব ভাল লেগেছিল। ফটিকের তখন চাকরি ছিল। কারখানা লক-আউট হয় নি। সন্ধ্যার পর কাজ থেকে ফিরে সবিনয়ের সঙ্গে তাস খেলছিল। তার তখন টি-টি একটা শব্দ উঠল। চোর চোর! তাস ফেলে ফটিকের সঙ্গে অভিনয়ের সঙ্গে ধরা-পড়া চোরকে সে-ও মারতে গিয়েছিল।

পকেটমারটা ধরা পড়েছিল বিরিঞ্চির দোকানে। হারাধনের মেঠাইয়ের দোকানের সামনে। অনেক মানুষ পকেটে-ছিল কলকাতার মিষ্টি কিনতে। ফটিকের তখন মনে পড়েছিল মিষ্টি কিনতে গিয়েছিল। একটা আশ্চর্য ভদ্রলোক ছেলে, চোখে পাতলা পরা, এমনি ছেলে ছোট ছোট ঘরে ছাটা, বেশী ওরে না, বেশীদিন এ পাড়ায় দেখা যায় নি। অবশ্য এরপে এসে কেউ খোঁজ করে নি, কারণ, কেবল পাড়ার মানুষ না, অপরিচিত অজানা কত মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় হারাধনের দোকানে ঢুকে সিঙ্গাড়া সন্দেশ খেয়ে যায় বা কেনার বেঁধে নিয়ে যায়। ছেলেটা অন্ধকারে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কে যেন দেখে ফেলেছিল। বাস্, তৎক্ষণাৎ ছোঁড়ার জন্য টিলে পড়া হয়। তারপর মার। মারের চোটে ছেলেটা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল।

সেদিনও বাস্তির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে ওরা পড়া পকেটমারকে দেখতে গিয়েছিল।

হুঁ, মারের, তারপর পুলিশ, তারপর জেল। কাজেই ফটিকের অবশ্যও যে একদিন এই ঘরে, ওরা কি প্রতি মুহূর্তে ভয়ে কুঁকড়ে থাকছে না? এই যে রোজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর একদিন হয়তো আর ফিরবেই না। আর ফিরল না। তখন?

কয়েকটি আমার ঘর সব সময় নানা-রকম আতঙ্কে বিষাদ হতাশা নিয়ে ভুগছে। এই ঘরে আজ কথা-কওয়া নেই এমন সুন্দরী কথার কেউ হাসবে জানতেও কেমন লাগে।

যেন বরফ-জমা ঠান্ডা শীতের মতো ইহাদে কেউ বসন্তের বাতাস বইয়ে দিতে চাইছে। ব্যাপার কি!

ব্রাউজের পুটলি ও ফটুর সুজেন্স-এর প্যাকেটটা হাতে ছিল, যাতে ওদের দেখা যায় হাতে তুলে দিতে পারে। মোমড়া-মুখে একটু হাসি ফুটুক, ফটিক চাইছিল।

কিন্তু তার আগেই ঘরের ভেতর কেমন হাসির লহর ছুটেছে—

কেমন যেন বুঁড়ির ফটিতে লাগল সে। একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সামনে পড়ে গেল। সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না। আজকাল খুব টুক টান করে গঁটেট করে সে হাঁটে, যাতে তাকে দেখে, অন্তত আর ওপরটা দেখে অন্তরে মনে কিছুটা সাহস আসে। অর্থাৎ তুমি যেমন ঘরে বসে থেকে ওরে ঘরে বাজ, আমি এত ভয়ের কাঁর না। লোকের চোখে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলার মতন কমপ্লেক্স বুদ্ধি রাখি। এভাবে খুব ভিতরে ছোট্ট বৌকে সে তাই বোঝাতে চাইছিল। হুঁ, চোর পকেটমার ধরা পড়ে ঠিকই, মারধোরও খায়, তারপর পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়, তারপর কয়েক মাস, বছরখানেক জেলও খাটে শ্রীঘর বাস। কিন্তু ফটিকটাকে ধরা পড়বে না। এই যাদবপুর, দুটো মানুষের ভিড়ে ধুলো দিয়ে মানুষের অন্তরে এক মানুষ পকেট মেরে পকেট ভরা তুলে নিয়ে এসেছে, কেমন হয়? কাজে দুজনে মিলে বোমার ভয় দেখিয়ে দোকানে ঢুকে দোকান লুট করে। তারপর কেটে পড়ে। তারপর কেটে বসে খাব।

কথাগুলি মনে মনে সে এতক্ষণ আওড়াচ্ছিল, সেই দুষ্কর্মের নোংরা কেটে দোকানে বসে গরম চপ-কাটলেট খেতে খেতে।

সব ঘোলাটে হয়ে গেল। শূন্যের মধ্যে ঘুরের ঘোরে এই হাসি সে এখনি শুনেছিল না!

উমলী। আরও লম্বা হয়েছে, মোটা হয়েছে। একটু লম্বা হয়েছে কি?

ফটিকের মনে হল, লম্বা হয়েছে ঠিকই, মোটা হওয়ার দরুন বোকা মনে হয়।

বাসন্তী রঙের শাড়ি, গায়ের রঙের ব্লাউজ, পায়ে আলতার ছোপ, অথচ চটি।

'চিনতে পারছেন?'

'কেন পারব না, হুঁ, উমলী না?'

উমলী তাকে 'আপনি' বলছে, তাই তো বলবে! বৌয়ের মতন 'তুমি' বলতে ব্যবহার মতন সুখ না, কাঁটা না। তা ছাড়া চিরকালই বেশ বুদ্ধি রেখে চলে ও। চলত। ফটিক দেখেছে।

সেই তুলনায়, তার তুলনায় অবশ্যি বুদ্ধি প্রায় শূন্যের কোঠায়, সরল ঠিকই, অবশ্যি মনটাও ভাল, কিন্তু এই নিয়ে ফটিক অনেকদিন ভেবেছে, বুদ্ধি না থাকলে সরল মানুষকে বোকা মনে হয় না কি? না কি বোকা মানেই সরল? বোকা বলেই কি একটা মানুষ সরল থাকে? অন্ত লোকে কিন্তু বুদ্ধিরও প্রশংসা করে, আবার এদিকে সরলতার প্রশংসায় হড়োহুড়ি চারদিকে। কিন্তু একটা থাকলে যে আর একটা হয় না, যার বুদ্ধি আছে কিছুতেই তার পক্ষে সরল-সিধে থাকা সম্ভব নয় এবং সরল মানুষ কথায় কথায় বুদ্ধির পাঁচ ভরে চলতে জানে না, এই মোটা কথাটা কি মানুষে বোঝে না? যার চোখ আছে সে-ই তো এটা দেখছে। তবে আর এক সঙ্গে দুটো জিনিসের প্রশংসা কেন?

এই জন্য, ফটিকের মনে হয়, চলতি কথায় আমরা যাকে সরলতা বলি সেটা আসলে কিছু না। সোজাসুজি বোকা বললেই কাজ সেরে যায়। হুঁ, বুদ্ধিমান বুদ্ধিহীন বা বোকা। বোকার বুদ্ধি স্থায়িত্ব নেই?

যাই হোক, তার চোখে উমলী বুদ্ধিবতী মেয়ে, অন্তত বোকা মেয়ে।

এখানে একটা জিনিস থেকে এই পরিষ্কার বোঝা যায়। কেন ফটিক

সোফায় অঞ্জলিকে শুইয়েদিয়েই ওরা তিন লোকের পকেট ঝেড়ে তার রোজগার। শুনে কাঁদল ও, তারপর মুখ গোমড়া করে থাকল। অথচ এদিকে কাঁটকের রোজগারের পয়সায় ভাত খাচ্ছে। যেন আর কোনো উপায় নেই। রাগ করে খাওয়া বন্ধ করল না, বা ধারের কাছে চলে গেল না। অঞ্জলির থাকার অবস্থা বেশ ভাল। উল্টো-ডাঙায় কত বড় বাড়ি। পুতুলের বাসরা। আজ যদি ও সেখানে চলে যায় বাবা তাকে কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু অঞ্জলি যাচ্ছে না। পকেটমার স্বামীর সঙ্গেই আছে। তবে কি বলতে হয়, কাঁটককে অঞ্জলি ভালবাসে বলে তাকে ছেড়ে যেতে পারছে না? যদি তাই হয় তো এই মেয়েকে সরলা বলে কেউ আখ্যা দেবে? না বোকা বলবে? স্বামী এখন কখনো তার কাছে বলে মনে মনে যার দুঃখ-অভিমান-চোখের জল, মুখ ভার, এদিকে মুখ ফুটে তাকে কিছু বলতে পারছে না, তার ভাতই খাচ্ছে, তার সঙ্গে একত্রে বাস করছে—এই সরলতার, এই ভালবাসায় কিছু মাথামুণ্ডু আছে?

যদি আজ উষসী হত? মনে করা যাক উষসী কাঁটকের স্ত্রী। কাঁটক তাকে তার পেশার কথাটা জানিয়ে দিল। এই অবস্থায় উষসী কী করবে? হয় তাকে ঘেন্না করবে, ঘেন্না করে বাপের বাড়ি চলে যাবে। উষসীর বাবা বড় ডাক্তার। অনেক পয়সা মানুষটার। হুঁ, পকেটমার স্বামীর ভাতে থুঃ থুঃ দিয়ে বাপের কাছে চলে যাবে—নয়তো কাঁটকের কথা শুনে মুখ টিপে হাসবে। উঁহুঁ, কাঁদবে না, মুখ গোমড়া করে থাকবে না। কেন না উষসী তখন চিন্তা করবে, বেঁচে থাকার জন্য একটা মানুষকে লড়াই করতে হয়—সবাইকে এভাবে লড়াই—মুখ করতে হচ্ছে, আসলে কাঁটক যে কাজটা করছে এটা মোটেই ঘেন্নার নয়। দেশটাই এখন এমন হয়েছে, এখানে চুরি না করলে, লোকের মাথায় বাড়ি না মারলে কারো পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। চারদিকে তাই হচ্ছে। কাঁটক একজনের পকেট কেটে দশ-বিশ-তিরিশ-চল্লিশ টাকা তুলে আনছে, যারা সমাজের মাথায় আছে তারাও পরের মনে পোঁচারি করছে, হাজার হাজার মানুষের রক্ত চুষে বড়মানুষী করছে। অর্থাৎ উষসী এতটা তলিয়ে ভাবত এবং কাঁটককে তখন বরং তার কাজে উৎসাহই দিত। সাঁতারের সহধর্মিণীর পরিচয় দিত। বোকার মতন তাকে ভাল-ছেলে হবার জন্য ক্ষেপাত না।

'আমি ভাবলাম, কি জানি, যদি চিনতে না পারেন।' উষসী ঠোঁটে ঘোমটা দিয়ে হাসল।

'কতক্ষণ এসেছ?' কাঁটক জল খাবার চলে গেল। 'বোসো বোসো, দাঁড়িয়ে কেন?'

'ওরে বাস্, অনেকক্ষণ এসেছি, একটা সময় তো বসলামই, হয়ে অঞ্জলির সঙ্গে গল্প করেছি, চা খেয়েছি।'

কাঁটক তার ছিপ দেখল। ঘরের মুখোমুখি দু'খানা আসন পাতা। বোকা ছেলে একটায় বসেছিল, আর একটা আসনে তার মায়াতো বোন উষসী বসেছিল। জটের ওপর হলদে সবুজ সুতোর কাজ করা আসনটি নিজের হাতের ঠোঁয় আসন। দুটো আসনের মাঝখানে ছোট্ট আলগোটায় দুটো খুলো কাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটায় হাতল ভেঙে গেছে। ওটাই যে অঞ্জলি ব্যবহার করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, ভাল কাপটি নিশ্চয় উষসীকে দেওয়া হয়েছিল। দুটো কাপের কিনারে মাছি এসে বসেছে। একজোড়া-ভাঙার বাড়ির বিয়াত মাছি। এত আছের মধ্যে বসে সরলা কখন চা খেতে উষসীর নিন্দে বা বিশ্লেষণ করছিল। তবে কিনা উষসী যদি কাঁটকের স্ত্রী হত এই সরলা জানে, এমন কি হাতলভাঙা কাপে চা খেতেও তার ঘেন্না করত না, খারাপ লাগত না, বরং ফুলের পাপড়ির মতন ঠোঁট, না কি কমলালেবুর কোয়ার মতন টুসটুসে ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে আদর করে চুমো খাওয়ার মতন ঐ কাপের কিনারে ঠোঁকিয়ে আঁচরে আঁচরে চা খেত। যেন কাঁটককে চোর জেনেও এই বস্তির বাড়ি তখনকার সাঁতসেতে ঘরে থাকতেও তার একটুও খারাপ লাগত না।

আমি ভাবলাম, কি জানি, যদি চিনতে না পারেন।

খুব ঘোমটা না করে হাসিমুখে সোজা দিকে এখানে থাকত।

কিন্তু কাজের কলাপে সেই সুখ আর হল কোথায়? ঐ যে বলা হয়েছে, অভাবের চাপে, বোঝার ভারে প্রেম উবে যায়, এ-ও হল তাইরে প্রেম করার আগে, এসব কথা এখন কটিক অথবা কটিকে বলতে চায় না, তবু এই ঔদাসী, বিয়ের আগে, এত প্রেমের খেলা খেলা যার সঙ্গে, তাকেই বিয়ে করার সময় কিনা করল হিমসুকে! কেন? জল চার্জ করে ছাড়া। খুব বড় ঝামেলা আছে।

'আমাদের ভালোবাসা কিছু কুঁচিয়ে যাচ্ছে না, কটিক।' ঔদাসী তাকে বুঝিয়েছিল। বিয়েটা নিছক একটা সামাজিক ব্যাপার, কাজেই যে ব্রতে কোনো বাধা ছিল না, তবে কি না খাওয়া-পরার একটা প্রশ্ন আছে তো, তাই পাকাপোক্ত একটা মানুষকেই বেছে নিলাম। যা দিনকাল পড়েছে! তাই তো? কটিক যে একটা কারখানায় কাজ করে। হাতা হিসাবে ঢুকি। কটিক সেদিনই বুঝতে পেরেছিল, পুরুষ হয়েও ঐ মেয়ের মনের কথা সে বোঝে না। তারপর আর কি, অবশ্য ঔদাসীর পিসতুতো বোনকেই ডেকে নিয়ে হল। ওই বাড়িতে থাকত অঞ্জলি, তখন থেকে কটিকের সঙ্গে জানাশোনা হয় এবং একটু আকর্ষণও বোধ করে। তা ছাড়া ঔদাসীর চেয়ে তার রূপ অনেক বেশি মিষ্টি ছিল যে। আর একদিকে কটিক লাভবানই হয়েছিল।

তবে এটা সত্য, ভালোবাসা থাকুক বা নাই থাকুক, কটিকের বিয়ের সময় ঔদাসী কিন্তু এসেছিল। অঞ্জলি সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। তাদের দুজনকে, কটিক ও অঞ্জলিকে কেন ওরা ঔদাসী-ঐদাসীও কেন বিয়েছিল। কি বিয়েছিল আজ আর কটিকের মনে নেই।

তারপর ঔদাসী আর আসে নি। একদিনও না। যা হয়। কটিকও একটুখানি আশা করেছিল। এই জন্য কটিকের মনে কোন আক্ষেপ ছিল না। আর সত্যিকথা বলতে কি, বুঝিতে প্রায় সবটা ঘরজুড়ে ছিল, সন্দেহও নেই, অঞ্জলি ঔদাসীকে নিয়ে অঞ্জলি একদিনও কটিককে কিছু বিজ্ঞেস করত না, তাদের বিয়ের আগের ভালোবাসার কথা অঞ্জলি কি আর টের না পেয়েছিল? কিন্তু এ টের পাওয়া পর্যন্ত। যেন এই জন্যই, যাকে বলে কোনো খুঁতের বিয়ে না আগ বেরিয়ে গেছে, অঞ্জলি ভুল করেও কোনোদিন ঔদাসীর কথা তুলত না। কটিক তাই চেয়েছিল।

কিন্তু আজ হঠাৎ ঔদাসী এখানে? এই বাস্তির ঘরে? এই জন্যই অঞ্জলি বাইরে, ঘরে ঢোকার আগে, আজ কিনা, হু, আজ তো আগা চেনাই, একেবারে অচেনা বললেও ভোল হয় না—যেন সংসারের মধ্যে কবে পুরোনো হলায় গেছে। কাজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কটিক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পা দুটো তার হয়ে গিয়েছিল। হাতেও কর্ত হয়েছিল তার।

এখন অবশ্য রাতের অন্ধকারটা ফোটে গেছে। কেন না, সে দেখতে পাচ্ছে দুজন বেশ বোঝ করে বসে চা খাচ্ছিল, গল্প করছিল। ভোনোরকম জল ক্যাকাবি, ঘনঘনাবীটার আসার ঘটে নি।

হু, বুদ্ধিমতী ঔদাসী মিটিমিটি হেসে আলো ভালো চোখ মেলে কটিককে দেখছিল।

'তারপর, কেমন আছ তোমরা?'

কটিক পকেট থেকে প্যাকেট দুটো বের করে ভদ্রলোকের কাছে রাখল। লোকটার মুখে চোখ ছিল না। অঞ্জলিরও না, ঔদাসীরও না। তা ছাড়া কাজের মানুষ, মেয়ের কী আছে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, সন্দেহের বড় কাজ করে ঘরে ছিল না। সন্দেহ বাইরে বেরুচ্ছিল, তা না হলে এতক্ষণে মোড়ক দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

'কাজ, আসলেই?' কেমন আর-ম ভেতরে ঔদাসী প্রশ্নটা করল।

'বিশ্বাস পাচ্ছ?' কটিক কপট হাসল, তারপর আবার বলল, 'সেটাইটি।' মানের জামাটা খুলে ফেলল সে, কেন জামাটা হুকে ঝুলিয়ে রাখতে ঘরে ঘাড়িয়ে ভেতরে লাগল, তারপর বিবাহসূত্রে কটিকে কী প্রশ্ন করা যায়?

কিন্তু নতুন করে ভাবছিল সে।

ঘর ঢুকেই অঞ্জলির হাসিমুখ তোমরা দেখেছিল না? আবার মুখটা গোমড়া হয়ে যাচ্ছে কেন? এমন চোরা চোখে সে তাকে দেখছে কেন, কেন ঔদাসীর দিকেও এখন আর সোজা চোখে তাকাতে পারছে না। অথচ একটক তো দুজনে কেন ছেলেবেলার কথা বলছিল। এটা কি ঈর্ষার জন্য? যেহেতু কটিক ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির মনে পড়ে গেল, এই ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের আগে তার স্বামীর বিয়েটা হলে ছিল, হু, বিয়েটা, তার অতীতের কিছু অঞ্জলির জানার কথা নয়।

কিন্তু, কিন্তু—

চিন্তাটার সঙ্গে সঙ্গে কটিকের বুকের ভেতর দারুণ ভয় ঔদাস। ঐ যে বলে, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। তার মানে কি, আজ অনেকদিন পর ঔদাসীর না জানে তার এতদিনের ঔদাস বিয়ে কটিকের সংসারটা ভেঙে যাক। বিয়ের সময়ই বড় চাকরি করছে, আজ সুখে আছে, মেয়েদের সুখ বলতে যা বোঝায় তার কোনো অভাব নেই, তাই আজ বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ পিসতুতো বোনের বাড়ি গল্প করতে চলে এল। এবং গল্পের সুতোটা টানতে টানতে ঔদাসী যে কত বড় করেছিল কে বলবে? না কি তার বিয়ের অনেক বছর পরানার প্রেমের গল্প করতে করতে ঔদাসী একেবারে হুঁস হারিয়ে ফেলেছিল, খেয়াল ছিল না এই গল্প শোনার পর অঞ্জলির মনের অবস্থা কেমন হবে?

হঠাৎ আজ কী মনে করে?' সরাসরি ঔদাসীর চোখের দিকে তাকাল কটিক। যেন একটু, কঠিন করে তাকাতে তার ইচ্ছা করছিল।

'জানি, ঔদাসী সুন্দর করে হাসল। অনেকদিন ধরে আসব আসব ভাবছি, হয়ে উঠছিল না, আজ হুস্ করে এসে পড়লাম, আজ তো মোক্ষার মোঁজ করবে না বেরোবিনি, তাই আমাকেই দুজনেরতে আসতে হল।'

'না যে ঔদাসী, আমিও অনেকদিন ভেবেছি, তোর কাছে যাব, কিন্তু শনে-ছিলাম তোরা বাসা বদল করেছিস নতুন ঠিকানাটা জানতাম না। মনে করেছিলাম বাবার বাসায় গিয়ে ঠিকানাটা জেনে এসে একদিন তোকে দেখতে যাব, যাই-যাই করে আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না।'

কটিকের কথাটা কাটল। না, সেসব কিছু না, তা হলে এত সহজভাবে অঞ্জু ঔদাসীকে দেখতে আসার কথা বলতে না। একটি মেয়ে যতই বোকা হোক, তার স্বামীর সঙ্গে যেসব দুর্বলতা প্রেম করতে গিয়ে মজা হারিয়ে ফেলেছিল সোনার পর অন্তত সেই দুর্বলতার মূলে কথা বলতে তার ঘেন্না হত, তার চোখে-মুখের চেহারা, কথার সুর অন্যরকম হয়ে যেত, একটা স্বাভাবিক, এমন টানা কখনই থাকত না। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোত, অথবা সেই দুর্বলতা আবার তার স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কথা বলছে, এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেত বা দেওয়ালে কপাল ঠুকত। অথচ অঞ্জু এখন কত স্বাভাবিক, কত নিস্তব্ধ। যেন এই দুর্বলতা চুপ করে দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে চোরা চোখে তাকাতে ইচ্ছিল না বলে মাঁটিমত হাসতা যেন অঞ্জলির সে। তাই তো কটিক দেখল।

'যাবো, দুজনে আর একটু গল্প করু, মুখ-হাতটা ধুয়ে আসছি।' কটিক ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বাথরুমের দরজায় আয়না ঔদাসীর হাসতা গলার মিষ্টি হাসি তার অঞ্জু

অন্য কোন ধরণের চুলের তেল
আজকাল আর পাওয়া যায়
তার মধ্যে
বসন্ত মালতীর তুলনা নেই।

বসন্ত মালতী তেল মাখলে চুল অটিসাট থাকে।
কারণ এতে চুলের পক্ষে উপকারী সেরা
উপাদানগুলি অধিকতর অবস্থায় রাখা হয়েছে,
তাতে গুণ কোন ভাবে নষ্ট করা হয়নি।
জবাকুসুম হৈরবীর ৯২ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে
জি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী
তৈরী করেছেন বসন্ত মালতী তেল।
এদিকে দামেও সুবিধে

বসন্ত মালতী
কেশ তৈল
জি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস
৩৩ সিরাজুদ্দৌলা এভিনিউ
কলিকাতা-১৩

চুলের পক্ষে উপকারী উপাদানগুলি
বসন্ত মালতী তেলে
অধিকতর অবস্থায়
রাখা হয়েছে।

বসন্তমালতী তেল
দামেও সুবিধে।

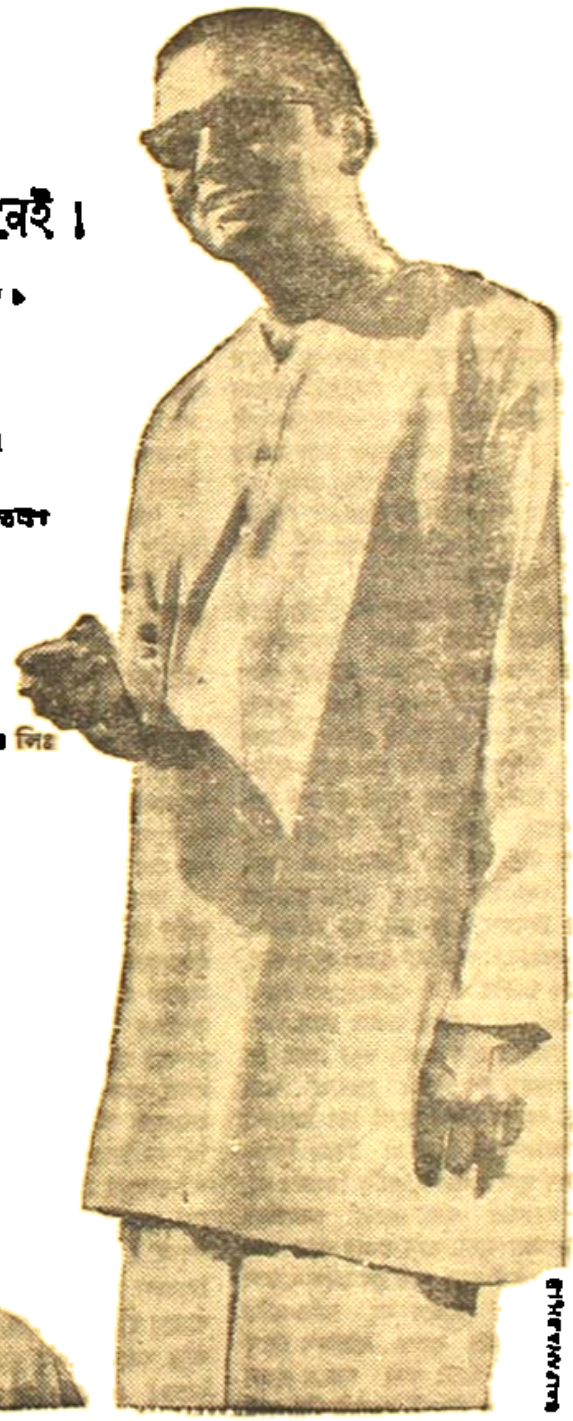

...ক্লান্ত। ...উৎসাহ নিয়ে ফাটিক ...

...এই বার ...এবার ফাটিক ঘুরতে ...। আকাশে হাত মেলে, সে ঘরে ...আলোর মধ্যে সারা সারা অন্ধকার সেই জিনিস ...পড়ে গেছে। ফাটিক একটা সিগারেট ধরায়। লোকের পকেট মেরে সংসার চালায়। আর তাই বোন উমরীর কত পরিচয় সুন্দর জীবন। বড় চাকরি করে স্বামী। কত রোজগার। তুলনায় নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে ফাটিক যত না দুঃখ পাচ্ছিল, লজ্জা পাচ্ছিল অনেক বেশি। কে জানে, হয়তো তাই, তাকেই এখানে নিক্ষেপ সব কিছু। যদি কোনো-রকমে উমরী টের পেয়ে যায় যে, ফাটিকের চাকরি নেই, সে কাজকর্ম করে না, কোনো প্রাইভেট জায়গায়ও কাজ করে না, সব মিথ্যা কথা, সারাদিন ট্রামে-বাসে ঘুরে লোকের পকেট মেরে বেড়ায়। তাহলে কেউ তাকার ঘরকে বলে আত্মধিক্কার। ভাই হয়ে মুখে হাতে জল দিতে দিতে ফাটিক নিজের মনে হাসল। বোকা মেয়ে এই ভয়েই মরে যাচ্ছে। যদি তার এই বোনটি, সবটুকু ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে, তার দাদা ফাটিকচন্দ্র—

উমরী, কলহাসা থেকে উমরীকে ছেড়ে তার বলতে ইচ্ছে করল, অন্ধকারকে, তোমার বোকা বোনটিকে বুঝিয়ে বলো যে, ফাটিক মোটেই খারাপ কিছু করছে না। বলে দাও যে, সবাই এভাবে বাঁচবার লড়াই করছে। ফাটিক তো চুনোপুঁটি। ছিনতে চোর, লোকের পকেট হাতড়ে দশ-বিশ পঞ্চাশ টাকা তুলে নিচ্ছে। সেই তুলনায় কত বড় বড় চোর-জোচ্চোর দেশে এখন বিরাজিত করছে। যেমন তোমার স্বামী। হিমাদ্রি, রায় কত বড় প্রফেসার, সম্পাদনা, বিদেশ থেকে ঘুরে হাওয়া খুব খায়, লোকের চোখে ধুলো দেয়, বড়সাহেবের সঙ্গে ইন্টারভিউ-এর সুযোগ করিয়ে দেবে এমন লোভ দেখিয়ে কত জনের থেকে যে আজ পর্যন্ত সে পয়সা খেয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। হয়তো তো হিমাদ্রি নিজে আলিপুরে জায়গা কিনে বিরাট মানসন তুলতে পারল, গাড়ি কিনল। হুঁ, বেচে থাকবার জন্য, একটু ভালভাবে বাঁচবার জন্য খুন, জল করার কাকে বলে সংগ্রাম। হুট করে আজ সে চোখ বুজলে তুমি পাতালে ডুববে না, গাড়ি-বাড়ি করেও সে মোটা অঙ্কের ব্যালান্স রেখে যাবে। আর একটা কথা অন্ধকে কানে কানে বলে যাও উমরী, কোম্পানীর বাল শেয়ারের দরকষা দিয়ে কলকাতাতে পাচার করে গত বছর হিমাদ্রি দু' লাখ টাকা উপার করেছে, ফাটিক সব খোঁজ রাখে, তাই গত পুজোয় তোমাকে সে হীরের দুল গড়িয়ে দিয়েছিল। দিতে পেরে সে খুশি, পেয়ে তুমি খুশি। দুটির পয়সা বলে তোমার তুমি একটুও লাজ সিটকাও নি। তুমি অন্ধকে বলো যে, ফাটিক যদি ছিনতে চোর হয়েও কিছু কিছু ধরে আনতে পারে তো তোমাকে ঠকতে উপায় থাকতে হবে না, তা না হলে ফাটিক পেয়ে দুজনেই একদিন—

আজ অবশ্য উমরীর কানে হীরের দুল ছিল না। গলায় দামী হারও নেই, বাস্তু-ভাঁস্তুতে বেড়াতে যাচ্ছে ভেবে হাতেও বেশি দামী জিনিসপত্তর করে নেয়ে এসেছে। কেন না, বাস্তুর মানুষের অভাব বেশি, ছুরা বেশি। কথাটা চিন্তা করে ফাটিক একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। কেবল হাতে যা ঐ কব্জায় সোনার চুড়ি, আর বাঁ হাতের অনামিকায় একটা ছুদ্দর পাথরের আংটি। বোধ করি ওর বিয়ের আংটি, আশীর্বাদের সময় শ্বশুর বা হিমাদ্রি নিজেই বুঝি ঐ আংটি দিয়েছিল।

"আপনি বসুন, এখন ছটফট করছেন কেন?" উমরী এদিকে চোখ ফেরাল।

"আমি এখনি আসছি, তুমি বলো, তোমরা দুজন গল্প করো।"

"সে কি, আবার কোথায় যাচ্ছেন কোথায়, এই তো ফিরলেন।"

ফাটিক কথা না বলে অল্প একটু হাসল। জামাটা গায়ে চড়াল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আসলে অন্ধকারের তাকানোটা তার সহ্য হচ্ছিল না। ঐ আতঙ্কে-ভরা ক্যাকাসে চাউনিটা দেখে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

কেন আজ উমরীকে দেখে অন্ধকারকে বেশি মনে পড়ছে, তার মতন হতভাগিনী ছিতুবনে নেই। এখন ছেলের জীবন, সংসার আর কারো হয় না। বলি এই জগতের তুমি কতটা দেখেছ শোনা! রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ফাটিক নিজের মনে বলল, অন্ধকার একটা নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে তোমাকে আমি ঘর থেকে বেরোতে দিই নি, না দিয়ে এখন মনে হয় খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ করি নি, যদি বেরোতে তো দেখতে মানুষ বড় বড় বয়ক্ষ গড়ে তুলছে, রেলের ওভারব্রিজ ভাঙছে, জোড়াসনে দোকানে চড়াও হয়ে কাল তুলে নিয়ে যাচ্ছে! হুঁ, দিনদুপুরে, কারো সঙ্গে মাল-কড়ি অঙ্গে সন্দেহ হলেই ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। সুবিধা না পেলে তাদের তার ছুরি করছে, ইলেকট্রিক বাল্ব খুলে নিয়ে যাচ্ছে, মানুষের চাকরি তুলে নিয়ে লোহালক্কড়ের দোকানে ওজন দরে বেচে দিচ্ছে। তাদের অন্ধও যে আজ বোন আছে। তোমার মতন কেউ মুখ দোকরা করে বসে থাকে না। বেতোল পেনা-পাওনার জেরে ভালো সিনেমা দেখতে যায়, বাচ্চা-কাচ্চার হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যায়। যেমন উমরী আজ সেকেন্ডশোতে বেড়াতে এসেছে। তারা জানে যে, তাদের দোনো-দেহ, তাহলের এ না করে উপায় নেই। কেন কি ফাটিকের মৌতাল কারখানা, রোজ একটা করে নতুন কারখানার তালা খুলছে, রোজ পাঁচশ' হাজার দু' হাজার করে মানুষ বেকার হচ্ছে। কাজেই চারদিকে হাহাকার, চারদিকে ক্ষুধা। আর বাঁচবার জন্য লড়াই। যারা এসব পারে না জানে সৎ হয়ে থাকতে চায়, ভালমানুষ হয়ে বাঁচতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত বাঁচে না। হাসানের মত রাস্তার ঘুষে ফেরি করতে নেমে টি-বি হয়ে মরে অথবা খগেনের মত সপরিবারে রাতে বিষ খেয়ে বিছানায় ঘুমের ঘুমের অবোধে শেষ হয়।

কাজেই তোমাকে দুজনের একজনকে বেছে নিতে হবে অন্ধ, হয় হিমাদ্রির মতন টাই-সুট-পরা ইংরাজী বুকনি ঝাড়া বাবুকে, নয়তো বাবলার মতন ওয়াগন ভাঙিয়ে কি আমার মতন ছিনতে আত্মনিয়ন্ত্রকে। সবটা হাত পকেটে ঢোকাতে যাওয়ার বিপদ আছে, আঙুল গলিয়ে সাঁড়াশীর মত পকেট থেকে মানি-ব্যাগ তুলতে হয় বলে কি ঐ নাম? হুঁ, এই সংসারে হিমাদ্রি বা ফাটিক বা বাবলা এই মারামারি আর কেনো মানুষ নেই। আমাদের পাশের ঘরে অবিনাশ? ললিত-বাবু? কৃষ্ণ নন্দী? টিফিনের বাক্স পকেটে পুরে পান চিবোতে চিবোতে অফিসে যায়। পুজোর বোনাস পেয়ে খুব করে ইলিশ মাছ খায়, ঘরের মানুষ-দের জন্য শাড়ি জামা জুতো কিনে আনে। আগামী পুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কে কোথায় আছে তখন খোঁজ নিও। ছেলে কি কারখানায়, অফিসপাড়ায় স্ট্রাইক চলছে না, ছাঁটাই হচ্ছে না, তালা ঝুলছে না? হুঁ, তখন কে কোথায় থাকে, কার ঘরে ইলিশ আসে, বোনাসের টাকায় শাড়ি জামা কেনা হয় চেয়ে দেখো।

অন্ধকে নিয়ে এত সব বাজে ভাবনা-চিন্তা সত্ত্বেও তার মনটা কিন্তু ভাল লাগছিল। আশ্চিনের সোনালি রোদ-ঝরা বিকেল। তার ওপর ষোল পঞ্চাশটা টাকা পাওয়া গেছে। এত কায়দাজির পর যদি ষোল টাকা হাতে উঠে আসত মনটা কেমন লাগত? হুঁ, এক মাসের পঞ্চাশটা টাকা, আশ্চিনের সোনা-ঝরা বিকেল, তার কিনা আবার কতকালের প্রেমিকা উমরী এসে চাঁপাতে।

এই জন্যই লোকে বলে পরিস্থিতি

কলিযুগের আত্মা। ছেলে-ধরে, কলকে ফুলে

...কেও কোথায় যেন চটচটে একটুখানি লেগে থাকে। আলকাতরার মতন। সবটা ঘষে তুলে ফেলার পরও কলঙ্কে একটা দাগ লেগে থাকে।

তা না হলে, তা ছাড়া আর কি বুঝি বলতে পার, একদিন পর নারকেলডাঙার বাসিন্দাকে উকিল দিতে ফেরুদা ডাকল কেন?

পিসতুতো বোনকে দেখতে? বলা তো, না হয় অজুকে দেখতেই এসেছে। কিন্তু এতদূর তো অজুনগি এখানে নেই। কন্টু অবশ্য। কন্টু ও অজুকে অবশ্য ক্লাবেরই মধ্যে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু আর একটা মানুষ আছে না? অজুর স্বামী, ভদ্রলোক কারা?

অজুকে কন্টুকে দেখতে আসার ছলা করে হিমাংশু-গিন্নী যে ফাঁকি চাটুজ্জেকে দেখতে আসে নি তা বুঝি হলপ করে বলতে পার না।

তা ছাড়া মেয়ের আকারের ভাঁজ, মুখের রং দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

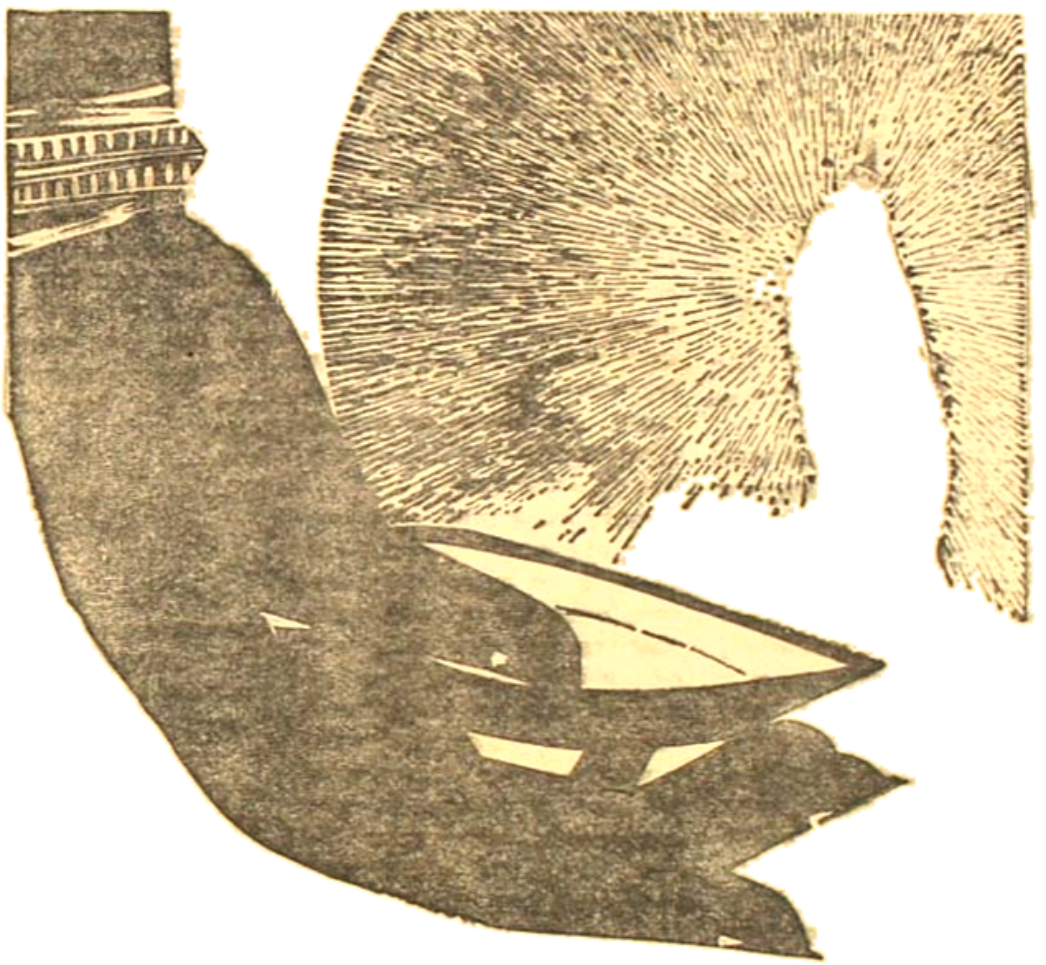

আলোকের উৎসবে

উৎসবের মাঙ্গলিক মন্ত্র—প্রকৃতিকে মুখর ক'রে তুলেছে, নতুন করে প্রকৃতি সেজেছে সোনালীরোদ্দুর মেখে।

দারুণ বছরের ব্যস্ততার পর এসেছে অবসরের বেলা। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার সময় এখন—যা সার্থক হবে কেবল সঞ্চয় দিনগুলির সঞ্চয়ের নির্দ্বিধেই—ইউবিআই রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস :

৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

হঠাৎ ফটিকের চোখে চোখ পড়তে কী ভেবে সে ওকে ডাকতে হুরু করল।

আহা, বেচারী, ওদের ভয় নেই।

বিশুর আগের ব্যবহার যে কিনা বিশেষ ছিল। মনে হতো সমস্ত পৃথিবীর মেয়েদের কিশোরী বয়সে আমাদের ভাল লাগে, তেমন করে দেখতে, ভাবতে ভাল লাগে। হু, সেই মনে হতেই যৌবন আসুক। তারা নিজেরাও এই ডাক শুনতে ভালবাসে। অনেকটা দূরে পরে থাকতে চাওয়ার মতন। বন্ধুত কিশোর-কিশোরী কটিকেই বা থাকতে না চায়? যতদিন থাকবার, ততদিন নয়। যৌবন এলেই তো প্রৌঢ়ত্বের প্রশ্ন আসবে, তারপর বার্ধক্য, জরা। কে আর তাড়াহুড়ো করে সাধ করে সে সব দিকে পা বাড়াতে যায়।

ওহ্, কী সুন্দর ছিল উষসী, আদরে ঝলমলে, কখনো গাঢ় নীল, কখনো টুকটুকে লাল ওকনো চলন সুন্দর একটি প্রজাপতি।

উষসীর সেদিনের সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দিত, আজকের গায় রূপ মন ভরিয়ে দেয়।

ফটিক এসব ভাবল, ভাবতে ভাবতে পকেট হাল্‌ইয়ের দোকান থেকে এক ঠোঙা খাবার কিনে ফেলল। আজ পকেট গরম। এই প্রথম বোকাহার বাবুটির পকেট থেকে মারা টাকার বাণ্ডিলটা খুলে একটা দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে ফেলল। প্রায় দু টাকার খাবার কিনে ফেলল সে। খুব তো খেয়েছে উষসী। কেবল চা খাইয়ে কাউকে বিদায় করা যায়। হিমাংশুকে বিয়ে করে বড়ই মেয়ে নিষ্ঠুরতার, হৃদয়হীনতার পরিচয় দিক, ফটিক তার ভদ্রতা রক্ষা করবে না কেন? তা ছাড়া নিজে থেকে যখন ফটিকের আস্তানায় উঁকি দিয়েছে। না এলে ফটিক কী করত! অনেক জায়গা আছে উষসীর বেড়াবার। কলকাতায় কত বড় বড় মানুষ, হু, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে,—এমন কি জরুরকাল বালানবাড়ি আছে এমন সব শাঁসালো লোকের সঙ্গেও হিমাংশুর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সেই সূত্রে তাদের পরিবারের সঙ্গে উষসীরও মেলামেশা, আনাগোনা। ফটিক তো অন্ধকূপ-ভবন ঘরে বসে থাকে না, প্রচুর ঘোরাঘুরি করে বাইরে। প্রচুর খবর তার কানে আসে।

যাই হোক, অনেকদিন পর পুরনো পরিচিতের মানুষে এসেছে, ভিখিরির হাতের মতন একটা প্রচণ্ড সুখের, যেমন যেন সুখের অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে, সে টের পাচ্ছিল।

মিষ্টি দেখে উষসী কিন্তু চটেমটে আগুন। অবশ্য রাগটা ফুটিয়ে, হেসে কেউ রাগ করতে পারে না।

'কী মুশকিল, কী যাচ্ছে তা-ই কাণ্ড —আবার আপনি ছুটে গেলেন মিষ্টির দোকানে—তা ছাড়া এত খাবার খাবে কে?'

মুখে গোমড়া করে অঞ্জলি প্লেট সাজিয়ে দিচ্ছিল।

'এত কিছু না, সামান্য দুটো সন্দেশ, সিঙ্গাড়া।'

'অঞ্জু, তুই এখানে আয়।' অঞ্জলিকে ভাল নিতে ডাকতে অঞ্জলি মাথা নেড়ে প্রায় পালিয়ে যাওয়ার মতন করে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে সরে গেল।

'ইস্, একা একা এত খাওয়া যায়!' মুখে বলল উষসী, আবার খেতেও লাগল। খেতে খেতে ফটিকের সঙ্গে কথা বলে চলল। অঞ্জলি এখন অন্তর্ধানে, ফটিক প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল উষসী 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' করে ডাকে এক-আধবার অন্তত ডাকবে। সে সব কিছু হল না। যেন নিতান্তই ভদ্রতার আলাপ, ওপর ওপর জিজ্ঞাসাবাদ, যেমন আপনারা এখানে কবর ভাড়াটে আছেন, তাঁরা কে কি করেন। আপনারা বাজার করেন কোথায়, এই বস্তিতে কল-কারখানার সুবিধা আছে কেমন, ঘর পিছে কত ভাড়া দিতে হয়...ইত্যাদি ইত্যাদি...

ফটিক ভেতরে ভেতরে দারুণ হতাশ হচ্ছিল, দুঃখ পাচ্ছিল, কিন্তু চেহারায় সে সব ফুটতে দিল না, যেন উষসীর এত-কালের চেনা লোক না সে, কেবল অঞ্জলির পরিচয়ে তার সঙ্গে পরিচয়, যেহেতু অঞ্জলি এর বোন, উষসী ভদ্রিনস্তী হিসাবে তার সঙ্গে কথা বলছে এবং ফটিকও একটা সাজান হাসি মুখে চড়িয়ে হুঁ হাঁ করছে। অনেকদিন পরে এসেছে। সন্ধেও কাটছে মা। এখন সে পরদেশী। তা ছাড়া পাশেই রান্নাঘরে অঞ্জলি হয়তো কান পেতে আছে। বোন করি এই জন্যই চমৎকার একটা সুযোগ ফেলে অঞ্জলি তার সঙ্গে কথা বলছে, হয়তো আবার আসা-যাওয়া আরম্ভ হলেই এটা চলে যাবে ভিন্তা করে ফটিক নিজেকে সান্ত্বনা দিল।

উষসীর খাওয়া শেষ হতে অঞ্জলি আবার ঘরে ঢুকল।

'তোর সঙ্গে আর কথা বলব না, তুই ভয়ানক দুষ্টুমি করলি আমার সঙ্গে।' মুখে হাসি নিয়ে উষসীর আবার সেই ন্যাকা চেহারা।

ফটিক বুঝতে পারছিল, যদি সে এখানে উপস্থিত না থাকত অঞ্জলি ফিক করে হেসে ফেলত, কিন্তু তার জন্য হাসতে পারছে না। মুখটা কালো করে পায়ের নখ দিয়ে মেঝের মাটি খুঁটছে।

'কালই তোর সঙ্গে আড়ি, এখন পালাই।' জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে উষসী ঘুমন্ত ঘিরে মুখ মুছে ফেলল। হাসি ফটিকবাবু।'

'সে কি, এখুনি কি, বোসো।'

'না, না, সন্ধে হয়ে আসছে।'

'তবুই যা।' ফটিক জানালার দিকে চোখ টেরা করে দেখল বাইরে রোদটোখ মুছে গেছে। ঘোর ঘোর অন্ধকার নামছে। উষসীর চোখে চোখ রেখে সে হাসল। 'পরশুদিন নম্বর বাস ধরবে তো, আমি তোমাকে বাসে তুলে দেব। এখন থেকে বাসস্ট্যান্ড দূরে না।'

'আহা, সে কথা বলছে কে? কোথায় বসে উঠতে হয় আমি অবশ্যি জায়গাটা দেখি নি—তা হলেও—' উষসী হঠাৎ থেমে গেল। হাসল।

ফটিক নিজের ভুল বুঝতে পারল। টাক্সি করে এসেছিল না হিমাংশুর বৌ? যেন নিজেকে সংশোধন করতে তাড়াতাড়ি বলল, 'আর যদি টাক্সি ডাকতে চাও আমি ডেকে দেব। ওদিকে একটু এগিয়ে গেলে টাক্সি পাওয়া যায়।'

ইতিমধ্যে অঞ্জলি খালো প্লেট ও কাচের গেলাসটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেছে।

ঘরের ভেতর দ্রুত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আর একটা সুন্দর সুযোগ। যদি এই মুহূর্তে উষসী একবার 'তুমি' বলে ওঠে।

'উষী, সত্যি করে বলো তো তুমি আজ হঠাৎ এখানে কেন এসেছিলে, কাকে দেখতে এসেছিলে?' উষসীর একটা হাত কোলে টেনে নিয়ে ফটিকের আদর করতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু তার ভাবনা শেষ হবার আগেই হ্যারিকেন হাতে কুপিয়ে অঞ্জলি ঢুকল। মেয়েটার মুখটা আরও ঘরা শুকনো ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে না! আশ্চর্য, একটু আগে কাপসা অন্ধকারে হয়তো বোকা যায় নি, এখন ফটিক বাতির আলোয় পরিষ্কার দেখল অঞ্জলির চোখের পাতা যেন একটু ফোলা ফোলা। তবে কি তখন রান্নাঘরে বসে বোকা মেয়ে কাঁদছিল? হাই তোলার ভঙ্গিতে ফটিক তার মুখের বিকৃতিটা ঢাকতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত বড় একটা হাই তুলল। অঞ্জুকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলল, তোমার উচিত ছিল কলেজের বৌ হওয়া, তোমার উচিত ছিল হাজারের স্ত্রী হওয়া, মুকুল অঞ্জুমণি, ঘরা বাঁচবে না, ভালমানুষ হয়ে থাকতে গিয়ে সাধু হতে গিয়ে মারা মরছে, মরে গেছে। তোমাকে নিয়ে, কন্টুকে নিয়ে আমিও ঘর বেঁধেছি, কিন্তু মরব না। লড়াই করব মনে মনে ঠিক করে সেইজন্য আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দু-পাঁচটা পকেট হাতড়ে কিছু

কিছু রোজগার আরম্ভ করেছি, তোমার এমন দুঃসময় মনেতার জামাকাটি দুরু হল—এখন দেখছি তোমার জন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে পালয়া কাঁধে নিয়ে আমাকেও ছাপ্পার ঘুরতে হবে।'

'যাঃ, আপনারা দু'জনেই চুপচাপ কি যে করছ, দুই একটাও কথা বলছিস না যে?' ভোল থেকে ছোট ব্যাগটা হাতে তুলে নিল উষসী। ফটিকের মতন মুখের বিকৃতি ঢাকতে না, যেন সুন্দর ধুতিনটা একটু ছড়িয়ে দিয়ে আরও মনোহর করে তুলে উষসীও ছোট একটা হাই তুলল। চোখের লম্বা পালক দুটো স্থির করে ঘরে এক পলক হ্যারিকেনের লণ্ঠনটা দেখল, তারপর ফটিকের দিকে ঘাড় ফেরাল, 'আর বসব না ফটিকবন্ধু। অনেকটা রাস্তা। ফিরতে রাত হয়ে যাবে।' উষসী উঠে দাঁড়াল।

'হলই বা, পাড়াগাঁ না যে তোমার ভয় করবে।' বলতে বলতে ফটিকও উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ ঘুরে একটা বেতের মোড়ায় বসে ছিল সে। উষসীকে অবশ্য সে আর বসতে বলল না। বরং যেন সেও তাকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে যাচ্ছে, গায়ের জামাটার জন্য দেওয়ালের হুকের দিকে হাত বাড়াল।

'পাড়াগাঁ না ঠিকই', উষসী আর হাসছিল না, বরং একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'কলকাতার রাস্তাঘাটেও এখন বাঘা কাণ্ড হচ্ছে, বরং পাড়াগাঁয়ের চেয়ে এই শহরটাই এখন বেশি ভয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ফটিক চোখ আড় করে আর একটি মানুষকে দেখল। ঘাড় গুঁজে পায়ের নখ দিয়ে মেঝে খুঁড়ছে।

'অন্তু, চল', অঞ্জলির কাঁধে হাত রাখল উষসী। 'তুই একদিন আয় আমার এখানে, বাড়ির ঠিকানা তো এখন জানলি।'

অঞ্জলি ঘাড় কাত করল কি না ফটিক দেখতে পেল না, উষসী তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। তবে এটা সে বুঝল উষসী তার বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম অঞ্জলিকে বলে দিয়েছে। ফটিক মনে মনে খুশি হল। অঞ্জলি তো আর একলা বেরোবে না। যেতে হলে ফটিককেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই অঞ্জলিকে ঠিকানা বলার অর্থই হল ফটিকও কয়েক দিন বাদে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ফটিককেই যেতে বলা।

'চলি', উষসী রাস্তার দিকে পা বাড়ানোর আগে ফটিকের দিকে চোখ ফেরাল। ফটিক জামা চড়িয়ে তৈরি হয়ে আছে।

'এসো, এই রাস্তাটুকু তোমায় এগিয়ে দিই।'

'উঁহু, তুমি সঙ্গে যাবে না, এই প্রথম অঞ্জলি মুখ তুলে উঠল, তার চোখ দুটো ঝলমল করছিল।

উষসী অবাক হল। অন্তরা মনে হল যেন একটুও অবাক হয় নি সে। একলা ফটিক রাস্তায় তাকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছে অঞ্জলি যে তাতে আপত্তি করবে মনে মনে যেন তার জানা ছিল।

তাই বুঝি অঞ্জলির দিক থেকে চোখ সরিয়ে উষসী মিটিমিটি হেসে ফটিকের দিকে তাকাল।

'আমিও বলছি, আপনার কষ্ট করে এখন বেরোবার দরকার নেই, এমনি তো কথায় কথায় ছুটোছুটি করছেন, রাস্তাটা আমি চিনব।'

'কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা যে অন্ধকার, আজ আলো জ্বলে নি।' ফটিক আস্তে বলল।

'লাইন খারাপ বুঝি?'

'লাইন ঠিকই আছে', ফটিক কথা বলার আগে আর একজন উত্তর দিল, তখনও অঞ্জলির দুচোখ ঝলমল করছিল। 'কাল রাত্তিরে এদিকের সব তার চুরি হয়ে গেছে।'

'এখানেও সেই উপদ্রব?' উষসী চোখ কপালে তুলল। 'আমাদের ওদিকেও ভীষণ হামলা তার চুরি যাচ্ছে।'

'চারদিকেই খুব চুরি-টুরি হচ্ছে, অঞ্জলির সুন্দর চেহারাটা কি রকম বিকৃত হয়ে উঠল, নাকের ডগা কুঁচকে কেমন সে। 'তার-ফার্চিরের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।'

কটমট করে একবার ঘরের মানুষটা দিকে তাকাল ফটিক, তখনই অবশ্য উষসীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে হাসল। 'বেড়ে পাচ্ছে না মানুষ, চুরি-ডাকাতি ওরা ছাড়া উপায় কি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই আরো বাড়বে, বেশের যা অবস্থা।'

উষসী শুনল, কিছু বলল না।

'সীতা, তোমাকে অনেকটা দূরে যেতে হবে, ফটিক উষসীকে ডাকল, 'এসো, অন্তত এই অন্ধকার জায়গাটা তোমাকে পার করে দিই, তারপর দেখা যাবে, বড় রাস্তায় মোড়ে যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়।' উষসী পা বাড়াবার আগে ফটিক দরজার দিকে পা বাড়াল। যেন হিমালয়ের চোখে অন্ধকার রাস্তায় এগিয়ে দেবার গুরুত্বটা তার কাছেই বেড়ে যাচ্ছিল।

'খবরদার, তুমি সঙ্গে যাবে না!' অঞ্জলি এত জোরে চিৎকার করে উঠল, উষসী স্তম্ভিত। হাতের বইটা কাঁপছে, যেন চোখ দুটো থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে অঞ্জলির, নাকের বাঁশী ফুলে উঠছে। ক্রোধ, আতঙ্ক, আক্রোশ, ঘৃণা কত কি ঐ ছোট্ট মুখখানার মধ্যে দেখতে পেল উষসী। ফটিকও ভয় পেয়ে গেছে দেখছিল।

এমন অবস্থা যেন অঞ্জলি উষসী ভাবল, ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তারও মতন

এই বহুবিখ্যাত গ্রন্থের বহুকাল পরে বহু প্রত্যাশিত

পুনর্মুদ্রণ

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দীর

ওমর খৈয়াম

গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "যাঁহারা 'ওমর' বলিতে শুধু বুলবুল ও সোলাপ, মদিরা ও সাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, লোকটা কবি ও তোলী মাত্র ছিলেন না, কঠোর গণিতবিদ্ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য অনেক লেখকের নিকট কৃতী।"

"জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে আরবীয় আলীয় গ্রন্থের ধারণা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর 'ওমর খৈয়াম' এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরের কাব্যের ভাষিতা ও দর্শনের শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরব সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব-পশ্চিমের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বড় জ্ঞানের ইতিহাস-বিভাগের সন্ধান বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি বঙ্গভাষায় নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।"

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা—১২

জিনিসটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বলো, এতক্ষণ হেডমেডম আমার সঙ্গে ও কথা বলল, তারপর হঠাৎ করে আমার মাথা খারাপ করে দিল, এখন হঠাৎ আমাকে অন্ধকার রাস্তায় একিয়ে দিতে যাচ্ছে দেখে মেয়ে হাঁটাবার ছেলে গেছে। তাই বলো, হাইচাপা আবহাওয়া হয়ে ছিল অরুণির চেতনাকে। বিয়ের আগে ফটিকের সঙ্গে আমার ভাব ছিল অরুণি জানত, কিন্তু তাতো জানত, কতটা দেখেছে ও! কিন্তু ঐ যে ফুল মেয়েদের মন, একটু-খানিতেই নড়েচড়ে ওঠে। সুযোগ পেলে সাপ হয়ে ওঠে। নতুন করে অরুণির মুখে সন্দেহটা তুলে উঠেছে।

মেয়ে মেয়েকে অনুকম্পা করতে ইচ্ছে হল উমাশীর। ছেলে সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, ফটিকবাবুকে আমি কিছু আমার বাড়ি চেনে নিয়ে যাচ্ছি না। আলো নিয়ে, নিয়ে একটু ছেড়ে তুমি দেখতে পাচ্ছিস, তোমার এই সামনের রাস্তাটা রিক্সাওয়ালা অন্ধকার হয়ে আছে। তাছাড়াও আমাকে খুব বড় রাস্তায় তুলে দেবে, তুই এমন করছিস কেন।'

না না, এই অন্ধকারে ও তোমার সঙ্গে যেতে পারবে না। রাস্তা তেমন কিছু খারাপ না। একটু এগিয়ে গেলেই হাতেই দোকানের সামনে রিক্সা পেয়ে যাবে।'

কিন্তু ফটিক কি তাই ভাবছিল, অরুণির চোখে কি সে ঠিক এই জিনিস দেখতে পেয়েছে। সে ভাবছিল অন্য কিছু। আরও ভয়ংকর কিছু। জল-জলে চোখ নিয়ে, আতঙ্কের দৃষ্টি নিয়ে অরুণি একবার তার দিকে আর একবার উমাশীর হাতের কঙ্কনে সোনার চুড়ি ও অন্ধকারের আততায়ীর দিকে তাকাচ্ছে। এই জন্যই ও ভয় পেয়েছে বোধি।

যা ভেবে পাগলী ফটিক চিন্তা করল, চোখে এসে ভাকতে হয়ত ভালবাসে। মেয়েদের সঙ্গেই চারটে কম-বিশি-চরিত্রের পুরুষের বেশি ফুল আলাপ পারছে না। আর সবগুলো পারে না, একজন আটজনা চাঁড় দু' ফটিক বেশি দেখা। এমন যারা পারছে তাদেরই আবার, সবসময় কথা বলতে সে অভ্যস্ত নয়, তুমি কি জান না দু' হাজারের মতন আবহাওয়া কম হয়ে গেছে? যা দিনকাল মতন মানুষ বেঁচে থাকে কম আছে? ফটিক তাদের একজন? চোখের চেয়ে সোনার দাম তার কাছে কখনও হয়নি। তা ছাড়া এমন চমৎকার অন্ধকার, এমন সন্ধের সুযোগ। তবে কে ভেবেছিল ছিল সে তাকে ভোগ।

'এসো।' ঘরের বৌয়ের মতো আপনি কোনো সন্দেহ কোনো ভয় সে জাহির করল না। উমাশীর হাত ধরে অন্ধকার রাস্তায় নেমে পড়ল।

আস্তে আস্তে কেশে উঠল।

'আমাকে ছোট বোনের বৌয়ের মতো।' উমাশী খিলখিলিয়ে বলল।

বোকা, বোকা, ফটিক ভোটা খাবার হাসল। যদি একটোটা বুদ্ধি থাকত ওর, কোনদিন এই বস্তি ছেড়ে আমি চলে যেতে পারতাম, গাড়ি চড়তে পারতাম।'

কেমন যেন হেডমিস্ট্রেস ধরনের মানুষ ফটিকের মনে হচ্ছিল। তাই আর কিছু না বলে অন্ধকারে উমাশী তার পাশে পাশে হেঁটে চলল।

অনেক চেষ্টা করে জল নেমে ছিল অরুণির। ছেলের অন্ধকারে মুখোমুখি হবার সাহসে আগুন করে লাফাচ্ছিল, যেন এখনি নিয়ে যাবে। কষ্ট মেয়ে নিয়ে এসে যাবার জন্য-তাগিদা, ঠিক তখন, পাশের ঘরে সাইকেলের ঘন্টিতে বাজনা থামে বলা অসম্ভব হচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুরে ফের চলে জন্য-জন্য যেমন অপেক্ষা একটা ঘুটো শব্দ যেন শোনা গেল। দরজায় পিঠ লাগিয়ে অরুণির শুনছিল, চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গেল লাফাল, বস্তির ছেলে বুড়ো বৌ-ঝি সকলের কানে ভালো আসল। প্রচণ্ড জল করে পর পর ঘুটো বোমা ফাটল। তারপর সব চুপ। এক মিনিট, যেন আরও কম সময় এই নীরবতাটুকু ছিল, তারপর অনেকে গোলমাল শোনা গেল, যেন অনেক মানুষ দৌড়াদৌড় করে কোথাও ছুটছে, বস্তির আর দশটা মানুষের সঙ্গে অরুণিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, ঘর খোলা পড়ে রইল, সকলের সঙ্গে সে-ও ছুটতে লাগল।

ছাদুই দোকান পিছনে রেখে বড় রাস্তার আধাআধি সেই যে চায়ের দোকান, ফোনওলী ফেরিকল, তার সামনে এত মানুষ পাঁচিয়ে পড়েছে। ফোন আর সমস্তদের ভিড়ে পুরো কিছু ফোন দেখা সব। অরুণির হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছিল। পাঁচটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে-ও ভিড়ের ভেতর একটুখানি জায়গা করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে চিৎকার করে উঠল, কপালটা ঘুঁটিয়ে ফেলার ভয়ে তার বাঁচল না। মাটিতে বসে পড়ল, আর সেই সঙ্গে এলোমেলো অনেক কথা তার কানে এল। ...অমানুষ ফটিক, বাস সন্ধের বস্তির ফটিক চাটুজ্যে, আর যে ফটিক তো পাঁচ মিনিট আগে তোমে সোনার মাইলাটিকের ভিতর ফটিক সোনালী বেরিয়ে ছড়ছে। কতজন ছিল? দু, আরেকটা, পর্দা ফেলা বলেছিল ওরা ফোন দুজন চা ফোন ফালতোলা করল আমি তো আসল আসলাদিয়ার ভাষাই? পর্দার ভেতর থেকে বৌয়ের এসে ফটিকই ঘিলা ঘিটিয়ে ছিল। অরুণির অন্তর্বাসগুলো নিয়ে মোকদ্দমা থেকে চলে গেল। কিন্তু খুব বেশি দূরে যেতে কি, ঐ—ঐ যে ঘাড়িগাছটা তখানে.... কজন ছিল?.....মনে হল দু'জনের, মোকদ্দমা থেকে ঠিক বুঝলাম না, ওদিকটা ঘরের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। তবে দু' দুজোন পরা ছিল লোক দুটোর, দু' দুজন ছিল, সঙ্গে মেয়ে ছিল, আমার মনাই তখন পলা শুকিয়ে গেছে। রাস্তায় একটা মানুষ নেই, দোকানের ঝাঁপটা বন্ধ করে কেউ সেই সাহস ছিল না...কাঠের পুতুল হয়ে বসে রইলেন বুঝি?...করবেটা কি, না হলে আমি চেঁচাতে পারতাম, চোখের সামনে দেখলাম একজন ছেলে ছুলে ফটিকের সামনে দাঁড়িয়ে গেল, আর একজন পাঁচা করে আমার হাতের চুরিগুলো খুলে নিল...তারপর? ঐ তো, তখনই তো ভুল করল ফটিক, তোর জন্য চেঁচাতে চেঁচাতে ছোটদের দেখলে ছুটল...দু, দু'. একেই বলে নিয়তি। ফটিকের বোকা উচিত ছিল, মানুষের সঙ্গে ছোরা কেমন খারাপ পটকা বোমাও থাকতে পারে...তাই তো ছিল, শব্দ শুনি নি? দুবার আওয়াজ হয়েছিল, দুটো বোমা ফুটেছিল...কজন কিনা আওয়াজ, বলল—আমি মনাই তখন পাহারাদার দাঁড়িয়েছিলাম, আওয়াজ শুনে পাহারাদার মাথার ওপর ফেল...তবে কিনা ফটিকের সাহস আছে, সাহস আছে। সাহস দেখিয়ে গেছে। একলা দু' দুটো গুণ্ডাকে ধাওয়া করল ...এই সাহসের কোনো অর্থ হয় না মানে। তাই তোমার মতন মরল। ছেলেদুটো আমাদের সঙ্গে লড়াই করে ছুঁড়িগুলো ছিনিয়ে আনবে...আহা—হা-হা, কার হাত কেমন করে যে দেখাবে, কাঁধের অর্ধেকটা উড়ে গেছে...বাঁচা পড়ছে? মনে হয় না, আর আমার কে ফটিকের?...দুই একটা বাচ্চা... ফটিকটাই বে হয়?...হবে কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় বা বা.....মনাই আজকালকার ছেলেরা, কলেজে যা বিদ্যে, শিয়ালদহের মানুষ-টানুষ একটি দুটি থাকে...আর ধারে, ছয়ে গেছে মানুষটা, এবার তার এমন হলে কি হবে...তবে কিনা ফটিক সাহস দেখিয়ে গেল, এটাই আমাদের গর্ব, খালি হাতে একাকারে গুণ্ডাদের সেদিন ছুটে আসা...

যেন অরুণির ঘুম ভেঙেছিল, আরও অনেক কথা তার শোনার বাকি ছিল, কিন্তু তার আগেই চোখের সামনে সব কিছু আবার অন্ধকার হয়ে গেল। কানের ভেতর ঝিঁঝির ডাকটা অনেক কিছু ডাকছিল। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে না সে। এক সময় তার মনে হল আসল ভেতর চলছে। রাস্তায় লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি ডাকছে—ডাকছে।

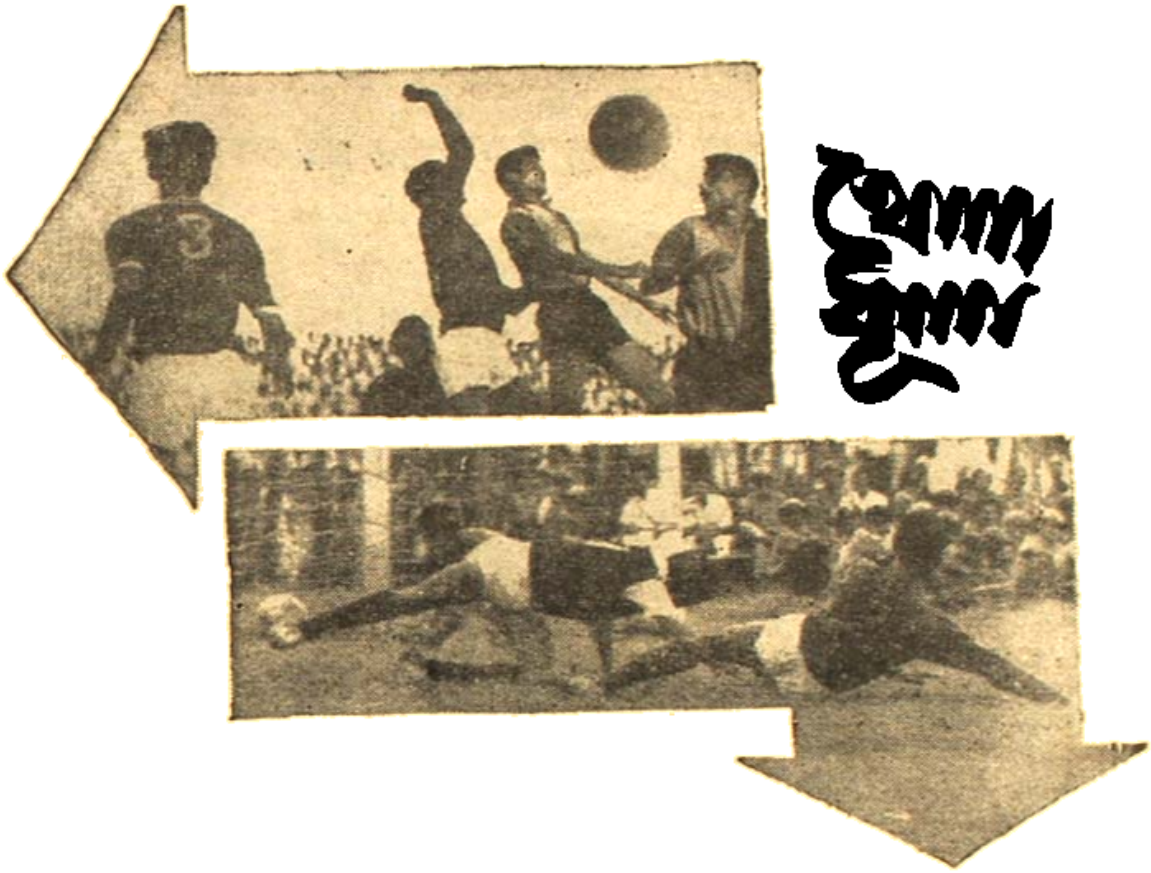

খেলার খবর

সোবার্সকে ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরে ক্রিকেটজগতে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেছে। প্রশ্ন সেই একই—সাদা কালোর ঠাণ্ডা লড়াই। আত্মমর্যাদার সঙ্গে গায়ের রং-এর কথা ভুলে গিয়ে সাদাদের পদলেহন করার প্রবৃত্তি আমাদের নেই বলেই সমস্ত জগৎ জুড়ে বার বার উঠছে প্রতিবাদের ঝড়। বর্ণবৈষম্যের ঘিরে বিশ্বের পরিস্থিতিকে সোবার্স হঠাৎই বড় অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোরালো করে তুলেছেন রোডেশিয়ায় খেলে এসে। সাদাদের দেশ রোডেশিয়া। কালোদের সঙ্গে খেলতে তারা ঘৃণা বোধ করে। অথচ কালোর দেশের লোক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক

সোবার্স

সোবার্স নিজের গায়ের রং-এর কথা ভুলে সেই রোডেশিয়ায় গিয়ে খেলে এলেন। কিন্তু সে জন্যে তাঁর মনে নেই এতোটুকুও কুণ্ঠার ভাব। আসলে সোবার্স এতোটুকুও লজ্জিত নন্। তাই তুল স্বীকার করতে কিংবা মার্জনা চাইতে তাঁর এতো দ্বিধা। শুধু তাই নয়—এ কথা বলতেও সোবার্স ইতস্তত করেন নি যে, তিনি রোডেশিয়ায় খেলতে গিয়েছিলেন ইংলণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেটের অধিনায়ক হিসেবে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড় হিসেবে নয়। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয়, গায়ের রং-এর সঙ্গে সোবার্স এখনও ভুলে যেতে পারেন যে, সারা বিশ্বে তাঁর পরিচিতি ইংলণ্ডের একটি কাউণ্টি ক্লাবের দলপতি হিসেবে নয়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মানুষ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক হিসেবেই। জানি নে, সোবার্সকে নিয়ে ঘোলমাল কতোদূরে গড়াবে। এ কথা শোনা যাচ্ছে যে, সোবার্স হয়তো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করবেন। তাতে কিন্তু সোবার্সের গায়ের রং সাদা হবে না, কালোই থাকবে। সে কথা থাক, আমাদের ভয় অন্য কারণে। আমরা ভয় পাচ্ছি, পাছে এই ডামাডোলের মধ্যে ভারতীয় দলের আসন্ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর বাতিল হয়ে যায়।

—শান্তিপ্রিয়

জোর করে হারানো হলো বাংলাকে ঃ

এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

ঃ নবীন ঃ
ভক্ত সেনাপতির সুযোগে গোলটি তিনি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ঃ হাবিব ঃ
হাবিবের দেওয়া গোলটা কেন যে রেফারী নাকচ করলেন কে জানে।

ঃ ধনরাজ ঃ
স্পেশালিষ্ট থেকে চারটি গোল খেলেও সেনাপতির সুযোগ থেকে গোল করে বিরোধিতার ভার একটি।

ঃ সুবীর কর্মকার ঃ
ভক্তর সুবীরের দেওয়া ভক্ত সহজেই বিরোধিতা করতে।

ঃ পল্লব মিত্র ঃ
পাকা মিডি দেওয়া কিন্তু কর্মকারকে খুশি করতে পারে নি।

ঃ অর্ণাল সিং ঃ
একমা বাংলার খেলোয়াড় অর্ণাল সিংই আক্রমণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

ইডেনের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি

আরবি

আজ ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ম্যাচের শেষ হবে। কথা ছিলো সমাপ্তির হবে, পর পর পাঁচ দিনব্যাপী সাত পূর্বে ভারতের একটি মাত্র ঐতিহ্যবাহী মাঠে। সেখানে কত খেলা হলো, কত রিপ্লে-ম্যাচ ও কত সেমিফাইনাল-ফাইনাল, কত টস হলো, কত রান ও উইকেট, আর কত হৈ-হুল্লোড়, আনন্দ, মেঘ-বাদলের অফুরন্ত-বৈচিত্র্য, কত শেষ ও শেষাশেষি।

তা বলে খেলাটি শেষ নয়। কিন্তু শেষের আর আমাদের মনে শেষ নেই, অনন্তকালীন বৃক্ষের বিস্তার, অন্তর তার ভালোর ঐশ্বর্য বহুরই। খেলোয়াড় ও দর্শকদের মনোজগতে কী প্রতিক্রিয়া? খুব আমাদের মনের মধ্যে ঢুকেছে, এই যা।

কিন্তু ক্রিকেট খেলা যাঁরা সংগঠন প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু ক্রিকেটের মধ্যে অফুরন্তকাল ছুটির আয়োজন। শরীরের আবশ্যকতা, নিত্য ভোরে অনেক মাঠে ঘাসে, রোদে ও ক্রিকেট-এর মাঝারে এবং খেলার সামাজিক সমাজে তাঁদের পরিচয়ের প্রয়োজন। অনুসন্ধানী কি খেলোয়াড় কম ছেলে, তাই সমাজ, মাঠ পরিষদে যে খেলোয়াড়ে ছোট বলিষ্ঠ প্রবৃত্তির মেয়ে, আর ক্রিকেটমাঠেই যা ক্রিকেট মাঠেরমানের মাঝে মেয়েটি। কথা এই ক্রিং সার্বভৌমের মাঝেটি। ক্রোকেটমাঠে যত ভিন্ন ছেলে, যা মাঝে মাঝের সর্বদিকে তার ছেলে, বেলিং, ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ের বিভিন্নপ্রকৃতির সাথে আমাদের মাঠের, একজন আরো আলাদা ক্রীড়াস্থানের অর্থাৎ অনন্ত সার্বভৌম বিশ্বের ক্রিকেটের আয়োজন হয় না। পরস্পর মাঝারের অর্থসংস্থা নিম্ন যাঁরা খেলোয়াড় ছোঁয়ার বিশ্বকর ক্রিকেট না খেলা, বেলিয়া মাঝার ছেলেমানুষ খুব বিশ্বাসের মাঝার ছোট-ছোট্ট নিম্ন ক্রিকেটে সমাজ বর্ষা আর—আরো সব ঐতিহ্যবাহিনীর ক্রিকেট, স্মরণীয় মাঠ, সব-ভালো মাঠ ঘাঁস, মাঠের ঘাঁস, ঐতিহ্য ঘাঁসের মিশ্রিত ছেলে টেস্ট মাঠের মাঝে একেবারেই ভিন্ন।

আমাদের চিরন্তন আকর্ষণ খুব ক্রিকেটোন্মাদনার ক্রিকেট। টেস্ট খেলা আমাদের মনে কিছু ছাড়ে সম্ভাবনার, আর এও মনে হয়েছে, আমাদের সার্বভৌমের প্রাকৃতিক, আর ক্রিকেট খেলার চেষ্টার রানী বাঁধনের আমাদের এবং ক্রিকেট কথা-পরিচয়ের নিয়মে ঘরানাদি—ইডেনের চত্বর ও মেলার আর মনে রাখিয়ে দেয়। নাম ক্রিকেটের অনিত্রির ক্রমের খেলার মাঠ চলার হওয়া, কিন্তু খুঁজে দেওয়া, আশাময় ঐতিহ্যের ঘটনাবলী খুঁজবার।

আজকাল আমরা আমাদের অনেকের একসঙ্গে খেলা হই। কিন্তু ক্রিকেট যখন খেলা ছিল, দর্শক ও খেলোয়াড় সবাই

ছবি ঃ

ইডেনের অফুরন্ত আমের মেঘে খেলা উদ্যানের অনুভূতি অবশ্য করতে পারলে বোঝা, রাঁধন যাদের কাঁধের সুখে চলবার ছুটি মনে থাকে আমাদের আমাদের করছে।

যখন খেলোয়াড়ের আমাদের করত আসে, তখন কিন্তু ক্রিকেট ঘটেছে খেলেন ছিল। সবারই সবে কর্মপ্রবাহিত মাঠে প্রতিপক্ষ

ছড়ানো মনের নিয়মে তারা করে ক্রিকেটমাঠে যখন ছুটে যেত, সারাদিন তার ছিল ঘনঘনবাদী খেলায়, খুঁজেছেন। ইডেনক্রিকেটের খোঁজে মনের কাঁটার ক্রিকেটার নয়।

খেলা যেন উপলক্ষে দেশ্যেরে মত পরস্পরকে খেলা নয়, খাদের ধারার খুব না ছাড়িয়ে চৌরাঙ্গীর বাড়িয়ে পরস্পরের নিজেরা, মত ছড়ানো তার ভেবে খাওয়া ভালো হয়। সব কিছুতে ছুটির খেলায়।

খেলো ইতিহাস ক্রীড়া খেলো বাঁধ খুঁজে দেখিনের ক্রিকেটের খেলাকেটা খাদের পারবেন না। প্রত্যেকদলিনের খাঁজতে নয়, প্রত্যেক ফলাফলটির অনুভূতিতে ইডেনের যে ছুটো বর্তমান আবহ হতে হতে একেবারে মিশিয়ে যা যাবে।

অনেক কিছু কম আফিসার হয়ে এ-হয়ে। সবুজ ঘাসের খুঁজের চত্বরে পরিষদের ভালো খেলে খেলা উদ্যানের অনুভূতি প্রত্যক্ষ করতে পারলে বোঝা, রাঁধন যাদের কাঁধের সুখে চলবার ছুটি মনে থাকে আমাদের আমাদের করছে। সেই লাল মলম ছুটি মনে কি অনুভূতি আমাদের খাদের খেলো। ঐতিহ্যই, অনন্তের, আমাদের খেলো, পাইন আমাদের, কাঁটাতে, ঘাসের, কাঁটাদারের মাঝ, ছুটাছুটি মাঝ মেঘ মিলনীয় বাঁধন ছুটির টানে আঁকা এক-একটি প্রাকৃতিক চিত্র।

ইডেনের প্রথম টেস্ট খেলা হয় ১৯৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে। তার প্রথম দর্শকবিহীন ওয়েস্টইন্ডিজ খুব ক্রীড়া ছিলেন। কৃতিত্বের মধ্যে ক্রীড়াবিদদের প্রতিযোগিতাই খুব নয়, আসলে তা ছিল ক্রিকেটপ্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ইডেন গার্ডেনে ছিল কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবের মোকাবেলা। যেখানে একদল একাদশটি পর্যন্ত ইংলন্ডকে আউট করতে পেরেছে, ভারতবর্ষ তাদি কলম প্রবলে খুব ক্রিকেটার ভালোবেসে ও ঈর্ষা ভালোবাসে আছে।

ছবি ক্রিকেটের সমাজে একদিনের খেলা

॥ প্রবীণ সিং ॥

ব্যাটসম্যানের সঙ্গে জোরদার, সুনাম্ভ, বাপুনাদ্, রামিনজ, এবিদজন, সেপ্টার ইত্যাদি, চৌকস ফিল্ডসম্যান। মুম্বইয়ে আলোয়ান চাঁদের হাসা করে নিয়ে বসেছি, তারপর সুর্য অস্তের দক্ষিণ দিকে একটু একটু করে চলে যেতে দীর্ঘ মুহূর্তগুলির হাসা দিয়ে ধীরে ধীরে গাঢ়তর হয়ে মাঠের অন্ধকারে দেশকাল রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

প্রথম টেস্টে বিদেশী বোলিং ও ফিল্ডিং-এর বিরুদ্ধে স্থানীয় ব্যাটসম্যানের ব্যর্থতা, যা ব্রাবোর্নে শুরু হয়ে দিল্লি টেস্টে সারা সিরিজে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনীয় ব্যর্থতা দেখিয়েছিল ও আমাদের ব্যাটসম্যানরা। ইডেন গার্ডেনে ওয়ার্ল্ড অল্প ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলিং ও ফিল্ডিং-এর বিরুদ্ধে খেলেছি ছিল যে দিনের ব্যাটিংয়ের কাছে টেস্ট খেলিকে ছেলে ছড়িয়েছে ও

॥ গোলা আমেদ ॥
প্রথম টেস্ট আরম্ভের আগে খেলবেন কিনা সেই কলকাতার খেলতে এসে আমেদও কিন্তু খেলেই দেখিয়ে করতে পারেন নি।

ইন্ডিজের। টেস্ট ক্রিকেটে খেলেন ওয়ালকট, এভারেটের কিন্তু মুখোমুখি—একাধিক, কুমার-ট্রেইল ইট (খেলিনি) পল, সেপ্টার ইট-মিডলের বার্তিক খেলা এবং এভারেটের দুষ্ট ব্যাটসম্যান—এই খেলোয়াড়দের তালিকা। অবশ্য আমার দেখা ইডেনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার মুস্তাক এবারের কলের পি. এ. বানিজার করেছিলেন ১৯৪৭-৪৮-এ। সাম্প্রতিক প্রকাশের চলচ্চিত্রে কী ভীরুতাতে ফল হয়ে খেলে মাঠের দর্শকদের খেলে কলকাতার মতন চালাকে ফুলির ঘটিয়ে, কলকাতার নিজেই ভিন্নিয়ে অবশ্য করে

॥ কার্তিক বসু ॥
প্রতিটি ব্যর্থ খেলে ভিশনীর বালিশ বুলির ঠিকে থাকে...

এবারের মত ঘরের মাঠেতে বিদেশীদের ফিরে, ভারিজার ফলস্বরূপ যে ব্যর্থতা এবং অসম্মানের ঔদাসীন্যের নিয়মন করে দুর্ভাগ্যের সার ভারিজারের কীর্তি-কাহিনী স্মরণিয়েছিলেন।

ইডেনে যে খেলোরি যা খেলতে পারে অনেকের মনে হয়েছিলো, তা ছিল সেদিনের ক্রিকেটে আমাদের চালের ঠাকুর কাঁচকে কলে খেলোরি এক সরস্বতীপুজোর দিন। সরস্বতীপুজো ছেলে মেয়েদের কোন ধারের পক্ষে ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়া ছিল কল্পনাতীত। অন্যদিকে ভারতীয় ঔদাসীন্যের ফলে ক্রিকেটের পক্ষে যে বিরোধী প্রভুত্বের অভিশাপ, এই কথা মনে মনে সেদিন পরাধীনতার গ্লানি বোধ করে ফেলেছিল।

॥ সি কে নাইডু ॥
ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম পুরুষ সি কে নাইডু, তাঁর সাবলীল ব্যাটিংয়ের বারবার আমিয়ে তুলেছিলেন ইডেনকে।

অবশ্য সেদিন স্বাধীন হবার পর অধিকাংশ প্রভুত্বে ভারতীয় ক্রিকেট, উদাসীন্যের ইজ্জত এতটুকুও যায়নি খেলা সংশ্লিষ্টদের তারে।

ইডেনে খেলোরি না হলেই খেলা মহড়ার অন্তরে খেলে যাঁদের তাঁরা তাঁদের মুখোমুখি (এভারেস্ট ও মোহনবাগান) ও এভারেস্টের খালাসন মুখোমুখি অবশ্যে ১৮ ও ১৫-এ আউট হয়ে যান। সঠিক মনে নেই, ইডেনে বাঁশ মহলের (হোকার সেপ্টার) খেলে ইনিংস স্কোর হয় ৮১, অথচ অন্যে ৭৪। সবই প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায়। ইনিংস সুরুর অবশ্য খেলোরী সুরুসহ, খেলোরী সুরুসহ,

[illegible] আলো-ঝলমল পুরুষ, ইউরিন পুরুষ আর আলো-ঝলমল পুরুষ, আর কালকাটা হলো বেলজী ডিমক্রেজ— এই ছিল প্রতি বছরে ডিসেম্বরে শেষ আকর্ষণ। বেশ কয়েক বছর ব্যবসায়ীদের এক অংশ ডিসেম্বর মাসে আসা বন্ধ করেছিল, তাদের মালপত্তো ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে কিন্তু ব্যবসা ওরকম ভালো হচ্ছে না। ডিসেম্বর শেষ সাইটে।

কুমারটুলির হাতের তৈরি মূর্তিগুলো আইসের পর পর ছিল এক মোক্ষম আইটেম। এখন সি [illegible] ডিসেম্বর মেলাটা আসে আসে ইন্ডাস্ট্রি কলকাতার মতো এখানেও ডিসেম্বর মেলায় যখন ভরবেলার পুরোদমে শেষ এক সপ্তাহের ব্যবসার শেষে ডিসেম্বর ৩১-এর [illegible] তিনে ডেকেই মাঝ রাত, আলোর রোশনাই ও কার্নিভাল মোড় থেকে শুরু

স্যাভিলরূপে ফিরে গিয়েছিলেন, হাদের মিডল এসেই টেস্টে পর পর দুটো বল সোজা ব্যাটে খেলেছিলেন।

ইডেনে ব্রডম্যানের রেকর্ড অবশ্য অক্ষতই রয়েছে, সেঞ্চুরীতে নেই। আরো একটি ইনিংস ছিল তাঁর, মেলবোর্ন স্কুলের বিরুদ্ধে খেলায় আক্রান্তমাত্র বল করে অধিনায়ক হেরাল্ড রেসকে আউট করা। তবে মাত্রে তাঁকে বোলিং দিয়েছিলেন দুবারমাত্র, তিন ওভার মোট।

ব্র্যাডম্যান একবার কালকাটার বিরুদ্ধে স্পোর্টিং ইউনিয়নের অধিনায়কত্ব করেছিলেন, তবুও দু-চার বাউন্ডারি ও অপর প্রান্তে দ্রুত উইকেটপতনেই বোঝা যায়। দু-একবার দু-পক্ষে মিলে সিদ্ধান্ত করতে মাঠে ফেরা-ফিরিও করেছিলেন। অবশ্য এ ঘটনা ইডেনের নয়, স্পোর্টিং ইউনিয়নের হোম গ্রাউন্ড মার্কাস স্কোয়ারে।

সে যুগের ক্রিকেট কিন্তু ছিলেন আপাদ টেস্টবাজ। অস্ট্রেলিয়ান যুগেও তিনি ডিভিসনের খেলতেন। ব্যবসার কুটনিয়ার অফিসের চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসে স্থায়ী হন। অনেকেরই ধারণা অস্ট্রেলিয়া বা ইংলণ্ডকে হয়ে টেস্ট খেলে তাঁর দুনিয়ার ইউনিয়নের সমুখে হয়।

ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং—এক হাতে আর ডিভে নিয়ার ক্ষমতায় টেস্টেই ছিলেন অধিনায়ক। কুচবিহারের বলে, কখনো বা ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে তাঁর বা হাতের ব্যাটিং তার করলে বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের সোজা হবেন। আর অস্ট্রেলিয়ান ক্রীড়ায় যতোটা জন্য দুর্দশ ফাট চলতো তাঁর। তবে, ইডেনে তাঁর দুনিয়ের স্মারক রেখা ছিল না। আন্তর্জাতীয় সিনেটার এবং আন্তরায় ডিভেরও তিনি ভারতীয় ডিভেটের সেবা করেছেন। তাতে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান বলের সমস্ত তাঁর চেষ্টার সফল হয়েছিল।

টেস্টবাজের রোলিং-এর বিরুদ্ধে (ইডেনের বাইরে) সেঞ্চুরি করেই প্রথম খ্যাতি লাভ করেছিলেন বেলহুভে (বি. এন. আর.)। পরে দুটি টিকে দুবে টেস্টবাজেই তার ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে মেল ডিভে-বাজ বলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুনী খেলা। বেঙ্গলের বিরুদ্ধেদের কলকাতা ডিভেটের সর্বশ্রেষ্ঠ আলো-টাঁকান খেলোয়াড়।

আলো-টাঁকানের মতে ইডেনে ডিভেটের সর্বশ্রেষ্ঠ আলো-টাঁকান খেলোয়ার দুটির একজন নিঃসন্দেহে এবং পক্ষে না, বোধ হয় আন্তর্জাতিকদের অনেক বেশি খেলোয়াড় কার্যতিক ইডেনে খেলোয়ার করেছিলেন কলকাতার বিরুদ্ধে। ইডেনে নয়, তবু একটিমাত্র খেলায় অভিনব দুই পরিচিত ছবির ছবিতে করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আলো-টাঁকান খেলোয়ার কার্যতিক।

ইডেনে একটি খেলায় কার্তিক, আমার আলি (কাস্টমস) ও বোসী তিন জনই করে ৪৮ রানের তিন রকমের ব্যাটিংক্রমে ব্যাটিং-এর যে ছাপ রেখে গেছেন ১৯৩০-এর সেই ঘটনা অর্থাৎ মন থেকে আজও মুছে যায় নি। হবস্ স্যাটক্লিফ সমেত ডিভিসনাল-রানের কলকে বিরুদ্ধে বাংলার পক্ষপাত বলের সঙ্গে তাঁদের ওই খেলা। অন্যদিকে ডেভি আলো-টাঁকান খেলার সাত ফোর্ড ও মাটা সুইনি এবং কালকাটার দুর্দের বিরুদ্ধে শ্যাড্ ব্যাট দুই ডাইং যাই হাতে এলেন আর খেলেন। তবে, ম্যাচ জিতলো ডিভিসন দলই। অজান্ত এক তবুও, নাম মুস্তাক আলি, যাঁ হাতের বোলিং-এ বিপক্ষকে দুর্দান্ত করেছিলেন।

পাশী বলের এম ব্যাটিওয়ালা, অন্তত্রকার স্পোর্টিং-এর এম এইচ খাঁ বোলার হিসেবে নয় ব্যাটসম্যানেরই প্রশংসা পাবি করতেন।

ইডেনে অনে বাস কাটার মত ডিভিসন দেখিয়েছেন স্পোর্টিং ইউনিয়নের হেমো বক-হাম এবং ওরিয়ান্টেলস ক্লাবে অনুমোদার। ফিল্ডিংয়ে ছুটে চলেন নিজের বল কুড়িয়ে নিজের সঙ্গে তা উইকেটে ছোড়ার ক্ষমতায় চমক লাগাতেন তাঁরা।

তবু যাঁর অনবদ্য ডিভিসন-এর ব্যাটিং হিসেবে প্রেমদার নাম হয়েছিল ইংলণ্ডান কালপক্ষে, তাঁর মত নিয়ে-ওপরে সমানে ডিভিসন বোধ হয় ইডেনে টেস্টের মধ্যেও কেউ দেখাতে পারে নি। অধিনায়কের জন্য বোলিং-এর সুযোগ কোনদিন তিনি খিলিয়ানের এম সি সিকে হারু করেছিলেন সর্বভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে। তবে, দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের মাইল ও মুক্ত অপেনা জুটি হিসেবে ১৮২ রান করে আউটের ফেরেছিল এম সি সি দলকে এবং অপরে অর্ধশতী হয়েছিল সে আউটে। আজ এম খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত সেই সর্বভারতীয় দলের প্রধান আকর্ষণ কিন্তু ছিলেন অন্য হিন্দু দলের অধিনায়ক বিজয় এম অন্যত্র সি ডে সাইড্। বিজয় খেলতে এসেছেন না, তাঁর স্থান নিয়েন উজীর আলি। সাইড্ প্রথম ইনিংসে মুখ-এর ৪০-এর পরেই সর্বোচ্চ রান করেছিলেন ভটে (৬৩), দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র সাত। আর উজীর ১ ও ৪। দুজনেই নিরাশ করেছিলেন আমায়। বিজয় অবশ্য কলকাতে মাইনর ব্যাটিংয়ারী ওয়ার্ল-ব্যাটিংয়ারীর উদ্যোগেই ছোটানো ১৫০-র পর আমাদের প্রত্যাশা ছিল তার একটি আরো শতরান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাপ্টেন কালকাটা দুর্দের ছাবে অধিনায়ক ছাড়াই কৃষ্ণাক হিসেবে ছিলেন বড়োদা। প্রেমী ছিলেন দুর্দের ও ছবিতে শক্তি ও স্থৈর্য বিধায়ী।

মহারাজের ক্রিকেট খেলতে আমার ছবি-কলকাতা, কিন্তু ইডেনের ঈশ্বরে ছিল-অসম্ভবীয়। খেলে পরে তখন ন্যাশনাল হিরো। তিনি ইডেনে ক্রিকেট খেলতে দেখেছেন সেদিন, কেন আমি যা, ব্যাট-পাই পরে। ব্যাসকাটার মেক্রেটারি ব্যাটসম্যান হাতে ক্রিকেট মনোযোগ করতেন, চলার ছেলে না পরলে খেলোয়াড়ে তো। ক্রিকেটে খেলা হলে না। খেলে পরে ইডেনের প্যাভিলিয়নের সিঁড়ি ভেঙে ছাড় নিলেন, কাল আসবের অনুরোধ। সমস্ত টীম ওয়ার্ক-আউট করলো এবং সেই থেকে বেশ কয়েকবার মোহনবাগানের সঙ্গে কালকাটার ক্রিকেট ক্রিকেটে বন্ধ ছিল।

ইডেন-এর সঙ্গে অত্যধিক মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে পরিবারের। বর্তমানে বি. এন. আর-এর খেলার মাঠ-এর ঠাকুরদা আমাদের বেলাঘাট ফোর্ট, সাজা হাফ প্যান্ট ও খালি পা নিয়ে মেঠে ও মাঠের বাইরেকার ওয়ার্ল্ড আসল বল করতেন, অনবদ্য প্রায় মেরেছ, ডিরেকশন, আর ছাবল মাইন। সবচে ছিল তাঁর তাঁর আত্মসমাধান মনোভাব। তবু মাত্র খেলার সুযোগ পান নি তিনি, এ-দুঃখে হয়ে টেস্ট খেলার হয়েন। ওই শোকাকেই বর্ণনা হিসেবে অনেক অভিধাসা ডিভিসন খেলোয়েছেন কালকাটার হয়ে। একবার প্রথম খেলেই চক্ষে অন্ধ আউ ঘর ফেলেছিলেন ডিভিও। আহ্বান ফোর্ট ডিপ্রেশন আসবার, আসবার তাঁর নিজের সিদ্ধের বন্ধুরা দিয়ে আমাদের যে আহ্বান আসবার করে ডিভিসনের এবং নাম এক মোহর বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এ-কাহিনী আমার আমার ছেলেদের কথা শোনা, তাঁর দু-চারের একজন একবার ইডেনে আছে, অন্যজন মৃত। তাদেরে আমি অনেক দেখেছি, তবে তাঁদের টাইমে আমি জন্মাই নি।

কোন নির্দিষ্ট ডিভিসনে ইতিহাস লিখতে বসি নি। খেলানো সম্ভবও নয়। উইলোরা লাগায় অসংখ্য পুরোনো স্কোর খাতা সব ফেলে দিয়েছে কালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ইডেনে থাকতেই। সে স্কোর বইগুলোতে অনেক ইতিহাস ছিল নিশ্চই। কিন্তু ইডেনের ক্রিকেট যাই কথা সত্যিকার মানুষ ছিল, তাদেরকার আনন্দকলের এক ফলাফও স্পর্শ নিলতো না তাতে।

সে আনন্দ ছিল পরিবেশে, দর্শক ও খেলোয়াড়দের মানসিকতায়। আজকের মার মার কাট কাট কিল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মানসিকতার যুগে সে সবই অবিশ্বাস্যভাবে হারিয়ে গেছে। আমরা যারা তার ছবে অতিরিক্ত হবার সুযোগ সৌভাগ্য পেয়েছিলাম, তাদের অনেক কোনো যা সে ছবের অন্তরালের এক-আধটুকু সাক্ষ্য আমার। সেই বাঁশির ঘাটিলীর বেশ আজে আজ যাদুঘরের মেয়াদোটক আবেশ সৃষ্টি করে।

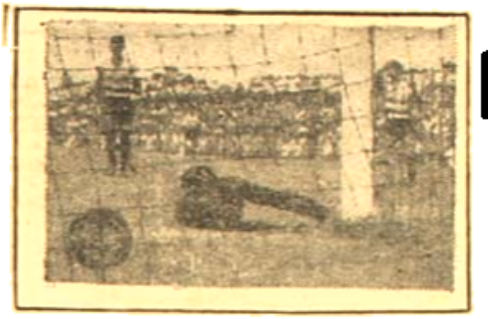

মালিক ঘোষাল

অঙ্গনে ক্রীড়াঙ্গনে

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে এমন উল্লেখযোগ্য ঘটনার ছড়াছড়ি। খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ নিজের পায়ে হাত-কুড়ুল মেরে নিজেকে চাইছেন সাদাদের দলে, আবার কেউ রাজা খাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ঔষধার্থে মতামত প্রকাশ করছেন খেলার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। মোট কথা বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে আজ সবই যেন কেমন কেমন। তার ঢেউ এসে লেগেছে ভারতেও। তবু সমস্ত বিশ্বে খেলাধুলোর শ্রেষ্ঠতম নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেও দেখা যাচ্ছে কাউকে কাউকে। সেই ভালো আর মন্দের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া কটি ঘটনার কথা বলা হলো এই আলোচনায়।

—ক্রীড়াশিল্পাবক

পতৌদির ঔদ্ধত্য ?

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাক্তন রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপের সিদ্ধান্তের অন্যান্য রাজা-মহারাজার মতো ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁও যে মোটেই খুশি হন নি তা কেন বোঝা যাচ্ছে। মনের ক্ষোভ তিনি মনে চেপে রাখতে পারেন নি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি প্রকাশ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী) যদি ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্বভার দেওয়া হয়, তবে ভারত আর কোন টেস্টেই হারবে না। ভাবতে অবাক লাগে, কোন দেশের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সে দেশের জননীয়া প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে এ ধরনের সমালোচনা করেন কি-ভাবে? নেতা তাকলে পতৌদির এই মন্তব্য অসমীচীন। প্রথমত, ব্যাপারটা পুরোপুরি রাজনৈতিক, এর সঙ্গে খেলার মাঠের কোন যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, একজন মাননীয়া মহিলা প্রধানমন্ত্রী, যাঁর সঙ্গে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হবার কোন যোগসূত্রেই নেই, তাঁর সম্বন্ধে এইভাবে কথা বলা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। তৃতীয়ত, পতৌদি একজন ছোটখাটো রাজা হলেও লোকে তাঁকে চেনে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবেই। কাজেই এ-ক্ষেত্রে যে সাবধানতা বোধটুকু থাকার দরকার ছিল, পতৌদির মধ্যে তারও অভাব পরিলক্ষিত হলো। সব মিলিয়ে একথা বলা যায় যে, পতৌদির এই উক্তি মোটে অসমীচীন নয়, নিতান্তই অশোভনমূলক। অন্য যে-কোন দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে কি হতো, তা অনুমান করে নেওয়া যায়। মনে পড়ছে গত ভারত-পাক সম্বন্ধে এই পতৌদি-ই লন্ডনে বসে ভারিক্কি মেজাজের সঙ্গে খুব বিবৃতি দিয়ে উভয় দেশকে সংযম থেকে বিরত হতে বলেছিলেন। পতৌদির সে ঔদ্ধত্যও মার্জনা করা হয়েছিল। এবারের অপরাধ আরও গুরুতর। পতৌদির এই অযাচিত ঔদ্ধত্যের কোন প্রতিক্রিয়া হবে কি না জানি না, তবে একজন সাচ্চা ক্রীড়ামোদী হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের আচরণে লজ্জা পাচ্ছি।

সেই গোলটি ?

এবারের আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-ইরাদের খেলায় পাস ট্রাবের দেওয়া সেই গোলটি নাকচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে গেছে। অনেকে আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, ঐরকম গুরুত্বপূর্ণ খেলায় আই-এফ-এ কেন স্থানীয় রেফারীদের হাতে পরিচালনার ভার দিলেন? এরই আই-এফ-এ শীল্ডের বদনাম যে, স্থানীয় রেফারীরা পক্ষপাতিত্ব করেন। যে-কারণে ইরানের পাল ও পাঁচজন জাতীয় নিরপেক্ষ রেফারী বলে ছেড়ে দিলো তবে নি। অথচ আই-এফ-এ এবার এত টাকা খরচ করে বাইরে থেকে রেফারী আনলেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে, কিন্তু খেলা পরিচালনার সময় দেখা গেল, কয়েকটি খেলা ছাড়া ঘুরে-ফিরে সেই স্থানীয় রেফারীদেরই খেলা পরিচালনার ভার দেওয়া হচ্ছে। বাইরে থেকে রেফারী এনে বিলাসবহুল হোটেলে তাঁদের রেখে সেই স্থানীয় রেফারীদের দিয়েই খেলা পরিচালনার কি যুক্তি তা বোঝা গেল না। আই-এফ-এ যদি আগে-ভাগে এ সিদ্ধান্ত ঠিকই করে রেখেছিলেন, তবে কেন পাইসের কটি খরচ করে বাইরে থেকে রেফারী আনালেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

মার্গারেটের 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' ?

আমাদের বিশ্বে মার্গারেটই চতুর্থ মহিলা, যিনি টেনিসে 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' পেলেন। ইতিপূর্বে একই বছরে বিশ্বের সেরা চারটি প্রতিযোগিতা জয় করার কৃতিত্ব মাত্র দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' আখ্যা পেয়েছেন। তাঁরা হলেন ডোনাল্ড বাজ ও রড লেভার ও মরিস কনোলি। তবলাই সুবাদের দুর্লভ

[বাকিটা ১০৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

খেলার রাজার রাজা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে এসে সেদিন বিনা ৯১০১ সালের ১৪ই জুলাই।

ম্যানচেস্টারে আরম্ভ হলো ভারতের সফরে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। লর্ডসের প্রথম টেস্টে ভারত হেরে গেছে। কিন্তু সেই পরাজয় ভারতীয় দলের মনোবিকৃতা এতোটুকুও ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। বিশেষ করে মুস্তাক আলী, বিজয় মার্চেণ্ট, সি কে নাইডু প্রমুখের মন-মাতানো ব্যাটিং ইংলণ্ডের দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

তাই ম্যানচেস্টারের তিন দিনব্যাপী ম্যাচ শুরু হলো অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে। সকলেই আশা করেছিলেন যে, ভারত ভালো খেলবে আর খেলাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

খেলার সূচনাতে কিন্তু তার আভাস খুব একটা পাওয়া যায় নি। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বিশেষ ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

টসে জিতে ভিজে প্রথমে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। কিন্তু জমে ওঠা ঘাসের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন না ভারতের ব্যাটসম্যানরা। ব্যক্তিগত ১০ রানের মধ্যে প্রথম আউট হয়ে গেলেন মুস্তাক আলী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে। মার্চেণ্ট আর অমর সিং সাধ্যমত চেষ্টা করে খেলার গতি কিছুটা বাড়ালেও ৬৭ রানের মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান পাণ্ডে-লিপ্তো ফিরে যাবার পর দলের পতন কিছুতেই যেন রোধ করা গেল না।

পরে উইকেটে ওয়াজীর আলী আর রামস্বামী আর একবার চেষ্টা করে-ছিলেন। দুজনে মিলে যোগ করলেন ৪১ রান। কিন্তু ওয়াজীর আলী ৪২ ও রামস্বামী ৪০ রান করে আউট হয়ে গেলে খেলায় আর বিশেষ কিছু বাকী থাকলো না। আর মাত্র ২০০ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস।

ইংলণ্ডের বোলারদের মধ্যে ভেরিটিই সবচেয়ে ভালো বোলিং করে ৪১ রানের বিনিময়ে দখল করেছিলেন ৪টি উইকেট।

ভারতের প্রথম ইনিংসে ২০০ রানের উত্তরে ইংলণ্ড খেললো যেমনোর মতো খেলা। মাত্র ১ রান করে সিম্পসনের বল আউট হয়ে গেলেও দলের ক্ষতি হলো না কিন্তুমাত্রও। হ্যামণ্ড এসে প্রথম থেকেই শুরু করলেন মেরে খেলতে। মহম্মদ নিসার, অমর সিং, সি এস নাইডু প্রমুখের মতো বোলারদের আক্রমণই গ্রাহ্য করলেন না হ্যামণ্ড। রানের ফোয়ারা যেন ছোটে ছোটে লাগলো মাঠে। হ্যামণ্ড একাই খেলছেন খেলতে। অপর প্রান্তে ছিলেন ফাদ। তিনি তো খেলার সুযোগই পেলেন না।

মাত্র ১০০ মিনিটে হ্যামণ্ড পূর্ণ করলেন শতরান। মোট তিন ঘণ্টা হ্যামণ্ড ছিলেন ক্রীজে। এই তিন ঘণ্টার ভূমিকায় বাউণ্ডারীতে বল পাঠিয়ে হ্যামণ্ড আউট হলেন ১৬৭ রান করার পর।

হ্যামণ্ডের সঙ্গে খেলছিলেন ওয়ার্থিংটন। তিনি পারলেন না মাত্র ১০ রানের জন্যে এবং তারপর হার্ডস্টাফ এসে খেলার মতো খেলা সত্ত্বেও মাত্র ৬ রানের জন্যে পারলেন না শতরানের মুখ দেখতে। শেষের দিকেকার ব্যাটস-ম্যানদের মধ্যে ব্রাউন-এর ৭৩ আর ভেরিটির অপরাজিত ৬৮ রান ইংলণ্ডকে এগিয়ে দিল অনেকখানি। ৮ উইকেটে ৫৭১ রান করার পর ইংলণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলো।

৩১৮ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত শুরু করলো দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। বিজয় মার্চেণ্ট আর মুস্তাক আলী এলেন ভারতের ইনিংস সূচনা করতে। আর তারপরই আরম্ভ খেলা। সেই খেলা যেন ভারতের দিকেই ইতিহাসে একটি আলাদা অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।

মার্চেণ্ট আর মুস্তাকের সেই খেলা আরব্য-রজনীর মতো যেতে লাগলো মন্থর গতিতে। মুখে মুখে ফোরার বড় কেউই ছুটে।

ব্যাট-হাতে নিখুঁতভাবে খেলছিলেন মার্চেণ্ট। কিন্তু মুস্তাক? মুস্তাক যেন বেপরোয়া। মুস্তাক ইংলণ্ডের সমস্ত প্রয়োগকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আসর-জেতা খেলা খেলতে লাগলেন। তাঁকে রোখার সাধ্য নেই, তাঁকে বাধা দেবে—এমন সাহসই বা কার আছে।

ইংলণ্ডের সব বোলার যখন

ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট—যিনি ছিলেন ইংলণ্ডের পর্যটক।

—চালনা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মুস্তাকের মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছে অবিরাম গতিতে—আর তারই অঘাতে বলগুলো বার বার ছুটে যাচ্ছে বাউন্ডারীর দিকে।

কে বুঝবে, কে ভাববে যে, ৩৬৮ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত খেলা শুরু করেছে। যেমন মুস্তাক, তেমনি মার্চেন্ট। একজন বেপরোয়া আর একজন ধীর-স্থির কিন্তু সাবলীল ভঙ্গিমা।

কোথায় গেল এ্যালেন, মোটার, হ্যামণ্ড, ভেরিটি, রবিনস, কিম্বা ওয়ার্থিংটনের বোলিং-এর সেই ধার? কোথায় গেল ইংলণ্ডের ফিল্ডারদের সেই প্রভাব বিস্তার করা ডিসিপ্লিন? মুস্তাক আর মার্চেন্টের সেই সপ্রতিভ মূর্তির সামনে ইংলণ্ডের সব কিছুই যেন কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

মাত্র ৮০ মিনিটের মধ্যেই পূর্ণ হলো ভারতের শতরান। এর মধ্যে মুস্তাক আলী একাই করলেন পঞ্চাশ রান।

মুস্তাককে তখন ঠেকিয়ে রাখাই দুষ্কর। দুই লেগ বলগুলোকে হাফ তুলি করে নিয়ে মুস্তাক পিটান, স্টাম্পের বাইরের বলগুলো যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল বাউন্ডারীর দিকে ছুটে যাবে বলেই।

দর্শকদের মধ্যে তখন এসেছে আলোড়ন। এ ধরনের মনমাতানো খেলা তাঁরা অনেকদিন দেখেন নি। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে হ্যামণ্ড ১০০ মিনিটে করেছিলেন ১০০ রান। কিন্তু হ্যামণ্ডের খেলার সঙ্গে মুস্তাকের বেপরোয়া মূর্তি দর্শকদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

এদিকে নব্বুই-এর ঘরে কখন যে মুস্তাক পৌঁছেছেন তা খেয়ালও নেই। হ্যামণ্ড এসে মুস্তাককে উৎসাহিত করে গেলেন। মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরীর আগে একটু সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মুস্তাক শুনলেন। কিন্তু তারপর...

তারপর ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে উঠলো সেই গগন-বিদারী চিৎকার। আনন্দে উদ্বেল দর্শকরা সব কিছু ভুলে গিয়ে যেন ঝলমলিয়ে উঠলেন। আনন্দ, উচ্ছ্বাসে আর হাততালিতে মুখর হয়ে উঠলো মাঠ।

পরের দিন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখলো :

"...Perhaps, after all, the last laugh of the match will be the Indians? Nothing that can happen to-day (the following and the final day of the match) will surpass the joke of 190 for none."

মুস্তাকের খেলা সম্পর্কে গার্ডিয়ান লিখলো :

"...His cricket at times was touched with genius and imagination. There was supple ness and a loose : easy grace which concealed power, as the feline silkness conceals the strength of some jungle beauty of gleaming eyes and sharp fangs."

দি ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ক্রিকেটের লিখলেন :

"...The Indian batting in this match has paid rare tributes to cricket's loveliness, its art and originality. We could understand how a Ranjit Singhji flowered from this field of play. Here were the average talented products, nearly all of them, at some-time or other, enchanted us with a stroke not possible in

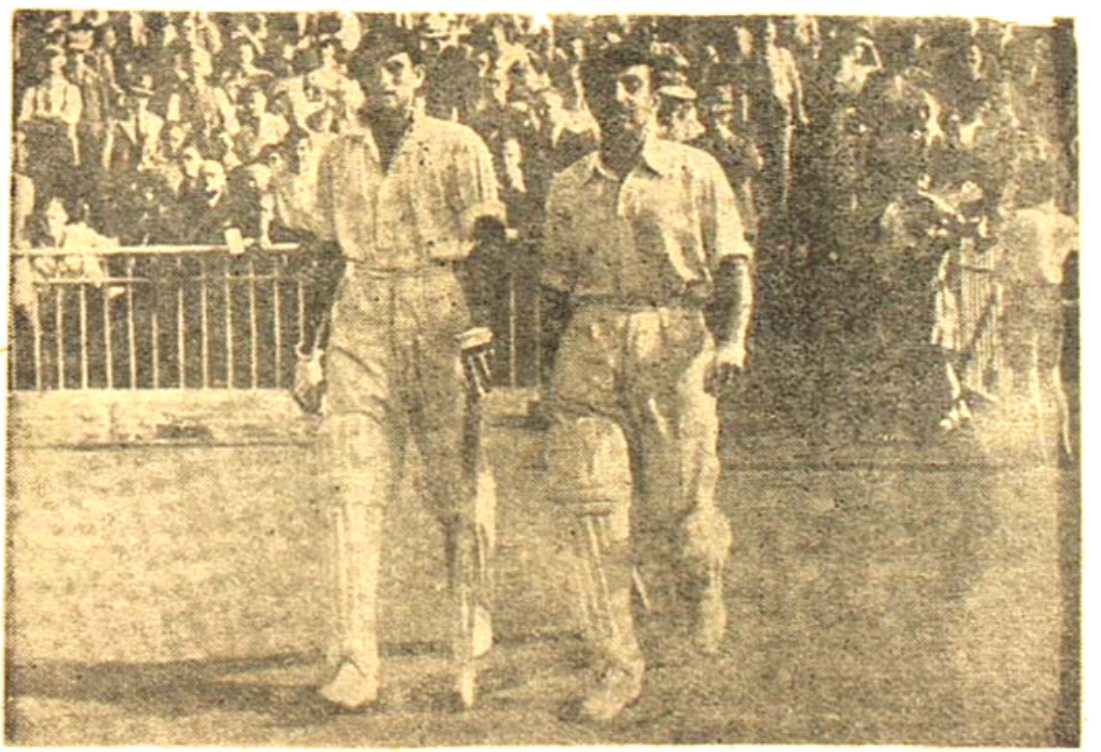

॥ অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ॥
ম্যাঞ্চেস্টারের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে মুস্তাক আলী ও বিজয় মার্চেন্ট চলেছেন ব্যাট করতে।

ঃ বাঁদিকে ঃ
বৃন্দাবন সেহওয়াগ যখন থেকে বৃদ্ধি বাড়িয়েছেন বাঁদিকে।

the rational and prosaic range of Occidental Science..."

মর্চেন্টের খেলা সম্বন্ধে 'নিকোল' লিখছেন :

"... Merchant is in method the Indians' good European: he could be easily England's opening batsman. He is a thoroughly organised player, he thinks out his strokes, does not perform them by instinct; he has brilliant thrusts all round the wicket, but he is master of them all, not slave to them, selecting quickly but wisely, never a creature of impulse. Here was international quality unmistakable, batsmanship good enough to lay the foundations of any English or Australian innings—and lay it, not only soundly, but with method, wearing the dress of style."

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের রান উঠেছে পড়েছে ২০০ রানের মধ্যে। মার্চেন্ট ১১৯ আর বৃন্দাবন ১১২ রান করে আউট হয়ে যেতেন। মি কে মাইল্ড করেছেন ৩৩ রান, অন্যান্য আউট

ঃ ডানদিকে ঃ
ক্রিকেট খেলার বিশেষজ্ঞ নিকোল যাঁর খেলা নিয়ে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ লিখেছেন বাঁদিকের ছবিতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে।

হলেন ৩০ রান করার পর আর কেউ খেলার আগে মাত্র ৪৮ রান করে অনুপস্থিত রইলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৫টি উইকেট হারিয়ে করেছে ৩১০ রান।

এরপর বাকিদের ভারত বনাম ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট খেলা দেখা হবে আগামীবারের।

(ক্রমশ)

ঃ REVISED EDITION ঃ

An indispensable and dependable reference book for the students and practitioners.

HAND BOOK OF COMMERCIAL LAW

by

A. K. SEN, B.A., B.L. (Hons.) London, Bar-at-Law

The author needs no introduction in the realm of law. The 10th. Edition of his compendium on 'Commercial Law' is for all practical purposes, the last word on the subject. Students and practitioners alike will benefit from it. Chapters on Industrial Law have been newly added.

963 Pages

Board Bound

PRICE RUPEES TWENTY ONLY

To be had from :

BASUMATI (P) Ltd., CAL.-12

(১০৭০ পৃষ্ঠার পর)

'ডাকুর সময়' আসল বড়ো সেজবৌয়ের মুখের আদল বড়। এঁদের সঙ্গে মাণিকলালই নিজের আসলটি পরিচয়টুকু ধরা দিলেন। তবে মাণিকলালের এ মানসিকতা একদিনে আসে নি। বহু দুঃখের ঘাতের মধ্যে অনেক পরিচয়ের ভিতর দিয়ে তাঁকে আত্মবিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। তবু মাণিকলাল হার মানেন নি। প্রতিবারই নতুন করে আবার নতুন উদ্যমে নিজের খুঁটিটি পাকড়ান। অবশেষে সেই খুঁটির সন্ধান যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের আমরা এই বিচার করে দেখতে চাই। তিনি, নিশ্চয়, যার আসনটায় থাকলে কোন কিছুই যে আটকায় না, তার সার্থক প্রমাণ মাণিকলাল নিজে।

পাঁচপাদের

সুভাষ সমাজদার

আমি ক্যাজুয়াল্টি লিস্ট

বিনিদ্র আকাশের মুখে ঘিম ভাঙা ভোর।

যে কোন সময়ে ফোন ঘুমিয়ে পড়বে। আর তারা ধরাধরি করে নাইটডিউটি ডাক্তারদের ঘরগুলো থেকে সেই তালিকা, ডিফেন্স-অফ ইন্ডিয়া রুলস। নিরাপত্তা, সাবধান আর ঘোষণার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।

এমনি সময়ে ঘিয়ে লাইট্রোপীতে পাহারাদার আবছায়ায় মুখ ঘষে ঘষে। সেদিন মুখে তারা আসে—যারা নিশ্চিন্ত থাকেনা। ভোরের ফোন ঘিয়ে ঘিয়ানো যাবে না। যেই 'ঘিয়াও' করা যাবে। নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত মানুষ। নিশ্চিন্ত ঘুমানোর ভাবে। ভোরের ঘিয়ে ঘুমন্ত ঘুমানো চুরি।

আমি নিশ্চিন্ত।

ঘোরাঘুরি ঘুরিয়ে ঘিয়ে আকাশের মেঘের মাতামাতি দেখছিলাম। আর ঘরের ভেতরে ফোন ফোন ঘৌঘিয়ে এই পাহারাদারের মাথা নিচু ৪৪—৪৫টা সংখ্যা নিয়ে ইন্টারনের লম্বাচওড়া পাহারাদারিটা—তার সেই আকাশমাখা আশিবাদীর নিচে ঘই ফোনের ঢকঢা সেই ঘুমন্ত আমিবাদীর ঘোরাঘুরি ঘোরাঘুরি আমার ঘুমিয়ে ঘুমে ফোন এমনকি ভার ফোন লাইটফোন ঘরগুলো ঘোরাঘুরিতে আমার ঘই ফোনের, আর তার ফোনের ঘিনের চার নিশ্চিন্তে—

একটিবার ঘি সার—নাইট্রোপী একজন সকালটার ভোরে আমাদের মত ঘরটা ঘিয়ে একটি নিশ্চিন্ত বাচ্চাদের। ফোন মুখ তুলে তাকালাম।

ফোনটিকার চাঁদের মত দীর্ঘ সাদের মত। আটিকারী পাকের মাদের মত ফোনগুলী মত। নোয়াই নোটোকাটা পাকাপাটা ঘোরাঘুর এক বিদেশী তরুণী।

নেতী চু মাথার ফাটা। ফোনের একটা ফোনটিটে আলো ফোন! মুখে চুল। ফোটটার ঘোকার মত ঘরের ওপর ঘুমের ঘোট ঘোট চুল। আর—

ঘুমঘাখি।

ঘিন ফোন আটীন মাঁঘিকের ঘুমোঘুমের। ফোন ভাতাতুলে, একতোমাঘরো—ফোনে ওষুধের কাটা, দাম ঘরা। ফোন ঘুমের পাশা যায়, ফলন্তের ঘাটে ঘাটে যা ফোন ফোনে ফোন একেবারে ঘুমের ঘিয়ের।

ঘাঁন ফোন ?

মাথা নিচু করল। আস্তে আস্তে আলা, আমি ক্যাজুয়াল্টি লিস্ট আনব?

ক্যাজুয়াল্টি লিস্ট! কিন্তু আমার আমাদের আমি লিস্ট আনে—ক্যাজুয়াল্টি লিস্ট তো—

ও নো-নো—নির্নাবিষ্ট আর ফিরেদের ফোনে ঘাথা ঘুম এই লিস্ট, আমাদের সোজা সাদের মত ফোনটা ফরে ঘিয়ে দে। ঘিয়ে ঘিয়ে ফোন ঘুমে আলা, একটা, ফাইভাল আল করে দেখুন, পজার্টমেন্ট পার্সানেলদের তো এখানে আমার কথা—বলেই সে আমার মুখের পর চুপ করল।

ক্যাজুয়াল্টি লিস্ট।

ক্যাজুয়াল্টি আনে তো ঘুমোনো। আমিবাদের আমার ফোনে আমা আমে, এ ঘিয়ারেন আমে এ্যাডিকেন্টে—মুখে ঘিয়ের এবং আমার আমিবাদের নামের তালিকা—ফোন ঘিয়ে আর ঘিয়ের ঘিন ফোনে—এই আকাশমাখা ঘুম ফোনে পজার্টমেন্ট পার্সানেলদের তালিকা আমাকে দেবে ফোনে আমার।

আমার আমার আমার ঘিয়ে তালিকার সে ফোন ঘোন।

ঘিয়ের ফোন ফোন ঘিয়ে ঘোনাবার আমে ঘোনাবার ফোনে পড়ছে। ঘুমের আমাদের ফোনের করে বাচ্চার মে।

ঘিয়ুক্ষণ পর।

ফোনআমে আমে আমার এলাম। আলাম, আমার, আমে ঘুমোনাম। কিন্তু ঘিয়ে ঘি আমে ফোনের নামের ফোন তালিকা—

আপনারা ঘিয়ে আমুন না, তাঁদের ফোন ফোনে ফোন ঘিয়ে দাঁড়াল। ক্যাজুয়াল্টি লিস্ট মানে ঘিয়ের আর ফোনের লিস্ট—এসব যে আমের ?

আমাদের ?

ফোন কথা আলা না যে। আর এমনো-ফোনো ফোনো আমেরুলো আমে আমে পাশে। ও ফাঁনি ফোন ঘিয়ে ঘিয়ে। ঘুম ফোন ফোন ফোঁ। ফাঁনা হাতে ফোন ফোন ফোন ফোনে ৪৮টা ফাঁনি আমেরী

এই ফোনে একটা আকাশমা—ক্যাজু-য়াল্টি লিস্ট এইরকম একটা ফোন—

ফোনমা—নৌফোনের ঘাম, ঘিয়ের, ফাঁনি আম, ফলন্ত-ফলন্তিত নাম—ফোন, এই পাঁচটি ফোনের আমে। ক্যাজুয়াল্টি লিস্টে একজন নৌফোনের পাকিস্তানের ফোনটা ফোন পাওয়া যায় আমে, ক্যাজুয়ালের ফোনে ফোনে ঘিয়ে পড়ল, একটা, ঘিয়ে ফোন ফাঁনে ফেলুন—আমার ঘুমে ফোনার—চোখের ফোনে ফোনো ঘিয়ে ঘিয়ে আমে ঘিয়ে। আমে আমে ফোনে বসে পড়ল।

ঘিয়ুক্ষণ পর ঘিয়ে ফোন ফোনে ফোন ঘই আমানো হল তার আটীনস ফোনারে। ঘিয়ুক্ষণের ফোনার।

ফোনা ফোনের ফোনে ফোনল। আমি আমাদের ফোন ফোনার ফোন ফোনটার আ। ফাঁনি ফোনফোনার ঘিয়ে। আমি-ফোনা ১,৫১ আমের ফাঁনি ঘিয়ে ঘিয়ে ফোন ফোনের ফোনে আমে ঘিয়ে। ফোনের ফোনে ঘিয়ে ফোনে ফোনে ফোনে আমে। ফোনে ফোনে আমার ফোনার ফোনা আমানো ফোনে আমেরো ঘিয়ে ঘিয়ে ফোনে। ফোনে ফোনে ঘিয়ের ফোনে ফোনার আমে আমে আমে।

আমার ফোনে ফোনে ফোনে না। ক্যাজু-য়াল্টি লিস্ট ফোনে ? ফোন ফোনাল্টিস্ট আমি-ফোনটা ফোন? ঘুমের আমানাম না। আমের আমুনের ফোনার, আমিনিস্ট্রেশন তো আমাদের ফোনার ফোনা। আপনি কি আমার আনেন ?

আমা নিচু ফোন।

ফোনফোনার ঘিয়াসিক আরে কি যেন ফোনল।

হেসে ইঙ্গিতে পাশের মানুষ—

চোখ দুটো বড় বড় করে আমার দিকে তাকালে। আশ্চর্য, সেই চোখ দুটোর দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয় না। যেন অনেক—অনেক দূরে কিছু দেখছে। বলল, দূরে ভারতীয় নয়, চেক, ইতালিয়ান অথবা বড় ইউরোপীয়ান ল্যাণ্ড-স্কেই আমি—আরও অনেক কিছু আমি। একটু থেমে বাঁচা হাঁচা ছেলে ধরে বলল, সেই জন্যই আমাকে বলা হলো—

আমার ঘরে ঢোকা হলো। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে কি জিজ্ঞাসা করা যায়? তাই চুপ করে থাকলাম।

সামনে কাগজটা রই পাওয়া গিয়েছে। আমার বেয়ারা কাগজটা আর কী কী (যেমন ধর, পুলিসরা বলা হলে) নিয়ে এল। বলল, আন্তর্জাতিকতার অধিকারবাদ খুঁজে দিলেন—

দেখলাম, সারি সারি বিদেশী অর্থ ছিকেন থেকে ঝোলা আন্তর্জাতিক লিস্ট।

দেখি—দেখি— দেখতে চোখ দুটো আরও ডাগরডাগর করে উঠল।

দেখি আমার, এখানকার কোন ফেরত দেখতে হলে হিজারস্ ব্রেজিস্টারে নাম লিখতে হয়—

নেম ?

হিজস মাক্সনাহিল্ড ব্রেশনার (কেমারিনিজ)।

আড্রেস?

সেই মেয়ে লৌকিক প্রোফেসর ওয়েন পার্ক স্কোয়ার—

পাসপোর্ট অব ভিজিট?

এখানে কি লিখি করলে হয়ে ?

কেন ঐ, অকুপেশন আমি আন্তর্জাতিক লিস্ট'

দেখি আমার, আমি যে দেখতে এসেছিলাম —সেই কেসটা আমি আপনে চাই না—

কিন্তু আমাদের লাইব্রেরীর নিয়ম—

নিয়ম! আমনে গোড়া সাপের মত ছোবল মেরে উঠল প্রোফেসর। বিশ্বের কোন স্থানির পরিচয় যেন ছেলেরে ছেলেরে ভুলে যেতে বসল, আমি যে এক—এক—না—কাউকে জানতে দিতে চাই না, জানতে দিতে চাই না যে, আমি এসব খুঁজে বেড়াচ্ছি। উত্তেজনায় কিন্তু কিন্তু মুখ জবা উঠল তার কপালে। হাত এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাওয়াতে নাড়তে লাগল। একটা কথাও বলল না। মুখে ও হাতে দুয়ে খাপ খাপ করে খাতার লিখল অকুপেশন অব ভিজিট—টু, অকুপেশন আমি আন্তর্জাতিক লিস্ট, লিখেই চিরার মত সোঁ মেরে ঘরিয়ে ভুলে নিয়ে চলে গেল রীতিমত হাওয়া একেবারে দেহের ভিতে। বল করে একটা ঝোরে বুকে পড়ল। আর—

আমার কিন্তুক একটা সন্দীহানের মত হয়ে ভাল হাতের তর্জনীটা ঠোঁটদুটোর চতুর্থটি লাইনে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কমুনিস্ট ম্যানিফেস্টো।

মার্ক্স-এঙ্গেলস্। এখনের সঙ্গে আমি আন্তর্জাতিক লিস্টের কি যোগাযোগ থাকতে পারে। প্রতিটি মানুষের জন্যে ভেতরে এক একটা জগৎ। কে জানে, হয়তো ভাইজোনস্ড ওয়াইফ। মানুষ চেনাবেনা করার জন্য হয়তো সঙ্গিনীর হৈরি এসেছে। আন্তর্জাতিক লিস্ট থেকে কুট নিয়ে নেওয়া যাবে ঠিকানার বাড়ি।

কিন্তু আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে কেস হাওয়া পালায় বলল, কিন্তু দেখলাম না। একটু থেমে বলল, কার্ল মার্ক্সের কোন ভাল বায়োগ্রাফী আছে?

আন্তর্জাতিক লিস্ট থেকে একেবারে কার্ল মার্ক্স! অবাক হলাম। বললাম, আমিনেরি স্কোয়ার লেখা সেন্সাল এন্ড পলিটিক্যাল বই অব কার্ল মার্ক্স আছে; আছে মেহরিং ছাড়ের লেখা, কার্ল মার্ক্স—স্টোরি অফ হিজ লাইফ।

হাঁ এই মেহরিং-এর বইটা দিন—আর অবশ্য দিটে সাদা কাগজ দেবেন—

কিছুক্ষণ পর।

সেই বিচিত্র মহিলা মার্ক্সের জীবনীর ভেতরে একেবারে ডুবে গেল। আর আমার সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতা ঘুমোচ্ছিল এত ঘুমে মতীর চুলচিরে বের হল।

ভদ্রমহিলাকে আমার মনে হল, খুব আর স্বাস্থ্যসম্পন্ন একটা ঘোড়া। আর আমি যেন সেই বনে পথ হারিয়েছি। আবার মনে হল, হয়তো নিজের জীবনের কোন দুঃখকে ভোলে রাখার জন্যই মার্ক্সিজম পড়ছে! মার্ক্স নিজেই তো অন্য মার্ক্সিস্টের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে মার্ক্সিজমের ভেতরে শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই হাসতে হাসতে পাশের একজন আমাটা বিড়ি করে দেখার ছাপ-কালি বিলেছিলেন।

এই পাশ্চাত্যদেশে অনেকে আছে। আমি কত বিচিত্র পড়ুয়া। কেউ আজীবন খাঁপ-খাদের অন্যায়ন করে মার্ক্সের গ্রন্থে এসে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীতলায় নিয়ে ভেড়ে উঠেছে; আবার কেউ দেখে কি ফেরেস্টেনেসের চাকরি ছেড়ে বিচারার করে আলোচনায় নিয়ে পড়াশুনা করছে। যে মুখোমুখি শ্রেণিন-খানের সিলনে বসে মুখোমুখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে খুঁজেছে শত্রুর সেই চোখের তেমনি দৃষ্টিতে খুঁজছে মার্ক্সের আকাশের অমল নক্ষত্র। হয়তো মাক্সনাহিল্ড এই দলের পড়ুয়া। কোন একটা আকস্মিক ঘটনে তাদিকে নিয়ে চলেছে মার্ক্সিজমের দিকে—

আচ্ছা, মাক্সনের কোন বায়োগ্রাফী আই মীন কোন আন্তর্জাতিক লিস্ট আছে? একটু থেমে বলল, তাঁর নাম শোনেন নি? ইনি সেই বিখ্যাত এঙ্গেল কোটিপতির একমাত্র কন্যা, যিনি লোকের চোখের আড়ালে থেকে শেষ মার্ক্সের আর অন্যান্য নির্যাতনের ভেতরে মার্ক্সকে হাসিমুখে সেবা দিয়ে—

মার্ক্সের স্ত্রীর কথা বলছেন তো?

ইয়েস! মার্ক্সের অর্টোগ্রাফিক্যাল অন্তেষ্টিসংকারে এক হিংসিকে হৈরীহীন সমাজের মানুষকে, তার বিপ্লবের আদর্শকে যে ওপেন-হার্টেড মনোভাবে স্বীকার করেছেন: কিন্তু— কিন্তু—একটা ব্যাপার। কথাটা ঠিক মনে উঠল মনে। লজ্জা হয়ে গেল চোখদুটো। মুখোমুখি নত করে মুখে হেসে করে চাপা গলায় বলল, আমি যে এর কোন দুর্ভাগ্যেরই একটুকুও সমর্থন করতে পারি না—

কার কথা বলছেন আপনি?

কোন কথা বলল না মাক্সনাহিল্ড। মুখটা মন করে প্রায় ছুটে যেন লাইব্রেরী আনুষের কোন ঘরের ভেতর নিজেকে ঘটানোর জন্যই লাইব্রেরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু—

আবার এসেছিল। এসেছিল মার্ক্সিজমের টানেই হোক, আর আন্তর্জাতিক লিস্টের কোন আকর্ষণেই হোক। মার্ক্সের জীবনী থেকে সেই আমার অন্তর্ধানের দিনি.....In exile and torture and in the midst of grim poverty always Inspired Marx—জীবনের কাহিনীর বিবেচিনায়। সেই ওয়েস্টফালেনকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে মাক্সনাহিল্ড উত্তেজনায় মুহূর্তে কোন একজনকে বিশ্ব জীবনবৃত্তান্ত বলে ফেলেছিল।

এখানে সংক্ষেপে বলছি তার জীবন-কাহিনী। পাঠক এইবার বুঝতে পারবেন কেন আমি আন্তর্জাতিক লিস্ট দেখতে এসে-ছিল মাক্সনাহিল্ড আর কেনই বা আন্তর্জাতিক লিস্ট দেখতে এসে উনবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখ পুরুষ মার্ক্সের জীবনী খুঁজছিল—

বেশি দূরে নয়।

এই কলকাতারই পার্কস্ট্রীট অঞ্চলের চেকদের নিয়ে শিরীষকায় আর দেবদারু বীথির মিষ্টি মিষ্টি নীলার ছায়ায় একটা বনেদিয়ানার মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল মাক্সনাহিল্ডের বাল্যকাল।

সিলভার্ট:

মাক্সনাহিল্ড।

পাশাপাশি বাড়ি। কিন্ডারগার্টেন থেকে হাইস্কুলের বাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়াশুনো। অনেকের হড়াহড়ি। এই অবসান তাদের পড়াশুনাকে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তারপর যা হয়। তাই হয়েছিল

সর্বত্র সুখিনঃ সন্তু
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেত্॥
স্টেট ব্যাঙ্ক

এ মাটির বুকে

অর্তিকরঞ্জন মিত্র

এ মাটির বুকে
শিশু, তুমালেই স্বপ্ন হয়ে জেগেছি।
যান চোখ থেকে
হাটার আমার ক্লান্ত বুলেবুল
কেঁপে কেঁপে উঠে যার
মনের আনন্দে।

একদিকে পাতার পরে শিশিরকণার
শিশুর মনের মতো সাদা মেঘমালা ভেসে
বেড়ে বেড়ে, আকাশ ছুঁয়েছে নিয়ে
জল চোখ দুটো।
আমার মায়াবী ঘুমে পরে আমলেই
সব শিশু স্বপ্ন নিয়ে জেগেছে।

সেখানে কোন ফল নেই।

কোন বৈচিত্র্য নেই।

হয়তো বুঝতে পারতো। কবির ভাষায় নয়। ধারণা। অমলের আবেগ-হর্ষলিত বক্তব্যের বাঁধ, আর মেয়েটির সেই অকপটভাবী আর স্বাভাবিক ব্যবহারে ভাঙন ধরে যেত। কিন্তু তা হলো না। অমল—

একদিন তারা বেড়াতে গিয়েছিল ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

সেই শত শত বছরপুরাণ ব্রোনাকদের স্মৃতি জড়ানো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। চারিদিকে ঘুমের ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। ফলতঃ বিভিন্নতির গাড়ার ফলতঃ ফলে আমলের মত ভাই-বাই করে জলছিল। সমস্তটা রাস্তা আর রাস্তা রকম।

জানো তাপিং, এই পরিবার এলেই মনে হয় জন্মতে যা সত্য, তার জন্ম হয়েই?

—কেন?

—মোদ্দলো এই পরিবা থেকে করেছে। ধারণা জন্মান্তরীয়ের হকুমে পাড়ী যা হুকুমে পাকা রোডের পাশের নিচু ছেলে দেওয়া হয়েছে—একটু খারল সিমেন্ট, স্বাভাবিক-কর্ম সিমিতে একটা মেসনারীয়ের স্মৃতি নিয়ে জন্মান্তরে অভিবাদিক ভাইতে ভাইতে বলল, কিন্তু চাকী তাকে পারে না শিশু মুক্ত নিয়ে আদর করেছিল—

খারল সিমেন্ট। একটা সিমেন্টের বাঁধনে মুখে বেদ-বিকৃতিক জন্মার দিকে চোখ দুটো ফিরিয়ে দিল। সে লক্ষ করল না তার সান্নিধ্যের হাতের দিকে। জানতে পারল না তার হাতে কি ছুঁয়েছে। তখন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তার স্মৃতির ভেতরে আলোড়িত চরে উঠেছে সেই ভেদবন্দালোকিত প্রতি.....সেই জনকল্প মেসী মাতার মূর্তির আবার ফিরে পাওয়া আর সেই জন্মান্তরীয়ের ঘরে বিশ্ব জাহাজের জন্মুল.....যা চলে আর হাজারো পর্তুগীজ সৈনিকের উৎসবের আর্তনাদ আরও কত কি—

—তুমি যে একেবারে ডুবে গেলে। একটু মিরজ মনে হল কাজেরিয়ন্তরে।

কোন কথা বলল না সিমেন্ট। আমলের জন্মেরের ওপর চোখ রেখে তার যা চী-চী করতে লাগল। এই নরম-নরম ঘাসের ঘর জন্মুষ্টানে সে ভেবে করে যে ভাল-বেসেছিল।

—তা তুমি কি এখান থেকে উঠবে, না এখানেই বসে থাকবে সারাদিন?

তোমার ভেতরে সব সময় একটা অস্থিরতা রোধ কেন জানিনা, তবে মনে হয় স্থিরের তাকাতেই যেমন ব্যাকেরিয়েনের হাতে লাল ছাতার একটা ঘা।

—এই কি? আমলের চোখের হিন্দি, মুক্তো ঝিলিমিলি মেসেরিয়ের? যা কাল হারের সৌরি আর নাইক, মেহেরি-এর লেখা।

স্তব্ধতা আর অটোর হয়ে যেন সিমেন্টের মুখে। ভেতরটা ঝিলমিলে ঘরিল শরীর চাহিদার মত সুডৌল মুখ, সোনালী চুল সব মিলিয়ে আমলে সুখের সেই উচ্ছিত-ছোঁয়া নারীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হল,—মনে হল যেন এই অনন্তের রমণী-মূর্তির মুখে জন্মেরের ঘাম পড়ছে। সেই কালো কালো আমল আমল মুটো চোখের সরল দৃষ্টিতে জন্মের আলিঙ্গন। দৃষ্টির প্রথম নারী কি আশ্চর্যিক পড়তো? পুরুষের কাছে নারীর একটা—আর একটা মুখই থাকা উচিত। যেন ইথর কি পলিটিক্যাল আইডিয়াস ওদের মনের সরলতা, মমতা একেবারে নষ্ট করে দেয়—

কি ভেবে আমল করে?

তুমি আবার এসব বই পড়ো—পার্টি'ও নিশ্চয়ই করছো? ধারে সরানর করতে করতে উঠে চলে গেল সিমেন্ট' পরিবার শিল্পের উঠারে যেখানে সেই জন্মান্তরীয়ের আর ভূকম্প (মেসী মাতার ঘাসে আকুল চার্চনার ফলে রক্ষা পেয়েছিল ফল প্রবাল আরে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা বাস্তুল উৎসবে নিয়েছিল এই পরিবার। সেই বাস্তুলটি পোতা আজ উঠানো জাহাজের জন্মুলের কাছে বসে আর একটা ভূকম্প নাবিকের মত চার্চনা করতে লাগল।

সেই মুহূর্তে।

এই পর্যন্ত বলে থেমেছিল কাজেরিয়ন্ত। জন্মুষ্টেম্বরে জানিয়েছিল, আমার পার্টি করা, পলিটিক্স নিয়ে মতানৈতিক করাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না সে। কিন্তু আমাকে ভালবাসত—খুব করে বিশ্বাস করেছিল। সন্ধ্যার ছায়া পড়েছিল মুখে।

আমিও কেন কেন এর ভালবাসার বিনিময়েও পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারতাম না। আমার শুধু মনে হত—প্রেম হয়ে জন্মেছি বলে কি কোন স্বাধীন মতামত থাকতে নেই? কোন পার্টিকুমার চীনের প্রতি এটাচমেন্ট আছে বলে তার ওপর আমার এটাচমেন্টের এতটুকু ক্ষতি তো হচ্ছে না—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। খুব ক্লান্ত আর অবসন্ন মনের মত শুধু-বয়ু মুখ থেকে বলল, আমার সঙ্গে তার আকর্ষণের অনেক ঝগড়াই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমার ওপর অভিমান করেই মুখে চলে গিয়েছিল সে। মিস ফাজেরিয়ন্ত মাথা নিচু করল। লাইব্রেরীর ঘন সবুজ লিনোলিয়ামে মোড়া মেঝের দিকে নিচু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন তার ব্যর্থ জীবনের ওপরে ইতিহাস জমাট জমিতে দেখা হচ্ছে সেই মেয়েকে।

—মুখে তো শেষ হয়েছে অনেকদিন আগে। তারপর দীর্ঘ পাঁচিশ বছর কোন খোঁজ-খবর পাও নি?

আস্তে আস্তে মাথা তুললো সে। বিশেষ কেন তীব্র যন্ত্রণায় তার কোমলমুখে মুখে এঁকে-বেঁকে যন্ত্রণার বুদ্বুদ উঠতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত আগে আনন্দ আর কল, সিনিসিজ আর ডিসেপ্টের নোটিফিকেশনে দেখেছি ও মুখে আগে উঠতি করেছে, এখন মেয়ের মরেছে। কিন্তু—

হঠাৎ ফেটে পড়ল সে।

তার আগের ঠোঁটে-ওঠা হাতের ওপরে চোখের জল চিকচিক করতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে বলল, কোন ক্যাজুয়েলটি লিস্টেই ওর ডিসের খবর পাই নি। আমরাও অনুসন্ধানেই ও আজও—আমার ভেতরে জমে-ওঠা আমার উজান ঠেলে আর রুখতে পারল না। চোখের জলে হাসির আমার জল হয়ে এল তার দুটো।

আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের সংকট ও জিজ্ঞাসা

মনোরঞ্জন হাজরা

বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়—ইংরেজিতে যাদের বলা হয় ইনটেলেকচুয়ালস। রাজনীতি, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা প্রভৃতির মাধ্যমে এঁদের পরিচয় কারো অবিদিত নেই। এ ছাড়া অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, সমাজসেবা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এঁদের পরিচিতি যথেষ্ট। এই সম্প্রদায় বহু বহু বছর ধরে যে ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন তার বোধ করি তুলনা হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীকে যখন বিশ্ব শতাব্দীতে পৌঁছে দিচ্ছিলেন এই বুদ্ধিজীবীরা তখন তাঁদের অসম্ভব প্রয়াস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বস্তুতঃ জাতীয় জাগরণের ভিত্তিস্থাপন সেদিন এঁরাই করেছিলেন। এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কোনদিন ছুতমার্গী অথবা সংকীর্ণতাবাদী ছিলেন না। রক্ষণশীলতা হয়তো কিছু কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তা হলেও সমকালীন বাংলাকে গ্রহণ করতে তাঁদের সংকোচ একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে গিয়ে কখনই পৌঁছয় নি।

সেই তুলনায় আজকের কথা চিন্তা করলে কিন্তু এলা বড় মনে হয় এবং মনে নানা প্রশ্নও জেগে ওঠে। আজ যখন দেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত ও বিপর্যস্ত, যখন সমাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, সে মানুষ সমাজের যে স্তরেরই হোক, প্রচণ্ডভাবে যখন আঘাতপ্রাপ্ত, যখন গভীর উদ্বেগে আমরা তন্ময় ভাগ্যের কঠিন পাথরে নিজের বন্দনার নিষ্ফল মাথা কুটে মরছি, যখন সরস্বতীর বেদী বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা প্রভৃতি যখন অভিমানক্ষুব্ধ, যখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার বুদ্ধিজীবী উপাধীর মতো বাহিত মাথা গুঁড়ে সবকিছুকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রেকর্নিকস এ্যাডভান্টেজ ও নো-এ্যান্ড-অর্ডারের স্লোগান দিচ্ছেন—তখন বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন বাংলার উত্তরসূরী বুদ্ধিজীবীরা কোথায় এবং তাঁরা তাঁদের কী বা কোন্ অবদান তাঁরা এই মুহূর্তে দেশের জন্য উপস্থাপিত করছেন, তা স্বভাবই জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রশ্নটা এই, জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব মিলবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অসঙ্গত বলা যেতে পারে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মতো বুদ্ধিজীবী মহলেও আজ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

এই সংকটের সবচেয়ে মূলগত দিক হচ্ছে—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সমাজে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সক্রিয়তার রীতিমত অভাব ঘটেছে।

প্রথমত একদল পর্যবেক্ষক পাণ্ডিত্য নিয়ে একেবারে নেপথ্যচারী হয়ে গেছেন। জনকান্ত সেনাপতির মতো এই সব দিক্‌পালেরা এখন কেন অবসরভোগী অতীত। এঁরা মনে করেন এঁরা ব্যাকডেটেড, এঁদের আর করণীয় কিছু নেই, করতে গেলে শেষ পর্যন্ত সম্মানহানির হয়তো ভয় আছে। তবে এঁরা যাই মনে করুন, আসলে এটা এঁদের পলায়নী মনোবৃত্তি, ইংরেজিতে যাকে বলে Escapism. দ্বিতীয়ত আরেক দলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা হচ্ছেন হতাশাবাদী বা frustrated অর্থাৎ কিছুতেই আর কিছু হবে না, শেষ হয়ে গেছে দেশের সব কিছু, আমরা undone. তৃতীয়ত যে দলের কথা বলা যেতে পারে, তাঁরা ঠিক পলায়নবাদীও নন আর হতাশাগ্রস্তও নন—তাঁরা কিছু করতে চান, আন্তরিকতাও তাঁদের আছে, কিন্তু চিন্তা তাঁদের সম্পূর্ণীকৃত নয় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের সামঞ্জস্যিকতার অভাব। সেজন্য প্রথমত তাঁরা আংশিক চিন্তা ও আংশিক অভিব্যক্তির উপরই নির্ভরশীল। তাই তাঁদের আংশিকতাবাদী বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এইবার এই (১) পলায়নবাদী, (২) হতাশাবাদী ও (৩) আংশিকতাবাদীদের পরে চতুর্থত যাঁদের নাম করতে পারা যায় তাঁদের আজ বেশেরভাগ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পুরোপুরি প্রকাশ ও সক্রিয়তা নেই কোথাও, সেইজন্য তাঁরা অবিদম্যবাদী বিকল্প প্রকাশ ও অভিব্যক্তি—এক কথায় বুদ্ধিজীবীদের নেতা। কারখানার মালিকের যেমন উৎপাদনের উপাদানগুলি (elements of production) হস্তগত থাকে তেমনি এঁদেরও বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব করার উপাদানগুলি কুক্ষিগত। সংবাদপত্র, রাসায়ানা প্রকাশনা, রেডিও টিভি, প্রশাসনযন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই এঁদের আছে। এঁদের শক্তি আরো এঁরা পলায়নবাদীদের সম্পূর্ণ কাছে পাবেন, হতাশাবাদীদের নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে পারেন এবং আংশিকতাবাদীদের বিশ্লেষণী শক্তির দিয়ে নিজেরা বুদ্ধিজীবীদের (Intellectualism-এর) কৌলীন্য জাহির করতে পারেন। বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা ঠিক এইখানে।

পূর্বোক্ত বিষয়ে যদি কয়েকটা উদাহরণের সহায়তা নিই, তবে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেকেই হয়তো অসন্তুষ্টিবোধ করবেন। কেন না দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্তাই সকলে পরাধীন মনের শিথিলতাটা এখনও অবলুপ্ত ঘটে নি। তা ছাড়া ওটাই যা কিছু করে—সেই একদা চুলোচিল, সেই কার্জনিউ, সেই লাট, কমিশনে ঘাম, ঘুণী, অমানুষিক পুলিশী নির্যাতন সবই তো রয়েছে। কাজেই মনের দিক থেকে আর পরিবর্তন হবে কি করে? তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা অহিংসার আদর্শে বলীয়ান হয়ে সংগ্রাম করেছি ইংরেজ আমাদের নির্যাতন করে, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তার এই বিশ্লেষণটুকু করতে পারেন বলেই আজ? আর স্বাধীনতা লাভের পর কি হয়েছে? ইংরেজ নেই, অহিংসার আজ আমাদের মুখে খৈ ফুটে যাচ্ছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের মানুষের বল না থাকায় আমাদের স্বদেশী সরকার প্রশাসনের পরিবেশ বজায় রাখতে পারেন না। এখন এতে কি বলা যায়? অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীকে নির্যাতন করে ইংরেজ যদি 'বর্বরতা' দেখিয়ে থাকে, তবে আমাদের স্বদেশী সরকার অনুরূপে নির্যাতন করে বর্বর আখ্যা পাবেন না কেন? তা ছাড়া ইংরেজ নির্যাতনই করত, অহিংসার বড়াই করত না—আমাদের স্বদেশী সরকার যখন সে বড়াইও করেন তখন ইংরেজের চেয়ে তাঁকে আরও একটি অতিরিক্ত দায়ে দায়ী

করা যায় এবং সেটা হচ্ছে অক্সফোর্ড। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যাঁরা প্রায়ই বিদেশে, তাঁরা কিন্তু এসব কথা বলতে পারেন না। কারণ হয় এদের সম্মান যাবার না এই ভয়ে এরা হতোদ্যম। অনেক সময়ে এই হতাশাগ্রস্তরা সাম্প্রতিককালের বুদ্ধিজীবী হত্যাদি সংবাদের উল্লেখ করে বলেও ফেলেন, 'ও ওরা যা এরাও তাই।' অর্থাৎ ভারতের বুদ্ধিজীবীদের আসন নিয়ে টানা হেঁচড়া নয়, ব্যাপারটা শুধু ঘোলাটে হয়ে গেল। এমন মৌলানা আজাদের মত নেতৃত্ব এটা সহজভাবেই তুলে ধরেছিলেন। His India wins Freedom গ্রন্থে তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন—অহিংসায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা এত বছর ধরে সামরিক নির্ভরশীল হবেন কেন? গত চল্লিশ বছর ধরে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মৌলানাজীর কথার প্রতিধ্বনিটুকু পর্যন্ত করতে পারলেন না তো!

আরাজকতাবাদীরা কিন্তু এর ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। যেমন আমরা অহিংসে ঠিকই, এটা আমাদের ভারতের অর্থবাণী, কিন্তু রাষ্ট্র শাসন তো করতে হবে, সেখানে হিংসা যদি কিছুটা প্রয়োজন হয় তা করতে হবে বৈ কি। তাই যদি হয় তবে দুটো প্রশ্ন প্রথমেই করে নিতে হয়, রাষ্ট্র শাসনের প্রধানত দুটো দিক। একদিক স্বদেশী মানুষের শাসন, যার অপর নাম হচ্ছে দেশের সামাজিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিকভাবে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং আরেক দিক হচ্ছে বৈদেশিক সম্পর্ক—যার অপর নাম হচ্ছে প্রধানত মৈত্রী ও সদ্ভাব স্থাপন, কিন্তু না হলে ও আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা। রাষ্ট্র শাসনের এই স্তরে অহিংসার বাঁচবার সর্বাধিকারী। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্র শাসন হিংসোদ্যমী হয়ে উঠবে কেন? যদি আসতে পারে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে, আভ্যন্তরীণ শত্রু বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাকে মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে এর উত্তর কোথায়? অহিংসেপন্থার এদের কি মোকাবিলা করা যায় না? অন্তত সেরকম কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়েছে কী? কোন প্রদেশের কোন মন্ত্রী এই পরীক্ষা করতে গিয়ে অন্তত জীবিকাচ্যুত হয়েছেন, এ রকম কোন ঘটনা আছে কী? তা ছাড়া কেন আভ্যন্তরীণ শত্রু হিসাবে চিহ্নিত পড়ে উঠবে কেন? সে কি রাষ্ট্র শাসকদের চেয়ে বর্বরতা ময়? তাই নিজেদের গলা ধরে করতে অন্যের ওপর ছিদ্র করে ওঠা তো অহিংসার ধর্ম নয়। আরও কথা থেকে গেল অহিংসে অবশ্যই মানুষ উদ্ভূদ্ধ হলে রাষ্ট্রকেও তো সেই অবশ্যই পথে চলতে হবে—তা না হলে কথায় ও কাজে যে বিরাট পার্থক্য ফুটে উঠবে তা এড়িয়ে যাওয়া যাবে কি করে?

আরও কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার আসা যাক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা, মনীষীদের মূর্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির উপর আক্রমণ, খুনখারাপির যে ভয়াবহ সমস্যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা কি? পূর্বেই বলেছি আজ বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব করেন তাঁরা। যাঁদের হাতে কারখানা মালিকের মতো means of production রয়েছে তাঁরাই আজ বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব করছেন। প্রশাসন তথা সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের ঘোরাফেরা থাকার ফলে তাঁদের দৃষ্টিতেই আজ তাঁরা এই সমস্যাগুলি দেখছেন। রেডিওতে চিন্তা পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁরা বুদ্ধিজীবীদের আজ বিভ্রান্ত করছেন, যদি এ কথা বলা যায় তবে নিশ্চয়ই তা অন্যায় হবে না। কোন কোন নেতা বা সংবাদপত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোনালাল, মনীষীদের মূর্তির অবমাননা এবং জাতীয় সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সম্পর্কে নিন্দা করেছেন ঠিকই এবং করাও উচিত; কিন্তু তা করতে গিয়ে তাঁরা আর অধিক দূর এগোচ্ছেন না অর্থাৎ গুপ্তহত্যা বা খুনখারাপির বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না। আবার কেউ কেউ গুপ্তহত্যা ও খুনখারাপির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বলবার চেষ্টা করছেন—এ খুনোখুনি সুরু হয়েছে যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে। এবং এতে করে যে জিনিস ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে তা হচ্ছে একজনের বিরুদ্ধে আরেক দলের ঘৃণার উদ্রেক উস্কিয়ে দেওয়া। প্রথমত যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোনালাল, মনীষীদের মূর্তির অবমাননা ও জাতীয় সংস্কৃতির উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বলছেন, তাঁরা যদি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ গুপ্তহত্যা, খুনখারাপি প্রভৃতির বিরুদ্ধে না বলার জন্য সমস্যাটাকে আংশিকভাবে ধরছেন এবং যদিটা না করতে পারার মধ্যে ব্যাপারটার সুষ্ঠু সমাধানও হচ্ছে না। মনীষীদের মূর্তি, যেমন বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, গান্ধীজী, নেতাজী প্রভৃতি দেশবাসীর কাছে কতখানি সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না, তাঁদের গলা কেটে যে কাজ করা হচ্ছে তা জাতির প্রতি অবমাননা। কিন্তু একটা কথা এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে পরলোকগত মানুষের মর্মরমূর্তির গলা কেটে যে পাপ দর্শকেরা করছে তার চেয়ে কি কম পাপ করছে খুনেরাতের দ্বারা জীবিত মানুষের গলা কেটে? সেখানে প্রতিবাদ নেই, নিন্দা নেই, প্রতিকারের আগ্রহ নেই? তা যদি না হয় তবে, জনগণের মনের দুঃখের কথা কাটল, ওটাকে প্রাণ অবমাননা বলে কখনো বলা যাবে না। জীবন্ত মানুষের গলা কাটলে যদি প্রতিবাদ না হয়, তবে এটাকে নেই যে মানুষ তার গলা কাটলে প্রতিবাদ করে কি কোন ফল পাওয়া যাবে? বর্তমানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে একথা ভেবে দেখতে হবে। অন্যদিকে খুনখারাপি যুক্তফ্রন্টের আমলেই প্রথম সুরু হল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বক্তব্য তাই। যদি সমস্যাটির পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চান তবে সে হবে মারাত্মক অপপ্রচারের সামিল। তাতে হয়তো সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে কিন্তু তা সাময়িক হতে পারে না। যুক্তফ্রন্টের আমলেই সুরু এ খুনখারাপি সুরু হয়েছিল, একথা বলা তথ্যনিষ্ঠার পরিচায়কও নয় এবং তা সত্যও নয়। অনেক দুষ্কার্যকারী বেরুবার অনেক আগে থেকে অন্তর্হিত হয়ে এসেছে এবং সেরকম কিছু তথ্য সংবাদপত্রের ফাইল থেকে কিংবা বিধানসভার কার্য বিবরণীতে পাওয়া যাবে। এবং এগুলিকে অস্বীকার করে বুদ্ধিজীবীদের বর্তমান নেতৃত্ব যে সব কথা বলছেন, তা রীতিমত উদ্বেগজনক।

প্রসঙ্গত জাতীয় সংস্কৃতি কথায় আসা যেতে পারে। যে কোন দেশে যে কোন সময়ে জাতীয় সংস্কৃতি সংগঠনে সাহিত্য একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, তারাশঙ্কর, মানিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের পরে সাহিত্য কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তার কি কোন সংবাদ আমাদের বুদ্ধিজীবীরা রাখছেন? যাঁরা নেপথ্যে আড়ালে বা হতাশাগ্রস্ত তাঁরা যে এ বিষয়ে একেবারেই নীরব এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরা যাঁরা সংবাদ রাখেন তাঁরাই উৎসাহিত করেন বেশি করে। যে সাহিত্যের পসরাকে আদালতের মানদণ্ডে বিচার করতে হয় তাকে উৎসাহিত করার মধ্যে সার্থকতা কোথায় তা উপলব্ধি করার বিষয়। তা ছাড়া কোনও এক দেশের জেন দিয়ে আমদানী করা যে সাহিত্য আমাদের বাজারে ছেয়ে যাচ্ছে তাও এই প্রসঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ, বোন সাহিত্য, দেশের সংস্কৃতি বিধ্বংসী জন্য আমাদের কোন্ পত্র-পত্রিকার না আছে? তাই এগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব না, অথচ জাতীয় সংস্কৃতিকে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব, এ কি করে সম্ভব? এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যদি মুখে আসন করেন আর সংবাদপত্র দু-চারটে বিবৃতি দেন, তাতে এ সমস্যার সমাধান হবে না। পথ হচ্ছে আর কিছু দিন তবে কিছুটা হতে

পাহাড়ে বলে আশা করা যেতে পারে। তাই আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এই মুখ-ভঙ্গির সাথে উপলব্ধি করতে হবে, শুধু রোদনের চিহ্নের যোগান দেয়া সম্ভব হলে চলবে না।

আরও একটা সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের পরবর্তী মনোবৃত্তি, হতাশা এবং আত্মিকতাবোধের প্রমাণ পাওয়া যাবে। বলা হচ্ছে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার কথা। প্রশাসনমহল থেকে বিপুল ঢকানিনাদ করে বলা হল যত টাকা লাগে তত টাকা দেয়া হবে। কিন্তু বন্যাপীড়িত মানুষরা এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ করে যখন প্রয়োজনীয় রিলিফ না পেয়ে স্থানীয় বি-ডি-ও অফিস, মহকুমা শাসক, জেলা শাসক প্রভৃতির কাছে দল বেঁধে আসতেন, তখন তাঁদের জন্য দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। কেউও এক জন পুলিস অফিসার আমার কাছে বলেছেন, যা কিছু প্রাপ্তি প্রকাশ করতে পারি একদিকে যত টাকা লাগে তত টাকা দেয়া হবে-র ফাঁকিটা ফাঁস করার জন্য এবং অন্যদিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনীতি করার আবেগে সর্বস্বহারা বন্যাকবলিতদের ওপর নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করা হয়েছে। আসল ঘটনা এই বন্যার যাদের ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে বেশি হয়েছে, তারা দরিদ্র ক্ষেত-মজুর, গরীব চাষী বা ভাগচাষী। বর্তমান প্রশাসন যন্ত্র এই শ্রেণীর মধ্যে ভূত দেখছেন, কারণ এদের মধ্যে এক বিন্দুও রাজনৈতিক চেতনা নাকি অস্তিত্ব প্রভাব। তাইই এই শ্রেণী যখন বন্যায় মার খেয়েছে, তখন আবার মার দিয়ে তাদের শিরদাঁড়া এমন-ভাবে ভেঙে দাও যেন আর উঠে দাঁড়াতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত তারা গ্রামের জোতদার, মহাজনের হাতে বন্দী হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদেশের বুদ্ধি-জীবীরা বন্যাটা দেখেছেন, বন্যার পর প্রশাসন যন্ত্রের লীলা দেখেন নি। এই না দেখা বা আংশিক দেখার কারণেও সেই এক —বর্তমানে যাঁরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করছেন তাঁরা এই পুরুষের সমস্যা-টিকে অন্যভাবে চিহ্নিত করছেন। তাই বর্তমানে আজকের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্কটটা কি ভয়াবহ এবং গুরুতর। সমস্যার মূলে পৌঁছতে চলেও আজ সালাম করতে হবে।

যখন আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কত না উজ্জ্বল। শুধু অতীতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত যে কোন জটিল সঙ্কটে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আস্থা স্থাপিয়েছেন এবং পথের সন্ধানও দিয়েছেন। তাই জিজ্ঞাসা এই, অতঃপর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সঙ্কট দূর করার উদ্দেশ্যে পথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসবেন কি?

একটি ভিন্ন স্বাদের বই

বহু অনুপ্রেরণায় লিখা অনুপ্রাণিতে লেখা

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বহু

অনুদ্ঘাটিত তথ্যে সমৃদ্ধ

"Out of a handful of dust lacs of Vivekananda can be made by him—This Ramkrishna"

—Swami Vivekananda

ঠাকুর পরমহংসদেবের

আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

ঘরে ঘরে রাখবার, অন্যকে উপহার দেবার মত বই

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি রচিত

মূল্য মাত্র ৫৫ টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ
কলিকাতা-১২

মুক্তস্রোত

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

[illegible] নীল নীল অবিরাম ঢেউগুলোই যেন
বুকের ভিতর থেকে পড়লো বুকের কাছেই:
ঢেউগুলো নালা হয়ে জড়লো গলায়।

[illegible] চোখেরই হেরফের খেলার। নীল ঢেউ নয়,
নীল শাড়ির আঁচল তার, ভিজিয়েছে বাহু, মুখ, বুক,
অনিমিখ আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে।

আমার মাথায় শুধু ফেনার মুকুট, আমার ফেনার মালা,
পরিয়ে সে মায়াবিনী কোথা চলে গেছে সন্তর্পণে!
জিনে নেয় অন্তরে, অথবা জৌতুকদায়।

জিনিস, চলনাময়ী কবিতাই, মনুষ্যত্ব আমি
বলি, বাসনা, আমি আমি তোমারই প্রতীক্ষারত,
আজীবন বাধ্যতা করতে চাই তোমারই দরজায়।

দুঃখ অন্ধকারে নয়, আলো জ্বলে উঠছে দিকে দিকে,
জানিনা, মুহূর্তে থেকে মুক্তস্রোত জীবন বুঝিবা;
উবে যাবে সব বাধা, সব অন্ধকার।

কাছে বা দূরে

সুনন্দর রায়

পাকা দিন, সার কথা বুঝেছে বোকসন্ত নাগরিক
জীবন সার্থক কোথায়?
বহু ব্যাপ্তা—কাছে অথবা দূরে।
ভীষণ অনিশ্চয়তায় ভোর
তাইতো সমুদ্র ঢেউ-এর মতো আসে অর্থ—আবছায়
আমরা সেই বালুকো বেলার—বালুকো পদরে পড়ে।
বড় কাছে—সুখের—সুখের ছড়ো কাছে।

আমরা চলেছি তো চলেছি
মনের সুখতলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে
পা বাড়ানো সমুদ্রের অতলের তলায়
বিস্মিত অভিজ্ঞান—আরো কাছে?"

আধা-জল কথা মাঠে চলেছি
আলেয়া বাহু ঘুরে মিলায়—ঘুরে শুধু ঘুরে।
ভুলে যে গেলো। দৌড়—কোথায়।

বন্ধুদের জন্য

অরুণেশ ঘোষ

হাতে গণ্ডগোল রেখে অন্যান্যদের-কে নিয়ে
অহো ব্যস্ত কেন বলুনতো
যাত্রার রহস্য জানা রাজনৈতিক মহলেরই উচিত
অর্থাৎ টাইম-ইউনিট
এরা সবসময়ই তো আসে শহরে শহরে জীবনের প্রকৃত উৎসব

নবযৌবনে ঘরছাড়া কাদের কারা হাতে মিলি ওষ্ঠাধি তানপুরা
পরাশক্তি যে অঙ্গে আবহমান দেখা স্বপ্ন দেখতে দেখা

জীবনে-জীবনে শিরায়-শিরায় সুর ছিঁড়ে আই
রাজনীতিরে গান গেয়ে ওঠো ওঠো ওঠো সবাই

হাতে গণ্ডগোল রেখে অন্যান্যদের-কে নিয়ে
অহো ব্যস্ত কেন বলুনতো
কে কবে ঘুমাবে জন্তু স্বাস্থ্যবান সন্তান প্রসব
যাত্রার রহস্য জানা রাজনৈতিক মহলেরই উচিত
কে কবে মাটি ও ছিনে নেবে মেয় টাওয়ারের ভিত্ত।

বেঁকে যায়

অরবিন্দ সরকার

ছিঁড়ে ফেলা যায়নো অনেক পৃষ্ঠার মধ্যে
কয়েকটি পৃষ্ঠার
ঘাস ঘাস
রক্তের দাগ থেকে যায়;

যেতে যেতেও সোনা-ধরা দেহলে
থেকে যায় কণ্ঠের চেয়ে
কয়েকজন;

অন্ধ মৃত্যুর স্রোতে
যেতে যেতে থেকে যায়, কেউ
চৌরাস্তার মোড়ে,

থেকে যায় বিন্দু-ক-বিন্দু সে টিক
এখানে সেখানে
ছিটানো কালির দাগ
কর্তনালী ছিঁড়ে ফেলেও
তার বাড়িয়ে
আকাশের ফুলা সেই স্বপ্ন
বুকে বুকে টিক থেকে যায়।

ভালোলাগা মৃতি

প্রেমেন্দ্র সরকার

প্রায়ই যে আসে সে থাকে ওপারে বাড়িটায়
তাই তার সঙ্গে দেখা হয় না—
আমি ছাড়া কারুর অন্যোগই নয়—
সে জানতো না তাই
একদিন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেললো পথে
অসংখ্য গাড়ির তলায়
পিষ্ট হয়ে হয়ে যখন ফিরে এলাম
তখন আবৈলোর সন্ধ্যায়
কেবল সেজে।
আমার প্রাণের অন্ধকারে বাড়িওয়ালির আসি—
তার সঙ্গে দেখা—
যে ওপারে বাড়িওয়ালির চাকে
আমার পিষ্ট অবয়ব
পড়ে ছিলো পথে।

আগুনেই ফুল, ফুলেই আগুন

সুরেন্দ্র সরকার

রথ থেকে নেমে এলো বীজ
অঙ্কুরিত হবে বলে মাঠের উঠানে।
তুমি বলে ভালবাসো তিল
আমিও ভালবাসি ফুল,
মিষ্টি চন্দনের গন্ধ
আর অমলকি পাতার হাওয়া
কে না ভালবাসে বল।
কিন্তু হায় যখন থাকে বিষ
তীব্র বুকের জ্বালা
তখন কি আর ভাল লাগে বলো?

প্রলয় আকাশ হলে সমাচ্ছন্ন
প্রত্যয়ের লাগল থাকবে ধরে
প্রিয়, তুমি থাকলে আমার পাশে
আগুনেই ফুল দেখবো, ফুলেই আগুন।

একটি উজ্জ্বল তারা

বন্দে আলিমিয়া

কে জেগেছ অন্ধকারে, পথিক আঁধারে একা একা
কেন বৃথা ঘুরে মরো, রাতজাগা পাখির মতন?
একাকার জলে স্থলে আলো ঘুমন্ত মানুষের মুখে
উজ্জ্বল তারার ঘর সব দুঃখ ভুলে জেগে আছে।

একলা ফেলেছ তার স্বপ্নাতীর নিস্তব্ধ দেহ ঘিরে
অন্ধকার নদীর জলে আকাশে তাকিয়ে কেন।
যে নিবিড় ছায়াটির, নিঃশেষের মোহাচ্ছন্ন মেলার
অন্তত ছিটেটুকু পথ হেঁটে এলো পাশ আজিনায়
আলো অন্ধকারে পথ হাঁটে আলোর প্রেমিক
আলোর চেতনা নিয়ে নিরাসক্তি আলো হয়েছো।

কে আর ওদের খুঁজে বেড়ায় আকাশে আকাশে—
শুধুনো বকুলে বৃথা কে ওরে মেলায় ফুলমালা।
যে প্রতিজ্ঞাদীপ্ত দুঃখ, আঁধারের বাঁধনই সীমায়
একটি উজ্জ্বল তারা অন্ধকারে দেখাও নিরালা।

দূর মেরে যেমন নবনী

শান্তনু দাস

তামাম পৃথিবী জুড়ে অন্তহীন ক্ষুধা।
এমন মাটিকে পাওয়া গেল না
চিনুকে চিনুকে রেখে ভালবাসাবাসি।
অন্ধ ধমনী, তৃষ্ণাই বিছিয়ে রেখে
অন্ধকার নিস্তেজ চেনে ঘুরে
অন্ধরা কি সুখে
বাঁচতে চাইতে হয়।

তবুই, যেন যা লিখি,
যেমন আছিকে রাখি বন্ধ নিশ্বাস
হৃদয়ের ভেতরে অন্ধকার
দূর মেরে যেমন নবনী,
উঠে আসে
হৃতমনি বিশ্বাস
অতিদূরে অন্ধকারের ভেতরে
জেগে ওঠে প্রত্যুষা মুক্তোর মতো।

আশ্বিনের হাওয়ায় কাঁপছে

বংশীবদনী পাল

আশ্বিনের হাওয়ায় কাঁপছে প্রাতঃটি প্রহর
প্রাতঃটি শহর, গ্রাম, প্রাতঃটি মানুষ
আকাশ বাতাসের কণ্ঠস্বরে তিলোত্তমা, তাপীরথী
মহানন্দা, পানোদর, ব্রহ্মপুত্রনদ

দুশ্চিন্তার ঘটে যাচ্ছে চেতনার পরাভব
বদলে যাচ্ছে মুহূর্তেই চেনা পৃথিবি
মন থেকে সরে যাচ্ছে নামহীন দুঃখ
পরিচিত কণ্ঠস্বর, পরিচিত আমি।

আকাশের বিস্ফোরণ ঘটে চরাচরে
জীবনের হৃদয়ে হৃদয়ে, বিশ্বাসে, প্রত্যয়ে
উদ্দীপ্ত হুটোহুটি, তীব্র কোলাহলে
জেগে আছে, ডুবে আছে বিচ্ছিন্ন মানুষ।

গরুড়

অমিয়কুমার হাটী

অন্ধকার পাখীটে ওরা বসেছিল। তখন ভোরের
প্রথম প্রভাত সূর্য। কোথা থেকে এল যে ঝড়।
যেন এ আকাশ চায় তছনছ পাখীদের ঝাঁক,
সুনীল আকাশ যার চেয়ে চেয়ে আছে সুখে
কেবল উৎপল ছেড়! বুঝি যা সে আজও অসুখে!
পাখার ঝাপটে তার প্রতিক্ষণে যেন উল্কাপাত।

ঝড়ের অন্তরে কাঁদে, ভোলো কই? পাখির সমাজ
সমস্ত আকাশ এল অভিনব ভোরের আবেশ
মুহূর্তে উধাও হল। ভেবে ভেবে ছন্নছাড়া সুখে—
ঈথারে আকাশ ওঠে, চাপা চাপা ভয় হয় ভয়
এদের মনের মধ্যে অন্তর্হিত আকাশ যেন
কালো আঁধার আজ। যা যা করে মুক্তির কামনা।

এদের বিচার বাড়ে। কখনোবে ঝড়ের আবেগ
ভোরেতে পাঁড়িয়ে যায়। পক্ষাঘাত পাখীর আবার।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ নীরব সামাজিক বিপ্লব

ডি. পি. প্যাটিল

[কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী]

অনেকের ধারণা পরিবার পরিকল্পনার মাতা আমরা সোজা কিংবা কোনোরকম কিন্তু বাঁকা পদ্ধতিতে উৎপাদন বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ হল সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে দম্পতিকে স্বাধীনতা দেওয়া। এই স্বাধীনতার ফলে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন। এই স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে দম্পতিরা নিজেদের ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।

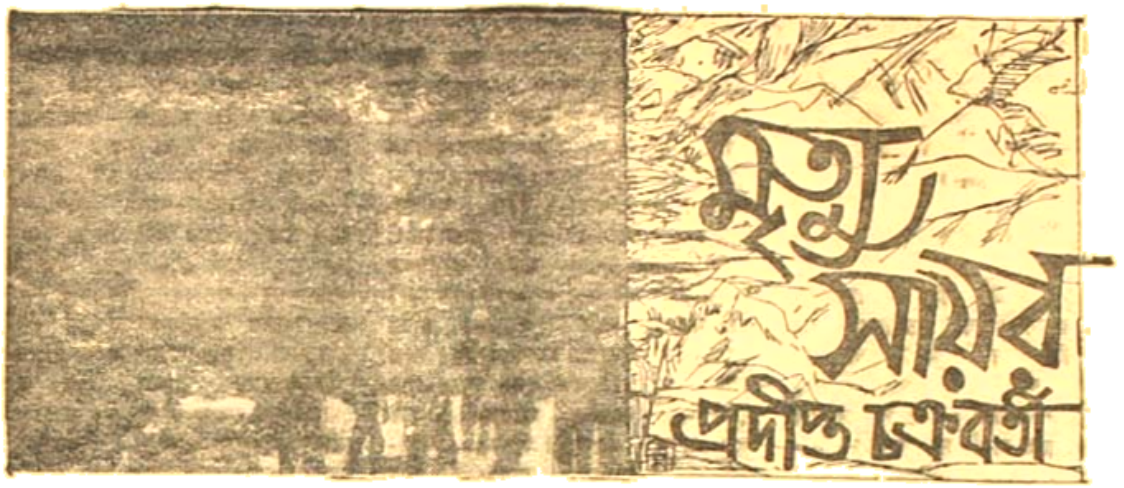

কে যেন বলেছিলো—পাহাড়ের [illegible] নেশা লাগে।

আর নয় তো এমনই বা হবে কেন? ছেলে তো কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে ছিপ্পী-লিপ্পী করে বেরিয়েছিলাম; এ ভূত মাথায় চাপবে কেন?

মনে পড়ে বেশ অনেকদিন আগের কথা। বোম্বাইয়ে গিয়েছিলাম বেড়াতে। বিবিধ ট্যুরিস্টের মত ঘুরে-ফিরে শহর দেখি বোকা বোকা চোখে। কোনো সূত্রে স্টুডিও পাড়ায় গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি রূপকাপুরে রানীকুমারী। এমন সময়ই একদিন বলেছিলেন আমার এক নিকট আত্মীয়: তুমি পাহাড়ে গিয়েছ?

কবিন ধরে একটানা বৃষ্টি নেমেছিলো বোম্বাইয়ে। ঘর থেকে বেরুনোর উপায় নেই। ঘরে বসে বৃষ্টি অনবরত ঘুইস রোড প্রায় কাবু। চার্চগেট স্টেশনে ঘন্টা আসার পারমাণও প্রায় কুন্ধ। ইরোজ সিনেমা বন্ধ হতে চলেছে। জামাইবাবু কবিন আগে ফিরেছেন বিদেশ থেকে। আমাদের ঘুরুশ্রেন বলছেন। তাঁর দেখে চিত্র বিবরণ। তিনিই প্রসঙ্গটা তুললেন,—পাহাড় দেখেছো?

এক্সট্রা প্রশ্ন—একটা নিঃশ্বাস—আমার বেড়ানোর পথের আমূল পরিবর্তন করেছিল। ফিরে এলাম কলকাতায়। মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো পাহাড়, পাহাড়। হিমালয়, হিমালয়। তখনকার চাকরিটা আমার বেশ ভিজে। আমার পরে কেউ নেই। কম বেশি বেরিয়ে পড়ি। ছুটি-ছাটার চিন্তা নিয়ে নেই। আর পরনা-কড়িতেও টান বিশেষ থাকতো না। কাজেই সুযোগ সুবিধেমত একাধিক বারজীলিঙ পাহাড় ঘুরে এসেছিলাম।

শিলিগুড়ির ছোট ছোট ছবি ভাল লেগেছিলো। তরুলতা-ঘেরা পাহাড়ী গ্রাম-গুলো। সুন্দর-নিরিবিলি অবসরে ঘুরতে উৎসাহিত হল এক মোহনার ওপরের খাদ ছেলের সামনে। অতল-স্পর্শী খাদ-কলের আর চা-বাগানের ছেলেকে ভালবেসে ফেলার প্রথম দর্শনেই।

দেশটাকে ভালো লাগলেও দার্জিলিংকে কিন্তু ভালো লাগলো না। কেমন যেন ক্লান্তি-ভরা পরিবেশ—আর বাইরে থেকে আসা মানুষজনেরা। লোকজনের ভীড়, বাজারের আর ভেতরে সহজ-সরল স্থানীয় লোকদের মধ্যে এরা বরফ হয়ে বিরাট থাকেন। কোথায় যেন একটা বিচ্ছেদের বীজ সুপ্ত অবস্থায় আছে মনে হয়।

পরে পরে একদিন হাজির হয়েছিলাম ট্যুরিস্ট অফিসে। সেখানে ছেলেরা সমবেত পর্যটকদের সৌজন্য পরিচয় দেয় ইউথ হোস্টেলে বা ঘুরে নিবন্ধের। যেখানে থাকলে প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যে উপভোগ করা যাবে এই পাহাড়ী ছেলেরা যেন সহজ-সরল পাহাড়ী মানুষজনের সঙ্গে।

কাম-পাইসা খরচায় ঘুরিয়ে বাড়িয়ে দেখা দার্জিলিংএর নিরিবিলি ঘুরে-ফিরে—অমনি-ধারা। ছুটি ফেলার ছেলে কলকাতা; পরে ছুরে ছুরে ভালবেসে পাহাড়ী গ্রামগুলো। পাইন, দেবদারুর জঙ্গল। সহজ-সরল পরিশ্রমী মানুষজনের সঙ্গে কাটানো দিনগুলো চিরস্মরণী হয়ে থাকবে মনের মধ্যে। পূর্ণ পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়।

দিন কাটে। দেবদার-পাইন-সিডারের পাহাড় ছেড়েই। হিমালয়ের নগর বন্দর ছোট্ট সহজ-সরল অঞ্চলগুলি। পাইনের পাতা ঘরে ঝরা হাঁটার মনে হয় তখনো-এ এই রকম ঝরা পাতা ছেয়েছিলো না। তাদের এসে দলন পরিবর্তিত এইরকম এক রহস্যেই। সহজ-সরলতা ছেয়ে থাকে না। উদ্যান গাঁয়ের ঘর ছুটে চলে ছোট্ট পাহাড়ী গাঁয়ে—পাহাড়ী পথে-প্রান্তরে। যেখানে কেউ নেই। বিরাট নিস্তব্ধ নির্জনতা। কাছের সাথী মাত্র, বিরাট বিরাট শাওলাজড়া পাথরগুলো। টুপ-টাপ করে শিশির ঝরে। ঝরে পাতা ঝরা নাম-না-জানা পাখীর। সরল পাহাড়ী মানুষজনের সঙ্গে কথা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা। দিন পড়িয়ে রাত হবে। তাড়াতাড়ি ঘরে পড়। কি সাঙ্ঘাতিক ঠাণ্ডা রে বাবা! তারপর মাঝরাতে হয়তো ভালুকে এসে গরুটা খাবে। চিন্তা করতে করতে কোন কৈ পাওয়া যায় না।

এই চলছে একটানা। কোন বাধা-ছন্দ নেই। বসন্তের সুরুতে গাছের পাতা গজানোর দিন থেকেই মনে অস্থিরতা হয়—এবার কোথায়, এবার কোথায়? পাহাড়ী গাঁয়ের চিন্তা—যত্তা সহজ হয়েছিল এত্তা এবার। ঘরে বন্ধুবান্ধব বাড়ে। সবাই ছোটে। সবারই উৎসুক। সবাই যেতে চায়। ফেব্রুয়ারী কালেই চিঠি আসা সুরু হয় বিভিন্ন দিক থেকে—এবার কোন্ পথে? কি ঠিক করলে? কবে যাচ্ছো কোথায়?

অভিজ্ঞতা অনেক নেই। পর্বত অভিযানের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা চিন্তা করি না কোন পর্বত-শীর্ষে উঠে পতাকা প্রোথিত করে নিজেদের শৌর্য-বীর্যের প্রমাণ রেখে আসবো সমতলের অধিবাসীদের জন্যে। পর্বতারোহণের কোন শিক্ষা। সারা বছর সরকারী ধরচে পাহাড়ে ঘুরে শিখি—গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই সরকারী বরফ সম্বল করে—কিন্তু কখনো কখনো এই বাঁধাধরা জীবন থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে। তখনই ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা হয় বিরাট প্রান্তর বিস্তারের মধ্যে। কখন হয়তো

আমরা কয়েকদিনই আগেই এই বিরাট রহস্য ভেদ করতে পারবো। কিন্তু তারই জন্যে দুপুরের চেনা সাজা বন্ধ করে। সমস্ত মন ভরে উঠে থাকে এই নিয়ে কয়েকদিনই ভরা।

॥ দুই ॥

হাতে একটা বই এসেছিলো। রামেশ ঈমানের লেখা তেনজিং কথিত আত্মজীবনী—মাই অন এভারেস্ট। কিছুদিন আগে ঘুরে এসেছি লোকপাল-নন্দনকানন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধবলগিরির পর্বত-সানুদেশে সেই বিরাট বিস্তৃত ফুলের সমারোহ। চারদিকে বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানে ফুলের সমারোহ। বাঁরুণ থেকে তমেঙ্গপুর জেলার ছোবজাঙ্গ লামাকাম্পের দেশ ঝাড়ুমাসে। বাস-বহুরের চালালে ফুল ফোটে। চোখে ভাসে নন্দনকাননের বিরাট অপার সৌন্দর্য। দেখতে পাই মনশ্চক্ষে লোকপাল হ্রদের বুকে মেঘ-রৌদ্রের খেলা। শুনতে পাই লোকপালজীর মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। কয়েকদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলাম। অবসরটা দুপুরে নামাম রাইটার্স বিল্ডিংসের চার তলার কোণের ঘরে আড্ডা জমে উঠেছে। সেই সময়ে পাহাড়ী অভিযানের অন্যতম সঙ্গী কানুই বইটা দেখালো। অনেক দিন আগের পাঁচটির পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কিনেছে। বেশ সস্তাতেই পেয়েছে বইটা। আর রাত জেগে পড়েও ফেলেছে। ওকে অনুরোধ করেছি একটা আলোচনার। তেনজিং নেহরু ওলমাস্টনের সঙ্গে সাউথের কাজে নন্দাদেবী উপত্যকায় গিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। এবং তার বর্ণনা আছে এই বইয়ে যেখানে তেনজিং বলেছেন, নন্দাদেবী উপত্যকার সৌন্দর্য নন্দনকাননের থেকে অনেক—অনেকগুণে বেশি।

আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। অনিন্দ্যসুন্দর উঠে পড়লেন—আবার হোমকুণ্ডের পাহাড় সুরু হলো! নতুন করেকজন এসে জুটলো—এবং আমরা কজন এপ্রিলের মাঝামাঝি দুপুরে রাইটার্সের চার তলার কাইল-কর্তব্যের ঘরে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম নন্দাদেবীর পাদদেশে আমরা কজন ঘুরে বেড়াচ্ছি বুক সমান উঁচু ফুলের জঙ্গলের ভেতরে ভেতরে।

সাবধান করে দেওয়া সুরু হলো বন্ধুদের। নন্দাদেবী উপত্যকা সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেল—এই পুরো উপত্যকার স্থিতি হচ্ছে নন্দাদেবীর পাদদেশ থেকে চোদ্দ থেকে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবীকে ঘিরে ঘুরেছে চারদিকে অনেকগুলি পর্বত, যাদের কোনটার উচ্চতাই বিশ হাজার ফুটের কম নয়। এবং সেগুলি অতিক্রম করা বাঘা বাঘা পর্বতারোহীদের পক্ষেও বেশ আয়াসসাধ্য নয়। একমাত্র উপায় হচ্ছে ঋষিগঙ্গা নদীর প্রবাহপথ ধরে এগোনো। যে নদী বদরীনাথের পথে হনুমান চটির কাছে এসে মিশেছে অলকানন্দায়। তবে এ-পথও খুবই দুর্গম এবং বছরে মাত্র দুটি মাস অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট করে এ পথে এগোনো সম্ভব। ঋষিগঙ্গা নদীর প্রবাহপথ অনুসরণ করা সম্ভব জোশী মঠ থেকে তপোবন হয়ে রিণি গ্রাম এবং সেখান থেকে ধৌলিগঙ্গা হয়ে এগোলে ঋষিগঙ্গার প্রবাহ পাওয়া যায়। এবং এ পথও খুবই বিপজ্জনক এবং সাধারণত পর্বতারোহণের উপযুক্ত শিক্ষা ও সরঞ্জাম নিয়ে এ পথে যারা প্রায় যাতায়াত করেছেন। কেন না, বিভিন্ন অভিযানের কাহিনীতে দেখেছি, এ পথেই নন্দা-ঘুন্টি, রাঙ্কি, বেথারতলি হিমালয়ের অভিযান হয়ে থাকে এবং অভিযাত্রীদের এ পথে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

দিন গড়িয়ে রাত আসে। ফিরে আসতে হয় কর্মস্থলে ঝাড়গ্রামে। একা একা মনে মনে চিন্তা। কি করা যায় কোন্ পথে? অসুবিধা হয়েছে আজকাল এসব ব্যাপারে, সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। চৈনিক আক্রমণের পর থেকে ভারতের উত্তর প্রান্তের দরজা বন্ধ হয়েছে আমাদের সামনে। প্রতিপদে পারমিট-পারমিশনের অনুশাসন। এবং এ বিষয়ে সর্বেসর্বা ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন। নয়াদিল্লীর সে কর্তারা আমাদের হৃদয়ের আকুলি-বিকুলি বুঝতে, অনুভব করতে অপারগ। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া উত্তর হিমালয়ের কোন ম্যাপটাপই বর্তমানে সাধারণের বিক্রি করেন না যে, আমরা আমাদের পথের খোঁজ সেখানে পাবো—পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে আন্দাজ, নিজেদের ধারণা এবং পাহাড়ী গাইডদের ওপরে। আর মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনকে লেখা বাতুলতা—আমরা তো অভিযানে যাচ্ছি না—আমাদের পেছনে নেই কোন তথাকথিত কেষ্ট-বিষ্টু নেতা। কাজেই ওপর মেহেরবানি হবে না—বলেই তাঁরা খালাস।

কিন্তু হৃদয়ের আকুতি বাধা মানতে চায় না। আবার ছুটে আসি কলকাতায়। আবার কোন এক বৃষ্টি-ধোয়া দুপুরে রাইটার্সের বৃষ্টির ছাঁটে ভেজা টেবিলের ফাইল সরিয়ে রেখে আলোচনার আসর। নতুন বিয়ে করেছেন আমাদের অন্যতম সঙ্গী গোপদা, তিনিই বললেন—আচ্ছা দীপু—অমন আর একটা পথের কথা চিন্তা করলে কি হয়? আমি কদিন ধরেই ভাবছি—ঋষিগঙ্গার উপত্যকা তো আছেই কিন্তু জোশীমঠের সামরিক আইনের বেড়াজালে না জড়িয়ে আমরা যদি আরমোড়া গোয়ালদামের রাস্তা দিয়ে যাই। গোয়ালদাম থেকে রূপকুণ্ড। তারও পরে হোমকুণ্ড এবং এদিকে পাওয়া যাবে ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টির মাঝে প্রসিদ্ধ হোমকুণ্ড পাস—বা কম। ঋষিও আজ পর্যন্ত এ পথে কেউ যায় নি। তবে বহুদূরে জানা যায় প্রাসঙ্গ পর্বতারোহী লর্ডস্টাফ ১৯০৫ সালে এই দিক দিয়েই নন্দাদেবীর পাদদেশে একবার পথের সন্ধান করেছিলেন। আমরা যদি কোন রকমে এই বিরাট প্রসিদ্ধ উৎরাইটি নেমে নন্দাদেবী উপত্যকায় নামবার পথ করে নিতে পারি তবে সেটা নেহাৎ মন্দ হবে না। আর যদি নাও পারি ক্ষতি নেই। কেন না, রূপকুণ্ড হোমকুণ্ড আমাদের দেখা জায়গা নয়—এবং সাধারণ পাহাড়ী পথের চলনকারী হিসেবে রূপকুণ্ড পথের দুর্গমতা, কষ্ট এবং শীত আমাদের ভবিষ্যতের পথ চলার অনেক শিক্ষাও দেবে।

যুক্তি হিসেবে কথাটা মন্দ লাগলো না। জোশীমঠের কথায় মাত্র পাঁচের দুরভোগী আমরা হাড়ে হাড়ে। ১৯৬৬ সালে আমরা ঠিক করেছিলাম বদরীনাথ হয়ে সতোপন্থে যাবো। কিন্তু রাইটার্সের অনুমতি আইন অনুযায়ী চামোলীর জেলা শাসকের কাছে যাবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখা হয়েছিলো বহু আগেই। তাতে আমাদের নামধাম পরিচয় দেওয়া হয়েছিলো পরিষ্কারভাবেই। এবং তিনি অর্থাৎ চামোলীর জেলা-শাসক ভদ্রলোকের এক কথার মত আমাদের প্রতিটি পদের জবাবেই জা না লে ন—জোশীমঠের তহশীলদারই প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবেন—এবং সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। অতএব খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে পাঁচ কপিতে হাজির হয়েছিলাম জোশীমঠে—কিন্তু কোথায় কি? তহশীলদার একটি পরিষ্কার জবাব দিলেন—সতোপন্থ যেতে দেবার মালিক তিনি নন—এসব অঞ্চলে সামরিক কারণে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা শত অনুনয়ের পত্রাবলী পেশ করেও তাঁকে টলাতে পারে নি। অবশেষে

লোকপাল-মদনকানন-বন্ধুরা যে যে ই সন্তুষ্ট থাকতে হয় সে সবার। অথচ সে সবই জানতে তিনটি পর্বত অভিযান সে অঞ্চলে হয়েছিলো—যার প্রতিটিতে কম করেও এগারো-বারোজন করে কুলী ছিল। আমরা বুঝতে পারি না, অভিযানের দেখভালে কি এতই সন্দেহজনক যার জন্যে অভিযানের খুঁটো পরিচয়জ্ঞাপক নিদর্শনসহ পেশ করা সত্ত্বেও আমাদের কাছে উত্তর হিমালয়ের দ্বার আজ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে—অথচ অভিযানের সঙ্গী কুলীরা যাচ্ছে কিসের জোরে—অভিযাত্রীদের না হয় পরিচয় আছে—কিন্তু কুলীদের মতো কি ছদ্মবেশী গুপ্তচর থাকতে পারে না। সরকারী আমলাদের নিজে মস্তিষ্কের বিচারে আমরা কি দালবাহকেরও নিচের পর্যায়ের?

যাই হোক সহযাত্রী লোকেশ্বর ঘোষাল অর্থাৎ ঘোষুদার প্রস্তাবেই সবাই মোটামুটি সায় দিলো। এবং বন্ধুবরীত আমাদের অফিস কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ গুরু ওকে কানুরে পরেই ছাড়ির চাপলো চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে। প্রথমেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন এ পথে নিষেধের বেড়াজাল আছে কি না এবং তারপরে লোকালয়ের ডাকবাংলোগুলির অবস্থান। কুলি এবং গাইডের ব্যবস্থা।

হাতে কিছু সময় ছিল। ঘুমসুতে আজকাল বছরে দু-চার দল যেতে শুরু করে। তাই ট্যুরিস্ট অফিসে খোঁজ পাওয়া গেলেও তেমন আর কেউ পায়ে হেঁটে হাঁটার হওয়া দেশ ডালহৌসীর ভাবও সরকারের দপ্তরে। সেখানে তাঁরা ইদানীং বিদেশী মার্কা ট্যুরিস্ট নিয়েই ব্যস্ত। ঘুমসুতের খোঁজ তাঁরা বিশেষ রাখেন না এক পাশাপাশি চেয়ারে বসা দুজনে অবলীলাক্রমে পরস্পর বিরোধী মত জানালেন পারমিট-এর যা পাবে। ঘুরোর বলে সবে বেরিয়ে এসে ওরে শান্তি।

ঠিক হলো আপাতত অলমোড়া আর শ্রীনগরের ট্যুরিস্ট অফিসে চিঠি লেখা হোক ঘুমসুত পর্যন্ত যাতায়াতের বিস্তারিত জানতে চেয়ে। এবং সেই অনুযায়ী পরের ব্যবস্থা করা হবে। অন্য দুজনের ওপরে ভার পড়লো জিনিসপত্র যোগাড়ের। বেশী ওজন হতে হবে বস্তুরে সম্ভব। কাজেই এয়ার ম্যাট্রেস এবং স্লিপিং ব্যাগ পেলে ভালো হয়। দল মোটামুটি ঠিক করা হোল পাঁচজন নিয়ে। বেশি হলে নানা অসুবিধা। সেভাবেই হিসাবপত্রের ব্যবস্থাও চললো।

কাঠগুদাম থেকে চিঠি লেখার দু' জায়গার ট্যুরিস্ট অফিস দু' রকম জানিয়েছে—একজন বলেছে পারমিট লাগবে, অন্যজন বলেছে না। আবার যোগাযোগ কোলকাতায়। এর জন্যে পাইটারীর বন দপ্তর থেকে চিঠি এসেছে পথের ডাকবাংলোগুলোর হদিশ দিয়ে। আর ওখান থেকে লিখেছে গাইড রাইচাঁদ সিং। তাদের এ পথের শেষ জনবসতি ওদের। সেখান থেকে পথের দায়িত্ব স্বীকার করেছে রাইচাঁদ। লিখেছে, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আবহাওয়া ভালো থাকলে ঘুমসুত যোমসুতের নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত আছে। কুলির ব্যবস্থাও করতে অসুবিধা হবে না।

পারমিটের ঝামেলা মেটানোর জন্য এবারে সোজাসুজি লেখা হোলো চমোলীর জেলা শাসককে। যাতায়াতের মোটামুটি হিসেব করে নেওয়া হোলো এবং সেই অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের ধন দপ্তরে লেখা হলো পথের ডাকবাংলো কটি আমাদের জন্যে রিজার্ভ করতে। রাইচাঁদকে লিখে দেওয়া হোলো আমরা যেন সেপ্টেম্বর ঘুমসুতে সোয়ালঙ্গায় পৌঁছুবো—ও যেন মালবাহক নিয়ে উপস্থিত থাকে। মোটামুটি-ভাবে জনা আটেক কুলি হলেই আমাদের চলে যাবে।

টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে মাঝে মাঝেই কানু করেকদিন হয়েই। কিছুতেই আর হিসেব মেলানো সম্ভব হয় না। মাস গেলে সামান্য কটা টাকা আমরা পাই। সেদিকে নুন আনতে পানতা ফুরোর অবস্থা। সঙ্গী দুজনই নতুন বিবাহিত। সংসারের চাপ। অথচ হিসেব যা মাথা খুঁড়ে আবার মোটামুটি। খুব কম করেও লাগে হাজার তিনেক টাকার ধরেছি। আসবে কোথা থেকে?

কাটো কাটো—খরচ কমাও। কোন্ত

হচ্ছে? আরে বলা, কিনতে হবে না তোমার হুকোতে হলে যাওয়া চলবে। নেই দরকার ঈস্টওয়ুড। কেবলে এতদিন ঘুরেছি—সেতবেই যাবো। কম্বলে চিরকাল ঠাণ্ডা আইকেছে, মোদ্দুকথা কয়ে বছরের ওপর বেঁচে কাটিয়েছি একটা কম্বলে—কাল্পের রাত তেইশে ছেঁড়া চাদরে আর এখনই দরকার হবে হুকুবার হলে! ছেলে সব চাঁচিয়ে উঠলো অমিল। অবশ্য কাউকে দরকার নেই। কিন্তু অন্তে তো হুইস্কি খাবে বন্ধুরা। তা তো বোঝেই, তবে উপায়? বাবা, একটা কিছু হবেই—কতটা মুখে চুক চিরে পেনসিলের শিস্ বন্ধুরা থেকে কাল—বড়বাবু উঠে এসে অফিসের অবোধের পুনরোধন। যেমন হচ্ছে হচ্ছে।

অফিসের শেষে কার্জন পার্কের আঁধারে বসে আলোচনা। মুখের নিজনগুলো বদলে নেবে। বাস কাটে না। মন কটা ঘুরে চলে হিমালয়ের কোন দুর্গম অঞ্চলে কোথায় চিরবসন্তের রাজ্যে কোন একদিন মুক্তির কোলে ঢলে পড়বিস এতদিন সন্দেহ। নরনী-শিল্পী-হুবেক-দুখে। কে তারা কেন এসেছিল? কি তাদের পরিচয়? কোন্ দুর্গম তাদের মুক্তির কথা বলেছিলো—তারও যে হিসেবের কড়ি নেই। নরা যাবো তাদের দেশে। প্রাণের খাদ্যাভাব ঘাড়িয়ে। চোখ কোথায় মনের অন্তরে অনুভূতি অনুভব করতে কোন্ টানে তারা ছুটে এসেছিলো এই দুর্গম পথে—কোথায় তারা চলেছিলো তাও দেখতে যাবো তারা মুক্তপুরুষ পার হয়ে। আমরা হিম দুর্গমের অন্বেষণ। পথের বিপদ ভয়—সব চিন্তা মেন এককথায় চাঁড় করে হাসে কার্জন পার্কের আরামের নিবিড় সন্ধ্যায়।

চিঠি এলো ডেরাদুনের দেবু সান্যালের কাছ থেকে। না, মুক্তপুরুষের পথে যাবার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম। যাবার দিন মোটামুটি-ভাবে ঠিক করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে—এখন ডেরাদুনের চেক দিয়ে আসিস ঠিক করা হোল ১৯শে সেপ্টেম্বর। টেলিগ্রামের চিঠিতে আনন্দে আরও কথা জানাবে। ডেরাদুনেই থেকে যাবার জন্য কেন দেবু ইঙ্গিত জানিয়েছেন। অফিস থেকে দেবু আসবার। ছুটিটাকে বিশেষ-এ আমাদের আরও একটিন ছোটো ডেরাদুনের উদ্দেশ্যে করার আবার জন্য। নাই বা থাকলো তার অভিপ্রায়। আমরা তো আনন্দ সামলাবার জন্যেও তো লোক চাই। এদিকে দিন এগিয়ে আসছে। রাইটারকে কথামে পাকাপাকিভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো। ১৩ তারিখে মোগলসরাই পৌঁছাবি। লোকজন নিয়ে হাজির থেকো। তারপর বেরোল হলো ছুটির দরখাস্তটাই পেশ করা হয় নি। কর্তা মা বলে কপাল ঠুকে এক মাসের লম্বা দরখাস্ত দিলাম। মনটা ছ্যাঁ ছ্যাঁ করে—সরকারী মাসপাত্র আবার আটকে না পড়ি। ছুটি না পেলেই চিত্তির।

দিন এগিয়ে আসে। আকাশের বাতাসটুকার চঞ্চল আর মন চলতে পারে না। প্রাত্যহিক আহারে যোগদান হয়ে ওঠে অনিয়মিত। এদিকে কি হচ্ছে কে জানে—কাজের হিসাবের কর্ম তো আর বাকী রাখতে হচ্ছে। জিনিসপত্রের হিসাবে হচ্ছে গণিতা। পঞ্চাশজনের আয়োজন আটজন। পথে কেন কয়েকটা গ্রাম কাটাতে হবে তাঁবুতে। যোগাড় হয়েছে যে ক'টি, তাতে বড়জোর চল্লিশজনের ঠাঁই হবে। বাকী কজনকে সেকেণ্ড ক্লাসের নিচে হবে টিকিটের নিচে মালবাহকদের সাথে। মোল-আঠারো হাজার ফুট ওপরে যেখানে বরফের কম্বল গায়ে এভাবে কতক চিন্তাও তো কম-কম। একা একা চিন্তা করে যে পাওয়া যায় না। সব খুঁজিয়ে যায়—আবার চলো কোজাগরা। ছুটিটা পাওয়া গিয়েছে। বাক, বাঁচা গেল।

আগস্টের শেষ দিকে এলাম কোলকাতায়। সবই প্রায় মোটামুটি ব্যবস্থা হয়েছে। আটজন নিয়ে দল গড়া হয়েছে। পাহাড়ী-পথের অভিজ্ঞতা একমাত্র অনুভবেরই নেই। না থাকুক—অনুবিধা বোধ করি তো তাকে ওজনের ভার-বহনের ছেড়ে যাওয়া যাবে। ইচ্ছে আছে সুযোগ-সুবিধা বুঝে মেলে, তবে অন্তরের শেষ গ্রাম ওয়ানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ও অর্থনৈতিক অবিনিময়ের ওপর একটা নক্সার সমীক্ষা চালাবো। ওয়ানের পরেই যার সেদিক দিয়ে সুবিধা হবে। আমাদের অনেকের ভ্রমণ বিচিত্র করবে। অন্য আমাদের নিয়ে চিন্তা নেই। একজনেই বিদেশী বিদেশীর আমার চেনার নয়—পাহাড়ের অধিবাসীই উপরে পর্যটকেরা ঘরে তোলে। সেদিক দিয়ে অন্য আমাদের সম্বন্ধেই এই পথের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

কেনাকাটার আর পুরো বাকী। মুহূর্তে মুহূর্তে স্ফীত হয়ে—আমাদী-অন্নের হিসেবের তালিকা হিসেব আর যায় মনে না। অবশেষে টাকা। কত লাগবে। এদিকে ছাইটার টাকা সম্বন্ধে কিছুই জানার না। বিনয়ের অবতার মেকে বসে যাবুরা যা চেয়েন—তাই-ই আমদানী। কাজেই পাহাড়ী পথের পরিচয়ের বড় বাজার—দুনিকারা সম্বন্ধেই আমরা পুরো অন্ধকারে।

শেষ মুহূর্তের একটা লিস্ট মেলানো হলো। ঠিক হলো কাল্, সোদ্দুধা, দিলীপ আর অন্যদের মেয়েদের প্রথম সাতটা দিন-এ টাকা মিলিয়ে বাজার সারবে। তাতেই বাড়ীতে মোটামুটি খরচের কথা জানিয়েছে। একমাত্র সোদ্দুধা বাদে। সাত দশ আগে ফিরে এসেছেন নাড়। অনিশ্চিত যাবার কথা তুলতে ঠিক ভরসা হচ্ছে না। তবে ইচ্ছে আছে শেষ মুহূর্তে জানাবে বাড়িতে আর বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না।

প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা অনুযায়ী সংগ্রহও সমাপ্ত। একমাত্র বাকী রইল ট্রেনের টিকিট কাটা। এবং এ সময়ে ট্রেনের ভীড় বিনা রিজার্ভেশনে যাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। পায়ে পায়ে হাজির হওয়া গেল পূর্ব রেলের জনসংযোগ দপ্তরে। বিনা মূল্যে প্রচুর জ্ঞান লাভ করা গেল সেখানে। এবং অবশেষে বিদায়ে আপ্যায়ন করার জন্য তাঁরা জানালেন—সারানিনের ছুটোছুটি আর চিন্তার কিছু ভাল লাগছিলা না। ঠিক হলো নিজেরাই পরদিন সকালে হাওড়ায় এসে টিকিট কাটবো। যদিও সেদিন আমাকে অফিসের এপারোটার গাড়ি করে আড়ম্বরে কিরতে হবে। কোলকাতায় আমার নিজের থাকার কোন ঠেকা নেই। যখন যেখানে মেজাজ হয় ছেকে যাওয়া। পরদিন কেবলমাত্র কাল্পের সাথে টিকিট কাটতে যাবার কথা—সেদিক দিয়ে টেলিগ্রাম ওর বাড়িতে থাকাই ভাল। কাজেই অফিস ফিরে হাত মুখটা নামাবার ফাঁকে ওর বাড়িতে। ওর মা স্নেহে ছিলেন। কাল্পের যাবার ঘরে ঢুকেই তিনি এলেন আমার কাছে এবং পেশ করলেন একটি মোক্ষম প্রশ্ন—আচ্ছা ভাবীজ—তোমাদের সাহেব পুরোটা কেতা?, মুহূর্তের অবর্ণনীয়তায় অবাক হবার পালা আমার। ভাবে ফিলাম। নাটের গুরু মনে আগাগোড়া ঠিক। হ হ বুকছি। আমাকে থামিয়ে দিলেন তিনি, সাথে কাল্ বাড়ির বড় ছেলে, বিয়া করছে, পরবর্তির আছে। তোমার চাপড়ুলে নাই—ঘাটনদুলের বড় পুইয়া বেড়াও। তোমার মা সাহেব আর কি তাই মায়ে? তুমি কেন ঘরে চিন্তিবার চাহো?

—কি জবাব দেবো এ কথার। নিজেকে খাটী অপরাধী মনে হতে লাগলো। চুপ করে বসে রইলাম। কাল্পের ছোটভাই এসে আবহাওয়াটা হালকা করার চেষ্টা করলেন। অবশেষে কোনরকমে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু চিন্তাটা গেল না। এটা কি ঠিক হচ্ছে। সত্যি তো বটে,

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ত্রিপুরায় ৬ হইতে ১১ বছর বয়সের প্রতিটি বালক-বালিকা শিক্ষার সুযোগ পাইবে। ইতিমধ্যেই দূরতম গ্রামাঞ্চলেও চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তৈরী হইতেছে রাজপথ, জেলাপথ এবং গ্রাম্যপথ। পানীয় জলের জন্য নলকূপ ও ইঁদারার সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুপরিকল্পিত কলোনীগুলিতে যাযাবর আদিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি ক্রমেই প্রচলিত হইতেছে। কুটীর-শিল্প বিস্তারলাভ করিতেছে। মধ্যমায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। সমবায় সমিতির সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রামে গ্রামে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ভাবেই ত্রিপুরা অবশিষ্ট ভারতের সাথে আগাইয়া চলিয়াছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।

জনসংযোগ ও পর্য্যটন অধিকার ঃ ত্রিপুরা সরকার

ছলন মুখোটনা হয়। কোনো বিপদ দেখা দেয়! কোন্ সকালে বিছে এসে মুখ দেখাবো! কি কৈফিয়ৎ দেবার থাকবে! সারাটা রাত ঘুম হোল না। কেবলই চিন্তাটা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। কি আশ্চর্য! কিসের আকর্ষণে বার বার পথে নামি। খালি কষ্ট, কষ্ট, আর কষ্ট। কত রাত ঘুমে হয় না। কতদিন স্নেহ করে খাওয়া হয় না। রাহুল বলেছে-খাওয়া হয়। পাশ ফিরে দাঁড়ি। এক ঘাম হলো। তবু কি আসে! তবু কেন ছুটে চলি এই অপরূপ পথে! কেন হতেই উন্মুখ হয়ে ওঠে পাইতের দেব ছেলেই! এবার কোথায়! কোন্ বিদেশ!

রাত তিনটেতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। হাত-মুখ ধুয়ে এক কাপ কফি খেয়ে পথে নামা। দু' বন্ধুতে কিছু দূরে বর্ধমান ছেড়ে আসতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সাড়ে তিনটের মধ্যেই হাওড়া। স্টেশনে পৌঁছে দেখি, ও হরি এই রাতেই পাঞ্জাব মেলের লাইনে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে। চিন্তা হয়। কেন না নতুন নিয়মে হাওড়ার কোটা কম দিয়েছে। আর যাত্রীরা বার্থ। জিজ্ঞাসা করি জনে জনে। না, ওরা কেউই বল ঢাকিয়ে যাবে না। পূজোর যাত্রী। পূজোর জন্যে এক মাস আগে টিকিট নিয়েছে।

ভোর পাঁচটা নাগাদ বিমল এলো। টিকিট নেবে নেবে বেলা আটটা। আমাদের তিনটে টিকিট। হাতে নিয়ে চারটে চারটে করে গণনা গেল। তাই নই। বাইরে বেরিয়ে কলকাতার ছেড়ে দিলাম। তবু হোল, বাইরে থেকে অনেকে যারা আসছি, সবাই যেমন করে পারি আটটা হেলাকাতা পৌঁছুবো। ন তারিখ বেলা বারোটার ভেতর প্রত্যেক তাঁদের বাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে কলকে বাড়িতে পৌঁছবে। এক তখনই হবে পার্টিকলের কাজ আর এর আগেই কোলকাতার বাকী সন্ধী তখন সমস্ত কোলকাতা ছেড়ে যাবে-পত্র জমাবে কানুর একতলার ঘরে।

গল্পে কিছু সময় ছিলো। স্নান-খাওয়া সেরে নিতে শ্যামবাজারে বন্ধুর বাড়িতে হাজির হওয়া গেল। কিছু অভিমান, কিছু দুঃখের সাথে অভিযোগ মেশানো হোল। সেই পুরোনো কথা প্রতিবারই বলো এই শেষ আর ওপথে নয় এবার পড়লে যাবেই আমার ঘরে সেই পড়ে। এ তোর ছেলের সামনে করে।

কি করে বোঝাই আমি—কে যেন অলক্ষ্যে পাহাড়ের হাওয়ায় নেশা লাগে। এ নেশা কাটানোর শক্তি আমি নই।

॥ তিন ॥

এ যাত্রায় পাহাড়ের কিনলো যেন অন্যের চেয়ে দ্রুত গেল। অফিসের বাকী কাজকর্ম শেষ করে রাখলাম। অন্তত আমার অনুপস্থিতিতে কোন অসুবিধা দেখা না দেয়। বাসন নিয়ে কাজ করি এবং বাসের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়তি—দু' দলে ছুটো ছোটখাট ছোকরারও বাসনা হোল। তাদের আটই সেপ্টেম্বর সকালে যাবার ব্যবস্থা করে স্টেশনে এলাম বন্ধে মেল ধরতে।

ট্রেন প্রায় দু' ঘণ্টা লেট এলো এবং বেলা একটা নাগাদ পৌঁছুলাম হাওড়ায়। বন্ধুর বাড়িতে মালপত্র রেখে নিরস্ত্র কোলকাতায় বাজারে চললাম। বেলা পাঁচটা নাগাদ আবার ফিরে আসা কিন্তু নিয়েই ইয়াসুদের যেতে হলো। যাবার আগে নিজের বাড়িতে একবার দেখা দিয়ে যাওয়া দরকার।

হয়ে যাবার চৌকাঠে মাথা ঝুলেন, ঘরে যে পথে যাওয়া বড়ই জানি সে পথ আজ দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ। তবে, অনেকদিন পরেই দুটি ঘুরেছি পাহাড়-পর্বতে, অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই কিছুটা আছে, সাবধানে চলো, দোষারুপি কোরো না। দোষারুপির ফল কখনোই ভালো হয় না। সকলে মতো চিঠি দিয়ে খবর জানিও। আর সুস্থ শরীর নিয়ে সকলে ফিরে এসো। ইয়াসুদের চলন্ত গাড়ীর ওপর দিয়ে হাওয়া ছুটে আসছিলো। মাথার ঝাঁকুনি গরমে খোলা বাতায়নের পথে আমি সকল চেয়ে—প্রিয়-তুমার মুখে পথ হারিয়ে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে রয়েছি।

ন তারিখ দুপুরে দিন থাকতেও আমার মোটর ভয়ার উপায় ছিল না। সেদিনের বাজার থেকে আর অতি সতর্কতার সাথে অর্থ থেকে কিছু টাকা নিয়ে যাবার সময় করে পথে বেরোলাম। যাত্রীদের মধ্যে ট্যাক্সিতে পৌঁছতে হবে।

যাদব বৃষ্টি সামলো শ্যামবাজার পৌঁছবেই। কোলকাতা হয়ে পড়ে ছেড়ে কলকে যাবার। কিন্তু তারপর আর বেরোনো গেল না। চারটে অবধি এক-টানা বৃষ্টি। জল থৈ-থৈ পথঘাট। বেরুতে পারার মোটর হবে, কিন্তু উপায় নেই। অবশেষে কোলকাতে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসে ট্যাক্সিতে বোলাম। বেলা তখন পৌঁছে বাঁহারে ঘরে কলকে যাবি। দাদা হাওড়ার হাই ফল। সর্বারণী একটু চিন্তিত হয়েই ছেলেন। সামনে আর একটা বাড়ি বাকুছে। সেইও কলকে ছাড়ির সময়ে থাকবে। সিনেমার অগ্রিম মালপত্র আর গুরুপত্র-হাটের ভাড়ার ঘোর নামলো বাড়ি ছেড়ে। কানু বৌদির এসেছিলো বাইরে। চলন আমাই বোলো—বিমল ছেড়ে পারবে না। পরদিনের ওর মা মারা গিয়েছেন।

তখনও ট্যাক্সির ভাড়া মেটানো হয় নি। দাদা হাওড়া ফলন সকলের জন্য ডিম্ব-ভাজতে করতে এসেছি। বিদায় কর আশ্রুপূর্ণ ভত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে চলতে হয়েছে তার খবর তো অনেক রাখি। বাপ্প কাঁচনাড়ায়। এরা মুখে বাষ্পবাষ্পের মেলে। আজ এরা প্রবাসে বন্ধুর। আমাদের প্রতিটা চিঠি চৌদ্দ করানো, তোষামোদ করা, কতদিন কেন্দ্রে। আমার ছুটে বেড়ার টানা ছেড়ে টানিয়ে। ওর স্বিধেই একটু বেশি মাসে আর সেই সঙ্গে এক্সট্রাইনকাম প্রতি, এতেই আমাদের মোহ আমাদের আলোয়। বিয়েতে একটা বলের ঘোরার। মুখ-মুখে আটটে আলাদা মুখের বেয়ারাক। মুখ-মুখে আটটে আলাদা নেই। এক সঙ্গ মনের সঙ্গ একে সে চলতে। বিমলি ছেড়ে পারবে না বিয়েটা আমাদের ভবিষ্যতের নাড়া নির্ভরতা এবং তার সাজ যে পার্টিশিপেতে আটকে সেটা আরও বিবাদের।

মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ছেলের এলাম। কানু বললো বিমলি ওর বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে কাঁচড়াপাড়া থেকে এসেছিল। আমাদের সাথে দেখা করবার জন্য। দেরি থেকে ফিরে গিয়েছে। সাথের বাঁধনের সব জিনিস নিয়ে গিয়েছে বাঁধ আমাদের প্রয়োজন লাগে। আর দিয়ে গিয়েছে কিছু টাকা। পথে প্রয়োজনে লাগবে আমাদের।

রাতটা ভারি হয়ে গেল। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কি করুণ পরিণতি। এই মুহূর্তে কিছুই ভাল লাগছে না। আজ রাত থাকতে হবে না। কালকে লাগতে হবে। ছুটো, আর কলকে মালপত্র ছড়ানো। হিসেব মতো মেলানো আজ করতে হবে। বাঁধতে হবে। মালপত্র নিয়ে হবে, আজ প্রয়োজনে প্রতিটি জিনিসই সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। সবচে থেকে সেরাগুলি। ওদের বিদ্যা চিনি। হিসেব রাখতে হবে আলাদাকুল প্রতিটা জিনিসের।

মেঝে জুড়ে এসেছে মালপত্র জিনিসপত্র ছিল। কেন্দ্র থাকি ছেকে ট্যাক্সিতে নিয়েই অনেক হয়ে পড়েছে। কালকে সোজা স্টেশনে আসবে কষ্ট পাইনেছে। এত দুশ্চিন্তা মধ্যেও সোনুদা ঠিকই এসেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। কলকাতা মধ্যে কলকে খাবি চা নিয়ে এলো। চা খেয়ে আমরা সকলে হাত মোলায়ম পাখিদের কাজে। বাইরে আবার বৃষ্টি থামলো অবিরাম।

একসময় ছড়ানো ছেটে ওপরে পড়ে থাকি ঘরের মধ্যে আমার কলকে সঙ্গে ওদেরও রাত মেলাতে-মিলে হবে। অনেকের চেয়ারে বসে মিলেই আর ঐদিন তখন মিলে নিয়ে চলেছে—চেলার ফুরায় যাবে। ছোটখাট স্টেশন ছুটো। বালিশ ছুটো, সোনার দু' পাশেই-স্পিরিট দু' বোতল। সোনুদা পর পর সাজির যাচ্ছে জিনিস-গুলো। আমিন তখন তখন জানা-কাপড়ের

[বেলাল ১১০২ পৃষ্ঠায়]

(পূর্বানুবৃত্তি)

আশা—২

একটা বর্ষাস্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা চৌচালাটিকে ঘিরে। চোখের আশ্চর্যকুহক : একটা নিঃসঙ্গতার সঙ্গীত যেন গলার ওপরের মৃদু-বাতাসগুলো শুনে ফেলে। মেঠো পথটাকে ডিঙিয়ে ঝরে থাকা হলে খেয়ে ঘরানার পাহাড়ের উঁচু দিক থেকে নীচুতে দিয়ে—আড়া ফল্গু হয়ে ফল্গুধারা পরীক্ষিত্রুখে। আকাশটার অবস্থান এমন যে, যেখানে আকাশের বাগানবাড়ি চলছে, ঘনকালো বাহিনী তার মধ্যে কল্পনাকেও ছেড়ে পারছে না : তবে, পাশ ও ওপরে দিগন্তগুলো থেকে ছেড়ে চলছে আকাশটার ওপরে। ঝরিত বাদুর এক-একটা লম্বা আলো যা ছেড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর ওপরের কড়িকাঠগুলো হুকুমকে কাত করে পড়ছে ওপর থেকে নীচে।

চলছে আকাশটার উঁচুটা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ার দিক। দীর্ঘ যেখান থেকেই ঝিঁঝি আলো দেখা যায়, তবে দিগন্তের ঘন চোখে দিয়ে ফেলছে একেবারে আলোর ওপরে আর আলাভাল আলো চুপে ঘনকাল ঘনীভূত। কারণ, সোজা কড়িকাঠগুলো থেকেই পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাতে সন্দেহই আলো পাবে আবার দেখে ঘনকালো হয়ে পড়ে।

আদিবাসীরা ঘনকালোকে আলো ফেলবে ছাদ করছে তা দেখবার জন্য লোকগুলো পেছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে দেখছে। ওরা যত আলো উঠে এসে পড়ছে তাদের হাতের ওপর, আলোর ওপরগুলো ঝিঁঝিক হয়ে বৃষ্টির দিকে চলছে। আদিবাসী এতে তাদের চোখের আলো নেই ; তারা জানা করছে, আর হাসছে, ঘনকালো কড়িকাঠগুলো যখন আলোর তাদের পায়ের কাছে এসে পড়ছে তখন চীৎকার করে উঠছে। আলো যেখানে চোখের তার উঁচুটা দিয়ে যাদের ওপর পড়ছে তারা ছাই ছেড়ে উঠে হাতে-পায়ে লাফাচ্ছে, তারপর চোখান থেকে এক-একটা করে তারা চোখের আলো দিয়ে পড়ছে যাদের চোখের।

বিশেষ করে একজন যেন অন্ধকারে চেহারার আলোগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই এই আলাদা চলছিল আলো—ঘনকালোর পক্ষে ছিন্নভিন্ন কোট, মাথায় পালকের মেলীর টুপি, পরে কড়া আলো পালিসের জুতো। চোখগুলো নরম মুখ, লম্বা দেহি। হাতে লোহা বাঁধানো লাঠি—সেটা ঘনকালের উঁচুটা করে, ঘুরপাক খাবার মতো। উপর থেকে ঝরিতে পড়া কড়িকাঠগুলোকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ঘরটার চালা পর্যন্ত চলে ঘনকালের চোখের থেকে।

শুরু হয়ে গেল

ছিপছিপে লোকগুলো আলো পাবার মতো লাগল ; তার মাথার ওপরে লাঠিটা ঘুরে-ঘুরে করে চোখানোর আলো ফলে সোনা বাঁধানো মাথার পাগড়ি ঝিলিক দিয়ে গেল। তার টুপির ঝিলমিলে চোখের মেজাজ ভালো লাগে ; তার চোখগুলো কালো সাপের মতো লাফিয়ে ঘনকাল চিহ্নগুলো তাদের। কিন্তু এ ঘরে লোকটার চোখের খেয়াল নেই। চারদিকের সব কিছু ঘনকালে লোকটা একেবারেই. ছুড়ছাড় ; একটা বাচ্চা ছেলের মতো খেলে লাফ তার—যখন একটা ঘনকালের কড়ি তার পায়ের কাছে এসে পড়বে আর পায়ে লাফাবার তাহলে সে আবার নিয়ে পালে সরে যাবে।

এ আসরে সে নিঃসন্দেহেই . প্রতিযোগী আদিবাসীদের।

তার বাঁধা চেহারা এবং ঘনকের সত্ত্বেও ওকে খুবই চৌকস মনে হচ্ছিল। ওই যখন কড়িতে আসছে একটা কড়িকাঠ—ওটা ওকে আঘাত করবেই.....কিন্তু না—পরিত একটা লাফ এবং বিপদ কেটে গেল।

শুরু হয়ে গেল

এমন কি ঘনকালো কড়িকাঠের ওপর দিয়ে ঘনকেশবার সে লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল এবং চেহারাটের ওপরে ওপাট ছিপের চোখের থেকে ঘনকো হয়ে হাততালি উপহার দিলো। বেশ কিছু ঘনকের ছিপ সেখানে ঘনকে ঘনকের লোকের তাদের, কেউ কেউ আড়া ঘনকের আকাশের চলাচল ছেড়ে ঘনকা পাওয়ার জন্য। আমার মনে হলো—লোকটা নিজের ঘনকে পড়েছে এবং তার ঘনকেশবারের ঘনকে ঘনকে ঘনি হয়ে নিজেকেও ঘনকে মনকে ঘিরেছে। বিপদ ঘুরে গেছে।

শুরু-হা-হা-হা সে চীৎকার উঠলো। হাত পালানো টুপি ঘনকে গেছে আবার লোকো। ঘিরে, মুখ ঘুরে উঠলো বাঁধানো এবং তার মেজাজটা ঘনকাল ঘনকে।

মুখে আদিবাসীদের কাছ লোকগুলো ঘনকের লক্ষণে হাসিতে ঘনকেরের লোকগুলো সবাই চীৎকার করে উঠলো। এবং একটানে তাদের আদিবাসি নিয়ে ঘনকেরো কড়িকাঠকে বিদ্রূপ করে ঘনকেরে। ঘনকের কড়িকাঠগুলো আবার লাফিয়ে নিজের দিয়ে ঘনকে উঠলই ঘনকের এলোমেলোভাবে এ-পাশ ও-পাশ থেকে পড়িয়ে আসতে লাগল এবং ঘনকে ঘনিয়ে দিয়ে তাদের বাঁধনের ঘনকতে লাগল। ঘোর আবার পুনো একজনের উৎসিক্ত করে ঘনকের বাঁধানো পাগলের ওপরে ঘনকে ঘনকে একটার পর একটা এসে পড়িয়ে পড়তে লাগলো।

শুরু-হা আ—হা পালানো টুপি পরা লোকটা তার লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বিকট-

[illegible] কিন্তু একটা [illegible] [illegible] [illegible]

হয়েছে বলেছেন। আমাই তোমার নির্ভর—তিনি এই কথাটাই বলেছিলেন। নির্ভর!—দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকাই তোমার নির্ভর—আর স্বচ্ছন্দে সহজভাবে।'

আমি তাঁকে বলেছিলাম—এই সব অঙ্ক কথা, যার মা জ্যোতির্বিদ্যার আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু তিনি জোর করেছিলেন: আমি জন্মেই তুমি অনেকদিন বেঁচে থাকবে, এই জন্যই সব কিছু তোমার হোক্ষে যাবে। তুমি চেষ্টা করে দেখ একটা বিশ্বাস করে,—'

'সে কেমন করে হবে?'

'দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার নামগোত্র ছোট্ট অক্ষরে কোথা একটা কাগজে লিখে রেখে দিয়ো: যদি এটা তোমার মনে হয় যে, লোকটা যদি তোমার অজানা হয়।

'অজানা লোকের আগনে—মানে আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আমার কথায়,' তিনি বললেন, 'এটা বুঝতে পারা কি এতই কঠিন? মানুষ মাটির তিনি কলসীর কেউ কাউকুটো অন্ধকারের বা কোনো ঘরে আগনে লোকের বা অন্য কারো বাড়ির আগনে সোয়ামার জায়গায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আসে...'

অন্ধকারে আমার মাঝে আমার কথা বলার ইচ্ছা না করেই কি এটা ঘটলো—জানি, তাতাই হোক, আমরা সকলেই যদি একটি যদি মনের আশা নিয়ে জন্মাই, তাহলে আমরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতে কতটা জানি না কেন,—অথবা সেই বাঁধনটাই চেতনা একটা ফাঁস আমার উপলব্ধিতে। তাই ভাবি, অন্ধকারে আমার আমার আমার-হওয়ার চিন্তা শক্তিত হলো। আমি বাড়ি ফিরলাম, মন খারাপ এবং তাঁর কথাগুলো একটা কাগজে লেখক করে রাখলাম। মনে মনে ভাবলাম, পরিমার জ্যোতির্বিদ্যা প্রমাণ করে দেখা যাবে।

সেই সপ্তাহের শেষে আমার বাড়ির উপরে নিচে ভাড়াটেদের বাড়িতে আগুন লাগল। আমি আমার মেয়েগুলোর কাছে সারাদিন একটা জরুরী মিটিঙের কোরে ছুটে বিদায় আসছিলাম। আমি—আমি মনে মনে বললাম, 'কথাটা তো কথা নেই—উপরে সন্ধ্যা হলো। এখন দেখা যাক—ভবিষ্যতের সাক্ষাতে কি ঘটনা পাওয়া যায়।' কিন্তু কিছু আমার পরিচয়, বিশ্লেষণে তোমার যে ছিল একমাত্র ভরসা এবং অতলের সহজে সে আমার হারাতে পারতো। কেবল জ্যোতির্বিদ্যার শেষ সত্য হবার আগেই আমি তাকে হারিয়েছি।

(ক্রমশঃ)

শুভমুক্তি শুক্রবার ৩০শে অক্টোবর!

দুরন্ত যৌবনের উদ্দাম উচ্ছলতা আর উন্মত্ত ক্ষুধার নেশা!

যুগে যুগে পুরুষরাই প্রেমের তাগিদে মিথ্যাথে জীবন দিয়েছে, এক দুঃসাহসী যুবকের রক্তঝরা প্রেমালেখ্য !!!

রিগ্যাল ঃ কৃষ্ণা ঃ প্রিয়া ঃ তসবীরমহল

দীপ্তি ॥ পিয়ালী ॥ পি-সন ॥ কল্পনা ॥ সিকাডিলি
শ্যামশ্রী (ভাপ নিঃ) ॥ আনন্দম্ ॥ দীপক ॥ জয়শ্রী
(হাওড়া) (বন্ধুবান্ধব) (উত্তরপাড়া) (হিন্দ
সন্ধ্যা ॥ রজনী ॥ কুইন এবং অরুণ
(শ্রীরামপুর) (আসানসোল) (ভদ্রেশ্বর)

॥ মিউজিক্যাল কিংস্ প্রাইভেট লিমিটেড পরিবেশিত ॥

সত্তরের নির্বাচন ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ

অসীম মুখোপাধ্যায়

উনিশশ' সাতচল্লিশ থেকে উনসত্তর—এই দীর্ঘ বাইশ বছর একটানা লড়াই চালিয়ে পাকিস্তানের মানুষ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার যে অধিকার আদায় করে নিয়েছে, তা কেবল তাদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পরিচায়ক নয়, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনাও বটে। দূর-দূরান্তের শোষিত মানুষ, অবহেলিত মানুষ—যারা পৃথিবীর বুকে জন্মেও পৃথিবীর সুখ থেকে বঞ্চিত, যারা মানুষের মর্যাদা পেয়েও মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি পায়নি এবং এই অধিকার, এই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে বা করতে চাইছে, পাকিস্তানের জনগণের এই সাফল্য তাদের মনেও বিপুল দৈর্ঘ্যস্থায়ী আনন্দোল্লাস সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের গণতন্ত্রপ্রেমী জনগণ তাই আজ তাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, বরণীয় এবং আদর্শ স্থানীয়। বাস্তবিক, এই মর্যাদা, এই শ্রদ্ধা পাকিস্তানের মানুষ খুব ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারে। বাইশ বছর বাদে এই প্রথম প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন নির্বাচন হতে যাচ্ছে—সুতরাং কুইজ কোম্পানী, এইরকম ঐতিহাসিক প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যাদের সম্যক পরিচয় আছে, তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, পাকিস্তানের মানুষ এই বাইশ বছর ধরে এক চরম দুর্গতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে গেছে। যেমন—প্রথমত মুসলিম লীগের প্রতারণা। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে এবং অব্যবহিত পরেও সাধারণ মুসলমান লীগকে তার মুখপাত্র বলে মনে করত, মনে করত যে লীগ তার সুখ-দুঃখের ভাগীদার, তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। কিন্তু অতি দ্রুত লীগের মুখোশ খুলে গেল। পাকিস্তানের মানুষ বুঝল যে, দরিদ্র মুসলমানের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তানের দাবি তুললেও মুসলিম লীগ কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনী অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি সংগঠন মাত্র। সাধারণ মানুষকে তার প্রয়োজন হয়েছিল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য, যে রাষ্ট্র না থাকলে ঐ ধনী মুসলমানরা হিন্দু ধনিক, বণিকদের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষা, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং ক্রমবিকাশের সুযোগ পায় না। তাই প্রয়োজন মিটে যাওয়ামাত্র মুসলিম লীগ তার প্রকৃত চেহারাটা অতি প্রকাশ্যেই তুলে ধরল। পাকিস্তানের মানুষের লড়াই শুরু হয়েছিল ঠিক সেই সময় থেকেই। উত্তরবঙ্গের কৃষক আর পশ্চিম পাকিস্তানের আহমদীয়াদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল উভয় প্রান্তের মাটি। এরপরে এল ভাষা আন্দোলনের যুগ। বাংলার বদলে উর্দু বা বাংলার মধ্যে উর্দুর অনুপ্রবেশের মূলেও কিন্তু ছিল লীগের এ এক উপায়, সাধারণের বুকে দৃষ্টি-ভেদের ফাটল সৃষ্টি করা। কিন্তু সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হোল। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক এবং উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল, তা লীগের পক্ষে দুর্লঙ্ঘনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল এই কথাও যে লীগ পূর্ব পাকিস্তানীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের সংরক্ষিত উপর দৃষ্টিক্ষেপের কাজেই স্বার্থের গোলাপ ফোটাতে চায়। জাতির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই নেমে এসেছিল লীগের উপর। উনিশশ' চুয়ান্ন সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে জয়ভূমি হয়েছিল তার। সাধারণ মানুষ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, তারা লীগারদের বিরুদ্ধে বলাৎকারকেও নির্বাচিত করতে সম্মত ছিল। অনেক গ্রামে অন্তঃপুরবাসিনীরা ভোট দিতে গেছেন মাইলের পর মাইল হেঁটে। মধ্যবয়সী পুরুষেরা একটা বড় মশারির চারকোণ ধরে চলেছেন আর তার ভেতর আত্মগোপন করে চলেছেন মেয়েরা—এই দৃশ্য এখনও অনেকেরই মনে আছে। সত্তর থেকে সাতচল্লিশ—এই বাইশ বছর পিছিয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার সামাজিক চিত্রটি যদি আমরা দেখতে চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে, আজকের থেকে সেদিন কি গ্রাম, কি শহর অনেক বেশী জনসভায় এবং রক্ষণশীল ছিল। কিন্তু সেই বিরূপ পরিবেশেও পূর্ব পাকিস্তানের নরনারী সংগ্রাম করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। পূর্ব বাংলার মানুষের অতি সাধের, অতি আশার যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের কোনও প্রত্যাশাকেই মেটাতে পারে নি। কেন্দ্রে প্রথম মুসলিম লীগ ও পরে রিপাবলিকান পার্টি ছিল পুরোপুরি সামন্ত প্রভু এবং নবোদ্ভিত বুর্জোয়াদের সংগঠন। তারা এবং তাদের বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে গুলাম মোহম্মদ ও ইস্কান্দার মির্জা ইচ্ছেমত বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের নাচিয়েছেন। বাংলার নেতারাও নাচতে ছেড়েছিলেন! ফজলুল হক, আতিকুল হক, সোহরাওয়ার্দী, হাজিবুল হক চৌধুরী, মুজিবর রহমান বা পূর্ব পাকিস্তান কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা কম কলাকৌশল করেননি কত, ভাঙ্গ করেছেন তার অনেক কম! বাধা দেবার মত শ্রেণী সেদিন ছিল না। কেন না মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানে তখন সংগোত্রাত্ত মিলে-মাত্র তার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত বাঙালী তখন খুব সমঝদারই ছিল। আজ আন্দোলনে নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালী নিঃসন্দেহে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু এই কথা মনে রাখা দরকার যে, বাঙালীমাত্রই সেদিন উর্দুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দাঁড় তুলেছিল এবং তারা অনেকেই ছিল কৃষক ও শ্রমিক, আন্দোলনপ্রাণ মধ্যবিত্ত নয়।

সাই হোক, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা সাধারণ মানুষের মনে নিরাশার সঞ্চার সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই আসে খাঁ তাঁর সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করার অব্যবহিত পরেই পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীভূতায়নে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বিলোপ করা ছিল। সাধারণ মানুষ তাকার বা দাঁড়িয়ে পর নিয়ন্ত্রণ পাল সরকারকেই ছুড়ে মারছে। সেদিন এইরকমই নতুন করে কুখ্যাতি অর্জন করে জনগণ একনায়কত্বের থেকে পাকিস্তানের মানুষ অনেক বেশী সচেতন। তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব না—তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। উনিশশ' সাতচল্লিশ থেকে উনসত্তর এই বাইশ বছর পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষ পুঁজিবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই চালিয়ে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, গণতন্ত্রের

জন্য অবশ্যম্ভাবী। এই জয়ের স্বাভাবিক পুরস্কারস্বরূপ তারা লাভ করেছে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের অধিকার। দীর্ঘ বাইশ বছর পরে এই পুরস্কার তাদের হাতে এসেছে, কিন্তু যে অকল্পনীয় বিলম্বে—তার পরিমাণ সময় দিয়ে হয় না, তিন এইজন্যই বলা যায় যে পাকিস্তানের মানুষের এই জয় সারা বিশ্বের গণতন্ত্রসংগ্রামীদেরও জয়। তাই পাকিস্তানের সাইত্রিশ লাখ মানুষ আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল জানতে এত উৎসুক!

প্রথমে স্থির হয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচন আগে অক্টোবরে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিন অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বন্যাকবলিত হওয়ায় নির্বাচন পিছিয়ে গেছে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে সাতই ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে সতেরই ডিসেম্বর। সারা দেশে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে মোট পনের হাজার। জাতীয় পরিষদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ পনেরোই অক্টোবর। বাছাই-এর তারিখ সতেরোই অক্টোবর এবং প্রত্যাহার করার তারিখ চব্বিশে অক্টোবর। প্রাদেশিক পরিষদের জন্য এই তিনটি তারিখ হোল যথাক্রমে উনিশ, একুশ এবং আটাশে অক্টোবর। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মোট একত্রিশটি প্রতীক স্থির করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন নিয়ন্ত্রণকর্তা জনাব আবদুস সাত্তার ঘোষণা করেছেন যে, নির্বাচন আর পিছিয়ে দেওয়া হবে না।

আজ এই সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কি ভূমিকা নেবে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই নির্বাচন, সে উদ্দেশ্য তারা সফল করতে পারবে কিনা এবং বর্তমানে তারা যে বিরুদ্ধতা তাদ করছে এবং সেই ভাব থেকে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করা যায় কিনা, এই কটি প্রশ্ন খুব সঙ্গত কারণেই আমাদের মনে আসতে পারে।

আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে পূর্ব পাকিস্তানে বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে। জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলির অন্তত আড়াই ভাগ থেকে ষাট ভাগ, এমন কি পঁচাত্তর ভাগ আসনও তারা পেয়ে যেতে পারে। অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তানী দলগুলির মধ্যে আছে ভাসানীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ভাসানী ন্যাপ, মোজাফ্ফরপন্থী ন্যাপ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি বা পি. ডি. পি, জামাতে ইসলাম, ন্যাপ-মস্কো লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি।

মুজিবের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের পিছনে কেবলমাত্র বাঙালী-জনী, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়, অর্ধশিক্ষিত শ্রমিক ও কৃষকের সমর্থন আছে। নবোদ্বুদ্ধ বাঙালী শিল্পপতি গোষ্ঠী যে কারণে মুজিবকে তাদের আপন জন মনে করে থাকে তা হোল তাদ পূর্ব আঞ্চলিক শোষণমালের জন্য। এই কথা সত্য যে, পশ্চিম পাকিস্তান বলতে এখনও পর্যন্ত যেন পাঞ্জাবীদেরই বোঝায়, তেমন না এই পাঞ্জাবীরা অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের বঞ্চিত সাধিতে এবং ইউনিটের মাধ্যমে ক্ষেত্রে করে সাধিতে রেখে অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও গায়ের জোরে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের শাসন ও শোষণ বহাল রেখেছিল। এরাই আমার পূর্ব পাকিস্তানকে একযোগে ঔপনিবেশের আড়ত আর তৈরী পণ্যের বাজারে পরিণত করে উপনিবেশের পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি, পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর জন্মী শাসনের প্রবর্তন এই পাঞ্জাবীরাই চক্রান্তের ফল। কেন না তারা চায় নি যে, পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের বাজার এবং মানুষ তাদের হাতছাড়া হয়ে যাক। আজও তাদের এই মনোভাব অক্ষুণ্ণ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁর পিছনে যদি সামরিক সমর্থন না থাকত, তাহলে হয়ত পাঞ্জাবীরা এতদিনে তাঁকে হত্যা করার একাধিক চেষ্টা করত, কেন না রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া এক টইঁদুর ছেড়ে পাঞ্জাবী সামন্ত প্রভু এবং মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শিল্পপতিদের কাছেরী স্বার্থের হলে কুঠারাঘাত করেছেন।

পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে নিজেদের বঞ্চিতকে জনা করার তাগিদে পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান শিল্পপতি, বণিক এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী আজ দেখ মুজিবকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অধ্যবিত্ত বাঙালীরও কিছু মাত্রা অসন্তোষ আছে। পাঞ্জাবীদের চৌবাচ্চা এই পর্যন্ত চাকরীর ক্ষেত্রে তারা উপযুক্ত মর্যাদা পায় নি। এখনও দেখা গেছে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির বারো পরে, ভারতের কোনও এক অংশ থেকে আগত এক পাঞ্জাবী মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে তার কোনও আত্মীয়ের বাড়ী কিছুদিন বাস করে সরকারী কিংবদন্তির জন্য আবেদনপত্র পেশ করলে এক মাসের মধ্যে তার বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনও বাঙালী যদি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান তবে তাকে ঐ একই কাজের জন্য বছরের পর বছর ঘুরতে হয়।

তাছাড়া, ভাষা আন্দোলনের পরেও আয়ুব খাঁর আমলে নানাভাবে বাংলার মধ্যে উর্দুর অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর মনে প্রচণ্ড পাঞ্জাবী বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে, যার কিছু কিছু থেকে না সে নিজেই হেতো পায় সেটাকেই অনেক বেশী করে আঁকড়ে ধরে। তাছাড়া বিদেশে তাদের নাবিক সমুদ্রের বুকে ছেলে যাওয়া এক উত্তেজনা ছড়াবেই একটা সমস্ত আত্মীয়ের মত মনে করে থাকে। তেমনি পাঞ্জাবীদের কাছে চাকরীর ক্ষেত্র মাত্র দেশ, তাদের দেশের অধিকাংশ হয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা তাদের বাঙালীদেরই দেশ মনে করেছে। দেশ মুজিবর রহমান আজ সুযোগ্য এবং প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ্। তিনি এই সুযোগ বাঙালী জনসাধারণকে নিজের করে নিয়েছেন পুরোপুরিভাবেই। তাই আজ বাঙালী শিল্পপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, এমন কি শ্রমিক-কৃষকও দেশনায়ককে "আমার নেতা" মনে করছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপের ভাসানী, যা সাতষট্টি সাল থেকে শুরু হয়েছিল এবং এখনও চলছে তাও শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ে আওয়ামী লীগের হাতে ঠেলে দিয়েছে। নইলে এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আওয়ামী লীগ মাত্র এক বছর আগেও প্রধানত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করত। ন্যাপের শ্রমিক ফেডারেশন এবং কৃষক সমিতিই পরিচালনা করত কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষককে। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার আর এক কারণ হোল ইসলাম সম্পর্কে তার নিরপেক্ষতা। নির্বাচনী ইস্তাহারে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা স্পষ্ট করে না বলাতেও আওয়ামী লীগ এটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ইসলাম নিয়ে বাড়াবাড়ি তারা করবে না এবং হিন্দু এবং মুসলমান বাঙালীরাই প্রথম ও শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী নাগরিক। এই মনোভাব নিঃসন্দেহে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবশ্য এই কথাও স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম সম্পর্কে এই সহজ দৃষ্টিভঙ্গী মোজাফ্ফরের নাপ এবং ভাসানী ন্যাপেরও আছে। আওয়ামী লীগের সুবাদে আমার ফিরে আসি। আওয়ামী লীগ কি পূর্ব পাকিস্তানীদের দুঃখের পালা সাঙ্গ করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ নয়।

কেন? এর কারণ হোল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় দল নয়। পূর্ব পাকিস্তানেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার তেমন কোনও প্রভাব ছিল

না। তাদের মনোভাব ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে কোনো মীমাংসার ভার তাঁরা ছাড়বেন না। তাঁরা বলেছিলেন—এই দুটি সমস্যার ছয় দফা ও তাঁদের সমস্যা দুটোই সেখ-সাহেব জীবিত থাকা পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মধ্যাকাশে উঠে থাকবেন, তাঁর আগে পর্যন্ত তাঁদের কোনোই হিল্লে হবে না। তাঁদের মন যা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সেখসাহেবকে সেটা আগে পরে পথ থেকে সরাতে হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের কাছে তাঁর একটা গভীর আস্থা আছে বলেই এখানে তিনি কোন নির্বাচনী ঐক্য করতে চান নি। ভোটাধিকার প্রাপ্ত বার বার তাঁর কাছেই এসে ফিরে গেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেখসাহেবের এই আস্থা নেই। সেখানে আওয়ামী লীগ এত দুর্বল যে, পূর্ব পাকিস্তানের 'ক' শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলিও তার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। বাধ্য হয়ে সেখসাহেব সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এবার, নৈরাশ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তাঁর আশা আছে যে, ছাত্র নির্বাচনের পরে সিন্ধু ব্লকগুলি সহজেই আওয়ামী লীগে যোগ দেবে। কিন্তু এর পরেও আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কেন না, প্রভাব বিস্তার করতে যে পথে, সে পথে বাধা তো সে নিজেই সৃষ্টি করেছে, সেখসাহেবের ছয়-দফা দাবি পাকিস্তানের সাম্যতে প্রশ্ন এবং বিচ্ছিন্নতার কোনও মতেই মেনে নিতে পারবে না। পশ্চিম বিশ্বে অর্থে ভাষার তথা পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যারা, যারা আজও কৃষকের ঐতিহ্যের থেকে বেশ দূরে এবং কৃষকের বন্ধুকে নিজের স্বার্থান্বেষী বলে ভাবি করে তারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। বিচ্ছিন্ন সেখসাহেবের অর্থনৈতিক দাবিগুলি যদি স্বীকৃত হয় তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের বাজারটা কব্জা করার মত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। কাজেই, সেখসাহেব যে নীতির পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেন, তা হলেও আওয়ামী লীগের বিস্তার সাধন সম্ভব হবে না।

এই একই সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে, সেখসাহেব ছয়দফা সমর্থিত কোনও সার্বিক ফেডারেশন, তথা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান মেনে নেবেন না। যে দল কেবলমাত্র একটি অঞ্চলের ভোটের উপর নির্ভরশীল এবং সেই অঞ্চলে বিপুল ভোটাধিক্যের অধিকারী হলেও যার প্রভাব অপর অঞ্চলের ভোটারকে প্রভাবিত করতে পারবে না, তার পক্ষে ক্ষমতায় আসার কি অর্থ হয়, কেন উপরে, কেন্দ্রে পরে? পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি বা পি, পি, পি, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ধীর কাছাকাছি অবস্থা ছিল। লীগ, কাউন্সিল লীগ এবং অন্যান্য মিলে মুসলিম কনভেনশন কাউন্সিল লীগ, এই তিনটি দলের পক্ষেই ঐক্যবদ্ধ করার মত সাহস বা মূলধন, কোনোটাই মুজিবের সমকক্ষ হবে না। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই তিনটি দলের সঙ্গে মুজিবের সাহেবকে আপোষ করতেই হবে। আর, আপোষ করার অর্থই হচ্ছে ছয় দফা থেকে পিছু হটে আসা এবং পিছু হটে আসার ফল হবে সেখসাহেব এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে খুবই ভয়ঙ্কর। আওয়ামী লিগ-কর্মী এবং শিক্ষিত সমাজের হতাশ হয়ে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরক্ষার সুযোগ এইভাবে হাতে এসেও যদি হারিয়ে যায়, তবে তাদের সেই নৈরাশ্যের এবং প্রতিক্রিয়ার ফল হবে সেখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বের। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এটা একটা চরম বিশ্বাসের যুগ হবে। যাইস যারা পরবর্তী সময়ে, সার্বভৌম কোনও রাষ্ট্রের একটা অংশ অথবা কোনও অঞ্চলের কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে, এটা নিঃসন্দেহে একটা বিপর্যয়। কিন্তু এইরকম একটা কিছু ঘটবেই। তাই সেখ মুজিবের অবদান যে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ আজ খুব উজ্জ্বল মনে হচ্ছে, চরমপন্থীদের তাদের আন্দোলনের উপর যোগ করেছেন বলে আগে সেখ পছন্দ করছে। সেখ মুজিবের অবদান আজ এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করেছে, এখানে তিনি কেউ পারেন না। কেন না, ছয় দফা বাঙালীর আজ চিরন্তন অধিকার। সিদ্ধান্তে জনগণ কি, এবং, নৈরাশ্যের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী কোনোদিন আমাদের ভিত্তিতেই হচ্ছে। তখন নৈরাশ্য যদি আজ আর কোনও দল থেকে আজও নয় কোনও চরিত্রহীন পক্ষ, তবে তিনি নিজের ভূমিকাকে পরিবর্তন করবেন। এইজন্য আজ তিনি পূর্বেই সতর্ক অবস্থানে।

পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিতদের কাছে বলতে পারে যে, তখন কি এর, নৈরাশ্য এক সময়ে আপোষ করা ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তার বিরুদ্ধে সার্বিক সাফল্যের ক্ষেত্রেও সতর্কই তিনি অনেক চরিত্রহীনতার এবং সেই কারণে তাঁর পরবর্তীকালে আপোষ কিন্তু ঐতিহাসিক দেখা সেখসাহেব তিনি নাম পরিবর্তন করেছিলেন। যে কারণে যে সেখসাহেবের এই-ছয় দফা ঐতিহাসিক দেখলে যা অন্য কোনও দল আরও বহু ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণ নৈরাশ্য তার সঙ্গে হাত মেলাবে না। আন্তরিক স্বার্থের ভিত্তিতে যে ঐক্য বা মৈত্রী তা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। সেখ মুজিবরের প্রথম অসুবিধা হোল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও প্রধান রাজনৈতিক দল তাঁর ছয় দফা দাবিকে মেনে নেবে না। কেন না, সে ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সত্তা এবং স্বার্থ বিপন্ন হবে। তাই আজ সেখসাহেব আত্মনির্ভরশীলতার মহান্মন্ত্রের প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বার পাত্র। তিনি বাঙালীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি রাখতে পারবেন না। অথচ খুব সম্ভব আগামী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাঁকে ক্ষমা করবে না।

এ তো গেল মুজিবরের বিরুদ্ধে বাইরের বাধা। ভিতর থেকেও বাধা আসবে কি? নিশ্চয় আসবে এবং আসবে সেখ মুজিবরের বিরোধ দিক থেকেই। সেখ মুজিবরের রাজনৈতিক অতীত কথা সবার জানা। তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু সহীদ সুরাবর্দী ছিলেন চরম সুবিধাবাদী। এক ইউনিট, সামরিক শাসন এবং বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে তিনি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তার পরেই যৌথনির্বাচন প্রবর্তনে হাসিল খান তালুকদারকে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে নেজামে আওয়ামী পার্টি গঠন করতে হয়েছিল। সেখ মুজিবর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থেকে আটবার মোস্টলির পর্যন্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ভূমিকায় ছিলেন, তা স্বার্থান্বেষীর ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত হলেও দেশের স্বার্থের প্রশ্নে নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ছিল। বিগতবারে সেখ মুজিবর তাঁর পূর্বসূরিদের মত নিজস্ব বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মার্কিন সামরিক জোটের সঙ্গে পাকিস্তানের মৈত্রীর পক্ষপাতী ছিলেন। পরবর্তীকালে এই নীতি যে পরিবর্তন হয়েছে, তার কারণ জনমতের চাপ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ক্রমবর্ধমান জঙ্গিপ্রিয়তা। অতীতের সেখ মুজিবর বর্তমান আজ সমাজতন্ত্রের আমার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সমাজতন্ত্রী নন। তাঁর দলের সবাই সমাজতন্ত্রী নন। সবার আগে তাঁদের যে অংশটি স্বাধীনতা তথা ইতোমধ্যে সেখসাহেবের নেতৃত্বের স্বার্থে সবার আগে সমাজতন্ত্রের বিষয়ের কথা বলছে, তাদের সঙ্গে সেখসাহেবের এক অসামান্য চরিত্র এবং আশঙ্কা হচ্ছে অচিরেই তাঁরা ছয়-দফা তথা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাবে।

[শেষাংশ ৬৯০২ পৃষ্ঠায়]

ঔপনিবেশিক শোষণের অন্তিমকাল

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

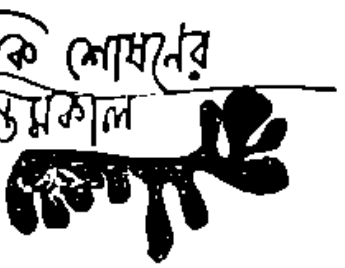

[illegible] ঔপনিবেশবাদ উচ্ছেদের [illegible] হবে। ইঙ্গ-মার্কিন জোট ঔপনিবেশবাদের [illegible] দূর করা অবশ্য সেখানে প্রত্যক্ষভাবে [illegible] পারে নি।

বিশেষজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকার [illegible] সাম্রাজ্যবাদ তথা ঔপনিবেশবাদ একটি [illegible] ও বহু আলোচিত বিষয়। এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত সহযোগী নীতি হিসেবে তাকে সংজ্ঞায়িত . উপস্থাপনা আজ করাও পক্ষেই সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এসে চেয়ে। পঞ্চাশ বছর আগে লেনিন বলেছিলেন যে, অন্যান্য এবং বিশ্বাসঘাতক অর্থনৈতিক আধিপত্যে পুঁজিবাদের উচ্চতম পুঁজিবাদী যুগের ইতিহাসে একটা মোড় সূচনা করে। পুঁজিবাদ তার অস্তিত্বের চেয়ে অবস্থা অতিক্রম করে অন্তিম পর্যায়ে এসে পড়েছে। তার চেয়ে বেশি প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে তার স্থান পূরণ করার সময় এসেছে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের শেষ স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাহ্ন বলে ঘোষণা করেছিলেন। সে সময় বিশ্বের পুঁজিবাদী সারা বিশ্ব এককভাবে বিশ্বের করেছে। সাম্রাজ্যবাদ সে সময়ের ছিল বিশ্বের বহু সংখ্যক একচ্ছত্র অধিকারী।

বর্তমান দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশের জনতা পুঁজিবাদের চিরবিদায়ের ঘোষণা জানাবার পর দিন গুণছে। এমন কি পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনসাধারণ বহুদিন আগেই—ঔপনিবেশিক দেশ ও আধা সহ) এখন পর্যন্ত জাতিসংঘে —ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়েছে।

পুঁজিবাদের বিকাশের আগের ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নীতির অস্তিত্ব ছিল। তারা সাম্রাজ্যবাদ মুনাফা লাগনীতির ওপর ভিত্তিক হলেও ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি চালাতে কম্বে করে নি। আগেকার ঔপনিবেশিক নীতির এবং প্রভুত্বের ভাষা ও পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তন বিশেষজ্ঞের আজই আধুনিক ঔপনিবেশবাদ সম্পর্কে সঠিক একটা ধারণা করা সম্ভব।

প্রতিশ্রুতিমূলক জন-বর্ণাহিতকর যে সমস্ত [illegible] [illegible] আগের লোকজন বর্তমান স্থানে করে থেকে মেরে সে সব জায়গায় ঔপনিবেশ বলে আখ্যা দেয়। যখন এ ধরনের ভূখণ্ড আর চাইল না—তখন বিজিত দেশগুলির ওপর দায়িত্বশালী ঘোষণা বা জাতির প্রভুত্ব ঔপনিবেশবাদের মূল ছিল। বিজিত ভূখণ্ডের জনসাধারণ বিজেতা জাতিদের বিশেষণীয় করলে পরে বিপর্যস্ত ও শোষিত হতে থাকল। দাস যুগের জন-বর্ণাহিতকর ভূখণ্ড দখলের কোনও তাৎপর্য ছিল না। বিনা পয়সায় প্রকৃতির সম্ভারের অফুরন্ত উৎস ঔপনিবেশগুলিই তখন মূল্য দিল।

দাস যুগের পর সামন্ততান্ত্রিক যুগে ভূমি এলাকাই গুরুত্ব পেয়েছে। ভূমি সম্পদই ছিল উৎপাদনী শক্তিকে শোষণে উপায়। সামন্ত প্রভুরা ভূমির ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা চালুর জন্য যে মধ্যশ্রেণী কোন্দল বাকিরা তাদের সুরক্ষিত করা হোত ভূমি বণ্টনের পথে।

সামন্তযুগের অবসান ঘটাতে পুঁজির যুগের অফুরন্ত উদ্বৃত্ত দেশগুলোর জন-সাধারণকে লুট করে বুর্জোয়া পুঁজি সঞ্চয়ের অপরিহার্য পর্যায় ছিল ঔপনিবেশ স্থাপন।

মার্ক এ বিষয়ে চেতনার বর্ণনা দেন—স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ ও ঔপনিবেশের আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীদের উৎখাত, খাসল খনিতে খনন এবং শর্তহীন বাণিজ্য তাদের সমাধি ছিল। ইতি ইস্টিন্ডিজ বিজয় ও লুণ্ঠনের সূত্রপাত, আফ্রিকাকে অবসানের জন্য কৃষ্ণকায় মানুষের শিকার করার মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা, পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগপ্রভাতের আভাস ছিলো। প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ে এই সবই ছিল প্রধান উপাদান। প্রথম দিকে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ অধোগতিতে না হওয়ায় অনাধিকৃত ভূখণ্ড দখলের ঝোঁক কেটে যায়। উৎপাদিকা শক্তিই একটা যুগে অনন্যতির ওপর প্রভাব বিস্তার করত এবং তাদের স্বার্থের তাগিদে থাকে করত। অর্থ-কারণগার যুগে উপনিবেশের মূল্য সম্পদ ঔপনিবেশগুলোতে উদ্বৃত্ত দেশ থেকে মানুষ এসে ভীড় জমাচ্ছিল।

একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য কায়েম হবার পর বিদেশের বাজারের প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। একচেটিয়াওয়ালারা উদ্বৃত্ত পুঁজিকে মুনাফার মুখোমুখি করতে চাইল কম্পা প্রকৃতি ও কাঁচামালের উৎস হিসেবে ঔপনিবেশগুলি এখন নতুন রূপ ধরে উঠেছিল যেখানে উদ্বৃত্ত পুঁজিতে সব চেয়ে বেশী মুনাফার কথা যায়।

নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠার পর বিশেষ প্রয়োজনীয় কাঁচামালের [illegible] হয়ে ওঠে। তার ফলে মুনাফা লুণ্ঠনের সাম্রাজ্যবাদী [illegible] কাঁচামালের নতুন উৎস [illegible] আবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো।

একচেটিয়া পুঁজির ঔপনিবেশের ব্যবস্থা পুরোনো হিসেবরক্ষক নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের আধা প্রশাসিত হল পুঁজি স্থানান্তর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে। অতিকায় একচেটিয়া পুঁজি প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিকভাবে দুনিয়াকে কব্জা করে নেয়। অস্ত্র নিয়ে হানা না দিয়েও একচেটিয়া পুঁজি সংগঠনগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে শোষণের মাধ্যমে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের দেশগুলোর ঔপনিবেশের আধিপত্যের পূর্বে নিজেদের এখন সাজা চোখে ভেসে না। পুঁজি স্থানান্তর থেকে উদ্বৃত্ত শোষণের সম্পর্কগুলো বর্তমানে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সাম্রাজ্যের সাজ পরিয়ে পাঠান হয়। এসব হিসেবে ঔপনিবেশ রক্ষার প্রধান বাহিনীর হিসাবে বাহিনী করতে তার এসে গেছে।

আধা-ঔপনিবেশগুলোতে বাহ্যত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির বিশেষ ভূমি হয়। সোজাসুজি রাজনীতিকদের শাসন ঔপনিবেশের পরিবর্তে তথা স্বরাষ্ট্রে নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। বহুৎ নীতি নির্ধারণের সময় জোট বেঁধে না তাদেরই বিশেষে নিয়োগকর্তা নামধারী সেটে যে সব পুঁজির পর চড়ি করে এরা অনুপ্রেরণা আমাদের মেরামতি যোগিয়ে ধারার মাধ্যমে সে সবই আধা-ঔপনিবেশের অর্থনীতির ধারা নির্ধারণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের মর্যাদা দিয়ে এদের সোজা করার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এই সবেরই মাধ্যমে ঐ সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি চালাতে সমর্থ থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে আধা-ঔপনিবেশগুলো ঔপনিবেশিক শোষণের জীবন রস জুগিয়ে যেত। কিন্তু এ অবস্থাতেও একক কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোনও বিশেষ দেশের ওপর তার ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে পারত না। তারা তাই তাদের [illegible] [illegible] অনুগামীদের [illegible] [illegible] [illegible] নিজেদের অবস্থান [illegible] করে।

ছোট ছোট সমাজের ধ্বংস ঘটিয়ে এক-একটা পুঁজি উৎপাদিকশক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মার্কেন্টিলা তার জন্মলগ্নে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনা, ধনোৎপাদক ক্রিয়াকলাপ, ফেরেঙ্গা ও ভেনিসের ক্ষেত্রে, ওলন্দেজদের এবং সম্ভবত ফ্লরেন্সেও, উপনিবেশিক সেবকের আকার তোলেনীতেই নিয়ন্ত্রণ করে না। উপনিবেশকরা নিজে সাম্রাজ্যের নামে সব সময় যুদ্ধ করতে চায়। জাতীয় পুঁজি আত্মপ্রকাশ করলে এবং অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণে এদের অসুবিধা হয় বলে এবং আরো একাধিক কারণে বহুদেশে একটিমাত্র পুঁজির শোষণ পর্যাপ্ত কাজ উপনিবেশ নিয়ে ভাবতে হয় না। পরন্তু তারা নিজের উপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার পক্ষপাতী হয়ে পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদের মূলে সামাজিক অসমপুঁজির উপনিবেশ গড়ার বিকাশে পৃষ্ঠপোষকরূপে হয়ে দাঁড়ায় বলে ঐ সামাজিক সম্পর্কগুলির আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উপনিবেশবাদের অনিবার্য ফলের ফলে পরাধীন এলাকার অধিবাসীদের আন্দোলন ও তাদের রাজনৈতিক অধিকারসচেতনতা। নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে উপনিবেশের অধিবাসী আক্রমণের তীব্রতা ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হয়ে দেখতে পায় যে, সাম্রাজ্যবাদের কৃষ্ণকায়ের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের শ্বেতাঙ্গের শ্রেণীস্বার্থের ঐক্য রয়েছে।

না উপনিবেশবাদের কৃষ্ণকায় নিজ এক একটি পরাধীন দেশের মধ্যে তার সঙ্গে সমস্ত নিজেকে শ্রেণীর মধ্যে টেনে নেয়। কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীলতা ঔপনিবেশিক দেশগুলোর কৃষিকে ঔপনিবেশিক করে এবং তাদের শিল্পায়নের বিরুদ্ধে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে নিজের শ্রেণীর কৃষিজ পণ্য ঔপনিবেশিক শ্রেণীরাজ্যের পণ্য থেকে উৎপাদন ও ক্রয় সাধারণের সঙ্গে তুলনায় নিম্ন স্তরে নেমে যায়। অনুন্নতশ্রেণী হলে ক্রয়ের ব্যাপারে কম বাঁধনের ফলে সমস্ত ব্যয় ৭০ শতাংশের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের মধ্যে এই সম্পর্কের সঙ্গে যে অসম সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসায়ের সম্পর্ক তুলনা করলে দেখা যায়। উপনিবেশের অসম সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসা হবার ফলে এবং তাছাড়া উপনিবেশে অসমের অসম উপনিবেশে নিজের সমস্ত পণ্য উপনিবেশের পরাধীন দেশের সম্পর্কে ছাড়া তুলনা করলে তাদের মোকাবিলা অসমনীতিসম্মত দিয়ে থাকে। ফলে লোক সংখ্যার তুলনায় কৃষি জমির অনুপাত বড় করে দেখান হয়ে থাকে। বৈষয়িক উপাদানের বিকাশ সাধনের সার্থে বিদেশ অর্থনৈতিক প্রয়োজনমতো না করে এক-চেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ও প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কিন্তু ছোট ছোট উপনিবেশ ক্রমে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগও এনে পারে না। তখন একটিমাত্র পুঁজি এই সব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের এবং শিল্প বিকাশের পথরোধ করে দেখায়। সাম্রাজ্যবাদী একটিমাত্র পুঁজি সংখ্যালঘিষ্ঠ উপনিবেশ ছেড়ে কতটা বিস্তার এবং তার ধন কি হবে তাও স্থির করে। ফেরেঙ্গে চলে পুঁজির ফলে প্রকাশমতা বিশেষভাবে হয়ে থাকে। ফলে দেশীয় বাজার ও শিল্প সমস্ত বেচা দেয়।

উপনিবেশবাদের নয়া পাওয়ার বিকাশ পুঁজি নিয়ে মূলে এই সব ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে বাঁধে নি, পরন্তু রাজনৈতিক দিক থেকেও শৃঙ্খলা চালায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও আরব আমেরিকার দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদের শাসন কায়েম করা হয় নিজের দখল। এরপর যে-কোনও প্রকারে তাদের স্বাধীন সংগঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক জোট ভাঙবার এই সব স্বাধীনতার পথে অন্তরায় জাতিসংঘের পরামর্শ ক্ষমতা ব্যবহার চালায়। এ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দালালিতে নতুন ভাবধারিত স্বাধীন দেশগুলোর ঔপনিবেশিক আশা পূরণ করে থাকে। তাদের ক্ষমতা সর্বাধিনিক ধাঁচ হলে তৈরি নিয়ন্ত্রণের এই হলো অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়।

বলেছেন্দারী অন্যান্য যা অসম বাঁধনের সমস্যা সাম্রাজ্যবাদীদের আর এক শোষণের অর্থনৈতিক জোট। অনুন্নত দেশগুলোকে এই সব বাজারে টেনে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তাদের আরও শক্ত করে বেঁধে ফেলে এবং একটিমাত্র পুঁজির অনুপ্রবেশ সহজ করে দেয়।

তারপর ঐ ঔপনিবেশিক পুঁজির যা সাম্রাজ্যবাদের বেনিয়ান শিল্পপতিরা নিজের দেশকে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার জালে বেঁধে ফেলে। দেশের কৃষিজ পণ্যাদি, কৃষিজ পণ্য এবং কম মজুরের অধিবাসন তারা পুঁজিপতির অভিপ্রায় ও বিদেশী পুঁজির লোভ বর্ধনের ভূমিকায় তার পড়ে।

অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ রাজনীতিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে যায়, সামন্ত ও পুঁজিপোষকের সাম্রাজ্য পুরোনো শিল্প পর্যন্ত ও সামন্তীয় অবস্থায় করে এবং তার সঙ্গে সমুদ্রপারী প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেই শ্রেণীর ক্ষেত্রেকে বেঁধিয়ে দেবার জন্য নিজের হাতে সর্বাধিক ভার্যাদান করে।

সাম্রাজ্যবাদ যখন অসমবাদের মূলে অবস্থান হয়ে তখন বিশ্ব বিপ্লবসমাজ এই দেশের বিরোধী শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সার্থিকতার একবদ্ধ হয়। তাই নতুন পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ তার পাঁচন চালায় মূলের আরো নয়—আরও নতুন কায়দায়, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পন্থায়। তখন যথা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের হয়ে আন্দোলনকর্ম করে এবং জনমতকে ধ্বংসকরে দমন-পীড়ন বন্ধের জন্য ধরে নিজে ধ্বংসকারে জোট বাঁধে। এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে জনগণ প্রায়ই গৃহযুদ্ধের আশ্রয় নেয়; আর সাম্রাজ্যবাদ প্রায়ই প্রত্যক্ষ অভিযানের পরিবর্তে পরোক্ষ পন্থায় গ্রহণ করে আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনমতকে পাঁচন করতে প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্যে করে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি তীব্র হয়ে ওঠে। যখন বিরোধী গৃহযুদ্ধে এমন পর্যায়ে পৌঁছয় সাম্রাজ্যবাদ ও তার জনবাদী সাহসের প্রতিক্রিয়াশীলদের অভিপ্রায়ই বিপদ হয়ে পড়ে, তখন সাম্রাজ্যবাদ তার শাসন কায়েম রাখার জন্য প্রায়ই অন্য পন্থতি গ্রহণ করে। বিরোধী জোটের ভেতরে থেকে দোলায়মান ঘাঁটিকে দুর্বল করে দিয়ে শান্তি ও সমঝোতার মধ্যে সমাধান রাখবার ব্যবস্থা করে। তা সম্ভব না হলে দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্যে সরাসরি সমস্ত ফৌজ পাঠায়। এই সময় একদিকে থাকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী প্রতিক্রিয়া এবং অন্য দলের তখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক মিত্রশ্রেণীর সমাবেশ ঘটে।

বিরোধী গৃহযুদ্ধ বিভিন্ন স্তরে বিকাশ লাভ করে। যে সমস্ত উপনিবেশে সামন্তবাদকে না ভেঙে তাকে ভিত্তি করেই পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে সেখানে শিল্প শ্রমিকদের সোবেশ সামন্ত শোষকেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রধানতঃ সামন্তশ্রেণীর ওপর দেশের জনসাধারণের অধিবাসনে কৃষক-শ্রেণীর আঘাতটাই হয় প্রধান আঘাত এবং পুঁজিবাদের ওপর, সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটির ওপর আঘাত। এই যুদ্ধপরিচালনে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত জঙ্গী অংশকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। মার্কেন্টিলা ও পার্টি যুদ্ধোদ্যম নেতৃত্বের অন্য ক্ষেত্রে অভিজাতশ্রেণীর পরিচালনে মুক্ত করে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তার পরিচালনার ভার এঁদের নিজে হাতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী সোবেশ সমাজ বিপ্লবের যে গতি মুখে প্রগতিশিল তাকে বন্ধ করা তখন কাজ, অর্থাৎ উপনিবেশকে ক্ষেত্রে নিয়ে-ধনতান্ত্রিক বিরোধ সমাধান করতে হয়।

উপনিবেশে বিদেশী শাসনকে তাড়ে পরাজিত না করেও বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ হয়ে পরাজিত দেশের ঔপনিবেশিক

চাহিদা মেটানো যায় না বলে, সৃষ্টি হয়েছে মূল্য বৃদ্ধির। উৎপাদন ব্যবস্থার সংকটের ও প্রতাপশালী পুঁজির মুনাফার ক্ষেত্রে উপনিবেশ যা কাজ করে অর্ধ-উপনিবেশ তাকে জোগান দেয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের জোয়ালে সমস্ত জনগণ বা উন্নয়নশীল দেশগুলো আটক পড়লে দুনিয়ায় যুদ্ধে পুঁজিপতিদের বিপদের বা বিরোধের আর কোনও পথ অবশিষ্ট থাকে না। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হবার পর আরও নতুন নতুন উপনিবেশ হয় সমস্ত বিকাশের ক্ষেত্রে। অনুন্নয়নের সৃষ্টি যেখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করে পুঁজির বিকাশের অত্যাবশ্যক গতিসম্পন্ন রূপ ধরে দেয় সেখানে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের প্রশ্নের সমাধান করতে হবে আগে আন্তর্জাতিক স্তরে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অন্তর্জাতিক বিপ্লবের প্রশ্নের সমাধান করে নিতে হয়।

সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর জোয়ালে উপনিবেশিক এবং আধা-উপনিবেশিক দেশের পরাধীন শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের বিবর্ধিত দুঃখ দুর্দশার মধ্যে বাস করে। উপনিবেশগুলোর ক্ষেত্রেও বলতে গিয়েই দেখা যায় বিদেশীদের ভোগের জন্যে, লাভের ও অর্জিত বাজিয়ে রাখার জন্য পুঁজিবাদই পুরোপুরি দায়ী। উপনিবেশিক শোষণের ফোলা বস্তুই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তবেই যখন উপনিবেশগুলোর ক্ষেত্রগুলো নেতৃত্বে মেহনতী সাম্রাজ্যবাদীর জনসাধারণ তাদের প্রভুত্ব সহ্য করবে, তাদের দাসত্বকে বাড়িয়ে তুলবে, তাদের কাছ থেকে মুনাফা নিতে নিতে এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পদ থেকে বেহাই দেবে বিদেশীদের সাধারণ মানুষের ওপর তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ বাড়িয়ে চলে। তাদের আসল উদ্দেশ্য শোষণের ও পরাধীন এবং প্রতাপ শাসনের নিষ্ঠুর জোয়ালের আর বহন করতে না পেরে সমস্ত প্রতিরোধের পথ নেয়, বিদেশী মুখে চালানোর জন্যে সব ইউনিট খুঁজে সংগঠিত করে, বিদেশী এলাকা এবং ছোট ও বড় মূল এলাকা থেকে তোলে ও সাম্রাজ্যবাদ ও তার জোয়ালের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভয় করে, করে তারা তাদের নবতম উপনিবেশ ও নির্ভরতার জালবিস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে এলাকা ও বিদেশী ঘাঁটির ওপর তাদের আরও বিস্তার দেশীয় বিপ্লবসমূহকে দমন করে তাদের সমাজতন্ত্রের উত্তরণের প্রশ্নের সমাধান করতে দেয়। এই অবস্থার দেশে সমাজের ভয় আসে। এই সমাজকে যা করার বৈদেশিক দ্বারা দুর্বলের দেশে আসল জনগণের নেতৃত্বে দেবার ক্ষমতা একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীরই থাকে। কাজেই শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সমস্ত নির্ভরের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রান্ত থাকে না। শ্রমিকদের জন্য সমাজ সৃষ্টি করে শ্রমিক-শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতাকে দুর্বল করতে সচেষ্ট হয়। ক্ষুদ্র-বেসরকারী সমাজতন্ত্র ও তাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদের আমলের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকারী শ্রমিক নেতৃত্ব; তাদের প্রভুত্ব অঞ্চলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করিয়ে দিয়ে ঐক্যকে সম্ভব করতে দেয় না। বিপ্লবী পরিস্থিতি যখন চরমতায় হয়ে ওঠে তখন ইউনিয়নী লড়াই বা দেশরক্ষার জন্য সংগ্রামের কাজ করা বন্ধ-ও হলে তাদের ইউনিট সামিল হয়ে চলিয়ে চলে থেকে সরে-যেয়ার নিয়মটা পাল্টে এবং চূড়ান্তে যুদ্ধে জোট্ করে শ্রমিকশ্রেণীর মূল সংগঠনে পরিণত হবার ব্যবস্থা করে। অর্থ নীতিবাদ-সর্বস্ব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জোয়ালে আর তাদের আটকে রাখা যায় না।

সমাজতন্ত্রী শক্তির নিজের দুর্বলতা আর দেশীয় বেসরকারী শ্রেণীর সমস্ত শক্তি অবলম্বন ভীত হয়ে উঠতে থাকবে। তারা বিদেশী পুঁজির শোষণের ক্ষেত্রে ভাগ বসাতে এবং এই অভিসন্ধিতে অবলম্বন থাকবে বিপ্লব করবে। পুঁজির শোষণের ক্ষেত্রে ভাগ বসাবার ফলে উপনিবেশের বিরুদ্ধে একটা পুঁজির শোষণ অর্থনৈতিক মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপনিবেশিক প্রভুত্বের পরাজয় সাধারণ জনগণের মধ্যে যে নৈরাশ্য নিয়ে আসে তার ওপর এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা যুক্ত

॥ মতের নির্বাচন ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ॥

(১০১৮ পৃষ্ঠার পর)

আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা আছে সেই সব বিচক্ষণ এবং শিক্ষিত মহলের অনেকে বেশি আতঙ্কিত হয়েছেন ঠিক ওইটা নিয়ে সমাজতন্ত্রী! সেদিনের বলেন, আমার সমাজতন্ত্র চীনের সমাজতন্ত্র নয়, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র নয়, অন্য কোনো সমাজতন্ত্র নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সমাজতন্ত্র, সম্পূর্ণ নিজস্ব সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই সম্পূর্ণ নিজস্ব সমাজতন্ত্রটা যে ঠিক কি, তা তিনি কখনও স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। চীনের পূর্বে পাকিস্তানী কৌতুক করে জানাতে বলেছিলেন যে, এই সমাজতন্ত্র হোল ইসলাম মতের সমাজতন্ত্র। কিন্তু আমি তা মানতে সম্মত নই। কেন না পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে আজ এত অভাব যে, সৈনিক আট আনা উপার্জন করার ক্ষমতাও অনেক কৃষক বা শ্রমিকের নেই। ইসলাম মাত্র থেকে সমাজতন্ত্রের জন্যে উপাদান তারা কিভাবে করবে? তাদেই সমাজতন্ত্রী না হয়েও সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেখেছেন এতটা বিরাট ভুল করেছেন।

তিনি সকলকে হাজত জাতীয়করণ করে, বহৎ শিল্প জাতীয়করণ করে। তাই যদি হয়, তবে তাঁর ভোটে সত্তা দেশের অধিকাংশ বিত্তশালিত আমদানি তাঁদের স্বার্থ কি রক্ষা হবে না এবং দেশ মুক্তিযুদ্ধ কি তাঁদের স্বার্থে যা দেওয়ার ক্ষমতা বা সাহস রাখেন? পশ্চিম বিদ্যার উদ্দেশে যাবের জমি আছে তারা কি তবে জমি সংক্রান্ত নীতির বিরোধী হবে না?

আমার সমাজতন্ত্রের বাণী দিয়ে সমাজতন্ত্র আসে না করতে পারলে শ্রমিক ও কৃষক, যারা আজ তাঁর অন্যতম শক্তি তারা কি তাঁকে আর চাইবে? যাদের, শিল্প ইত্যাদির জাতীয়করণ না হলে যা জমি সংক্রান্ত কোন উদ্যোগে সন্তোষ না হলে কৃষক বা শ্রমিক কি কারণে মুক্তিফ্রন্টের ভোটের সমর্থন দেবে?

এই সব কিছু খুঁটিয়ে দেখলে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরোধিতা এবং মুক্তিফ্রন্টের দলের চরিত্র আবিষ্কারের দিকে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে একটা বেশ বোঝা যায় যে, নির্বাচনে জয়ী হলেও আওয়ামী লীগ দেশ রক্ষা করতে পারবে না। দেশের প্রধানতম দলটির যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য দলগুলি কি করছে তা দেখা যাক।

(ক্রমশঃ)

॥ মুক্তা সাহু ॥

(১০১২ পৃষ্ঠার পর)

হিসাবে। সেখানকার উঁচু-মুখ জানকেই, কথা চলবে, ক চাঁই চলবে। বাবুর যা ক্ষমতার ওপরটা সবচেয়ে—চাঁই, তাই এই চিন্তা উপর পড়ায় বাবু অনেকে লাইন দিলেছিল বাড়ি

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কাজ শেষ হলো। চল, একটা, দি, হেল কাটা মজার আলোচনা করা হবে। ওখানে কিছু কম হবেছে। ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী কাল সেন্টার কাল সকাল কিনে নেবে। আমরা আর একবার চা খেয়ে এইবার উঠবো।

॥ চার ॥

বাওড়া ষ্টীমার ষ্টাফিক আসার ভয়ে একটু বেশি আগেই স্টেশনে এলাম। সময় কিছুই নেই। টাইমটেবিল দেখি নি। কিন্তু চেহারা চাঁচ। মালপত্র তাদের আগেই আর বেঞ্চের সাথে বেঁধে। মালপত্র সব এসে গিয়েছে। আমি ছাড়া আর সবাইও হাজির। ওদের কিনে নেওয়ার, তাই তাঁড়াতাড়ি চলে এসেছে—বলবো। কথা বলবার। আমি ওদের সাথে না কিনে এসেছিলাম। মালপত্র আগেই পাঠানো মালপত্র। কারু মোদ্দো অভাবের মাঁচিছে এবং তাঁড় করে আসেন আত্মীয়-স্বজনের দল। ছাড়ে বাঁধি ছেলে কারুর যা বলে আসেন একটা বাড়ের ওপর। আমার মনে হতে লাগলো সে বাড়ের কথাই। তোমরা নাচের ঘরে কেন?

গাড়ি এলো। ভীষণ ধাক্কাধাক্কি। তবে আমাদের কামরাটায় এরকমের আশার সম্ভাবনা নেই। টেলাটেলি করার পর মাল তোলা হোল কিনের করে। আমাদের ঘুর্ণাগ্রহে উঠলি—আমিন বলে না ডাকলেও। কিছুতেই হিসাব মেলে না। শেষে সমস্যার সমাধান সে নিজেই করলো। আমরা সাতজনও তার হিসাবের মধ্যেই।

চীন ধাক্কায় আগে ছিলেন এরোপ-সিয়েশনের সিনীয় অফিসার এবং স্ত্রীরেজা জনমুক্তে। অনেক উৎসাহ ছিলেন। পরিচয় আদানপ্রদান এবং নানা প্রশ্নে থেকে। চীন ধাক্কায় সময় এগিয়ে এলো। প্রত্যেক কাজ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলতে। অনেক কথন আলাপ করতে লাগলাম। উঁচুরো উঁচুরো কথা। কথন যে আলাপ আলো পাশেই খিয়েছে খেয়ালও হয় নি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হলো। সুভাষবোসাইটির ছেলে ছেলে পাশের ছেলে উঁচুস্বরে ছুটে চলেছে ছাত্রের অফিসের ঘরে কেউ।

চীন চলেও কারুর মুখে কথা নেই। সুভাষের আমিন অনেকে চিঠি ও অনেকে উপহার পাঠিয়েছেন। সেগুলো বেঞ্চের পর মুখে খুলেছে 'আমিন বাবুদের'। কারুর বাক্সে মহিলাদের ঘরে বোঝাই আমারটা এত বিরিয়ানি হয়ে গিয়েছে যে ভালো লাগছে না। সেগুলো বললো, তাঁর বাড়িতে তো কাজ ছেড়ে ছি-চ। কেউ কিছু জানতো না। একেবারে কিনা নেবে আসছে। আর অন্তরঙ্গের অনেকে বিছুটা বোঝেই নাকি এসেছিলেন। কি আর করা যাবে। বাস থেকে হাতের ঘড়ার বের ঘর থেকে ঘুঁচিয়ে পড়া ছেলে যে যার আসনে।

পাড়ার ছেলে উঁচুস্বরে ঠিক সময়েই স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে। মাঝে আসতে পারার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে ছাঁচের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ঘণ্টা খানেক। ছিলেন ইঞ্জিনের কাছে মুখ ঘণ্টা সময় কিছু নয়। ছাড়ার আগে সবে কথা পাকাপাকি চাঁদে আসের বাবদে। একটা ১৯ অভিনব খুলে। এবং প্রত্যেকের বেলা সাড়ে ছিনটের মধ্যেই।

ষ্টীমারের একপ্রান্তে জন্যে আমরা বাওড়া থেকেই আর পাঁচিবেছিলাম যাতে ছিনটে করার চলে। সেটা হয়েছে বেশ ভালো। কারুই মালপত্র ছেলে কেবিনগুলির ভিতরে রেখে আমরা চলবার সময়টা বেরুতে, আর ট্রেকিটাকি কেনাকাটা সারতে। আর সেই সঙ্গে সোনারের ওপরের সেকেন্ডারের মত মাঝ-বরাবর থেকে ভিতরে চলে। কে জানে পথে আর কোথাও জুটবে কিনা। একেবারে টিনের নাম আর ভালো লাগে না, তুমারদু।

স্টেশনে ঘণ্টা পাঁচেক সময় পাওয়া গেল। ছোটখাট কয়েকটা জিনিস কিনে নেওয়া হোল। বাড়ি ওদুদেরও। তারপর পাঞ্জাবী দোকানে বসে ঘণ্টাখানেক পর সবে চলবার জন্য আর নাম ছেড়ে স্টেশনে ফিরি। মালপত্র নিয়ে বেরোবার ব্যবস্থা করলেন। এবং বিছানা পেতে একটি অস্বস্তি-কারক নিদ্রা।

ঘুম ভাঙলো হলদোয়ানীতে। অনেক যাত্রী নামলেন এখানে। কাঠগোদাম পৌঁছতে প্রায় সকাল আটটা। খাবার লাইনে ভীড় নেই। টিকিট কেটে খাবার আবার ঘাল চালানো পর্ব শেষ হলো। আজকের কলকা আলুভাজা। চা-টোস্ট ঘণ্টা চা পর্ব শেষে নেওয়া হোল। বাস ছাড়তে দেরি হবে। তাক নিয়ে যাবে। সোনমোহনীর এখনো তৈরি হন নি।

বাস ঘণ্টা নাগাদ পাড়ি জমালো। এবারে এদিকে বর্ষার পথঘাটের ওপর চোখে পড়ে। মনে হয় যে অনেকদিনই এ পথে একটানা চলেছে আজকের জন্য সবকটি পাহাড়ী পথের থেকে এ পর্যন্ত অনেক বেশি সংরক্ষিত। বাঁকুনি খেতে খেতে ছোট-উৎরাই পথে চলা। একদিকে খাদ। পথ এঁকে-বেঁকে চলে। কিছুদিন

আসে। কিছু বলা যায় না। একটা অস্বস্তি। পাশে এসে দাঁড়ায় অনেক চৌকিদার। ছটফট করছে। ঘোলাটে চোখ। অল্প পরে পরে তোলা হচ্ছে ছাদের বোতল থেকে জলের গেলাস। অর্ধশিক্ষিত দর্জির সঙ্গে মনোযোগ। তখনো একটি বাঙালী পরিবার। ঘাড়াতাড়ি নিয়ে আসতেছেন বেড়াতে ডেকেছেন। গাড়ীতে ফিরবে উঠবেন তারা। ভিড়ের ভিতরে ঢুকি ঘটনাস্থলে করেছেন। চোখে পড়েছে। প্রথম চেষ্টাতে বলা একজন হত হত করে ধরি ধরা পড়ে। কলেজ। আসবে ছেড়ে উল্টে আসছে একটা লরী। দেখতে দেখতে আরও সরব পানিতে পৌঁছেছে।

চারিদিকে ঘরে ঘুরপাকের পর জমে হয়েছে এখান থেকে। প্রত্যেকটি ঘুরেই ঘাতা-ঘাতের পথে অন্তরঙ্গতা বাড়ে। মুখোমুখির প্রয়োজনের ঘটে ঠাটাসলাপ হয়, তবে আধখানি ঝিলমিলের তার অন্তর অন্তরের ভিতর ঘুরায়। পাশা হলওয়ে ছাদ-পাঁচিলে ঝিরি নীচে ছুটে চলেছে স্বচ্ছতোয়া ঝেলমী নদী। ওধারে বাদল বাদল উঠে গিয়েছে . পাহাড়ী ঢেউ। দূর চোখের আলোর ঠাঁই, গভীর আর আর পথে ঘাওয়া পথযাত্রীর সাথি। এখন দোতলায় আর একটি হিসেবে ছেলে ঝিলমের ঘটনার বৃদ্ধি ঘায়। অন্তরে ঝেলমীর বাঁধনের পরে। এই পথে চৌহদ্দি বাড়ায় ঘরে ঘুরী-ফেরে। আসাযাওয়ার পথ জমীদারে। বিশেষ বাড়ানোর এ পর্যটনে একঘুরী ছাদ ব্যবস্থা ছিল। পর্যটি নতুন তৈরি। আগে আসবার ব্যবস্থা পথ ছিল বাড়ীভিতর ঘরে। অবশ্য একদা সরকারী বাসস্থানের আসাযাওয়া ঝেলা-মেলির না নিয়ে বাড়ীভিতর যাওয়া যায়। কিন্তু ঝেলোয়াড়ী বাসের ঝিল পথ।

পাশে পাশে ঝিরে বাড়ির ঘরের ঝেল ছাদখানির দূরে পরিচয় ঘোরোয়াড়ের। ঝোড়শী সকল অভ্যর্থনা আসায়ে। ভাষা ঘরে একটা ভাল না হলেও ঝিরের ঘরে ঝেতে আসায় লাগে না। আর এ পথের আসাই ঝোধ ঘর এই ঘটনার ঘটনার ঝিরে পায়। যে ঘরের আসল একটি আরোগ্যনিবাস ঘর ঝেরি আসল আওয়া ঘরেছে—একটি সময় আওয়ার ঘরে।

আসর ঘরে আসছে। সেই একঘেয়ে আঁধুনি ঝিরের গল্প। সামনে সোকটি আসাযাওয়ার বসি সরছে। ঘরে আছে চৌকিদারী। ছোট টানের সুরমন পাহাড়ী। এক হাতে আসল আর এক হাতে সিগারিট ধরে বিশ্লেষণ করে পাহাড়ের সাহেব। ঘেরে ঝিরেছে। ওর তার তখন আবার বসি আসে। পরের সিপাহী ঝেলিয়ের আবার ঘরে আসাযাওয়ার ঘরে পুরিয়েছিল। সেটা একলা ঝেলে নি। ঘরে আসমোহার আছে এসে পৌঁছেছে। চৌকী চৌকিতে আড়ি পড়েছে। উত্তরসূরীদের অনেক কিছুই আল আসছে। এই একটা ঝিরির আবার ঝিরেদার পাহাড়ে ঘরের পাহাড়ে। ঘাঁটা পরে ঝোড়ার আসে দাঁড়ায়। টানা ধাও। তবে ঝোড়ার ঘরের পাহাড়। ঝিক তখনই ঝিরেদার ঝিরেদী ঘরে ঘর। ঘরিক স্থানীয় বাড়িঘরের চৌকিদারী এই ঘরেসরিই ঝিরে ঘর এবং এর পরিবারের ঝোরে এক নয়। চৌকিদারী একটি আর টান।

ঘুরপী চৌকীর আসলে ঝিরিয়ে আড়ি আসায় ঘরেছে। ঝেলা আর ঘরে। পাঁচের ঝোর আসে আসে ঝিরে ঘরে আসছে। সন্ধী বাড়ালী আরোগ্যনিবাস ঝিরির ঝেলেন ঘর। আসলেই আড়ি ঘরি ঘরিয়ে বাড়ীর ঘরে ঘরি আসাস্থ সাহায্যের ঝিরাম ঘরছাড়া—ঝেলা ঘর ঘরে পাঁচের ঝোরে আসে আসরে ঘের ঘাইল ঘুরি আরা পরতে হবে। ঘরঘোর ঘরমরী ঝিরের ঘরের না আসাযাওয়ার আরা, ঝেল আসাযাওয়ার ঝেলে পথার আসে। আসাযাওয়ার আসলেন। আসলেই ঘরি ঝিরাই ঝিরাই ঘাঁরা, ঝোরে ঝেলে আসাযাওয়ার এবং তিনি একটি পরিবারে আরোগ্য ঝেলার ঘরযোজন ঝোর আসলেন না।

পরে আবার আর আসাযাওয়ার আর আলাপোচার ঝেরে পোলাই ঘরিয়ে ঝেল ঝিরেরী ঝেরি ঘরেছে। ঘরেরার একটি, পরে পৌঁছেছিল পাল পরিবারে এবং আসল আসলের আবার ঘরযোগ পালা।

ঝোরে ঝোরোয়ার আসলোয়া পাহাড়। আসে আর আর ঘরে ঘরেছে। ঝিরেরীরী ঘরে-পাহাড়ে

সভ্যতা-জগতী বর্ষ শতিজগতে শ্রেষ্ঠতম যাত্রা সংঘ

জনপ্রিয়

সত্যম্বর অপেরা

৩৩৩৬ রবীন্দ্রসরণী, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৮১১০

অধিকারী—শৈলেন মোহান্ত বি-কম্

নাট্য উপদেষ্টা—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-এইচ-ডি

—: ১৩৭৭ সালের তিনটি চিত্তাকর্ষক অভিনব পালা উপহার :—

অনবদ্য পালাকার কানাই নাথের কালজয়ী অবদান নিবেদন

শহর থেকে দূরে

সুর—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

যুগ সচেতন পালাকার নরেশ চক্রবর্ত্তী এম-এ, প্রণীত

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ

সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

উৎপল দত্ত রচিত ও নির্দেশিত

জালিয়ানওয়ালাবাগ

রোমাঞ্চে—সত্যাশ্রয় পঞ্চরোর কৃতী ও কুশলী শিল্পিবৃন্দ

বুক—কুপন বোর্ডিং, আসানসোল, ফোন : ২৪১৩

সংযোজক—মধু বড়াল

এবে পাহাড়ী গ্রাম্য বালক-বালিকারা

(গল্প—শ্রীযুক্ত সরযূবালা)

চারা সকলে লোক এসেছে আলমোড়ায়। চলা দেখতে। পথে পথে লোক থৈ-থৈ। ঠাইনের অন্যে কোনরকমে বালসাদ্যুলি বানানো হলো। কোনটা ভুল ঘাতে না হয়, তাই পরে চিন্তা। সেগুলোকে আঁকিয়ে রাখা হোল এক পাশে। অনেকজনে ঘিরে ছিলেন। কুলির দল ঘিরেছে আরেকদিকে। কাকে আরেকটু দেরে চেলো বাকার আরেকা ঠিক করতে। টুরিস্ট অফিসে দেখি নেওয়া হোল, ঠিক, আটা চিনির জন্য। ও জিনিসগুলো এখানে কেনবেন পাওয়া যায় এবং খোলা বাজারেও। বাস স্ট্যান্ড থেকে পঞ্চাশের বাসের ঘর নিয়ে আসা হোল মোহনপাড়া পর্যন্ত এখান থেকে আরেকটা বাস যায়। তারপর পায়ে সকাল সাতটায়। একটু পরে কাকে এসে হাজির। অনেকে বার এসে আলমোড়ায় যে মোটেল উঠি সেটার ঠিকানাই ঠিক নেই। কাকে সেখানে নয়, তারপরে হলেন মোটেলেই আসা নেই। কাল ঘুরে একটি মোটেল—ব্রজন। দশ টাকার বিনিময়ে কাকে আরেকটু কাছাকাছির জন্য একটি ঘর নিয়ে রাখা যায়। এখন কি করা যায়!

চিন্তা করার কোন অবসর ছিল না। তাড়াতাড়ি এই আলমোড়াতেই ঘর নিয়ে দুটোকা দিয়ে হাত কাটিয়েছি। এখন ভীড় ভারি। অর্থনীতির নিয়মেই এ অবস্থার মেনে নিতে হবে। আলসা কুলিদের আবার চাপিয়ে আসা চলল। অন্যান্য জিনিষে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কাকদের দেখাকে সবাই ঘুরছে। তার মাঝে আমরা কজন মোহাই মোহাব। মোহা মোহাব। পথে বিশ্রামের অবসরে চলত ছোট-খুন। তাদের অনিবার্যই মহান পথের অবসর মোহাই মনে হয়ে ছেলেমেয়ে। আমরা এসে উঠলাম মোটেলে—দোতলার বাইরের দিকে একটি ঘর। মোটামুটি প্রশস্ত বলা চলে। আলসা মালিয়ে রেখেই দোতলা আর তত্ত্বাবধায়কে নিয়ে কাকে, চললো জিনিষই কমাবার জন্য কুলির কাছে। এই অতিরিক্তের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যই কেনার লাইসেন্স চাই। আমরা বাকি কজনে আলসা নিয়ে পড়লাম, কেন না ঠিক রয়েছে আলকে বলে মোহনপাড়ায় পৌঁছাই হাঁটা পথে। তারপরে বাসের পথে। তারপরে, আসল মহাপথের পরিধি এখানেই করে নিতে হবে। হাতে আর বেশি সময়।

আলসা পরেই ভরা ছিলো। পরাজিত সেরেছে বটে, কিন্তু আর অনেকবার। এখানে কেনবেন দোকানপাট সব আর বন্ধ। তারপরে, পথে হবে না। কতো খারাপ হয়ে গেল। চিন্তা পরে বিধা। বাইরে থেকে জিনিসগুলি কেনা যাবে হোক না হোক, বেড়ানো প্রায় একশ টাকা খরচ বেশি। অন্তত একদিন বেশি থাকলেও তারপরে অনুবিধে। চিন্তা করতে আর কিছু ভালো লাগল না। যা হবার হবে। কাঁচা বাজারের কিনে নিয়ে চললাম সবাই মিলে বাজারে। এখানেই কিনে পাকে না করলে চলবে না। কাকির সাহায্যে আলমোড়া শহরে উঠবে কথা উনবে। বাজার বাবে বন্ধ হয়ে। অতএব।

আলমোড়ার বাজারটি ভালো। সব রকমের জিনিসের অঢেল আমদানী। অনেকদিন পর সেই সেই ফল খেতে হয় না। এখানে আসার সঙ্গেই অনেকদিন পরে। বাকি সব জিনিসের দামই বেশ সস্তা-সস্তা করে। ঘুরে-ঘুরে জিনিস কিনতে আর ঘুরে গেল। দুটি কুলির পিঠে বোঝা চাপিয়ে মোটেল এলাম। ঠিক হলো অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম ঘুরে এসে স্নানাহারের করে নেওয়া। ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসছে। কুয়াশাটা মোহনীর পথে উঠলো। পায়ে পায়ে চলবার সবাই হাওয়ায়। একটা মোকানে চা খেয়ে আবার পথে। ওরেব বেলায় হলো ঠিক ছিলো এখান থেকে চাকুলির কেনা হবে। তারপরে, সন্ধ্যা উৎরে যেতে আর হলো না। চলবার ছিলেন। ঘর পাবে ঘরে মোহনীর নিয়ে।

আবার বিপদ। এখানে মালপত্রের ... ঠাণ্ডাতে। অনেকক্ষণ ধরে মোহনেরা পর জিনিসটি পাওয়া গেল। কাঁচের গ্লাস আটটা। ... বিছানার আলমারীর ওপরে। উলের-ছাপ্ত নরম-গরীর ধন নিয়ে ঘর পানে। আসল অসল চায়ের আলো এসে পড়েছে পাইন্ আর ফার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে। মোহনীর রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা এবার মোহনায় উঠলাম, কেন না হাতে অনেক কাজ।

প্লাস্টিক দিয়ে ঘরের মত করে চাল-আটা-ডালের প্যাকেটগুলি মুড়ে নেওয়া হোল। পথের ব্যবহার্য জিনিসগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ করে প্যাক করা হোল। মোমবাতি হাঁটাপথে প্রয়োজন—কাপড়ের প্রয়োজনীয় জিনিস আর পনেরো হাজার ফুটের ওপরে মোমবাতির প্রয়োজন হবে। কাজ ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় দশটা বাজলো। একটানা পরিশ্রমে সবাই-ই ক্লান্ত। বিছানা বিছিয়ে সহযাত্রীরা শুয়ে পড়লো। ঘরের কষ্ট না দেবার জন্যে বাইরের খোলা বারান্দায় এসে লাইট জ্বালিয়ে ডায়েরি লিখতে বসলাম। আলমোড়ার বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আলমস্তক চাদরে মুড়েও ঠাণ্ডা এড়ানো যাচ্ছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে সারা শহর। শীতের মেশের বেরুবারই এই। সন্ধ্যার মোমেই মোহনীর-মোমেরারা বন্ধ। পথে লোক থাকে না। আলো আলো জোৎস্না। মাথার ওপর ঝুলছে কালচে রাতের কম্বাটা। যাঁর কোন বিলম পাই দিয়ে মেরে কি বৈজ্ঞানিক মেরে। আমার চিন্তাটা অন্য দিকে মোড় নেয়—মনে হয় এরা বাঁচিয়ে আছি হৃৎপিণ্ডের বিরাট নিস্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে। সামনে হাজানো হোলগাড়। মুক্তমেঘ। নারী-শিশু-বৃদ্ধ। হিমালয়ের মোল হাজার ফুট উচ্চ চিলুলের নিচে তারা সবাই চাপা হয়ে পড়ে রয়েছে কোন্ অনন্তকাল ধরে। কিসের আকর্ষণে এখানে তারা এসেছিলো। কোন্ লক্ষ্যে যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলো। কোন্ দুর্ঘটনা তাদের চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে রেখেছিল নিষ্ঠুর হাতে? জানবার উপায় নেই। বৈজ্ঞানিকের কাজ পারবে না সেই রহস্যের আবরণটি অনুভব করতে। কিসের টানে তারা

পথে বিপদ

এসেছিলো, কোথায় যেতে চাইছিলো।

আলমোড়া—কর্তব্যের পরিবেশ সবই যেন ভুলে যাচ্ছিলাম—চোখে দেখার ছুটি যেন কাকে পড়ছে মাথার পরে। বাঁচতে চায় বার বার মনটা। সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলতে হবে—কাল সকালে ঘোড়ে উঠতে হবে, আর দেরী করা উচিত হবে না। লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওরা সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুধু লোকনাথের সঙ্গে সকালে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তখনো বিদায়ের আওয়াজে তার কম্বল নিলো।

॥ পাঁচ ॥

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো। মেঘের ফাঁকে সূর্যোদয় তখনও অনুভবন করছে। চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বাকী বন্ধুদের একজনকে নিয়ে বাসের টিকিট কাটতে চলে গেলাম। ঐসময় একটা বাস। কাল উৎসব গিয়েছে। আজ ভীড় বেশি হতে পারে। কাজেই, সকাল ছটার টিকিট দেওয়া হলেও সময়ে পৌঁছবার জন্যে লাইন লাগান ছাড়া উপায় নেই। আমরা বাকী কজন হাত-মুখ ধুয়ে হোটেলের পাওনা মিটিয়ে মালের পিঠে মালের বোঝা চাপিয়ে পথে নামলাম যখন, আলমোড়ার পথে তখন সবে দোকানের পাল্লা খোলা হচ্ছে—সবে দু-একজন আসছে বাজারে।

টিকিট পাওয়া গেল। কাগজের মলাট দিয়ে রোদে মাল ছোলা হতে লাগলো। সব ওঠানোর পর দেখা গেল একটি আইস এক্স ফেলে এসেছি। ডাক্তার ছুটলো হোটেলে এবং আধ পরেই নিয়ে এলো। কিন্তু পরেই আধ-ঘুমন্ত আলমোড়াকে পেছনে ফেলে এক-একটি বাঁকের মোড় ঘুরে যাবার সময় আমার বার বার করলো সোমনাথের দিকে।

১১৮৪ সালে ট্রেলসপাস-পিন্ডারী হিমবাহ আবার সময় এসেছিলো আমরা দিয়ে-ছিলাম। কারণেই, এ-বছরে ঘুমাছনের পথে নতুন মুখোন অর্থাৎ ডাক্তার আর তত্ত্বাবধানে আমাদের যাবে যেতে দেওয়া হবেনা। সবাই বিদায় নিয়ে গেছেন। আজ উৎসবে ভেসানো হচ্ছে আশপাশের গ্রাম, জনপদ। কোশী, সোমেশ্বর। বার বার বলা হচ্ছে এ পথের সৌন্দর্য আর হিমালয়ের ঘুমাছনদেশটির মুখ সম্বন্ধে ভাল দেখা যাবে কৌশানী থেকে। ওখানে বাস অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। কাজেই, আমরা মুখে মুখে দেখার প্রচুর সময় পাবো।

কৌশানীকে আমার খুব ভাল লাগে। কোন ঝুঁটিনতা নেই। নেই জনকোলাহল। ছায়া-পাইন-দেওদারে ছাওয়া এই ছোট জন-পল্লীটিতে এলে অনুভব করা যায় হিমালয়কে প্রাণভরে ঘিরে। পাওয়া যায় দেবতাত্মা হিমালয়ের সোম্য ধ্যানমূর্তির মুখোমুখি।

এখানে মোটামুটি কয়টি হোটেল আছে। আর আছে কয়েকটি ডাকবাংলো। চায়ের দোকান কিন্তু আলমোড়া থেকে হাতে দু-মাড়াই কমের পর। সাধারণ ভ্রমণকারীরাও এখানে অবশ্যই নয়তেই আসতে পারেন এবং এখানে এসে হিমালয়ের যে সাগরসুন্দর মুখ দেখতে পাবেন, তা চিরকালের তরে থাকবে মনের মণিকোঠায়।

ডাক্তারের কথা আলাদা। বাকী আর যৌথজন দাঁড়লো না কৌশানীতে এবং সর্বোপরি ঘুমাছনের ডাকা চারিদিক। বেলা সাড়ে আটটাতেও বল হাত মুখের কিন্তু দেখা যায় না। ঘুমাছনের চারদিকে মুখ মেলেছে উত্তরের বিশাল ঘুমাছনশৃঙ্গাবলি। আজিসের আকাশে—তার বড় ইচ্ছে ছিল নিজের চোখে একবারটার তুষারাবৃত আছাদে থাকার একটা ব্যবস্থা করবে, সেটা সময়ের অভাবে এবারেও হলো না।

কৌশানীর পর পথ একটানা উৎরাই। মুখেই নেমে চলা। একটানা পথটুকু অবশ্য। এ পথের কোন বর্ণনাই অসম্পূর্ণ পথটুকু। বড় বাসগুলি যাতায়াতের পথে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। দোকানীরা ছুটে ছুটে পাহাড়ী পশা-আপেল-আখরোট-বেদানা বিক্রি করবে। বিক্রি করছে চায়ের দোকানে আর হোটেলগুলোর। আমরা আগে পথ চলা হলেও বলা চলে পথটুকুই পিন্ডারী হিমবাহ আর ঘুমাছন-ঘোমাছনের পথের মিলনস্থল। এই পথটুকু থেকেই কাফকোট বাসপথে আটাশ মাইল। বাস চলে। কাফকোট ঠিক নয়, জায়গাটার আসল নাম ভাঙারি। সেখান থেকেই পিন্ডারী হিমবাহের হাঁটা পথের সুরু।

ডাক্তার সহজে সেবার হিমবাহের কাছে পৌঁছনো যায়, তার মূলে [illegible] একটি এবং এর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। নন্দাদেবী ও নন্দাঘোটের মাঝখান দিয়ে নেমে আসা এই হিমবাহের নদীর মোটামুটি বিস্তার প্রায় দু মাইল চওড়াও পড়বেক ছুটে। আমরা এই হিমবাহের ওপর দিয়ে উঠে নন্দাকোট ও নন্দাদেবীর মাঝের শিরিপথ অতিক্রম করেছিলাম। ১৮৩০ সালে ঘুমাছনে ভিক্টোরিয়ান অভিযানার ট্রেলস সাহেব এই দিক দিয়ে এই শিরিপথ আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাঁর নামে অনুযায়ী এই শিরিপথ আখ্যাত হয় ট্রেলস পাস নামে। এই শিরিপথের উচ্চতা ১৭,৭০০ ফুট। কিন্তু পরে এই হিমবাহের পুলিনের পাহাড় ক্রমাগত ভাঙতে থাকায় এ পথে বর্তমানে পৌঁছনো অসম্ভব প্রায়। ট্রেলস পাস আবার বর্তমান সময় জন পর্যটি হচ্ছে তাকুলি থেকে বাসে সামাবেরা দিয়ে সেখান থেকে মিলম ও মার্তোলী হয়ে ট্রেলস পাস আসা। বর্তমানকালের ট্রেলস পাসের অভিযানগুলি এই পথেই হয়ে থাকে।

তীব্রাতলের বাস অতঃপর পথ থেকে হারালো। জমল চারু উৎরাই-এ পথে পথে পার হয়ে যাস এলো বৈজনাথ। বলতে কি আজে এই সেতুটা না থাকলে বৈজনাথ এক পথে জনপদ এক হয়ে যেত। এ পথে বৈজনাথের প্রাচীন মন্দিরগুলো একটি অপূর্ব দেখার জিনিস। এখানে থেকে হাজারের অতাকীর ঘুমাছনশৃঙ্গ গোমতী নদীর অববাহিকার হাঁটা বাসের একটানা প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন হলেও এর অনেকগুলিই এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ঘিরে রক্ষিত। দেবদেউলে ঘন্টাধ্বনি বাজে। ওপরের চার্বাদা ভক্তমানের আজ নিবেদন করেন ভক্ত-জনী। বিশ্বাসের মূলে সূর্য হয় ভক্তের অনেকাত্মা।

ঠৈকনাথ পার হয়ে রাইল পুরের এঁকিয়ে বেঁকিয়ে—আসকোর্টের পথ ছেড়ে সোজা-সাপ্টা পথ আলাদা হয়। বাঁয়ে ঘুরে গেলে পুরনো পথ চলিয়ালদের পথ ছোট জনপদ ভাগলপুরী। কাছেপিঠে বিখ্যি মোকাম। মুঙ্গিয়ানা, ভাগলপুর। দুপুরুরের দুর্গাবিয়ার সঙ্গে বাঁড়ির কলা উৎসব-এর মুহূর্ত হয় এই ভাগলপুরী ছেলে। এখান থেকেই পাল্কিতে চড়ি বরা কলা চন্দনটীকে নিয়ে ভাগলপুর কলা ছোট কলা উৎসবে যায় ওদান গ্রাম পৌঁছে বিবাহবাড়ি। এবং সেখানে বাঁড়িয়ে যাবে আমার বিয়ে আসে এখানে এবং সে সময়ে এখানে হয় বিয়ে। সেখানে-দুখানে বাঁড়ি তখন কিছু কলার এই ছোট্ট পাল্ক ভাগলপুরীতে।

বাস এখানে আসতেই ছেলেরা আমাকে ঘেরে নিজেদের পাঁচালো। ঘোষ নিয়ে নেবে গেল—তাদের কি গন্তব্যস্থানে যেতে হবে। ওদিকে আমাদের আজকেই সোজাসুজি পৌঁছে যাব রাইল মোটে নেবে যেতে হবে। যেতে যেতে কত কিছুই জানতে পারা যায়। কিছু কলার কিছু চলি। আমরা বস যেতে ভাগলপুরি বাজারে ঘুরতে লাগলাম। কলে ইঞ্জিন আমার যে, সে বলতে ভুলে গিয়েছে যে, পূর্ব থেকে নিয়ে কলা কলকাতার দুপুরুর অফিসারের গাড়ির রাইটার আজ সোজাসুজি আসতে পারছে না। সে-কি কাণ্ড! অবাক হয়ে গেলাম বাড়ির আগে থেকে সোজাসুজি কলা হয়েছে। সে গাড়ী হয়েছে। এখন কেন নিয়ে ইঞ্জিন এই নিয়ে। কাজ কলাসলা রাইটার দু-আর বাড়িতে এক ছিটিয়ে জানিয়েছে, তার স্থান কলাসে এই সময় এক বেলা হয় এবং পরিবার আরম্ভের উদ্যোগে এই সময়টা সে নিজের কলে থাকে। কাজেই, আমাদের যাবা নিয়ে সঙ্গে নিয়ে তার পক্ষে নিজের সুবিধা হয়। অবশ্য আমরা যদি সোজাই আসি, সোজাসুজি আমাদের নিজেদের সুবিধার আসতে হবে এখন অবধি—ওখানেই তার সঙ্গে দেখা হবে।

আবার চেয়ার পরলাম। কাজ কেন আগে বলে নি। অবশ্য কলেই বা ক্ষোভ কি। সত্যিতার বর্তমান কলে সম্পূর্ণে সম্পূর্ণে অর্থাৎ রাইটার সিং-এর সুখের ওপরে ঘরে জানা সম্ভব নয় যাত্রার দিন ঠিক করার পেছনে কত চিন্তা, কত পরিকল্পনা কাজ করে। কত বার্তালাপ যোগাযোগ ঘটলে আমরা প্রস্তুত হতে পারি। ট্রেন-এর ছুটি প্রথমেই-এর হাওড়া ওয়ানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তার সময়ের শেষ মুহূর্তে কখন যাত্রা ঠিকানার কার কি কাজ আসে। কিন্তু আমাদের তো হাত-পা বাঁধা। আমার হাতেও উপায় নেই। কল কলিকাল কলকাতা ছেড়ে যাত্রা করতেই হবে।

বাস হাওড়া চালেলী মেরে। পাহাড়ী যাত্রীদের মোকাই। আমরা আর কারও কথা বিশ্বাসের প্রশ্নই যাত্রা। আমরা কলার মত আমাদি। কম নেওয়া যায় না। এর মধ্যেই আবার দেয়াতী হয়ে বাঁড়িয়েছে ভদ্রলোক। ভিজেল আর ছুটার মিলিয়ে কলের সঙ্গে ভিজেল বর্তমান জল-সাপ্লাইয়ের পরিচালনার আধা-কাজের কল। বাসের কাঁড়ুলির সঙ্গে সঙ্গে দোয়া ওঠা পক্ষে ঘুরো হুকুরে ছেলেরা। মুখ-চোখ আধা-আধা দেখা হচ্ছে। কাল হয়ে যাচ্ছে আমার ভুল। ইঞ্জিনের আওয়াজ। বাঁয়ের পাশটায়ে ভিজে কলের ঘরে কাঁপছে বাসের আলি। কলাকল আছাই আলো কাল হচ্ছে তার পক্ষে সম্ভব না—এই কলাসলা কিছু নিয়ে। একদিকে টানা কাল। আলো ঘরে বাসে বাসে উঠে ভিজেল পাইলের কলকল। পুরে ছোকরাদা পাশাপাশির কল ঘোল খাচ্ছে পাছের ভাসে। ভিজ দেখ ঘরে ছেড়াছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। আকাশে আকাশে বাস ঘুরে চলেছে ছোকাদাসের দিকে। পাহাড়ী আলি—কাল পাইলা—ঘোড়া এই পক্ষে কলর ভিজে।

কাঁড়ুনি থেকে ছেলে ছোকাদাসে পৌঁছলাম প্রায় একটার সময়। ঘাস-ভাসা—সমতলের সঙ্গে ছোকাদাসের এইখানেই শেষ। টানিক আকাশের পর এ-আকাশটি আরম্ভিক নিক নিয়ে ভিজের পুরুষপুর্ণে হয়ে উঠেছে। কলর একটি ভাসা ঘাসের পাহাড় মাইল ঘুরে কর্মচারীর আবাস। ওদের নির্মমত ঘাস চালান আছে। ছোকাদাসেই আলোচনার শেষ এবং চাকোলী ভেলার সুরু। ঘাস স্টেশনের কাছেই বড় কাজ নির্মাণ ছেওয়া আছে ভিজেলীসের প্রবেশ নিজে জানিয়ে। হাজোহাটি কলর আরম্ভিক বাঁধিনীর আঁড়িয়েলি। ছেলেরা লোকজন। লোকজনকাই। চলাকল কাঁচা পরপুর মুখে ছেলের ছেলেরা আঁতাঁরিয়ে চালাক হয়ে উঠেছে সবাই। আমরা নিজেরা ঘাসের মাঝ ছেড়ে আমাদের কল মালপত্র নামানো আমাদের এবং বাঁধিও আকাশপাতে আমরা আলাদাদেই আমের পরিচালনা নিয়ে ব্যাঁড়িয়েছিল—তবু ছেলে এঁকিয়ে এসে নয়। আমি নিজেদের কাজ হাসি-টাইপেই কলত।

মুখুজের প্রথম মুহূর্তের ভাগে ৬,৫০০ ফুট উঁচু ছোকাদাসের ছেলে আমার লাগছিলাম। বাঁড়িয়ে একটা আসে, ভিজেলের কাজ আমা কলাতেই হবে। সমতল ছেড়ে আসা কিন্তুই হয় নি। আমাদের কলাসলা আঁতাঁরিয়ে কাজ প্রয়োজন, ওঁদের কুলির ব্যবস্থাও আমাকে হবে। আলাদাদেরা পক্ষের এসময়ে ছেলে মুখুজের বাঁড়িয়ে ছোটো ছেলেরা। ছোকাদা আমার আঁতাঁরিয়ে নিয়ে ছোটোদের আলাদার ছেলেরা। আমি কাজ আর আমার ছেলের আলাদাদেরা ছেলের।

সন্ধ্যেবেলা আমার আলাদাদের পক্ষের পক্ষের ছোকাদাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিভোর হয়েছে। আকাশের আকাশের ছিনের ছেড়ে, কাজল। আলাদ ছেড়ে আসা ছিলী হয়েছে ছেলেদের দিকে। পক্ষে পড়োপড়ি আসা পাইল, তার আর চাঁদাবাদ। ঘুলো উঁড়ুরে ধারোয়ার কলকে সরীসৃপো। গমগমে অবস্থা। লোকালী নতুন লোক দেখে ভদ্রলোক চাঁদের কলছে, আইয়ে বাবু—গরম চা—চিনিলা চা।

প্রস্তাবের কোন দৈ পাওয়া গেল না। কুলির কল প্রথমেই পরবর্তি হলো—প্রায় ওপরের চাওয়ার ছেড়ে রাজী নয়। একটি লোক পাওয়া গেল—সে ওপরের শিঙ্গে মাল নিয়ে ওদান গ্রামে পৌঁছে দিতে পারে। এই পর্যন্ত। প্রতি কলর দুপুরে আলাদা মাল বইবে এবং সেজন্যে তাকে কলর পিছু পনেরো টাকা দিতে হবে। 'ওদান'-এ আমরা তৃতীয় দিনে পৌঁছবো। কাজেই, ঐ হিসেবে আমাদের কলপক্ষে ১৮০ টাকা দিতে হবে। মনে মনে হিসেব কলাম। কিন্তুক্ষণ এই কল। অর্থাৎ ভোজালপুর-ওদান যাতায়াতেই কুলি কলর চালনো ঠিক। আর আমাদের অনেক অনেক সঞ্চিত তিন হাজার টাকার অর্ধেক কলাম কলাম আজ—আর তার ছেলেরে কুলিভাড়া বাবদ ছোট আইলো টাকা। না হতে পারে না। হতাশায় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শেষ চেষ্টা হিসাবে চলাম বাঁধি ডাক্তারের কলকের সিং-এর কাজ। সকাল-বেলা আলোড়া যাব শুনাতে কে যেন এই নাম্বা বলেছিলো। কলকত্ত সিং নাকি শুক্লপ্রস্তরের ছেলে এ পক্ষের বাসিন্দের খুব সাহায্য করে থাকেন।

আজ এখিয়েই বাঁধি ডাক্তার। কলকত্ত সিং অফিসার ঘরে একটি মোক্তারে বিভিন্নে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের ডাক শুনে বাইরে এলেন এবং বলতে বলে আমার নিজের কাজে ডেকে নেলেন।

অল্পেকজন লোক মুখে আঁতাঁরিয়ে সহজভাবে আমাকে টানিছিল। আমাদের সব কথাবিবাদ কথা তাঁর শুনলেন। প্রাথমিকীতে ছেলে ভদ্রলোক কলকাওয়ালা ছোকাড় কলালেন এবং কেউই ছেলেদো টাকার ছেলে রাজী হতে চায় না।

আমি ছেলের দুপুরুরে ছেলে ফিরে এলাম। ঘাস স্টেশনে আলিসাদের কলকায় পালা ছেলে এই অবসরে ছোকাদাস ছেলে ছেলে ছেলে। বাঁড়িয়ে প্রায় ঘুরো। আর ছেলে কলা ঠিক হবে না।

হাতের কাজ শেষ করে কলকত্ত সিং ছেলেলেন। তিনি চাকরে ছোড়া ঠিক করে দিলেন। প্রতিদিন কল টাকা হিসাবে নিতে হবে এবং যাত্রাপথ শেষে খুশি মনে কিছু উপরি। তথাস্তু। কিন্তু, প্রথম কলিনে ঘোড়ার আলিসাটিকে ছিলের সুবিধের মনে হয় না। ভীষণ খিটখিটে। প্রতি পদে তার

দেখার জোয়াড়দের বন্ধুরা পথ জুড়ে দিয়েছে। সে ভারপরে আর এগনো যেতে পারবে না। জলদলে মাল নামিয়ে রেখে ফিরে আসবে নৌকোগুলোতে।

যা হবে তাকে এখানে কথা অন্ধকারের কোন মানে হয় না। আমরা যার স্টীমে চলে এসেছি। সে চাচাই হাত ফিরিয়ে খবর দিয়ে এলো। আমরা সবাই ফিরে চাল বাঁধার সাহায্য করলাম। ছাদের আলকাতরা মাখা কলসী, মশলা আদিম, সেদ্ধ আর মোদ্দুরা। এসব পাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। মাল পাচারে দিয়ে আমরা বাকি সকলকে চুক্তিমাফিক পয়সা ফেলে রোগী প্রফেসরীর আমরা দেয়ে নিতে। বাড়িতে প্রায় ভিন্নই ফেরা। সূর্য তখনো অনেকখানি পশ্চিমে ঝুলে পড়বে পড়বে করছে।

বিউলীর ভাল ঘুমোনো তখনো আর হয়। এবই জন্যে ফুলে ফুলে ফিরে ফোল মাঝারিচর ঘাটোলা। বিশ্রামের সময় নেই। খেলা পড়ে আছে। মাত্র চৌদ্দ একটানা প্রেতে খেলা করেই বাড়ানোর আজকের মাহের আয়োজন। তারপরই পথে নামানো হাড়-ভুবে ঘরে।

খেয়াঘাটে বাজারের মধ্য দিয়ে পথ নেমেছে

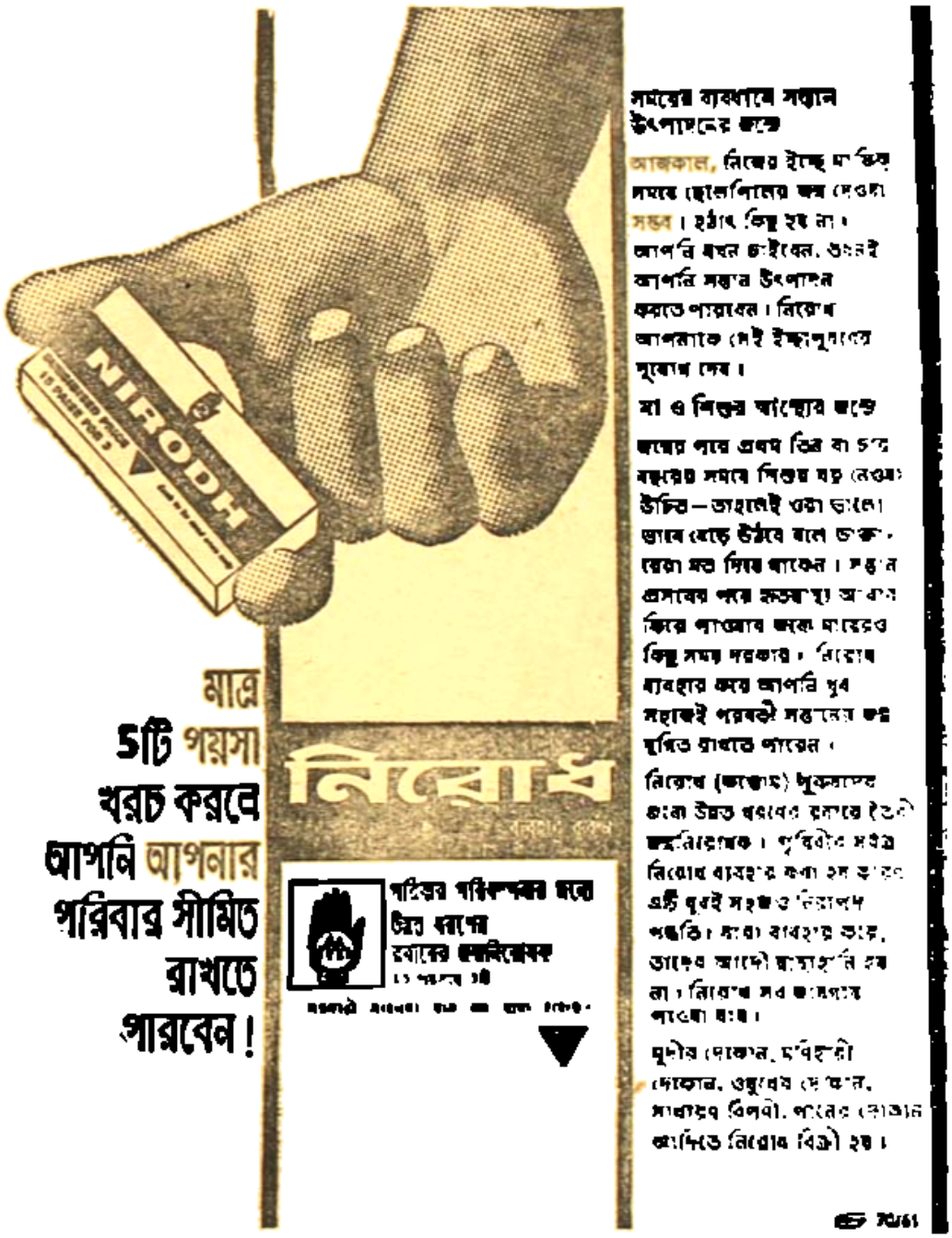

সময়ের ব্যবধানে সন্তান উৎপাদনের জন্যে

আজকাল, নিজের ইচ্ছা মতো সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে

জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তাররা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম মুলতুবি রাখতে পারেন।

নিরোধ (জাপান) পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ধরণের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরোধ ব্যবহার করা হয় জাপানে এটি খুবই সহজ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ অসুবিধা হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, ঔষধিকারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিক্রেতা, পানের দোকান প্রভৃতিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

ৎ 7061

একটায়। সবার ক্ষেত্রে একটা ঘোরের বন্ধুত্ব হয়। তাদের আছে একটা বিন্দু ছাতে চার এক মাইল হাঁটা হবে—আর তার মধ্যে কিছু খেলে তো চার ঘণ্টার পথ হাঁটা। তাহলেই, সন্ধ্যেবেলার পর হয়ে যাবে। তাঁর ছাড়া সাইন ফেরারের তাদের সঙ্গে কিছু সঙ্গে চলা পথ একটানা নেমে গিয়েছে ঘাসবনের দিকে। উজ্জ্বল শিশুরাণী নদীর কাছাকাছি। সেখানে ক্যেলেনো পথে পার হয়ে তাদের ঘরে ফিরতে পারলে তবে সেইখানে রাত কাটানো। আজকের রাতের মতন।

ঘুম একটা হবার। সর্বাণি সঙ্গে রাখা হয় নি। ওদেরো মালপত্তর সঙ্গে চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে শুকনো কোঁটা ঘাসের ঝোপ রয়েছে। তখনো থাকলে ভুলের মেয়াদে ফিরে হবে চলতেই। হয়তো বা ঘোরের পথে এ রকম ঘাসের ঝিলে পেয়ে রাত-কাটাতে যে ভয়ঙ্কর হয়ে হয়েছিলো—তাই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তবু কুল পাওয়ানোর উপায় নেই। তাদের এখানে।

সন্ধ্যেবেলা একজনের সঙ্গে আলাপ হলো। সেবারের পর কয়েকে গ্রামে বাড়ি। ক্ষেলা-ইনস্পেক্টর কাজ করেন। দুজনের ছুটিতে বাড়িতে ফিরছেন। বাস পান নি বলে হেঁটে আসছেন। বহুদিন প্রিয়-জন ছাড়া।

ভয় ভালো লাগছে না। আজকেই ঘরে পৌঁছবেন। রাত্রি তা রাত তো হয়েই। এগারোটার আগে তো কোন ক্রমে পৌঁছতে পারবেন না। তা হোক, তবু ফেরে হবেই। বাস ভাল লাগছে না নিঃসঙ্গ জীবন। হাতে তাঁর একটি ছোট বাক্সটি-জাতীয়। তার মধ্যে নতুন বেনো টাকা। বাজারের জন্যে কুড়ানো চকোলেট বিস্কুট। একটি নতুন ছাতা সাড়ি। এসব বাড়ির জন্যে। তার-তার জন্যে চলেছেন তিনি। তাঁরা এঁদের দেখা হবে সঙ্গে গল্প করতে করতে। আমরা তিন-জন পিছনে চলেছি।

আমাদের অন্তত সহযাত্রী ভদ্রলোকের এ অভিজ্ঞতা নতুন। আমরা দোতার পা ফেলে চলা—পাহাড়ী পথ ভোর ফেলে যাদের শিক্ষা হয়ে ঘুরে এসে পথ মাঝিতে দাঁড়ানো—ঠিক হয় হয় না। পারে না। প্রয়োজনে অবলীলা-ক্রমে চার হাত-পায়ে ছোটদের মত শিশল যায় ঘুরো পাথরের উপর। চমৎকার পিছিয়ে পড়ে আর আমাদেরও ফেলে চলতে হয়। অবশ্য উৎরাইয়ের পথে পায়ে একবার ঢোলা গতি সঞ্চারিত হলে আমরা কাবিল। হাঁটু ব্যথা করে—ছোটো খাবার তার থাকে। পা ছাঁড়ে হাত চায় না। ইত্যাদি।

একটু এগিয়ে ফিরেছিলাম। ভদ্রলোকের হাতে ফিরতে ফোন। পাহাড়ের পিছল ভদ্রমহিলা দেখতে বিশেষজ্ঞ, তবে পেছনে সে আসছে বলে আমি আর কারু পায়ের দিকে অবশ্যই মোট বাস বাঁধিয়ে এসেছি। লাফাতে বসে বোঝা তখা নয়। তবু সে ভরসা পাই না। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে নামিয়ে আনলাম। আবার পথ চলা।

উৎরাইয়ের একেবারে শেষে একটি ছোট ঝরনা দেখলাম। তিনজনে হাত মুখ ধুয়ে গা ভেজে। সারাদিন ভরসা চলে গিয়েছে। বাঁচার লোকে ফিরে ফোনো। ছোটখাটো গল্প। ওদের একজন বরফ খনির কাছে একবার বড় রকম উৎসবে গিয়েছিল। দুর্ঘটনাতে—আবহাওয়া খারাপ থাকায় ফিরতে বাধা হয় পাথরনাচুনি থেকে। সে তার অভিজ্ঞতার অনেক গল্প শোনালো। চা খেয়ে বহুতে বহুতে সন্ধিয়া অর্থাৎ ঘনঘোর আঁধারে পথ চলা সহজ হলো।

চারের দোকানের পরই পাথর ফেলা পথ। পাশে পাশে ধানে ধানে ধান ক্ষেত। ফসল কাটা হচ্ছে। নুয়ে পড়েছে ধান গাছ। অনেক নিচে পাহাড়ের গায়ে ছুটে চলা শিশুরাণী নদী। রাস্তা তারদিকে ঘুরেছে। পাশে পাহাড়ি। পাহাড়ী ঝর্নার জল নালা কেটে নিয়ে এসে ঘনানো হয়েছে বিরাট খাঁজা। গম-ভাঙা কল। ছোট ঘুপড়ি। তার পাশে সরু গায়ে চলা পথ। সোজা নেমেছে উজ্জ্বল পাহাড়ী ঝর্নার বুকে। ওপাশে জল ছড়াই পথ ফেলে পাওয়া যাবে ভালো সড়ক। সে পথে সোজা যেতে।

পাহাড়ী ঝর্নার ওপর পায়ে পাথরের উপর ঝর্নাটির ফেরে আর আসিস। ঘুরে ফেরে ফেরতে সোজা হাত ফেরে ইশারায় ফলো রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফেরে। অবশ্য এখানে ঝর্না পার হলে ফেরে অনেকটা পথ সংক্ষেপ হয়। কাজেই আমরা ওদের অনুরোধ উপেক্ষা করে সে পথেই চলাম।

ওরা ছোট উঠলো। ওদের ফোনো পার হতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন জলে। ফোমরে ছোট ফেলেছে বেশ। জামা-কাপড় ভিজে চপচপে। জল নিচে পাড়িতে গিয়ে পাথর আঁকড়ে উঠেছেন ফেরে। ওরা ঘুরের সেজন্য সহানুভূতি জানাবে, সঙ্গে আমরাও এগিয়ে না আসি।

ঘুরে, তাও হয় নাকি। পাহাড়ী পথের জানুয়ে-জন অবলীলাক্রমে হাঁটুজল পার হচ্ছে। আমরা বেফারেন্স আমাদের ফোন হাঁটতে রাজী নই। শেষে ঘিরে পার হয়ে এলাম জল। তবেতেও ভরসা পেলো না। জুতো-মোজা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে জলে নেমে পার হলো। ছোট নাম্বর জল পাহাড়ী ঝরনার। হাঁটুর জানুয়েক গভীর পথ হয়েছে। আল বিশ্রাম নিয়ে আমরা চড়াই ফেরে নতুন সড়ক ধরলাম। আর কয়েক পায়েই ওপরে ফেরল অবধি যাব যাবে। এখনও রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। ফলকাটা আর বড় বড় পাথরগুলো ইতস্তত মাঝেই ফেলা পড়ে রয়েছে।

চারু পথে ফিরছি এমেই নিচে জলধারার ফাঁকে ফাঁকে শিশুরাণী নদী দেখা যায়। ফেন রুপোর জল নিয়ে আসন খেলায় মত উজ্জ্বল শিশুরাণী নদী ছুটে চলেছে। দুধারে তার আকাশ ছোঁয়া বনের সবুজ ঘাসির চড়া। সবুজের ফেরে বিভিন্নতা ওপরে। সেই ঘাসির উপর দা ফেরে ছুটে চলেছে একটি ফেলে, একটি মেয়ে। ফোটোটার মাথার ফেরো। ওদের চলার ঘাসগুলি অবধি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সাদা ঘাসির ফেরে। পাশে উজ্জ্বল নদীর জল। ওদের প্রতিফলিত ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। ফেলে ফেলে উঠে ফেলে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ফোন্ খেলানার ঘারী ভগবান কে জানে।

কিছু পরেই শিশুরাণীর ঝুলন্ত সেতুর পাশে হাজির হলাম। ঝুলু প্রাচীন এই সেতু। * ঝুলু ফেটে পার হওয়া সম্ভব। দুধারে পাথর সাজিয়ে ওপরে পাঁজাতে ফোলানো সেতু। জল ছাওয়াতে ঘর পর ঘর ভাসে। মাঝে তার কাঠের পাটাতন। অনেক আয়গায় অবশ্য তাই নেই; কিছিং ফাঁক। নিচের জল দেখা যায়।

নদী পার হয়ে ছোট গ্রাম নমাক্ষেপারী। কয়েকটি চায়ের দোকান। কয়েকজন খোল হয়ে বসে গল্প করছে। ফেতের কাজ ফেরে কুড়ি পিঠে ভরে ফিরছে কয়েকটি বুবতী। পাকা ধানের গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। আল জল চড়াই ফেরে এগিয়ে চলা। বাস-রাস্তা এখনি মিলেই যাবে। তার চলেছে তাড়া। চলন সন্ধেহ হয়ে যায় ফেরে। তার বড় বড় টিন, পিঠে জড়ানো আছে আরামদায়ক। ঘণ্টার ঘণ্টা ধরা পাহাড়ী ফেরের বল মাথা কুটিয়ে ফরের পানে চেয়েছে।

চারু মাঠে পড়তে নামাল পৌঁছলাম ফেরলে। অবশ্যের প্রায়ান্ধকার ঘনীভূতের ঘাচ্ছে। ওরা আসেই পৌঁছবে। ফোনো জামা-কাপড় পাল্টে চায়ের কাঁটা দিয়ে ফেরে-ফেরারে যা এগিয়ে দিচ্ছেন। বাসের টিক নিচেই উজ্জ্বল শিশুরাণী তার ফোরেল ফলার নিমগ্নতা। তাঁর সুন্দর দেখার এখানে ফেরে। বাসের ঘাত্রাস্থান বাঁকিয়ে শিশুর ফোরা ঘাত্রাস্থের নামাতে চড়ার ফোরে পড়লো ফের ফেটে নিয়েছে। ফিল্মলাপ্তের ফলার ফরের পড়ন্ত ফোরের রঙিন আভায়। এ-সৌন্দর্যের ফোন তুলনা নেই। সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে অবাক নিশ্চয়ে চেয়ে রইলাম সবাই।

শেষ বাঁকিয়ে চায়ের ব্যবস্থা হলো। এ-বিস্কুট ফেয়ে ঘাত্রাস্থের ইনোজ কাজ

—আর আমিন সেখে সেরা খলাসি। আমরা ছোটনাগপুর থেকে বিহারা সেরে ফিরছি দারভাঙ্গার আগের স্টেশনে এসে ঘুম ভাঙল লালদার। আমিন এসে ডেকে তুলিয়ে দেয়—চাউ-মি, আফলো আর, আলু—বাঁধাকপির তরকারি, আরো চায়নী আর লাবাক। সবাই উল্লসিত হয়ে উঠলো আমরা। সাঁচি পর তিনদিন ধরে খুব পরাই পক্ক হয়েছে, খাওয়া হয় নি। আগে ফোরে ফার্স্টক্লাস-এর নাম ছিল, আজকাল আরাই টাকার বিনিময়ে যা দেয়, তাতে মন এবং পেট কোনটাই ভরে না।

টাকার জন্যে একে একে প্রায় সবাই উঠে গেছেন দেশ। ছেলার ভুবনের কাছ চাপিয়ে কানু এসে বাইরে। বাহে হিসেবের খাতা—টাকার থলি। আমি তার এই আগমনটাকে খুব ভয়ের চোখে দেখি। আমি জানি, প্রতিবারই এর বাজেটে ঘাটতিপূরণে অর্থমিল হয় এবং এ-ভয়ে এর আসার মুহূর্তে লব নিয়ে এসে বলছে—এ চলে যা—তোমার যা পাওনা হয়। এ পরিমাণ এতিশিক্ত হয় না। তাহলেও বেরুতে যাওয়া যায়।

অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, পাহিস্ত বটে। সারাদিন পরিশ্রমের পর আবার রান্না। কি-কাঁড় ছিল চৌকিদারকে দিয়ে বড়ো চাল ঘাটিয়ে নিলে।

হ—তুমরে হইছে—খইনাসিংহ তার বেরুলো কানু।—এই-ই কল বাদুলো হয়ে রোজ না—আমার কয় বাজাল—আরা যাইবো আকোরাদিল রাত্রা, তুইও যেমন। চেয়ার টেনে বসলো সে। হিসেব দেখীছস্?

—যা তো। সে তোর ডিসাটোরেই। তুই যা কাল দেখিস—তাই হবে।

—ঠিক আছে—মাতা নুয়ে উঠে দাঁড়ালো কানু, তাই হবে।

—কি রে, কি ঠিক আছে? কি হবে? আমাকে একটু জানাই হবে হয়।

—এই তুই যা বলবি—আমি তা বুঝবো।

—তুই কি বুঝবি, সেটা তো বল।

—আমরা কালকেই কলকাতা ফিরছি—ছেলে ঢাকা ডিসেম্বরের দিকে চোখ রেখে বোঝবা করলো কানু।

তার হাতটা চেপে ধরলাম। আরে বাবা ঈদ ফাঁসল কেন, খোল বোস্। কি হয়েছে বল।

—হয়েছে আমার মাথা—ঝাঁঝিয়ে উঠে, হাত ঝাড় দিলাম—চলে না, দুনিয়ার সব জিনিসের দাম বেড়েছে—তখন সেই আর বাড়ে না। এখন বোস চেলা। তিন হাজার টাকায় এসপিডিশন। তাহলে-তাহলাবার মেখে আর না।

ওকে টেনে বসাতে হলো। সাঁচা ভাই—প্রাথমিক ছোটাছুটি-কলরবই সবাই ভুলে গিয়ে —টাকার থলির দিকে তাকাই নি। বাবার

মুক্ত সাগরের পথে একটি বিদেশগামী জাহাজ

মুখের চেহারা তখন ছেলে এক বাবাই উঠে গিয়েছে। ওখানে পৌঁছে ছেলে-মেয়েই আমাদের টাকা পাঠাবে। তা ছেড়ে দিয়ে কি হবে, চিন্তাই বটে।

ভাবা হলো সবাইকে। পরিস্থিতির মুখের মোকাবেলা। কিন্তু বরে গিয়েছে ওদের মুখের। আমাদের ভালো লাগছে এই পথ। ভালো লাগছে এই যাওয়া-থাকা-খেওয়ার অনিশ্চয়তা। কারো কাছে হাত পেতে টাকা আনি নি। নিজেদের রক্তের সঙ্গে মিশে রোমাঞ্চের পথে। হতাশ হবার নয়, কম ছিল নজরবন্দী উপত্যকার পথ সন্ধানের জন্য ভাবছে। সে কথা বলতে আসছি কি। আমরা মুখচুরা। মেখবো নেই চিন্তাচেতনার মুখের। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে কঠোর বুনোর পাহাড়ী পথ চলায়; হতে পারে আরার আরও বেশি ছেলী হয়ে আসতে পারি। আরও বেশি চঞ্চল হয়ে পারি। বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

এখানে আর কথা চলে না। ওরা উঠে গেল। রাতটা ভার হয়ে আসে। এরমধ্যে আরও মেখা। এত আলো। ওই তো দিগন্তে দেখা যাচ্ছে। কত স্বপ্ন দেখেছি হিমালয় তীর্থ দর্শন করে ফিরবো নজরবন্দীর মাঝ দিয়ে অনেক দূরে নজরবন্দীর দিকে। প্রতিদিন পর্যটকদের মত কাছে যা পাবো নি, আমরা ঘুটিকের হিমালয়প্রেমী বাঙালী তাদের সেই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করবো। বিকিরে গেল সব আশা। খুব পরের দেরি নিয়েই ফিরে আসতে হবে মাঝপথ থেকে? ঘরে সাহস, পায়ে শক্তি অবশিষ্ট থাকতেও ফিরতে হবে। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে।

রাত ভোর হয়ে এলো। বাবার ডাক এলো। হাতমুখ ধুয়ে এলাম। বাবও ওকে পাল না দিয়ে জলখাবার কথা আমাদের বুঝিয়ে দেখে নি। খাওয়ার পরে খুব পাঠানো সেল। খাবার পরে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় ক্যাসপুল দিয়ে সবাই খুবে পড়লো। কানু-মোহনা বাড়িতে চিঠি লিখতে বসলো। শিলুটোনহীন আমি বসলাম ডায়েরী নিয়ে। বাইরে অন্ধকার করে আকাশ ফেঁপে উঠে মাঝলো। কিন্তু আশ্চর্য ভালোবাসার চেয়েও বেশ ঘরে আছে। ওদের যা এত-ভত সবাই গালাগালি করে খুমোই বসেই। ডায়েরী লেখা শেষ হলো তবু ঘুমটি ধরে না। মাথার মধ্যে চিন্তা। কানু-মিত্র-পরিবারের কথা মনে ভীড় করে আসে। মোমবাতি নিভিয়ে দিলাম। জোনাকির মত উষার ছোট ছোট জাহাজ। আমরা উৎসুক হয়ে ছিলাম। বলাম—কি রে কি হলো?

—জোনাকী ছেলী জলদাজ।

—ভেলো নাকে জাহাজের ছিলি এটে?

—নাপ্—কি বললে তুমি—যাক ভালো আমিরে উঠে এলেন জোনাকী। আর কোন কথা নেই। কম্বল টানা দিয়ে খুমে পড়লাম। আবার জোনাকীর ডাক শুনে ঘুম ভাঙলো। নিচে এলাম।

৪ দিন ৪

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো। ছোটর ঘুম চাঙ্গার বিছানার উপরে পাল কাটিয়ে উঠে বসে হয়। কিন্তু না উঠেও উপায় নেই। বন্দরকর্তাকে সাক্ষাৎকার জানাতে হবেই। জাল আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে সে জোনাকী খবরের জন্য প্রায়ই হাজির হয়ে গিয়েছিল। ধন-ধন নিয়ে। সে আবার আসবে আমাদের তিরি হতে হবে।

হৃষিকেশের পরিবেশ জুড়ে হিমবাহ

ছেলে বোধ হয় সাড়া ছিল, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছিল না। শৌচ ধাঙ্গির ঘর বানালাম। কম্বল সরিয়ে একেবারে ভেতরের হাতের কাছে যে ক'টি হাজির হলাম। কিন্তু ঘুনিয়ালে দেখা গেল ভয়ানক মেয়ার লোকের বড় অভাব। সকলে প্রাণপণে গালাগালি দিয়ে ঘুম ভাঙানোর জন্য তারপর চা খেয়ে বাইরে এসে চুপচাপটি শুয়ে রইলো—দেখে যা—দেখে যা—হিমালয় কি অপূর্ব সুন্দর দেখা যাচ্ছে!

সকালের জলখাবার চৌকিদার বানিয়ে দিল। আলুপরা মোড়ানো হয়ে গেছে। আমরা তৈরি। কিন্তু বাচ্চাদের পাত্তা নেই। পান সিং গলাঙ্কিক চাপ বাজাতে হবে ভাবাবে। ঘুমের হাতে চলেছে ঝাঁকি। রোদ উঠেছে খুব। বাইরে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আটটায়ও পরে পান সিং গলাঙ্কিক নিয়ে এলো এবং ঘুমের মাথা চাপড়ে করাতে দাঁড়াতে লাগল নাচা।

হৃষিকেশের পথের খাবার সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। আমরা খুব চলে ভাল চলে লাগলাম। কয়েকজন আগে যাবে। এবং কয়েকজনকে নিয়ে আমি পিছনে। ভবতোষের কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছে ও হাঁটতে পারছে না—হাঁটতে পারবে না। অবশ্য পরের ভেতর ওই সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। বুঝলাম মনের দুর্বলতা—অভিযানে তো এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

কেবল বাংলো থেকে বেরিয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে পথ। এখানে ছোট একটি চায়ের দোকান আছে পণ্ডিত কটীরামের। মাথায় হলদে পাগড়ী। বিরাট চলনের কোটা-তিলক কাটা কপাল। ভাকলো কাছে। বললো, চিল্লী তীর্থে যাচ্ছো তোমরা। বললাম, ইচ্ছে সেরকমই আছে—এখন নন্দাভগবতীর যা ইচ্ছা।

কটীরাম খুশি হলেন। বসতে বলে ভেতরে গিয়ে খুব যত্ন সহকারে একটা সাদা কাপড়ের ছোট বাণ্ডিল নিয়ে এলেন। তার ভেতরে সযত্নরক্ষিত কলকাতার ডিরেক্টর অফ এমারজেন্সি এন, দত্ত মজুমদার মশায়ের একটি সার্টিফিকেট। ১৯৫৬ সালে তিনি যখন ভারত সরকারের উদ্যোগে হৃষিকেশ অভিযান করেছিলেন, কটীরাম তাঁর সঙ্গে ছিল এবং তাকে কৈলাসিনাথকে একটি প্রাচীন শিলালিপির খোঁজ দিয়েছিল। সেই ছাপা প্রশংসা-পত্রটি।

কটীরাম অনেক যত্নের সঙ্গে সাদা কাপড়ের ভেতর থেকে আর একটি কাপড় বের করে দেখালেন সেই শিলালিপির প্রতিলিপিটি। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন করে সযত্নে করে রেখেছেন আজও সমতনে।

এই শিলালিপি আবিষ্কারের গল্পটিও ভার খুব ভালো। যৌবন পাহাড়পর্বতে ঘোরার একটা নেশা ছিল। এবং তারই জন্যে কয়েকবারই গিয়েছিলেন ওয়ান পাত ছুয়ে কখনো বৈদিনীতে। কখনো বা হৃষিকুণ্ড। তেমনার হয়তো ফিরে এসেছেন। মাকপথ থেকে। এরকমই একবার ঘুরতে ঘুরতে তিনি অল্প কজন সঙ্গী সহ কৈলাসিনাথের কাছে হাজির হন। আকাশে ঘন মেঘ। শরীর ক্লান্ত। বিশ্রামের আশায়— অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু আশায়। মেঘ সরতে উঠতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হলো যে পাথরে বসে আছেন ওটার যেমন যেন আঁকিবুঁকি কাটা এবং দেখেই বোঝা গেল শুধু নকশা নয়—এ ছবি কিছু একটা বলতে চায়।

ফিরে এলেন তিনি গ্রামে। পরের যাত্রার আগে যান এ লিপির কথা তিনি ভোলেন নি। সঙ্গে এক টুকরো কাগজ আর কালি নিয়ে গিয়েছিলেন। সযত্নে তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলে এনেছেন। এবং সেটা আজও তার কাছেই আছে। মজুমদার সাহেবকে তিনি এটা দেখিয়েছিলেন এবং এই জন্যই তিনি সেই অভিযাত্রীদলে যোগ দিতে পেরেছিলেন। অভিযাত্রীদল পাহাড়ীর অনেক ছবি-পত্র নিয়েছিল। কিন্তু গত করেক বছর ধরে আর শিলালিপিটিকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। কে কখন কোন লোক নিজের কোন অজ্ঞ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেটাকে সরিয়েছে।

চেনা জগৎ থেকে যোজন যোজন দূরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে। চোখের জল চেপে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠছে। একটা পাহাড়ী ঝরনা পথে। মোড়া যায় বর্ষায় এটাই হয়ে দাঁড়াবে যাতায়াতের নদী। পাইন গিরে ঢাল পাশের বনস্পতিটি বড় সুন্দর। এত অপূর্ব ঠাণ্ডা জল। আশিসের বাবার আবার ব্যবসাবুদ্ধিটা জাগলো মনে। ভবতোষের সঙ্গে গম্ভীরভাবে আলোচনা করতে করতে পথ চলতে লাগল—এই জল বোতলে পুরে কলকাতায় পাঠালে জোরাকোনা কোম্পানীকে তত সহজে মাত করা যাবে।

ঝর্নার পর থেকেই চড়াইয়ের পথ। রাস্তা চওড়া হলেও জল আর কাদায় একাকার। কাদায় ঘোড়াগুলো পথে প্রায়শঃই পিছলে পড়ছিল। একটা ঘোড়া আবার আশিসকে পিঠ নাড়িয়ে ফেলে এলো। ঢালে দুটো ঘোড়া কিংবা মানুষকে দেখলেই আশিস প্রশ্ন করা শুরু করলো খাটি ইংরাজী ভাষায়—আরে পথ নেই তো!, এবং নিজেই নিজেকে জানালো ওরা তো বাংলা বোঝে না!

মাইল দুয়েক চলার পরই পথের বহু স্থানে দীর্ঘস্থায়ী বরফ বিরল হয়ে এলো। ছাড়ে শুধু ঘোড়া খাস। ঝর্নাবহুটি। চোখের সুখ উপভোগ। সাদাকাদুরে পথের চিহ্নের মনে মনে পড়িয়ে নেয়। রোদের তাতে পথ চলা কষ্টকর। ছাতা নেই, চোখে গোগলও চোখে পড়ে না। শুরুই কষ্টকর পদযাত্রিকরা। মেহারী মানুষ-জনের সাথে দেখা হয়। কেউ খুশ মেজাজে—কেউ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে—মানুষের দাঁড়ানোর উপায় নেই। পথ চলে এগিয়ে চলা।

ক্ষুধা শুকিয়ে আসে। পাহাড়ী ঝর্নার ঠাণ্ডা আঁজলা ভরে খেয়ে আবার এগোও। পরিশ্রম হোক। কিন্তু দাঁড়ানোর উপায় নেই। এতক্ষণ রোদ ছিল। হঠাৎ আবার মেঘে ছেয়েছে চারদিক। বৃষ্টি আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। আর পাহাড়ী বৃষ্টি ভারি নিষ্ঠুর। অল্প সময়েই ঝরনা-কলা হয়ে উঠবে পথঘাট। আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। ওয়াটারপ্রুফে জল বাধা মানবে না।

কিন্তু কোথায় ঝরনা উপল অনাবৃষ্টি আর সাদা পাথরের দেখা আর পাইন গাছের লাল কিনা। ছোট্ট ছেলের মতো কিছু চিন্তা মনে হচ্ছে ছড়াচ্ছে। কেন ছড়াচ্ছে কিছু ভাবে। আশিসের পরিশ্রমী মন হালে ওঠে আবার। আবার নতুন উদ্যমে চলা।

অবসাদের আর হেতে চায় না। সত্যি পরমাণুরও বড়ই একঘেয়ে লাগছে। অথচ উপায় নেই—ওকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মনের মধ্যে বড় রকমের তাগিদ দেখালো—ওইটুকু চলুন। ওখানে নিশ্চয় চায়ের দোকান আছে। ওখানেই বিশ্রাম করা যাবে।

মনে এলাম সেই গ্রামে। নাম জানতে। ঘোড়ার চায়ের দোকান। ঘরার ভাল জায়গা পাওয়া নেই। কাজেই এগিয়ে চলা। বাচ্চা ছেলেরা, ঘরের বউরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। একটা জিনিস বেশ বোঝা যায়, এরা এখনো আমাদের মত জন্তুদের দেখি দেখে নি। নয়তো ওদের জন্যে নিশ্চয়ই ঘিরে ধরতো। এরা শুধু অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

কামাজের পরে বেশ কিছুটা জায়গা পাথর বিছানো পথের একটানা চড়াই। ভবতোষের পুরোপুরি উপলব্ধিহীন হয়ে পড়েছে। মুখে এখনো তবু পাঁচ মিনিট দাঁড়ায়। হাঁটতে থাকলেই চটে ওঠে। তবু উপায় নেই। প্রায়শঃ জোর করে তাকে নিয়ে সেই চড়াইয়ের মাথায় পৌঁছলাম। জায়গাটার নাম শিলখাড়া। একটা বেওয়ারিশ মালের গুদাম সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা রয়েছে। সেখানে ওরা সবাই আমাদের দুজনের অপেক্ষা করছে। পাশে একটি ছোট দোকান।

শিলখাড়ায় পৌঁছনোর মিনিট দুয়েকের মধ্যে সামলো বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টি। আর সেই সঙ্গে হাড়কাঁপানো হাওয়া। আমরা সবাই ছুটে আশ্রয় নিলাম দোকানটার ভেতরে। সেখানে বসেই সাথে আনা দুপুরের খাবার খেলাম। এর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বৃষ্টি থামতে না দেখে বর্ষাতি গায়ে গ্রামের দিকে আবার পথে নামলাম।

বৃষ্টিতে পথ কাদা-পিছল, ঢালের উৎরাই—এদুটো বাড়তিও একটা সুবিধা ছিল—পথ হাঁটার ক্লান্তিটা আর থাকে না। সবাই প্রায় একসঙ্গে চলতে লাগলাম। শুধু ভাবনা এক বন্ধু আমে ছুলে গিয়েছে। একটানা ঘন্টাখানেক এসে স্থানীয়দের ঠিক আগে আমকে দাঁড়াতে হলো। কোথাও থাকা পায় হতে হবে। বৃষ্টিতে ভেজেছে সবাই পারিষ। সেই কোন সেদ্ধ। অসহ্য ঠোকর মুখে ছুটে পায় হতে হাড়াও বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই একটু থেমে নিতে হলো। সবার ওপর দিকে একটা পাথর পাওয়া গেল, তেমনি জলের ওপর অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। ওখানে ইচ্ছা থাকা থেকে পাক দেওয়া। এরা ভেজে সেরাতেই উত্তীর্ণ হলো, কিন্তু আমার মনে হোল বেকায়দায় পড়ে পায়ে ছোট লাগলেও লাগতে পারে। কাজেই অনাবাদে এসে পায়ের এক দমা গুঁড়ি ঘরে ঝুলে চলে যাওয়া গেল। এবং এবারও লোকদের ভাকে দিতে ঘিরে পারে ছোট লাগলেন, যে ছোট কলকাতা তেমন অনিচ্ছুক ছিল।

তেমনি ঝরনা পার হয়ে বৃষ্টি-ভেজা আর ঘন্টাখানেক পথ পার হয়েই স্থানীয়দের ডাকবাংলো। নাম বাংলো। একটিমাত্র ঘুপচি ঘর-হাওয়া ঘর। গরমিতে ভোজের উপযুক্ত। ঠিকই। তবু আর বাংলোটা যাবার ইচ্ছা হোল না। যদিও ওখানে

ভারতী অপেরা

১১৩, রবীন্দ্র সরণী (আলবার্ট চিৎপুর রোড)

কলিকাতা-৯

প্রোপ্রাইটার :—উমাশংকর ঘোষ

এ বৎসরের শারদীয়া অর্ঘ্য

উৎপল দত্ত — প্রফুল্লকুমার দে'র

নীলরক্ত — আবল হাসান

সেই সঙ্গে গতবৎসরের বিরল বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক

অজেন ঘোষ — নির্মল মুখোপাধ্যায়ের

মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্যসেন (মাস্টারদা) — গরীব কেন মরে ?

নির্দেশনায় :—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

নাট্যাংশে :—নটনায়ক গুজিত পাঠক, জহর রায়, হিরণ বসুমল্লিক, গুরুদাস মিত্র, শচী মংগল, ছবি চ্যাটার্জী, মায়া পাল, মৌসুমী চাটার্জী ও সুদক্ষ নট পলান নস্কর।

ম্যানেজার :—অনিল দাস — সহকারী :—জাই ভালদার

বন্ধু নাম্বর বুশকুক গ্রামবাসীর কাছে

ফটো: বিশ্বনাথ রায়

পাহাড়ের ঘরে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে। কেন না, বৃষ্টিতে ভিজে সবাইই একটু বিশ্রাম প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং বৃষ্টি এখনো পড়ছে।

জামা-কাপড় পাল্টে বিছানা পাতা হলো। বারান্দার ধারেই মেওয়ালের ঠিক বাইরেই কোয়েল নদী। কর্ণার জলে সন্ধ্যা যৌবনবতী। উচ্ছল কলতান শোনা যাচ্ছে সব সময়। ঘরে ফেরার তাড়া দিচ্ছে গাঁয়ের লোক। সানাই জাতীয় বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটানা। চৌকিদার বার বার জানা জানালো—রাত্রে যেন কেউ একা বাইরে না বেরোয়। ভালুকের বড় উপদ্রব এখানে।

রান্না ঘরে গেলো তাড়াতাড়িই। খিচুড়ি, মাংস, পাঁপর আর চাটনী। খাওয়া সেরে সবাই বিছানায় শুয়ে পড়লো ক্যাম্পফুল থেকে। আমারও ক্লান্তি আসছিল বলে কোন রকমে চায়ের্ণীর নিয়মরক্ষা করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুলেও কি ঘুম আসার উপায় আছে মোস্কুদার জ্বালায়। আলো জ্বালতেই আসিস চেঁচালো—মোস্কুদা, কীস্ বলছে তোমার নাকে ছিপি আঁটবে। কান্ত বলল, না না একটা উপায় পেয়েছি। মোস্কুদার ডান কানে শুলে নাক ডাকে না। এই ব্যাস। কান্ত মোস্কুদাকে ডান কাত করে দিলো!

রাতে ঘুম কারোরই ভাল হল না। সারারাত বৃষ্টি এবং কোয়েল নদীর অবিশ্রান্ত কলতান। পাহাড়ী চুহার দল হার্ডল রেস দিল সারারাত ধরে আমাদের নাক মুখ চেয়ের ওপর। পাঁচটার আগেই চা তৈরি হলো। হাতমুখ ধুয়ে প্যাকিং করা হোল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু অপেক্ষা করার উপায় নেই। সামনে লোহাজঙ্গের চড়াই। সেটা পার হতে হবে রোদ ওঠার আগে, নয়তো জন্তুজানোয়ারকে নিয়ে মুস্কিল হবে। পান সিং-এর ফলল লটবহর নিয়ে যাত্রা করলো। ও অন্যপথ দিয়ে লোহাজঙ্গ যাবে। মহুয়ালীর পথ ধরে দিয়েছে। ও পথে খচ্চর যেতে পারবে না।

বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি জড়িয়ে সবাই পথে নামলাম। ছোট ছোট ঝোপঝাড় ভীড় করে এসেছে সরু পায়ে-চলা পথের ওপরে। সেগুলো বোঝাই ফোঁকে। সমস্ত সুযোগ পেলেই লেপ্টে লাফিয়ে পড়ছে গায়ে। আসিসের মোজাটা হঠাৎ লাল চোখে পড়ায় জুতো খুলে দেখা গেল রক্ত ভেসে যাচ্ছে মোজা। কখন যে ফোঁক লেগেছে বোঝাও যায় নি।

সামনেই পথ চলা। খাড়াই পথ। টিপটিপে বৃষ্টি। ফোঁকের থেকেও বড় উপদ্রব এক রকমের বিছুটি ঝোপঝাড়ে। কোনরকমে ধাক্কা একটুকু ছোঁওয়া লাগে তবে সারা শরীর জ্বলে ওঠে। মনে হয় গায়ে আগুন লেগেছে। কিন্তু সাবধান হবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। সেই বিছুটির জঙ্গলের মাঝ দিয়েই যে আমাদের পথ। যেতেই হবে।

অল্প কিছুটা এগিয়ে মনে পাহাড়ী পথের দেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সামনে জিমন্যাস্টিকের কায়দায় সে জায়গাটি পার হয়ে কয়েকটা বাঁক নিয়ে এসে হাজির হওয়া গেল মহুয়ালীতে। সেখানকার পঞ্চায়েত ঘরে বসে তাদের খুব মনোযোগ সহকারে পঞ্চায়েত রীতিনীতি হিন্দী খবর শুনেছে।

মহুয়ালীতে এ অঞ্চলের শেষ ডাক-ঘর। এর পর পথের অন্য কোন মানুষ যেন চৌকিদারও নেই। এখানে একটি সমবায় ভাণ্ডার আছে। রেশনের জিনিসপত্র সেখানেই পাওয়া যায়। একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। গ্রামসেবকের আস্তানাও এই গ্রামেই। এখানকার পঞ্চায়েত ঘরটি বেশ বড় এবং ভালো। কয়েকটি ঘর আছে। আলো-হাওয়া প্রচুর। পরিবেশের একটি ভালো মানসিক অনুভূতি।

চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। গ্রামসেবক ভদ্রলোক চায়ের ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের লোকে ভীড় করে এলো দিল্লীর তীর্থযাত্রীদের সাথে আলাপ করতে। বিদেশী নাম বলকাতা থেকে বাবুরা ছুটে ছুটে এলো, তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অবাক বিস্ময়ে শুধুই তাকিয়ে থাকে।

চিঠিপত্রের পাট চুকলো—চা খাওয়া হোল তবু বৃষ্টি থামে না। কাজেই আবার ওঠো। বর্ষাতি চাপাও। বন্দুক ওঠাও। মেঘে নাও ফ্রাস্ক—ওয়াটার বটল, —ক্যামেরা—সুরবীণ—আইস এক্স ঠিক আছে কিনা। পরক্ষণে বৃষ্টি—চল এগিয়ে। সমস্ত গ্রামবাসীদের অভিবাদন নিয়ে পথে নামলাম। ওরা বললো—দূরে ডিমাটি বিরাট পাইন গাছ—বলল, ওই চড়াইয়ের শেষেই লোহাজঙ্গল।

সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে ঝোরে জল নামছে। তার মধ্য দিয়ে চলা। কাদা, ফোঁক আর বিছুটি গাছের গা ছিন্ন ভিন্ন করা উপদ্রব। মেঘে ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে। অল্প দূরের কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ী ছেলের দল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে পূর্বদিকের বনের মধ্য দিয়ে চলেছে মাহুলালী স্কুলের দিকে। ওরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। ওদের চোখগুলো আশ্চর্য অদ্ভুত। পাথর কুঁদে তৈরি। নিষ্পলক বন্দুকের মত। এক হাতে আবার মাটির ভাঁড়ে চুনে-গোলা জল আর একটুকরো কাপড়। দেওয়ালের কাজ করবে। জল মেখে আবার ঘষিয়ে এনেছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। আমরা লোহাজঙ্গল পৌঁছলাম। ছোট্ট দোকানের চৌকোণ ঘরের বাঁশ নামাতে নামাতে আসিস বলল, স্যারে, চড়াইটা শালিক হয়ে গেল কি করে? সত্যি এ পথের প্রসিদ্ধ চড়াই লোহাজঙ্গল আমরা বিনা পরিশ্রমেই পার হয়ে এলাম।

লোহাজঙ্গলের উচ্চতা নয়শালার কুট। মাঝখানে কয়েকটা বিরাট পাইন, ফার আর দেওদার গাছ। তার নিচে ঘাসজমি, ঝোপঝাড়। একঘরে ঘাসে ঘাসে মেশে মিশেছে ঘন শ্বেত মাহুলালীর দিকে, অন্য দিকে পথ নেমেছে ওয়ানের দিকে। বড় গাছ কটি ছাড়া লোহাজঙ্গল ছেয়ে আছে সবুজে কচি ঘাসে। অল্প পরে শীতকালে লোহাজঙ্গল বরফ ঢাকা হয়ে

হবে। আমের দল ছ মাস ঘুরে ফিরে

একটি ছোট চায়ের দোকান। আর একবার চা খেয়ে নিলাম। পান সিং জানালো সামনে রাস্তা ভাঙা আছে। এবং পথ ভাঙা থাকলে সে ঘোলপথ বাঁচিয়ে দিয়ে কিভাবে পেরোতে হয়। কাজেই আমরা যেন রাস্তা খারাপ বেশলে অবাক হই। তথাস্তু। দেখাই যাক না কেন —কতটা খারাপ রাস্তা আছে সামনে।

লেহাজেলা থেকে একটানা উৎরাই। ভারি বিরক্তিকর একঘেয়ে পথ। আমরা দু ভাগে চলেছি। ডাক্তার, দেবু, কানু আগে এবং পেছনে আমরা চারজন। ডক্তোভ প্রতি পদে বিশ্রাম ঘোষণা করছে। যদিও আমরা বুঝতে ওর মনের জোরের অভাবই এর একমাত্র কারণ। পথে সবাই এদিকের রাস্তা সম্বন্ধে বার বার সাবধান করে দিয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব আছে। কাজেই দল বেঁধে হাঁটতে হবে —অথচ কখনও পিছনেও সম্ভব নয়। পায়ের ওপর চাপ বাড়ে। ডক্তোভ তাড়াতাড়ি চলতে রাজী নয়। কিই কিই করে। তবু চলতে হয়—চলতে হবে। একটা ওষুধ অন্তত না খেলে রেত ওর থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ চলার পর পথের বাঁকে একজনকে দেখা গেল। পাহাড়ী লোক। পিঠে হাতিয়ারপত্র। কাঁধে ঝোলা হাত তুলে নমস্কার করলো। হাতের ভেতর ভাঁজ করা একটা পোস্টকার্ড। চিনতে অসুবিধা হোল না—কানুর হাতের লেখা। লোকটি বললো—বাবু আমি রাইচাঁদ সিং। আপনাদের জন্য ওয়ান থেকে এসেছি।

গাইড রাইচাঁদকে দেখে আবার নতুন-ভাবে উৎসাহ পাওয়া গেল। ডক্তোভের বোঝাগুলো সে পিঠে চাপালো এবং আমাই ঘন জঙ্গলের পথে একটু দ্রুতই পা চালালাম।

গল্প করতে করতে একঘেয়ের পথ চলা। একটানা উৎরাই। ছোট ছোট ঝর্ণা পার হওয়া। ঘড়িতে দুপুর বারোটা। রোদের দেখা নেই। বেশ বড় গোছের একটি পাহাড়ী নদী পার হতে হলো জলের ভেতর দিয়ে। নদী পার হয়ে পাথরে বসে দুপুরের খাওয়ার পাট চুকানো হলো। রাইচাঁদ বললো—ওয়ান এখনো মাইল পাঁচেক।

পাহাড়ী পাঁচ মাইল শেষ হতে চায় না। একটানা চড়াই। এবং সমানে বৃষ্টি। বর্ষাতির ফাঁক ফোঁকর জল ঢুকে ভেজা অবধি ভিজিয়ে দিয়েছে। পদে পদে জুতো-মোজা। ঝাপসা হয়ে উঠছে চশমার কাচ। ডক্তোভের চলতে কষ্ট বোধ করছে। আমাদের দলের ভার রাখতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত রাইচাঁদের সঙ্গে মোলুয়া আর আস্তে এগিয়ে গেল। ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একটানা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা দুজনে চড়াই ভাঙতে লাগলাম।

শেষ মুহূর্তে ঘন গাছের ফাঁক দিয়ে ওয়ান গ্রাম চোখে পড়ল। গ্রামের ওপরে ঘন হয়ে আছে পাইন আর দেওদারের জঙ্গল। কোয়েল নদীর সেতু। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমাদের দেখাচ্ছিল। আলাপ হলো। সেনাবাহিনীতে কাজ করে। পরিচয় জানিয়ে ছুটি করেছে। তাকে সিকিমে কাজে যোগ দিতে হবে। গল্প করতে করতে এগোলাম। ডক্তোভের পেছন থেকে একাগত কিই কিই করতে থাকে—যেন এই চড়াই—এই বৃষ্টি—এই জঙ্গল—এই কষ্ট—সবের মূলে কারণ আমি। বুঝতে পারি ওর কষ্টটা। কাজেই মুখ বুজে সহ্য করতে হয় সব। এদিকে বৃষ্টির জোর বাড়ে। চশমা খুলে পকেটে রাখতে হয়। চারদিক ঝাপসা হয়ে আসে। কিছু দেখা যায় না। সঙ্গী ছেলেটির পাশে পাশে অন্ধের মত চলা। এবং অল্প একটুতেই একটি ডাক কানে আসে—বাবুজী আইয়ে, গরম চা পিইয়ে। রাইচাঁদ তার বন্ধুর বাড়িতে আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের আস্তানা—বনবিভাগ গৃহ —গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের প্রান্তে। আরও কিছুটা উঠতে হবে। ডক্তোভের দাঁড়াতে চাইলো না। টলতে টলতে উঠে গেল। ডাক্তার বলেছিলো। অন্য সবাই চা খেয়ে চলে গিয়েছে। মোলুয়াছিলের ঘরে দেওয়া মিষ্টির লাল চা খেয়ে সত্যি অপূর্ব ভালো লাগলো। বৃষ্টির বিরতির লক্ষণ নেই। চা খেয়ে ডাক্তার আর আমি ডাকবাংলোর পথ ধরলাম।

ওয়ান ডাকবাংলোটি গ্রাম থেকে বহু ফার্লং উপরে। উচ্চতা অন্তত হাজার ফুট। চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। দুদিন আগে অপর একটি দল এ পথে দুপুরভোজ সেরেছে। তাদের রসদের অবশেষ সঙ্গী হয়েছেন বাংলোর ঘরে। পান সিং পৌঁছয় নি। ওদের একজন ভোরেলে এগিয়ে দিলেন। কম্বল দিলেন। যতদূর সম্ভব ভেজা জামা-কাপড় ছেড়ে গা-হাত-মাথা মুছে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকা শুরু হলো। ঘনে ঘুলির আনেজ। যত বৃষ্টি হোক —যত বাধাই আসুক—আমরা এখন আর থামতে রাজী নই।

পান সিং-এর দলবল এলো। স্টোভ ধরিয়ে চা খেয়ে মনে জোর এলো। রাইচাঁদের সঙ্গে যাত্রার আলোচনা শুরু হলো। কুলিরা এ পথে বিশ কেজির বোঝা বয়ে নিয়ে যায়। দৈনিক ছ টাকা হিসেবে। মুহূর্ত মুহূর্তে অবধি যাওয়াতে পাঁচদিন কম পক্ষে। আর ফেরত-পথে ছেলে আসতে আট দিন। মোট তের দিনে ওর হিসেব মতো কুলি ভাড়াই দিতে হবে প্রায় একশো টাকা।

চাল ডাল আটার হিসেব নেওয়া হোল। যা মনে আসছিলো একদিন হয়তো ফুলবে না। আরও অন্তত দু দুরেক টাকার জিনিস কিনতে হবে। আর বেশি জিনিস মানেই বেশি কুলি—বেশি কুলি মানেই আরও টাকা। চড়-বৃদ্ধিহরের সবকিছুই বেড়ে চলে পাল্লা দিয়ে, শুধু টাকার জোগান ছাড়া।

কাজেই সে আলোচনায় আমরা যোগ দিলাম না। ঠিক হলো ছজন কুলি নিয়ে রাইচাঁদ আমাদের সঙ্গে যাবে। উৎসাহ দুপুরুষ। এবং সম্ভব হলে মিউনারলালকে পার হয়ে মৈলমুন্ডে ফিরবো—রাইচাঁদের ভাষায় শিলি লম্বোয়ের দিকটা একটু দেখে আসব। তবে রাইচাঁদের ধারণায় একটু বেশি প্রস্তুত হয়ে আসলে এবং হাতে অন্তত সময় থাকলে এ পথে যোমসুন্ড গাঁও হয়ে নন্দাদেবী উপত্যকার অবতরণ করা সম্ভব। তার এই ধারণার সমর্থনে পরে —এখানকার অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিকারী ফুন্ডুপ সিং-এর কথারও শুনেছি।

একদিকে কানু রায়ের বাস্ত এবং এপাশে আমরা কজন মালপত্র নিয়ে পড়লাম। প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস হিসেব করে নিতে হবে। বাড়তি বোঝা এক ছটাকও থাকলে চলবে না। ভুলে কিছু ফেলে গেলেও—ক্ষমা নেই। পাহাড়ী পথ এদিক দিয়ে বড় নিষ্ঠুর। ভুলের জরিমানা অবশ্যই বেশি।

রাত নটা অবধি স্কীকিম চললো। সব কিছু গুছিয়ে রেখে ডক্তোভকে বাকী সব জিনিস লিস্ট করে দেওয়া হোল। এবং সেই সঙ্গে তাকে এই কদিনের কর্মকাণ্ড ডায়েরীতে লিখে রাখার দেওয়া হলো। ভ্রমণের লোকেরা জীবনযাপন—তাদের সুখদুঃখ—আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি চিত্র দেখতে চাই। আর চাই তাদের অর্থনৈতিক জীবনের একটি পূর্ণ

দেওয়ালীর উপহার
এক খরচায় তিন (৩) পোজের ছবি তুলুন। মূল্য—৭০০ টাকা।
ফটো বিউটি
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া
(কালীবাবুর বাজার)
ফোন : ৬৭-৪৫২৬

পাহাড়ের। চলেছে কাফেলা অনায়াসে ছন্দে ছন্দে। আহার-বিহারও পুরোদমে চলছে। যাত্রাপথটি ভালো এবং চৌকিদার দেয়ালা সিং ব্যবহারে অমায়িক। কাজেই অসুবিধা হবার কথা নয়। এ ভালোই থাকবে। আশা করা যায়।

বৃষ্টি থেমে আকাশে চাঁদ উঠলো ঝিলমিলিয়ে। চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে পাইনের ডেরা পাহাড়ে। তাঁবুর বাইরে দেবদারুর আলো কাঁপছে। রাতের খাওয়া সেরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন সঙ্গী কজন। আমরা পাহারাদী বসার ভাবছি। তুষারের ডাক। ঘণ্টার আওয়াজ। রাত গভীর হয়ে আসে ওঠে।

॥ সাত ॥

হিন্দুরা তীর্থ করতে কিন্তু রুদ্রকুণ্ডকে বোঝায় না। হোমকুণ্ডই হচ্ছে গাড়োয়াল-কুমায়ুনের অধিবাসী মানুষের চিরসাধনার কামনা। আমাদের বাংলাদেশে যেমন ভগবানে বিশ্বাস করে গঙ্গাস্নানের সঙ্গে মকর সংক্রান্তির দিন একটি ডুব দিলেই বৈকুণ্ঠের সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়, ঠিক সেই রকমই গাড়োয়াল-কুমায়ুনের মানুষেরা বিশ্বাস করে হোমকুণ্ডে গিয়ে শিবের যজ্ঞ করে প্রার্থনা জানালে ত্রিভুবনের সব প্রার্থনাই পূরণ হয়। এবং সেই হোমকুণ্ডের পথই গিয়েছে রুদ্রকুণ্ডের পাশ দিয়ে। সাধারণ তীর্থ হিসেবে রুদ্রকুণ্ডের কোন বিশেষ আকর্ষণ অন্যদের কাছে নেই।

ত্রিশূল আর নন্দাঘুণ্টির মাঝে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে চনোনিয়াকোট পর্বত। উচ্চতায় ন'হাজার ফুট। পাহাড় বলতে হয়তো এর চেয়ে সামান্য বয়সের ছিপ দেখা যায়। চনোনিয়াকোট আর ত্রিশূলের মিলনস্থলে প্রায় আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে ত্রিউনাগধলিফল। ত্রিউনাগলি পিছনেই এগিয়ে গেছে হয় হোমকুণ্ডের উৎপত্তি। এখান থেকে কাশফে-বনফুলে ঘেরা সবুজ ঢালু মাইল। আর ত্রিউনাগলির ঠিক নিচেই একটা ছোট্ট ত্রিপ্রেসন। রুদ্রকুণ্ড।

হোমকুণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নন্দাদেবীর কাহিনী। যে নন্দাদেবী গাড়োয়াল-কুমায়ুনে ঘরে ঘরে পূজিত হন ভক্তিভরে। তোলা মহেশ্বরের গৃহিণী আমাদের পার্বতী। দেবী দুর্গা।

স্থানীয় কাহিনীতে আছে নন্দাভগবতী ছিলেন কুমায়ুনের রাজার মেয়ে। পরমাসুন্দরী। গাড়োয়ালী রাজার রাজার ইচ্ছা হয় নন্দাভগবতীকে বিয়ে করতে। এবং তাঁর প্রস্তাব নন্দাভগবতীর পিতা প্রত্যাখান করায় প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি আক্রমণ করেন কুমায়ুনে।

কুমায়ুনের ঘরে ঘরে কান্নার রোল দেখা দেয়। নন্দাভগবতী চলছেন ঘর ছেড়ে। অনেক কষ্টে পৌঁছলেন হোমকুণ্ড। মন দিলেন শিবের তপস্যায়। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর। নন্দাভগবতীকে নিয়ে গেলেন নিজের আলয়ে। তাঁদের বাসস্থানই হল ভারতের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ নন্দাদেবী। আর সেই নন্দাদেবীকে চাঁদনি রাতে পাহারা দিচ্ছে নন্দাকোট পর্বত আর ত্রিশূল। নন্দাদেবীতে যাবার আগে নন্দাভগবতী যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সে কুণ্ডের নাম হয়েছে নন্দাঘুণ্টি।

অবশ্য এই কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রকুণ্ড—হোমকুণ্ড নিয়ে এই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষজনের মুখে মুখে আরো নানা কথা শোনা যায়। নন্দাদেবীর স্থানীয় মতে নন্দা উৎপন্নকে আসতে হয় গাড়োয়াল-কুমায়ুনে নন্দাজাত উৎসব। তবে অর্থ যায়। ছোটো নন্দাজাত তাঁই বছরেই একবার হয়। তখন অংশোপাধি কাছ থেকে পাল্কীতে নন্দাদেবীর মূর্তি সাজিয়ে অনেক ওজন পার হয়ে হৈমবতী অবধি যায়। সেখানে রাত জাগিয়ে আবার ফেরে অংশোলীতে। বড়ো নন্দাজাত সাধারণত বারোটি বছর পরে একবার হয়। সে সময়ে নন্দা উৎসবের সম্পাদনের রীতিমত ঘোষণা করা হয়। অনেক দূরে, বহুদূর এবং বিদেশের সে পথে যেতে দেওয়া হয় না। তীর্থযাত্রী যখন থাকে হোমকুণ্ড। প্রতিবারই পথে নানা দুর্ঘটনায় কম-বিস্তর মারা যায়। এবার বছরের সংখ্যা সত্তর। কত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোন নন্দাজাত উৎসব-যাত্রীদল হোমকুণ্ড পৌঁছতে পারে নি। শেষ বড়ো নন্দাজাতের যাত্রীদল ফিরেছে পাথরনাচুনি থেকেই। পথশ্রমে ক্লান্ত সেই যাত্রীদল বরফ ঠেলে হৈমবতী কিনারকের চড়াই ভাঙতে পারে নি।

রুদ্রকুণ্ডতে বসে চাপা যে মানুষের গুলি পড়ে আছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হোমকুণ্ডের তীর্থযাত্রার ইতিহাস। স্থানীয় গল্পকথায় শোনা যায়, কনৌজের রাজা যশোধবল সিংহ একবার হোমকুণ্ড চলেছিলেন তীর্থ করতে। সঙ্গে অনেক লোকলস্কর। এবং সেই সঙ্গে তাঁর আদরের মহিষী রত্নভা। এবং কিছু বাঈজী।

রত্নভা তখন আসন্নপ্রসবা। তবু স্থির করেছেন তিনি তীর্থ করতে যাবেন। রাজা যশোধবল সিং না বলতে পারেন নি।

তীর্থযাত্রী দল এগিয়ে চলে। দেবী স্বপ্ন দেন রাজাকে, এ পথে বাঈজী নিয়ে তাঁর এই যাত্রার অবসান হবে। পরদিনই রাজা মন্ত্রীদের আদেশ দেন এবং সে আদেশ অনুযায়ী মাটি খুঁড়ে জীবন্ত কবর দেওয়া হয় বাঈজীদের—হৈমবতী কিনারকের চড়াইয়ের ঠিক নিচে। জায়গাটার নাম হয় পাথরনাচুনি।

পাথরনাচুনিতে মাইচাঁদ আমাদের সেই গর্ত তিনটে দেখিয়েছিল। তবে নাকি এক অভিযাত্রীদল এখানে খনন করে নাকি নাকি তিনটে কঙ্কাল পেয়েছিল। অবশ্যই বিজ্ঞানের সুযোগ পাই নি, তবে গর্ত তিনটে আজও দেখা যায় সেখানে।

বাঈজীদের জীবন্ত গোর দিয়ে রাজা যশোধবল সিং এগিয়ে চলে। হৈমবতী কিনারকের চড়াইয়ে পার হয়ে

হৈমবতী কিনারকের পথের পাশে

ফটো: অমীক চক্রবর্তী

দুর্নিরা গ্রহের জন্ম একটু আগে রাশী—তাঁর অসুখ হয়ে পড়লেন। পরপর ছ'টি রাশীর প্রসববেদনা উঠেছে। কিন্তু সন্তান এগিয়ে দিয়ে সেই রাত্রের মত আস্তর নিয়েছিল জেনানা-মহলে। বাকীরা সেখানে হাতে হাতে পড়ে তুললো এক পাথরের প্রসবগৃহ। সন্তান প্রসব হলো। কিন্তু তাঁরা হলেন নশ্বর-ভঙ্গুরতা। পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। সেবা-বিশ্রাম ছেয়ে গেল চারদিক। হিন্দুলীর পশ্চিম শিখর থেকে ঠাণ্ডাবেগে নেমে এল তুষারঝড়। হতভাগ্য সন্তানরা মারা গেল মুখপুড়ের বুকে। এদেরকে রাশী বলতো—নরজাতক—কিংবা অসুর সন্তানরা কেউই দেখা না দেবেই। তাঁদের করুণ বিচারে।

দুর্নিরা গ্রহের জন্ম আগে এই নিসর্গপুরুষ অন্তত দাঁড়িয়ে আছে। কাহিনীর সত্যাসত্য বিচারের জন্য ১৯৫৮ সালের অভিযাত্রীদল এ অঞ্চলটিকে পুরোপুরি তন্নতন্ন করেছিল, কিন্তু কোন নিদর্শনই এখানে পাওয়া যায় নি। পরে স্থানীয় প্রত্নবাদের স্থানীয় ওয়ানের অনেকজন অধিবাসীর সহায়তায় পল্লী-কাহিনী স্মৃতিবিজড়িত এ তাঁবুগোটি তিন দুটি মত উঁচু করে পাথর দিয়ে ঘিরে বিরোধিলেন। এরা একে বলে থাকেন রাশীরা সুরেজ। সুরেজ অর্থে প্রসবগৃহ।

প্রবল ১৯৫৬ সালে চারুত সরকারের উদ্যোগে যে অভিযান হয়েছিল, তাতে মুখপুড়ের মুখটাকে এমন স্থিরভাবে কোন নিদর্শনই এখানে পাওয়া যায় নি। এই মত বাহিনের দেবতাদেবের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে তাঁরা এখানে দুই ধারার মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। এবং সাধারণত তাদের এক ধারার সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মিল থাকলেও অপর ধারা উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী তাদেরই নয়। অনেকেই বলেন, এখানে পড়ে গেছে গ্রহমধ্য যোদ্ধার সৈন্যদল, যারা চলেছিল দিগন্ত জয় করতে। কেউ কেউ আবার বলেন, এরা জারোয়ের সিংহের সৈন্যদল। যোট কথা মুখপুড় নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বরফচাপা হতভাগা মৃতদেহগুলো পড়ে আছে শত শত বছর। অনাদৃত অবহেলিত।

৪ আই ॥

খাবার চলা উত্তেজনা মনে থাকায় আজ আর কাউকে ডাকতে হোল না। পরিচারা ভোরে উঠে চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে সবাই কাজে হাত লাগালো। ফাইটার তার দলবল নিয়ে এসে হাজির হলো। প্রত্যেকের বোঝা সমানভাবে ভাগ করতে লাগলো। মালবাহকদের ঘরের লোকজন এসে ভাড় জমালো বারান্দায়। মাঠে ডেক চেয়ার পেতে উদাস দৃষ্টিতে সামনের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে ওয়াংচু। সবলেই ব্যস্ত। একমাত্র তাকেই যেন ছুটি দিয়েছে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তাঁরা মালবাহক নিয়ে পথে নামলো। আমরা আসুলেশ মাত্র ছ'টার ব্রেকফাস্ট সেরে পথে নামলাম সাতটায়। ওয়াংচুর ডাকবাংলো থেকে আরও একটু এগিয়ে পাহাড়ী ঝর্নার ধার অবধি এলো। দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। ওকে তখন ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল।

ওয়ান থেকে মুখপুড় চারটে পথে যাওয়া যায়। প্রথমে সুকী-বাসতা হয়ে বন্দুবোবাসা। এ পথে উৎরাই কম। একটানাই উঠে যাওয়া। লোক চলাচল আছে। পরিচয় লোক জোগাড় করতে যায়। মেষপালকদের কুঁড়ে আছে আশ্রয়ের জন্য।

দ্বিতীয় পথ ঝুলা বা বিহুতোলা হয়ে পাথরনাচুনি এবং সেখান থেকে বন্দুবো-বাসা। ঝুলাতে বন-বিশ্রামগৃহ আছে। ওয়ান থেকে ঝুলা পথ আছে, কিন্তু গ্রামগুলি পথের কোন চিহ্ন নেই। ঘাস-পাথর আঁকড়ে চলতে হবে। জায়গাটার নাম বিহুতোলা হয়েছে এ্যাকোনাইট থেকে। এখান থেকে সরকারী উদ্যোগে এ্যাকোনাইট সংগ্রহ করা হয়।

তৃতীয় পথ হচ্ছে ওয়ান থেকে সোজা-সুজি উৎরাইয়ে নীলগঙ্গা অতিক্রম করে একটানা ছ' মাইল চড়াই ভেঙে বৈথিনীতে হাজির হওয়া। এখানে একটি আট কুঠে বাই আট কুঠরীর পাথর ছাওয়া ধর্মশালা আছে। এই বৈথিনীতেই প্রতি বছর আসে ছোট বন্দাবাহকের যাত্রীদল। বৈথিনী থেকে আরও মাইল খানেক চড়াই ভাঙলে পাওয়া যায় একটি সম্প্রতি তৈরি পাকে চলা পথ। ফোর্ট '৬৫ সালে তৈরি হয়েছে পাথরনাচুনি অবধি। তবে নীলগঙ্গার সাঁকো থেকে বৈথিনী একটানা ছ' হাজার ফিট চড়াই এবং পথের কোন বালাই নেই। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হয়।

আর চতুর্থ পথ হচ্ছে—নীলগঙ্গা পার হয়ে চড়াইয়ের পথ ভেঙে আলি বুগিয়ালে হাজির হওয়া। ওখানে একটা পরিত্যক্ত আস্তানা আছে। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন পথ ধরে পাথরনাচুনি যাওয়া সম্ভব। এ পথে কষ্ট কিছুটা কম হলেও তিন মাইল বেশি হাঁটতে হবে।

আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম বৈথিনী হয়ে যাবো। পুজো দেব ওখানে বৈথিনী আর পার্বতীর মন্দিরে। তারপর ওয়ান পার হয়ে উৎরাইয়ের পথ ধরবো নীলগঙ্গা নদীর দিকে। রাইটার এবং জারোয়ার দাঁড় তারের সেতুটা বহু দূরের পাহাড়ের ওপর সূর্যকরোজ্জ্বল হয়ে আছে। ডান পাশে আলি বুগিয়াল। সামনে বৈথিনী বুগিয়াল।

বুগিয়ালে পৌঁছবার আগে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হিমালয়ের ঘাটগুলি হাজার ফিট ওপরে বড় গাছ দেখা যায় না। ঝোপ-ঝাড়ের চিহ্নও যায় বিলীন হয়ে। মাইলের পর মাইল জুড়ে দেখা যায় পাথরাবৃত-ভেড়ার। এখানে থেকে ভেড়ার হাজার ফিট উচ্চতায়।

শীতে এই স্থানগুলি আট-দশ ফিট বরফচাপা থাকে। শীতের শেষে বরফ গলে। জাগে ঘোড়ার উদ্ভিদ পায়। ভাদ্রের আগেই মাথা তোলে ঘাসের দল। তখন নিচে থেকে পশুপালকের দল তাদের বহু ভেড়া-ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এসব জায়গায় উঠে আসে। তারি কয়েকটা তাদের ঘাঁটি-বাড়ী। সারাদিন তাঁবুগুলোতে উনুনে আগুন জ্বলে। ঘুরে বেড়ায় সেই পশুর দলের সঙ্গে। তাদের সর্বসময়ের সঙ্গী ঘোলাটে লাল চোখের বিরাট বিরাট ভালো কুকুর-গুলো। সারা রাত এরা নির্ঘুম তাঁবু গুলোকে পাহারা দেয় বন্যজন্তুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে। এ অঞ্চল ভেড়া

আপনার শিশুকে প্রাত্যহিক

প্রোটিন, ভিটামিন বা চার্চ স্কুলে ভর্তি করা কিম্বা সহজাত বুদ্ধি, এদের কিছুতেই কিন্তু প্রতিযোগী অধিকারী হবে না।

কেবলমাত্র জন্মা-সময় সাহিত্যই শিশু ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের বুদ্ধি-বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিতে পারে।

চিলড্রেন্স ডাইজেস্ট অল্পবয়সে শেখা-বুদ্ধি তার সঙ্গে অজ্ঞান মিশে হতে মিশে। শেখার তার বুদ্ধি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। শিশু ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য এটি ভারতের একমাত্র সার্থক পত্র। তাদের সবচেয়ে ভাল উপহার। আজই নাম লেখান।

বার্ষিক চাঁদা ১, ডাকে/এম ৩.১২, ভি.পি.পি. (অন্তত চার্জ ১, বোম্বের বাইরের ডাকের জন্য)। ঠিকানা বিভাগের জন্য অনুসন্ধান করুন। (১) হিন্দীনিবোধন, বাঙ্গালোর (২) ৫, এস্প্লি, হাইলাম, এলাহাবাদ ও (৩) পঞ্চিম সিনিমেকেট, কলিকাতা।

চিলড্রেন্স ডাইজেস্ট

৮৭, ওয়েস্টার্ন রোড, বোম্বে-৫।

ভাবী চিন্তা আর মানুষের ভালবেসে ছুটেই প্রস্থান।

মেয়েদের দল এক-একটা ঝুড়িকাতে আনতো বালুর। মাঝের ভাগে ছাউনি তৈরি হবে। পাতের অংশ মানুষের সমান ওপরের মেয়েদের আসবে অতি... ওপরের ভাগে ভেঙে না পড়ে। পরের ... বহুদূরে কাজে পারবে। এমনি তৈরি-কাজের ঝুড়ির হিসাবে প্রচুর। পাথরের পাঁচিলের আড়ম্বরহীন। এবং সে পাঁচিলও ফেলার সময় চালাটা না মুছে দেখে যায়। এমনি কাজে প্রয়োজনে আসবে।

হুমায়ুনের এই পরিপার্শ্বের কথা ওয়াশিংটন নাম করা পরিবারের মেয়ে অনেক বোঝা বহন। এরা ঝিনু দিতে দিতে ভেড়ার দলের সঙ্গে পাড় পাহাড়ের গা বেয়ে এসে অদ্ভুতভাবে উঠে যায়, দেখলে চমক লাগে। হিমালয়ের ওকালা প্রদেশের সন্ধানদাতাও এরাই। উৎসাহীনিভাবে ঘুরতে-ঘুরতেই এরা বাহির হয় প্রদেশের দুয়ারে। তোলার নিয়ে যাওয়া মুকুলের ছোলা চিবোতে চিবোতে দিন কাটায়। অজানা প্রদেশের দুয়ারে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। তারপরে লোকালয়ে ফিরে গল্প করে বন্ধুবান্ধবের কাছে। পরিচিত হয়ে সে কাহিনী আমরা শুনে ছুটি যেখানে। আবিষ্কারের গৌরব প্রাপ্য হয় আমাদের। রবি-নাম ছাপা হয় কাগজে কাগজে। ইতালী হতে ঝিনু দিতে দিতে ভেড়া-পালকের দল এমিয়ে চলে পাহাড় ডিঙে পাহাড়ে।

ওদের পার হয়ে এসে তোলা উঠলাই পথ এগোলাম। আমরা ওদের পরিচয়ের বন্ধনের সাক্ষী। নদী আমাদের যুদ্ধ না হলেও বন্ধুত্বের এবং পথ চলিতে একটানা বৃষ্টি হওয়ার ফলে বেরুতে জলের আবর্তন এবং বর্ধন।

মাঝের ওপর সামান্য ঘরের মিস্ত্রি নিয়ে ঘরে ওপর পরের মন ওপরে ফেলে দেওয়া হলো। খাড়া পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট বহুরে ভাঁড়। সূর্যের আলো ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। নিচে অন্ধকারের ভ্যাপসা ভাব। বড়দলের পুঁজির ঘন হয়ে পড়েছে। বিছুটির জোর। জোঁকের ঝামেলামি। ভাল-পাহাড়ের ভয়ঙ্কর। হিমালয়ের পরিবেশ।

পথে লোকজনের দেখা নেই। ঘামের ঠাণ্ডা ভয়ে আবার একটানা চড়াই ভাঙতে বুকে টান ধরে। কোথাও কোথাও মাথা নিচু করে হাঁটতে হয়। জোঁকের ভয় প্রতি পদে। আঠালো কাদা। কোথাও বা জমে থাকা কলো ঝিরঝিরে জল। পথের পিছলে যায় পা।

বৃষ্টি নামলো। বর্ষাতি গুটিয়ে নিলাম। পানে পড়ার ঘায়। ফেলাম মাথা ঝোরে। সেদিক নিয়ে কাজ সুবিধেই হয়েছে। দেখের জলো নিচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ঘরের ঘরের বাঁচিয়ে বিশ্রাম নেওয়া আমার চলা। ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড় বেশী ঘনসন্নিবেশ অন্ধকার করেছিলো। বাইচাঁদ বললো, ওগুলো খাওয়া যায়। খেয়ে দেখলাম—বেশ টক টক। আর কিছু না হোক জলতেষ্টা কমে। বাঁচিয়ে একটা ঝাড় থেকে পাড়লাম প্রচুর। দু' পকেট ভর্তি হলো তবে নিয়ে একসঙ্গে চড়াই ভাঙা।

ক্রমে আমরা বড় গাছের রাজ্যে পার হলাম। ফল-এগুরো হাজার ফুট ওপরে চলে এসেছি। এখানে এখন ফুলে যাওয়া সূর্যের উপলব্ধি। লিলি জাতীয় ছোট ছোট ফুলগুলো মৃদু হাওয়ায় দুলছে। এদের মেয়াদ বড়-জোর আর এক মাস। তারপর বরফে ঢাকা পড়বে।

বাইচাঁদ আমাদের থাকি কাজিয়ে চললো মাঠার খোঁজ করতে। ভেড়া-ওয়ালাদের কাছে পাওয়া ছেড়ে পরে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বিকট চীৎকার শুনতে লাগলাম।

অল্প পরে সে ফিরে এলো। মাঠা পাওয়া যায় নি। বললো বৈদিনীতে ছেড়ে খোঁজ করে দেখা যাবে। আবার চলা।

বেলা আর দুটো নাগাদ আমরা বৈদিনী বুনিয়ালে পৌঁছলাম। সত্যি বলতে কি ওকতেরের শিহুটান না থাকার আজ আমরা সবাই যে হাজার মিটের এই প্রসিদ্ধ চড়াইটা বেশ অবলীলাক্রমেই পার হয়ে এলাম। এর শেষ পঞ্চাশটু হাঁটতে তো বেশ মজাই লাগল—হাঁটুভর ঘাসের ক্ষেতের পা ডুবিয়ে ঘাসের ঝোড়ার পরে ঝর দিয়ে চলা। জল এদিক-সেদিক বলেই চড়াল ক্ষেত হয়। আবার চলা।

বৈদিনীর ঝর্ণাশালায় আড়াইটে নাগাদ পৌঁছলাম। ছোট পাহাড়ে পাঁচ ফুটের নীচে একটা সূর্যের শিখরের ঘন্টা। ওপরে ঘোরাই কাজ আছে ওকতেরের বৈদিনী ওর বাসস্থল নিয়ে এল। আমরা ঘন্টা বাজিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করলাম। বাস্ত ঘরা, আজ আর হাঁটতে হবে না। বাঁচা গেল।

বৈদিনীর উচ্চতা ১২৫০০ ফুট—ত্রিশটি পাহাড়ের ঢেরা এবং অপর দিক দিয়ে আমরা এখানে উঠে এসেছি। এই দিকেই পাহাড়ের পর পাহাড় সাজিয়ে স্থানীয় লোকের আনাগোনার সৃষ্টি করেছে একটি ছোট রাস্তার। ঘরে বৈদিনী মন্দিরের সামনে তৈরি ঘরেরে একটি ছোট সুন্দর চত্বর। চত্বর ঠিক যা ঘেরের দেওয়ালের সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে। নেপাল অঞ্চলে এরকম ঘরেরা থাকবে ঘাঁটি। চালা। ওপর ঘোড়ার সঙ্গে দিয়েই ঘরে এটা কিছু না থাকায় ঘাওয়া যাওয়ার প্রচুর সুযোগ। এর ঘরকার ঘাঁটিটি ফুট ঘাড়াই উঁচু এবং পরে ফুট দেড়েক। আট ফুট বাই আট ফুট ঘরেও আমার পরের সামনের দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা। পাশাপাশি দুটো ঘুপরি। মাঝে যাতায়াতের জন্য অল্প গর্ত।

বাইচাঁদ চিন্তিত মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—খুব ভারি পানি আসবে। এবং ভুলিরা এখনো ঘন্টা তিনেক সময় নেবে এখানে আসতে। অবশ্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই বিরাট চড়াই স্থিঠে বোঝা নিয়ে পার হওয়া সত্যি ভয়ঙ্কর। কিন্তু এতক্ষণে আমাদের ঠাণ্ডা লাগা সুরু হয়েছে। সিগারেট বাইরে বেশি রাখা হয় নি। তারপর যদি বৃষ্টি আসে তো চিন্তির।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি সুরু হলো। বৈদিনীতালে জলের বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগলো। বেলা তিনটে-তেই আঁধার ঘন হয়ে এলো। এবং দুর্দান্ত ঠাণ্ডা। সবাই ঘরে ঢুকে খোল হয়ে বসলাম। কাপুনি সুরু হলো। বাইচাঁদ বললো, অল্প ঘুরে ভেড়া-ওয়ালার কুপড়ি আছে। সে সেখান থেকে কাঠ আর আগুন নিয়ে আসতে পারে। আর কিছু না হোক, আগুনে হাতটা ঠাণ্ডায় হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। তাই হোক। বাইচাঁদ গেল আগুনের খোঁজে। আমরা ক্লান্তি-ভরে সেই ঢালা জায়গার বসে বৈদিনী-তালে বৃষ্টির ফোঁটাপড়া দেখতে লাগলাম। সিগারেটও নেই, খেতেই চেষ্টেলেই ঘরে। সত্যি অসহায়ের অবস্থা।

ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেল বৈদিনী মন্দিরে। বেরিয়ে এলাম। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে। বাইচাঁদ আসছে সামনে। হাতে একটি নবর ছাগলের অর্ধেকটা। পেছনে দুটি লোক কাঠের বোঝা নিয়ে।

বাইচাঁদ বললো—ভেড়াটাকে কালই রাতে চিবোবাবে ভেড়াওয়ালার, ওর অর্ধেকটা দান করেছে আর এই যে আগুনের জন্যে নিয়ে এসেছে চার ঝিনা দাম দেবে বলে।

অল্প নয়। তা সের ছয়েক মাংস তো হবেই। ব্যবসাবুদ্ধি মাথায়

দেওয়ালী !

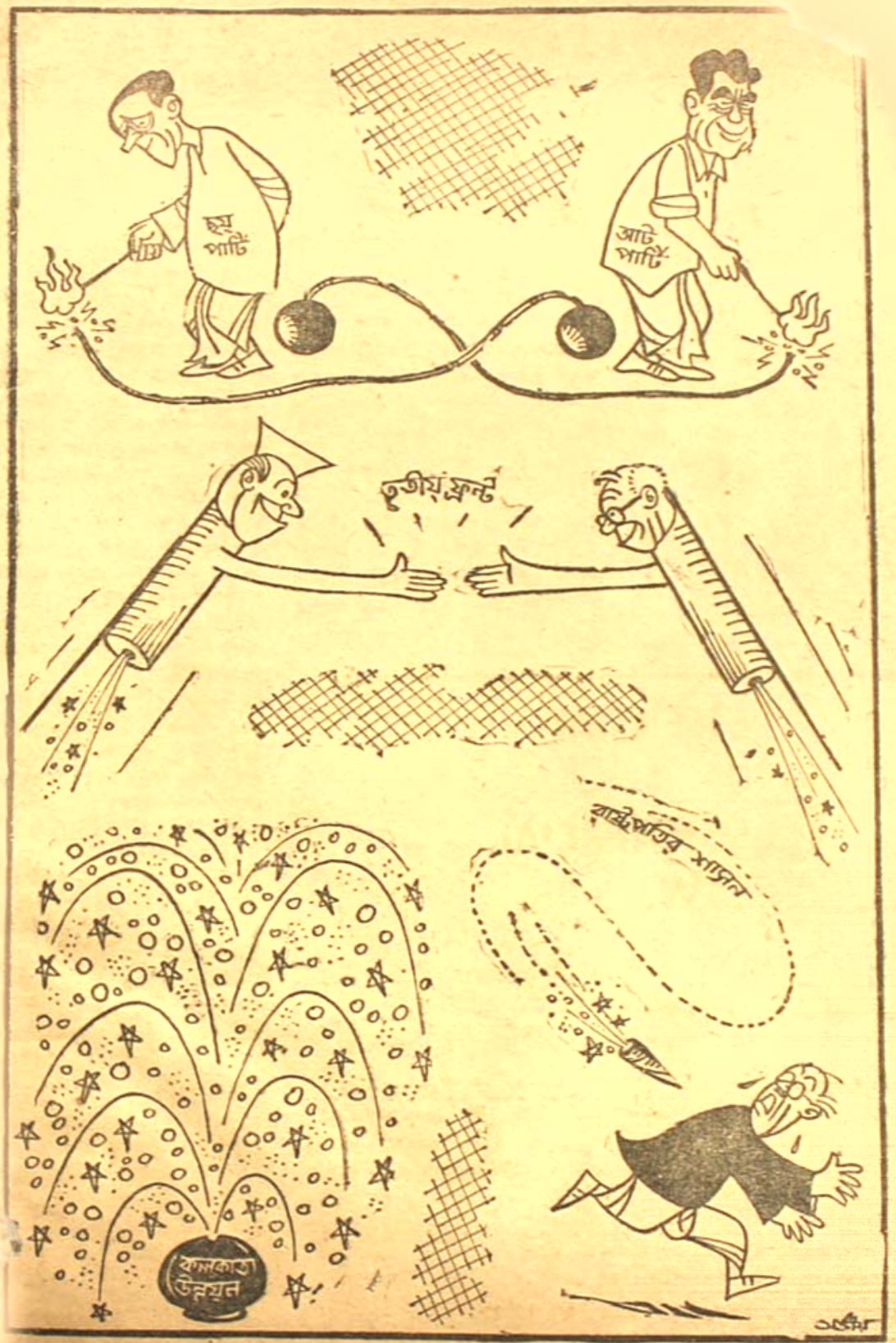

কাটা
ধরাশায়ী
হোল।
রাইচাঁদ
ঘরে। ভেতরে
ঝড়ের মধ্যে
ঘরে বসে
পথ মসৃণ
ফেলে দিলো
ও হলো।
পথ আর কাঁচা
ঘরের চারটিতে অব-
ঘরে চলেছিল। বাইরে
বেরিয়ে এ বৃষ্টি পড়ছে টিপ-
টিপ করে। ব উৎসাহে ছেলেরা
দিয়ে মাঝে করছে। অবশ্য
ছেলেদের আশেপাশে পড়ে
থাকা পাথরগুলো দিয়ে এ কাজটা
করতে তার বেশি ভাল লাগে বোঝা
যাচ্ছিল।

বৃষ্টি হলে দুটো লেজ-
হীন ইঁদুর ছুটোছুটি করছে সারা
ঘর জুড়ে। বৈদিনীতীরের জল
একবার ঘিরে চুইয়ে চুইয়ে ঝোট
করবার মত ছুটে চলেছে নিচের দিকে।
আঁধার হয়ে আসছে। ভাবনাদের জন্যে
চিন্তা ঘরে কিন্তু রাইচাঁদের ভ্রুক্ষেপ
নেই। একমনে কাঁচা মাংস চিবিয়ে
চলেছে

ওরা এলো ঘর পাঁচটায়। গ্রাউণ্ড
শীটে জিনিষপত্র মোড়ানো থাকায়
ভেজেনি। কিন্তু ওরা
ভিজে একসা।

মাংস কাটা হয়ে গিয়েছিলো।
চেটে ঘরিয়ে চা খেয়ে প্রেসারে মাংস
চড়ানো হোল। রাইচাঁদ রুটি বানাবে।
ধোঁয়ার জন্য ছোঁয়ে তাঁবু ঘটানো
হলো। ঘরে ধোঁয়ার বড় উপদ্রব।
কাজেই সেখানে বিছানা পেতে এখানে
গ্রাউণ্ড শীট বিছিয়ে আড্ডার জায়গা
করা হোল। বৃষ্টির ফলে মেঘ কেটে
যাওয়ায় শীতটা চাঙ্গিয়ে বসেছে।
তাঁবুর ভেতরেও হু হু করে হাওয়া
ঢুকছে। সবাই বসে গল্প করতে
লাগলাম। কি অদ্ভুত নির্জনতা। সাড়ে
বারো হাজার ফুট ওপরে আমরা
কয়েকজন বন্ধু বসে। কোথাকার লোক
কোথায় এলাম। ভাবতেও অবাক
লাগে। বৈদিনীতীরের বুকে বুগালী
ঢেউ ওঠে। সমাজ, দুনিয়া, আত্মীয়-
স্বজন ভুলে আমরা ক বন্ধু সেখানে
বসে আছি—আধার ঘুরছে সামনের
অথৈ দুর্গম পথের চিন্তা।

খিদে থাকার সাড়ে ছটার মধ্যেই
রাতের খাওয়া শেষ। বাসনপত্র পরিষ্কার
করতে বসে কর্মশালায় এলাম।—কিছু
সেখানে বসে কার সাধ্য। ঘরটা
ছোট্ট। বেরিয়ে এলাম। একটানা বৃষ্টি
পড়ছে। রাইচাঁদকে বললাম, ওর দল-
বলের খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করতে।
আগুন না নেভালে শোওয়া যাবে না।

ঠাণ্ডার চোটে আবার ঘরে ঢুকতে
হোল। ধোঁয়া যেন ঘুরে থাকতে
ধোঁয়ার কষ্ট কম হয়। যাই হোক,
ওদের আগুন নিভলো। দরজার
গ্রাউণ্ড শীট টাঙিয়ে দেওয়া হোল। ছোট্ট
একটু ফোকর রেখে শুধু জুতোটা
ছাড়া বাকী সব কিছু নিয়ে আমরা
গড়াগড়ি হয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু
ঘুম কার সাধ্যি। শিয়রে প্রলয়
ঙ্কারত কাঁকর-পাথর ছুটছে। তিল
ইঞ্চি সরলে আরামও বোধহয় এখন
নেই। ক্রমাগত উৎখাত করা। ওদিকে
নেভানো আগুন থেকে ধোঁয়ার
উঠছে। চোখ জ্বালা করে। গ্রাউণ্ড
শীট খুলে দেওয়া হলে তো ঠাণ্ডা
লাগে। এই করতে করতেই ঝম্ ঝম্
করে বৃষ্টি নামলো। ওপর থেকে
অঝোর ধারায় জল পড়তে লাগলো
সারা ঘরে। তাড়াতাড়ি ওয়াটারপ্রুফ
নিয়ে ঢাকা দিলাম। চড়বড় করে জলের
ফোঁটা পড়তে লাগলো—বর্ষাতির ওপর,
তার পর গড়িয়ে এসে ভেজাতে
লাগলো নিচের রিপ্পল-কম্বল-চাদর।
উপায় নেই।

সারা রাত এই চললো, ঘুমের
ট্যাবলেট খেয়েও কারো ঘুম এলো না।
শেষ সমস্ত রাত জেগে বর্ষাতি টানা-
টানি করে জলের হাত থেকে সবাইকে
বাঁচানোর চেষ্টা করলো। এবং এভাবেই
সকাল হলো।

রাইচাঁদের ইচ্ছে আজ এখানে থেকে
যাওয়া। আমরা কোন মতামত দিলাম
না। প্রেসারে খিচুড়ি বানিয়ে খেয়ে
বৃষ্টি একটু কমতেই হাঁটা দিলাম
অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাইচাঁদ দলবল নিয়ে
আমাদের অনুসরণ করলো।

পার্বতীর মন্দিরে নিজেদের
অনাড়ম্বর পূজো দিয়ে বেরুবামাত্র
খাড়াই পথে চললাম নতুন তৈরি রাস্তা
করবার জন্য। এ পথে কিছু চললেই
বুকে টান।
বৈদিনীতীরে। হাতে একটি লম্বর
মত [illegible] দেহের বৃষ্টি
মালা [illegible] বোঝা নিয়ে।
[illegible] বললো—ভেড়াটাকে কাঁধে
আর চলতে পারছে। ভেড়াওয়ালার
ঘণ্টাটিক পরেই চলাটা অভ্যস্ত হয়ে
আসে। আর কষ্ট হয় না। আমরা
পায়ে চলা পথ ছেড়ে দিয়েছি।

চড়াই হলেও এ পথে চলতে
অসুবিধা হয় না। কেন না পাথরের

ESSENTIAL OF COMMERCIAL LAW.

by

An Experienced Professor

Revised ...ente ...dition

: CONTENTS :

1. Law of Contract. 2. Sale of Goods. 3. Partnership. 4. Negotiable Instruments. 5. Law of Insolvency. 6. Arbitration. 7. Securities. 8. Law Relating to Carriage of Goods. 9. Insurance. 10. Industrial Law. 11. Company Law.

Price Rs. 6·00

To be had from

BASUMATI (P) LTD.

166, B. B. Ganguly Street, Calcutta-12

...প্রয়োজন নেই। তিন মাইল ...ন খুব কঠিন পাহাড়ের ...য়ে এসে আমরা পৌঁছুলাম ...নিতে।

...নাচুনিতে বিরাট বিরাট ...র বড়াবাড়ি। কিম্বা বলা যায় ...খের পাথরের রাজধানী সুদূর এখান ...। কেউ যা বলে দেবার অতি- ...ন নচুনি বা বাসিন্দাদের দল এখানে ...য়ে হয়েছে—এমন মনে হয়। ...ল তার বাসিন্দাদের এখানে ...য়ে অদেখে ওঁৎপেতে শুয়ে রয়েছে। ...হিনীর প্রমাণ হিসেবে রাইটার ...মাস সাইজের পাথর দেখালো। ...গুলি ভিন্নটে লেখলে ...সেই মুহূর্তে রাইটারকে ...তে ইচ্ছা হয় না।

...ঝরনা একনাগাড়ে ঝরে পাথরের ...ছিল ক্ষেত্রে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। ...ইয়ের বেশ নামডাক আছে। সেই ...ত পথ। ঘাসের চাদরটা সা ...য়ে চলে। নিচে চার হাজার ফিটের ...খা যায়। একটানে কোথেকে গলদার ...ওকালে মাথা ঘুরে ওঠে। ...ক্ষণ পায়ের বেশি চলা যায় না। ...ছেড়ে। বুকে টান ধরে। তবু ...হবে। ওঠ, চল। আবার বিশ্রাম। ...ক্ষণ সময়। তবু এ বিশ্রাম ...য়োজনীয়।

...চড়াকে উঠতে হয়। খুব ...পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় ...কদিন আগে হয়তো সেটা ...শত বছর আগে—এখানে এই ...চড়াইয়ের পথেও মানুষের ...পথ ছিল। সম্প্রতির অভাবে ...দিয়েছে। পাথরের চাপে ...য়েছে। ঘাসে ঢাকা পড়েছে। ...লোকের চড়াইয়ের পথে এ ...স্পষ্ট বোঝ যায়। বোঝা ...এ পথে নিয়মিত জল চলাচল

...দেখেরা এসে ঘিরে ...লাতে আরম্ভ করে আমাদের ...ড়া চড়াই পথের চিহ্নাঙ্কিত ...লে পড়বার জন্যেই। সবুজ ...ঘাস ...। ঘাসের ...চলা। ...মাথা ...। ...ঘিরে ছেলের আমাদের ...এবার কিলবিলাবে। ...তে হয়। বিশাল কালো ...ছুলের ঝুঁটি। ...ক। চোখ খুব, সেই ...ছাড়ি। বেলার মুখে কোথাও একটা লাল পেতেছিল। কোথা থেকে একটা ঘুঘু ডাকছে সবুজে ঘেরা ঘিটে ওপরে। পাহাড়ি ঘিরে নদীতীরবর্তী ক্ষেত্রে প্রবেশদ্বার।

এখানটা চড়োইরেশন বৈকালে। সামনে পথে পরপর, ঘরগুলো ঘন এবং সাদের দল। এই চড়াই ভাঙতে পরে- চলে ক্লান্ত মনে পড়ার ভগবতী তাকে এইখানেই রেখে যান। এর পরে বন্ধুরা-বান্ধবরা যখনই যাবেনের এবং সাদেশের ঘুরপথ-ঘুরে অনেক পরে পৌঁছেছে। সিলসমূহ হিসেবে নামটার মুখে পাল্টাতে পাল্টাতে রাইটারের মুখে হয়েছে ছিবি- নাল। নইলে গল্পের সঙ্গতি পাওয়া যায় না।

আমাদের আগে যেখেই ঠিক তার ছিল এখানে আত্মা পরপরের পূজো দেখ। রাইটার চরুবরাল ফুল নিয়ে এলো। ধূপ জ্বালানো হলো। অল- মোক্ষম মিষ্টি, কলকাতার খেজুরে, পয়সা-এর বিস্কুট নিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হলো। ওরাওঁর বাঁশের তৈরি পাত্রটা ঘরের পুব ঘরে নিয়ে পুরোধা পূজোর বসলেন। পকেট থেকে ঘরে তোলা কাগজ বেরুলো যাতে লেখা রয়েছে পূজোর মন্ত্র। সবাই ভক্তি- ভরে ঘোলা ঘরে ঘিরে বসেছে। খুব ভাল লাগছিল। কুলির দল অবাক ঘরে বন্দুকের কারুকারখানা দেখছে। এবং একটা আশ্চর্য ঠাণ্ডা অনুভূতি আমাদের এই উত্তুঙ্গ চড়াই ভাঙার পরিশ্রমের কথা আপাতত ভুলিয়ে দিল।

উচ্চস্বরে পরপর স্তোত্র আবৃত্তির সঙ্গে পূজো সমাপ্ত হল। পুরোধা ভক্তিভরে নির্মাল্য ও প্রসাদ বিলি করা সুরু করলেন। মুহূর্তে বোঝা গেল ভক্তজনের হৃদয়ে এত ভক্তি কিসের জন্যে জড় হয়ে- ছিলো। মিষ্টিগুলোর প্রতি চোখ সেই আগ্রহোড়া থেকে।

রাইটার একটা ভালো প্রশ্ন তুললো। পূজো হলো। প্রসাদী বই। ঠিক কথা। ছেলে কাদু পাঁচা পাহাড়ি ঘরিতির পাত্রে আগুনেই রাইটার তুলে পকেটে রেখে বলল, আইটম ওই বাদু। ঘুরোর পালা বিকেই হলো, আবার উঠলো আসিল।

এইবার কুলিদের সমবেত প্রশ্ন বলল। ওরা এক এক করে দেবতার আসন থেকে দু হাত দিয়ে সেই তিন- চার মন ওজনের ঘরিতিকে বুকে সমান তুলল এবং পাহাড়ের ঢালে পাথরের ঢালু পরিক্রম পাহাড়ে। উঠতে হলে আমাদের জন্যে ঘোড়ার, কেবল আর আসিল ঘরের ঘরে।

...ঘোড়া
...পাহাড়
...সমান।

এই চ...
...ছেলের এক মুহূর্তও ...
...মাথার চোখে পড়েছিল একটা ...। ...তখন তার চোখের ঘরে। ঘরের ছেলে ছিল। ঘুরতের পাহাড়ের-পর্বতে। পরের ...ন তিনি আবার এখানে এসেছিলেন ...সুদূ ওই শিলালিপির ছাপ নিতে। ১৯৫৩-তে ভারত সরকারের আর্কিওলজির সাথে এসে হরিণ মিস্টার সেই লিপির আমরা ছিল যদি ওই লিপির পাঠোদ্ধার করে এ পথের সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। কিন্তু না। কোন খবরই নেই। মাঝখান থেকে শিলালিপিটা এই দুর্গম জায়গা থেকে উধাও হয়ে গেল। ছেলেরা কেন যে জানে? ছেলেরা দুখ ছাড়ার সময়ের রক্ষা করবার সেই শিলা- লিপির ছাপটাই। চিল্‌লী তীর্থযাত্রী ছেলেরা নিজে ছেড়ে অনেক করেন। ছেলেরা নিজের সঙ্গের জন্যে লাঠি।

এবার উল্টো দিকে পাহাড়ের ঘা ছেড়ে অনেক উৎরাই। কদুবেরাজা রাইটারের হিসেবে আর রাইলাখানেক। এখানে নানা পাহাড় ঘ-ম করছে ছেলেদুর্গের গড়ন। আশ্চর্য এই ফুলগুলি। নিচে ঘরেরই এই ফুলগুলো ছোট হাজার ফিটের নিচে সাধারণত ফোটে না এবং ছোট ছোট ছেলেই আট হাজার ফিটের নিচে নিয়ে ছেলেই কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এর তীব্র মিষ্টি গন্ধটা একটা আশ্চর্য আনে। ঠিক নীলচে আকাশের সাদা পাপড়ি এই ফুলগুলোকে দু হাজার মুহূর্ত নাগাল পাওয়া যায় না। ছেলে বাচ্চাটার এর ফলের প্রতি গাছে একটি ফুল। হাত ছেলেকে লম্বা হবে ছিঁড়ে। পাথরের পাশে পাশে ফুটে থাকে অজস্র। মন্দ- মন্দ হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে আমাদের আসার জানাচ্ছে পথিককে।

কাদুবেরাজার পৌঁছে গেলাম। দূর থেকেই স্বামী প্রকল্পনন্দ সরস্বতী পুরোহিত ছেলে দাঁড়িয়ে। আমাদের আগের দলের লোকজন সেখানেই আস্তানা গেড়েছে। ওরা আজ হুলস্থুল ছিলেছে। কয়েকজন ঘুরি করেছে সুদূ। আমরা তাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে এগোলাম। ইচ্ছে আছে দুনিয়া ঘরে আমরা আজ কালের করবো।

ডান দিকে ঘাসে ঘনের উঠে গিয়েছে চিল্‌লীর পশ্চিম শৃঙ্গটি। কাছে থাকে এবং পথে ছড়ানো বিরাট বিরাট ঘরের পাথর। পাথর ঘরে একমাত্র ছোবে পড়ে চর- ঘরের ঘুরে। পাথর ছেলে পাথরে পা ছেলে চলা। কদুবেরাজার পরিবেশে একটা

[illegible] ওঠে ছোটা চিন্তা আর মালপত্তর [illegible] বাসা বেঁধেই অবাক্তার। [illegible] ভোরও [illegible] হেমন্তাশরের পথে [illegible] [illegible] পরিজনদের [illegible] [illegible] [illegible]